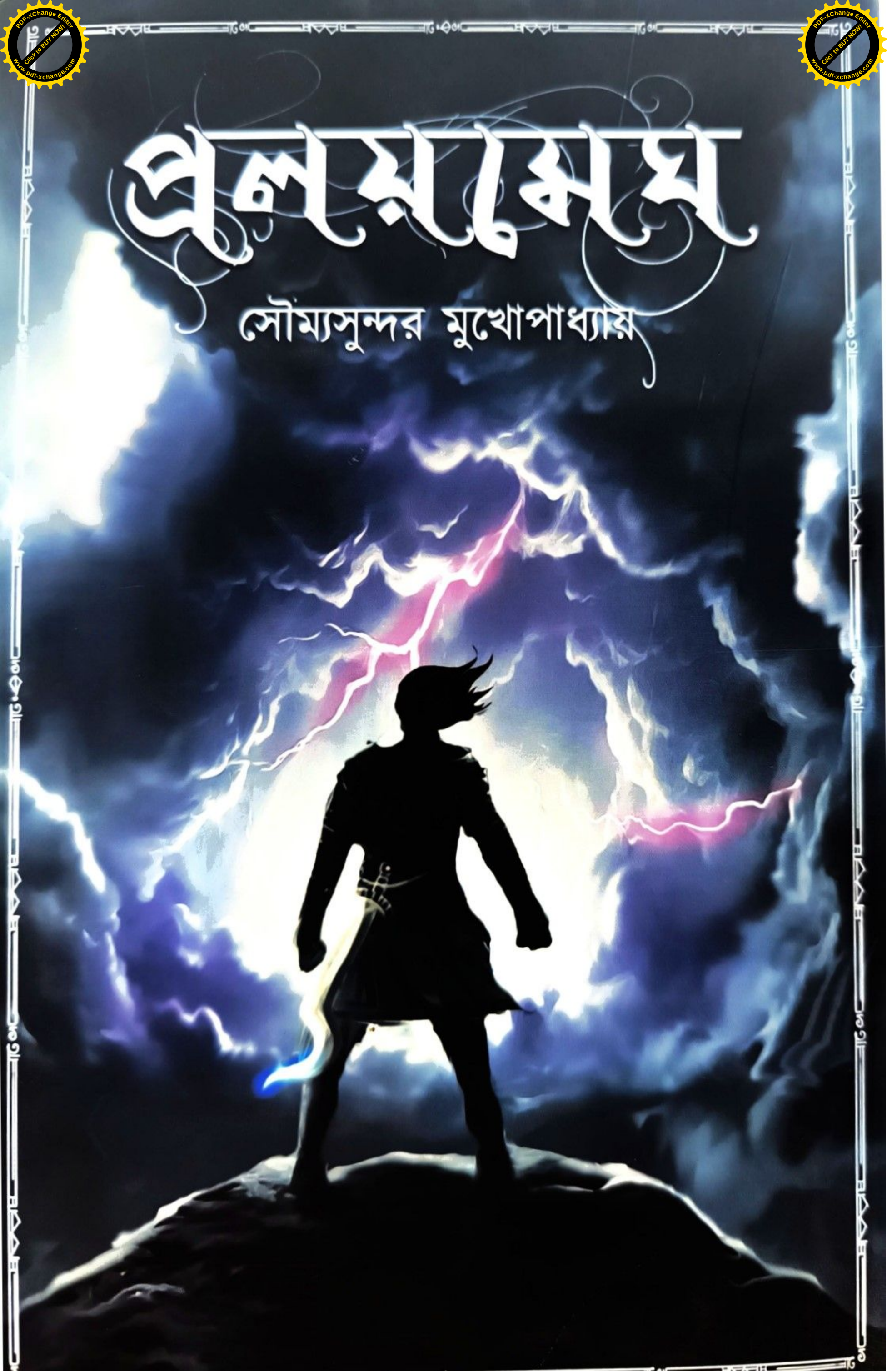


প্রলয়মোক্ষ

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়



রাক্ষসদের রাজত্বে চলছে রাজনৈতিক

পালাবদলের ষড়যন্ত্র, আর তার প্রভাব
সরাসরি এসে পড়ছে সমরগরিমার মানুষ
আর অর্ধরাক্ষসদের দুনিয়ায়। ওদিকে
চুপ করে বসে নেই ঐশিকরাও।

প্রলয়যোদ্ধার হিমশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই
করার জন্য তাঁরা তৈরি করছেন এক
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অগ্নিদানবকে।

এই দানবের সঙ্গে সম্মুখসমরে দাঁড়ানোর
ক্ষমতা আছে একমাত্র অভীর, কিন্তু
তাহলে দুর্ধর্ষ শৈত্যের সঙ্গে দুর্নিবার
অগ্নির এই অকল্পনীয় সংঘাতে অনিবার্য
হয়ে উঠবে সর্বধ্বংসী প্রলয়।

মহাবীর বজ্রধরের রেখে যাওয়া
সমরগরিমা আয়তন সম্মুখীন হতে
চলেছে সেই অমোঘ নিয়তির। শিবের
পাশুপতে ভর করে মৃত্যু আসছে সেখানে
সকলের জন্য; প্রলয়ের রক্তমেঘ ছেয়ে
ফেলেছে সমরগরিমার আকাশ, আর
তারই মধ্যে কেউ সুযোগ খুঁজছে
ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার,
আবার কেউ সন্ধান করে ফিরছে হারিয়ে
যাওয়া ভালোবাসার।

প্রলয়যোদ্ধা অভীর দুঃসাহসিক
অভিযানের তৃতীয় তথা শেষ পর্বে
মহাপ্রলয় আসছে সমগ্র মায়াজগতের
ধ্বংসের বার্তা নিয়ে। অভী নিজেও খুব
ভালো করেই জানে, এই ভয়াবহ
পরিণামকে আটকানোর ক্ষমতা ত্রিভুবনে
কারও নেই। কিন্তু তারপর? সর্বগ্রাসী
প্রলয়ের পরে আর কিছু কি বাকি থাকে?



প্রণয়মোক্ষ

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

অর্যম

অর্যমন প্রকাশনী

Proloymegh
A Novel by Soumyasundar Mukhopadhyay

প্রথম মুদ্রণ : বইমেলা, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
অলংকরণ : ওঙ্কার নাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক
চিরঞ্জী৭ দাস
অরণ্যমন প্রকাশনী
সূর্য সেন স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ
স্টল ২০, ব্লক ২, কলকাতা ৭০০ ০১২
যোগাযোগ ৭২৭৮৯৯২৫৪০

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূ মি কা

“ইট ইজ গুড টু হ্যাভ অ্যান এন্ড টু জান্নি টুওয়ার্ড; বাট ইট ইজ দ্য জান্নি দ্যাট ম্যাটার্স, ইন দ্য এন্ড।”

—উসুলা কে. লে গুই, ‘দ্য লেফট হ্যান্ড অফ ডার্কনেস’

অভী-কে মনে আছে নিশ্চয়ই আপনাদের!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই পনেরো বছর বয়সী ছেলেটির কথাই বলছি— যার সঙ্গে আমি-আপনি সব্বাই এতদিন এক প্রলয়ের পথে হেঁটেছি। যে বইটি এখন আপনি হাতে তুলে নিলেন, সেখানেই পথের শেষ। কিন্তু বইয়ের তিনটি খণ্ড, বিশেষত এই অন্তিম খণ্ডটি পড়লে হয়তো লেখার শুরুতে থাকা কথাটার মর্ম আরও একবার বোঝা যাবে। হয়তো আপনারাও বলবেন, পথের শেষে কী পেলাম, তার থেকেও বেশি করে মনে থেকে গেল এই পথচলাটা।

ফ্যান্টাসি বা কল্পকাহিনি আসলে এই পথচলারই এক বর্ণনা। একসময় মনে করা হত, এক নায়কের অভিযান বা ‘কোয়েস্ট’ না থাকলে কল্পকাহিনি গড়েই উঠতে পারে না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বোঝা গেছে, এমন অভিযান বাহিরের পরিবর্তে অন্তরেও চলে— হয়তো আরও বেশি করে। অভিজ্ঞতা আর সময়ের স্পর্শে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক, তার সঙ্গীরা, প্রতিনায়ক, এমনকি খলনায়ক নিজেও অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যায়। একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হয়, যে মূল লক্ষ্য নিয়ে সূচনা হয়েছিল ওই যাত্রার, তার পরিবর্তে একদম অন্য কোথাও পৌঁছে, অন্য অনেক কিছু পাওয়া আর হারানোর মধ্যে শেষ হয়েছে তা। কিন্তু তাতে না যাত্রাটা মিথ্যে হয়েছে, না ব্যর্থ হয়েছে সেই নায়ক ও তার সঙ্গীদের ত্যাগ ও অর্জন।

এটাই জীবন। আর এখানেই ফ্যান্টাসি তার যাবতীয় অসম্ভাব্যতা, যাবতীয় ‘সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ’ নিয়েও জীবনেরই এক চালচিত্র হয়ে ওঠে। ভেবে দেখুন, আমাদের জীবন কিন্তু শুধুই চাওয়া আর পাওয়া বা না-পাওয়ার সরল সমীকরণ নয়। বরং পথ চলতে গিয়ে কখনও নাকে আসা কদমের গন্ধ, মিস করা ট্রেন, হঠাৎ করে সব ছেড়ে চলে যাওয়া একটা মানুষ, অজান্তে কারও হাতে ঠেকে যাওয়া আঙুল— এ-সব দিয়েই সেজে ওঠে আমাদের জীবন। তাতে পুজোর ঢাকের বাদ্যি আর ধুনি নিয়ে পরিশীলিত নৃত্য যেমন আছে, বিশ্বকর্মা পুজোর ভাসানের মাতাল-নেত্যও তেমনই আছে।

সে-জন্যই শুধুমাত্র দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের ছকবন্দি গঠন অনুসরণ করেনি সৌম্যসুন্দরের এই প্রলয়গাথা। এটি আমাদের ভস্ম থেকে নতুন করে জন্মানোর কথা বলেছে। এতে কেউ হয়তো অনেক পেয়েও অনেক কিছু হারায়। আবার সব হারানো কেউ হঠাৎ আবিষ্কার করে, সংসারের সবচেয়ে দামি জিনিসটা তার বুকপকেটেই ছিল।

এই মুহূর্তে বিশ্ব-জুড়ে ফ্যান্টাসি তথা স্পেকুলেটিভ ফিকশনের ক্ষেত্রে এক বিরাট মন্বন চলছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে চেষ্টা চলছে, যাতে এযাবৎ যে-সব শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের ধ্বনি সাহিত্যের আঙিনায় শোনা যায়নি বা যাদের এতদিন দমন করা হয়েছে, তাদের কণ্ঠেই যেন ভরে ওঠে কল্পকাহিনির দুনিয়া। কৃষ্ণাঙ্গ, নারী, সমকামী, প্রাচ্যদেশীয়— এমন নানা ভাবনায় প্রতিদিন আরও বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনায় ভরে উঠছে এযাবৎ শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ইচ্ছাপূরণে নিবেদিত শাখাটি। একদা বাইবেলের নানা ভাবনার সম্প্রসারণেই সীমাবদ্ধ থাকা কল্পকাহিনীরা এখন ডানা মেলেছে এশিয়া ও আফ্রিকার আকাশে। নারীর মনোজগৎ, সমকামী বা উভলিঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরণ ও অবতরণের ভাবনা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ফ্যান্টাসিতে। তার প্রভাব কতখানি দেখা দিয়েছে আমাদের ফ্যান্টাসিতে, বিশেষত সৌম্যসুন্দরের আলোচ্য ট্রিলজিতে?

লক্ষ করলে দেখবেন, ক্যাম্পবেল-কথিত ‘আ হিরোজ জার্নি’-র কাঠামো দিয়ে শুরু হওয়া এই যাত্রা ক্রমেই সরে এসেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। সেখানে আপাতভাবে খল বা বিপজ্জনক চরিত্ররাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে— যাতে বোঝা যায়, কেন ও কীভাবে নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ‘প্রতিপক্ষের’ ধারণাটি। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-র সরল সাদা-কালোর ছাঁচ ভেঙে নিজের মতো করে একটি বিশ্ব ও তার ধূসর চরিত্রদের নির্মাণ করেছেন সৌম্যসুন্দর। তার একদিকে আছে প্রলয়। অন্যদিকে আছে এক কিশোরের বিস্ময়বিহ্বল চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখার প্রবল ইচ্ছে।

ট্রিলজি এখানে শেষ হয়েছে। অতীত গল্পও আপাতত এখানেই থেমেছে। কিন্তু তার সূত্র ধরে সৌম্যসুন্দর আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন সম্ভাবনা আর কল্পনা দিয়ে সাজানো পথ।

চলুন, এগিয়ে যাই।

নমস্কারসহ,
ঋজু গাঙ্গুলী
সম্বলপুর, ওড়িশা

প্রলয়মেঘসম্ভব

শেষের শুরু কিছুর কথা

“Some say the world will end in fire,
Some say in ice.”

— Robert Frost.

তিনটি বই জুড়ে এই মায়াঘেরা অভিযানে যাঁরা এতদিন অভীর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা সবাই জানেন, অগ্নি এবং হিমের দৃশ্যকল্প কীভাবে বারবার ফিরে এসেছে সমরগরিমা তথা সমগ্র মায়াজগতের নির্মাণে। আজ সেই ছেলেটির যাত্রাশেষের কাহিনির ভূমিকা লিখতে বসে আর এক প্রলয়সন্ধানী কবিতার এই লাইনদুটোই সবার আগে মনে এল। অগ্নিময় লোভ আর হিমশীতল ঘৃণার সংঘাতে প্রলয় যদি আসেই, তাহলে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় আদৌ আছে কি?

বইয়ের শেষে পাঠক এ-প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন, এই আশা রাখতে ক্ষতি নেই। ‘প্রলয়যোদ্ধা’-তে অভীর অভিযান যখন শুরু হয়েছিল, তখন এই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পাঠককে আনন্দ দেওয়া। ‘প্রলয়বহ্নি’-তে গল্প যত এগিয়েছে, ততই গম্ভীরতর হয়েছে বিষয়বস্তু; সমরগরিমার উজ্জ্বল জগতের কোণে-কোণে ক্রমশ ঘনিয়েছে অন্ধকার। ‘প্রলয়মেঘ’-এ অবশেষে আসতে চলেছে বহুজন-ভয়োদ্বেককারী অনিবার্য প্রলয়, যার পূর্বাভাস দেওয়া ছিল অভীর বিগত দু’টি কাহিনিতেই। তাই এই বইতে অন্ধকার হয়েছে গাঢ়তর, বেড়েছে ছায়াদের দৈর্ঘ্য। ছায়া বনাম আলোর এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কার জয় হল, সেই বিচারের ভার সুধী পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তা-ও একটি কথা না বললেই নয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমবার প্রলয়যোদ্ধার গল্প বলতে আরম্ভ করেছিলাম, আজ তার যাত্রাপথ শেষ হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু একই রয়ে গেছে— পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেওয়া। সেই কল্প-আনন্দের সন্ধান যদি অভীর কাহিনিতে আপনি পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

লেখকের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগে একটি ছোটো স্বীকারোক্তি এখানে করে রাখি। এই বইতে শিবের অস্ত্র পাণ্ডপত নিয়ে বেশ কিছু কথা রয়েছে। পাণ্ডপত শিবের অধিকারে থাকা এক চরম ধ্বংসাস্ত্র— পুরাণে এবং মহাকাব্যে উল্লিখিত পাণ্ডপতের সঙ্গে এই বইয়ের পাণ্ডপতের মিল এইটুকুই। অভীর গল্পের মধ্যে পাণ্ডপতকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেই ব্যাখ্যাটি একান্তই আমার মস্তিষ্কপ্রসূত; মহাকাব্যের বিধ্বংসী অস্ত্রটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য অতি সামান্য। লেখকের এই কল্পনাবিলাসে যদি কোনো শাস্ত্রবেত্তা অসন্তুষ্ট হন, আগেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে রাখলাম।

অগ্রজপ্রতিম লেখক মাননীয় ঋজু গাঙ্গুলী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানালাম তাঁর অসামান্য ভূমিকাটির জন্য। শুধু তা-ই নয়, অভীর এই কাহিনি তাঁর ভরসাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল; তাই একান্ত প্রিয় এই ‘হিরো’জ জার্নি’র শেষের গানে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলাম। আর অরণ্যমনের কর্ণধার মাননীয় চিরঞ্জী৭ দাসের কথাও না বললেই নয়। তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে অভীর গল্প এত পাঠকের কাছে পৌঁছত না কোনোদিনই। ‘প্রলয়যোদ্ধা’ সিরিজের নেপথ্যে থাকা এই দুই সমরোত্তমকে অন্তর থেকে আমার নমস্কার জানালাম।

এর পরেও আর একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো বাকি থেকে গেল।

সে ব্যক্তি আপনি, হে পাঠক। আপনার ভালো লাগবে— এই আশায় একদিন বলতে শুরু করেছিলাম স্বর্ণখেচরের সন্ধানে বেরনো এক অতি সাধারণ ছেলের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প। সেই ছেলেটাকে যে অকুণ্ঠ ভালোবাসা এতদিন আপনি দিয়েছেন, তার পাশে থেকেছেন প্রতিটি আনন্দ-বিষাদে, তার জন্য এই লেখকের ঋণ রইল আপনার কাছে। এ-লেখা তো আপনারই জন্য লিখেছিলাম আমি। প্রলয়কালে যখন অগ্নি আর হিম মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে অন্তিম যুদ্ধে, তখন আপনারই চোখের বিস্ময়মাখানো দৃষ্টি কল্পনা করে আমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছি। আপনি না থাকলে কে চিনত সমরগরিমাকে? এই লেখা আপনারই দান, পাঠক— সোনার পাখির দিব্যি!

আনন্দময় হোক আপনার আগামী; অটুট থাকুক জীবনপথের সমরগরিমা।
শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়
অগাস্ট, ২০২৩



।। প্রথম অধ্যায় ।।

বিচারসভা

দুঃস্বপ্ন দেখছিল অভী।

সে শুয়ে ছিল বিরাট পালঙ্কের ওপর, পালকের মতো নরম বিছানায়; তার ওপর পাতা আছে সূক্ষ্ম মখমলের তৈরি লালরঙের চাদর। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় শুতেই আরামে তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘুমটা মোটেই ভালো হচ্ছিল না।

স্বপ্নে লীনাকে দেখছিল সে। লীনা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে; তার বুকে বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে তার পোশাক ভিজিয়ে দিয়েছে। আর তার চোখেমুখে কী তীব্র কষ্টের ছাপ! লীনা কাঁদছে; বলছে, “অভী! যা হোক কিছু করো! এই যন্ত্রণা আর আমি সহিতে পারছি না।”

অভী ছটফট করে উঠল ঘুমের মধ্যে। “কী করব, বলে দাও তুমি। আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় আমি করব। কী করলে তোমার যন্ত্রণা কমবে, বলো আমাকে!”

“আমি নিজেই জানি না কী করে কমবে। তুমি কিছু উপায় করো।”

“তুমি কি বেঁচে আছ? লীনা, উত্তর দাও! তুমি কি জীবিত? কোথায় আছ তুমি?”

“একে কি ‘বেঁচে থাকা’ বলা যায়? জানি না। কিছু জানি না আমি; শুধু এইটুকু জানি, আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। আর আমি পারছি না। অভী! অভী!”

“বলো! বলো!”

“আমি যদি কোনোদিন ফিরে আসি, তুমি কি আগের মতো আমার বন্ধু হবেন? আমাকে ভালোবাসবে?”

অভী দেখতে পেল, লীনার দেহ থেকে ধোঁয়া উঠছে— দেহটা যেন প্রচণ্ড গরম কোনো ধাতুর তৈরি। সে বলল, “তা নিয়ে সন্দেহ আছে তোমার? কিন্তু তুমি কোথায়? তুমি কি ফিরে আসতে পারবে?”

লীনা তাকিয়ে রইল তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে। তার চোখে জল টলটল করছে। হাতদুটো শক্ত করে মুঠো করে রেখেছে সে। ফিসফিস করে সে বলে উঠল, “অভী, আমি যদি কোনোদিন ফিরে আসি, তুমি কি আমাকে মরে যেতে বলবে?”

ঘুমের মধ্যে আবার ছটফটিয়ে উঠল অভী। এ-সব কী কথা বলছে লীনা? গোঙাতে লাগল সে নিজের অজান্তেই। লীনার অবয়ব পিছিয়ে যাচ্ছে, একটা কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলছে তাকে। সে শুনতে পাচ্ছে লীনা বলছে, “আমার ফিরে না আসাই ভালো। আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না, অভী।”

পুড়ে যাচ্ছে লীনার দেহটা, তপ্ত তামার মতো রং ধারণ করেছে তার চামড়া, হু-হু হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, ছাই উড়ছে চতুর্দিকে, দৃশ্যটা কাঁপছে তীব্র তাপে। অভী একটা চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল স্বপ্নের ঘোরটা কাটতে। চারপাশ ভরে আছে অস্পষ্ট অন্ধকারে। তারপর সে বুঝতে পারল, সে বসে আছে রক্ষোপুরীর অতিথিশালার বিছানার ওপর। একটু দূরের জানালা দিয়ে বাইরের মশালের আলোর হালকা আভা আসছে। জানালার একপাশে সরানো পরদা দুলছে মৃদু হাওয়ায়। তার হাত চলে গেল বালিশের নিচে। স্বপ্ন-উপলটা ঠেকল হাতে।

এ ভয়ানক জিনিস মাথার নিচে নিয়ে শোয়া তার উচিত হয়নি। স্বপ্ন-উপল এই ধরনের অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখায়, সে জানে। তবু যদি ভবিষ্যতের কোনো দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, এই আশায় সে ওটাকে মাথার তলায় নিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল। কাজটা অন্যায় হয়েছে। অধিনায়ক বজ্রধর জানতে পারলে বকাবকি করবেন।

গলা শুকিয়ে গেছে দুঃস্বপ্ন দেখে। উঠে গিয়ে স্ফটিকনির্মিত জলপাত্র থেকে আকণ্ঠ জল পান করল অভী।

পাশের কক্ষে আছেন বজ্রধর আর মেঘবর্ণ। সৌজন্যের বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ওঁদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন রাক্ষসরাজ পুনর্বসু।

সমরগরিমার নিয়ামক বিনীতেশকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে; তবে তাঁকে আলাদা করে অন্যত্র রাখা হয়েছে কড়া প্রহরার মধ্যে। সৌজন্যের মতো কারাকক্ষে তাঁর ঠাঁই হয়নি ঠিকই, তবে বিগত রাক্ষস-মানুষ যুদ্ধ বাধানোর পেছনে তাঁরও যে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল, সেটা কেউ ভোলেনি। আপাতত অধিনায়ক

বজ্রধরের ব্যবস্থাপনায় তাঁকে জটায়ুবাহনে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। কাল সৌজন্য আর বিনীতেশ— দু'জনেরই বক্তব্য সর্বসমক্ষে শোনা হবে। রাজা পুনর্বসু বিনা বাক্যব্যয়ে দু'জনেরই শিরশ্ছেদ চাইছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে তিনি ওদের কথা শুনতে রাজি হয়েছেন।

কাল সকালে রাজা ও অন্যান্য বিমোহক ও পত্রতিলক অভিজাত রাক্ষসদের সামনে বসবে বিচারসভা। সমরগরিমার পক্ষ থেকে অভীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক বজ্রধর আর সমরোত্তম মেঘবর্ণ।

আর একজনও অবশ্য এসেছেন সমরগরিমা থেকে, তবে বিচারসভায় তিনি অংশ নেবেন না, বলেই দিয়েছেন। তিনি রক্ষোবৈদ্য। রাজকন্যা উর্মির অব্যবহৃত কক্ষটি আপাতত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

অভী আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু আর তার চোখে ঘুম এল না। লীনার সেই কষ্টে ভরা মুখটা বারবার ভেসে উঠতে লাগল তার চোখের সামনে।

ধীরে-ধীরে জানালার বাইরে আকাশ ফরসা হয়ে এল। রাজপুরী মুখরিত হয়ে উঠল পরিচারক-পরিচারিকাদের কলরবে। অভী উঠে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে।

শরীরটাতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে তার। এই অতিথিশালাতেই গতবার এসে থাকতে হয়েছিল তাকে। সে-বার রাজকন্যা উর্মি স্বয়ং তার তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তিনি না থাকাতে মাল্যপর্বতের রক্ষোপুরী বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে তার।

উর্মির কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল অভীর। এই শত্রুপুরীতে অমন অকৃত্রিম বন্ধু তার আর কেউ ছিল না। দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে সেই জীবন্ত আঁধারের সামনে তাঁর শেষ মুহূর্ত মনে পড়তেই একবার শিউরে উঠল সে।

না, আর বেশিক্ষণ একলা থাকা যাবে না। এই জায়গাটার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একা থাকলেই সেগুলো এসে ঘিরে ধরছে তাকে। শৌচালয়ে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে অভী অতিথিশালায় তার কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল।

একজন বর্ষাধারী মধ্যবয়স্ক রাক্ষস প্রহরী পাহারায় ছিল বাইরে। কাল আলাপ হয়েছে লোকটার সঙ্গে। অভী বলল, “বীরেশ, আমাদের সমরোত্তমরা কি ঘুম থেকে উঠেছেন?”

বীরেশ নামে প্রহরী মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, প্রলয়যোদ্ধা। পূর্বদিকের কক্ষে ওঁরা আছেন। আমাদের সেনানায়িকা গেছেন ওঁদের কাছে। আপনিও চাইলে ওঁদের সঙ্গে যোগদান করতে পারেন। এই যে, এইদিকে।”

তার দেখিয়ে দেওয়া কক্ষটির দরজায় টোকা দিল অভী। দরজা খুলে তাকে দেখে মেঘবর্ণ একগাল হাসল। “কী, ঘুম ভাঙল?”

অভীও হাসল। “বেশ কিছুক্ষণ ভেঙেছে। ভেতরে আসব?”

“এসো, এসো। এঁদের সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এসেছেন। আজকের বিচারসভার আগে তাঁর সঙ্গেই একটু প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিচ্ছি আমরা।”

মেঘবর্ণ দরজার সামনে থেকে সরে গেল, অভী এসে ভেতরে ঢুকল।

অধিনায়ক বজ্রধর ও প্রজ্ঞাকে দেখে নমস্কার জানাল সে। তাঁরাও প্রতিনমস্কার করলেন। বজ্রধর বললেন, “অভী, ভালোই হয়েছে তুমি এসে পড়েছ। রাক্ষস সেনানায়িকা এখনি তোমার কথাই বলছিলেন।”

অভী কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। প্রজ্ঞা বললেন, “অভী, আমি মরুময় প্রসঙ্গে রাজাকে তোমার কথা বলছিলাম। গতবার সমরগরিমার সঙ্গে মাল্যপর্বত যে অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, তার পেছনে সৌজন্য বা তোমাদের নিয়ামক বিনীতেশ যেমন দায়ী, তেমনই আমাদের মহামন্ত্রী মরুময়ের ভূমিকাও নিতান্ত কম ছিল না। সৌজন্যের বদ মতলব সব জানা সত্ত্বেও তিনি স্রেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে গেছেন। পরোক্ষভাবে রাজকন্যা উর্মির মৃত্যুর জন্য তিনিও দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর সাহায্য না পেলে সৌজন্যের এতটা বাড়বাড়ন্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।”

অভী মাথা নাড়ল। কথাগুলো প্রজ্ঞা ঠিকই বলেছেন। তার হঠাৎ মনে হল, “আচ্ছা, সুতসোমের মৃত্যুশোক কি উনি এতদিনে ভুলতে পেরেছেন?”

সেই প্রসঙ্গ তোলা একান্তই অনুচিত, সে জানে। সে শুধু বলল, “কিন্তু মরুময় ঐশিকমায়ার অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মহারাজ পুনর্বসু পারবেন তো?”

বজ্রধর বললেন, “এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল আমাদের। তোমার এই আশঙ্কা সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে, অভী।”

প্রজ্ঞা বললেন, “দেখুন, আমি রাজা পুনর্বসুর মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাইনি কোনোদিন। তাঁকে আমি অনেকবার বলেছি, সমরগরিমার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে অভীকে অনুরোধ করলে সে তাঁকে দেশের মেঘের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দিতে পারে। অভী যে মেঘনিয়ন্ত্রণ-মায়ার প্রয়োগ করতে পারে, তা তো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। ওই মেঘনির্মাণশালার মেঘগুলোকে নিজের মুঠোয় এনেছে বলেই তো মরুময়ের এত ক্ষমতা! ও একটা অতি দুষ্ট লোক; কেউ ওকে পছন্দ করে না। আমি রাজাকে গতকালই বলছিলাম, ‘আপনার কী মনে হয়, কেন মেঘনির্মাণশালার প্রহরীরা অভীকে সাহায্য করেছিল?’ পুরোটাই ওরা করেছিল মরুময়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। ওই লোকটা এ-দেশের পক্ষে একটা অভিশাপ, ওকে ত্যাগ করাতেই আমাদের সবার কল্যাণ। মৃত্যুদণ্ড যদি ওকে দিতে না-ও পারা যায়, রাজ্য থেকে তো বিতাড়িত করাই যায়।”

মেঘবর্ণ এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে অভীর পাশের কাষ্ঠাসনে বসে বলল, “রাজা যদি তা করতে পারেন, তিনি যদি অভীর সাহায্যে সাধারণ রাক্ষসদের কাছে জলের উৎস খুলে দিতে পারেন, তাহলে দেশবাসী তাঁকে দু’হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।”

অধিনায়ক বজ্রধর মৃদু হাসলেন। “মেঘবর্ণ, রাজা পুনর্বসুকে আমি দীর্ঘদিন চিনি। মাননীয় সেনানায়িকা, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলেছে, গর্বিত রাজা আমাদের সাহায্য নিতে রাজি হবেন না। আপনাদের রাক্ষসদের কাছে অভী-সহ আমরা সবাই শত্রুদেশের লোক। এতখানি গুরুত্বপূর্ণ

বাপারে অভীর সাহায্য নিলে দেশবাসীর কাছে রাজার মর্যাদা কমে যাবে; অন্তত রাজা পুনর্বসু সেইরকমই ভাববেন, আমি জানি। তা ছাড়া, মরুময় ঐশিকমায়ার অধিকারী; তাঁকে শাস্তি দেওয়ার দুঃসাহস রাজা দেখাতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।”

প্রজ্ঞা দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন। “সমরোত্তম-অধিনায়ক বজ্রধর, আপনার অনুমান অশ্রান্ত। রাজা আমাকে আগেই জানিয়ে রেখেছেন, মরুময়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে ঐশিকদের কোপে তাঁর সিংহাসন চলে যেতে পারে।”

মেঘবর্ণ মন্তব্য করল, “সিংহাসন থাকার এই এক ভয়। সর্বদাই তা হারানোর আশঙ্কা করতে হয়।”

অভী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। গতবার মরুময়ের সাহায্যেই শেষমুখ কীভাবে তার মা আর মেঘবর্ণকে বজ্রমাণিকের বিষপ্রয়োগ করে উন্মাদ করে দিয়েছিল, মনে পড়ছিল তার। সে বলল, “আর সৌজন্য? তার কী হবে?”

প্রজ্ঞা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, “সৌজন্য যুদ্ধাপরাধী। দুই দেশের মধ্যে কৌশলে যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা করেছে সে। তার ওপর সে রাজসিংহাসনের অন্যায় দাবিদারও বটে। আমার মনে হয় না আজ বিচারসভায় রাজা ওকে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি দিতে পারবেন।”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “সৌজন্য যা করেছে, তার জন্য মৃত্যুদণ্ড ওর প্রাপ্য।”

বাইরে থেকে শিঙার গম্ভীর শব্দ শোনা গেল। প্রজ্ঞা উঠে দাঁড়ালেন। “সভা বসতে চলেছে— ওই তার আহ্বানধ্বনি। আমি এগোচ্ছি, আপনারা আসুন।”

উপস্থিত সবাইকে নমস্কার করে তিনি কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বজ্রধর বাকি দু’জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “একটা কথা মনে রেখো তোমরা। সৌজন্যের কী হবে, তা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু নিয়ামক বিনীতেশকে আমরা এখানে এনেছি কেবলমাত্র সত্য উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করার জন্য। তিনি মাল্যপর্বতের নাগরিক নন এবং রাক্ষসরাজ পুনর্বসুও তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কেউ নন। নিয়ামক মহোদয়কে নিয়ে কী করা উচিত, তা কিন্তু আমরা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর সমরগরিমায় গিয়ে স্থির করব।”

ওরা মাথা নেড়ে সায় দিল। বজ্রধর বললেন, “চলো এবার। সভার উদ্দেশ্যে যাওয়া যাক।”

ওরা বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় রক্ষোবৈদ্য এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে বজ্রধর নমস্কার জানালেন। “কেমন লাগছে, রক্ষোবৈদ্য, এতদিন পর নিজের দেশে ফিরে?”

রক্ষোবৈদ্য তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলেন। “অধিনায়ক বজ্রধর, মাল্যপর্বত আর আমার দেশ নয়। রাজা পুনর্বসু ইতোমধ্যেই আমাকে গোপনে অনুরোধ জানিয়েছেন এখানে ফিরে এসে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতে। কিন্তু আমি সবিনয় তাঁকে আমার অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছি। একদিন

এরাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমি সে-সব কথা ভুলিনি, অধিনায়ক। এখন সমরগরিমাই আমার ঘর; এরা আমার কেউ নয়।”

অভী একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল। “উর্মির সেবাকক্ষটা দেখলেন?”

বৃদ্ধ রক্ষাবৈদ্য আঙুল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিলেন। “দেখলাম, অভী। তার ঔষধপত্রের সম্ভার দেখে অবাক হলাম। বেঁচে থাকলে মেয়েটা চিকিৎসা জগতে অদ্ভুত কিছু কাজ করে যেতে পারত। কিন্তু নিয়তি ওকে বড়ো কম সময়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন।”

তাঁকে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখে বজ্রধর একবার তাঁর পিঠে আলতো করে হাত রাখলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে রক্ষাবৈদ্য বললেন, “আপনাদের সভার সময় হয়ে গেছে। আসুন আপনারা; পরে কথা হবে আবার।”

তাঁকে ওই কক্ষে রেখে এঁরা তিনজন বেরিয়ে এলেন। সুবিশাল মর্মরপ্রাসাদের অলিন্দে চলতে চলতে নিধি আর লীনার কথা বারবার মনে পড়ছিল অভীর। এইখানে একটা বিরাট জলাশয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার সে আর লীনা...

রাতের স্বপ্নটার দৃশ্যগুলো আবার ফিরে এল মনে। লীনার সারা দেহ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে সে। ভাবতেই কেমন অসুস্থ মনে হতে লাগল অভীর। জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে সে চলল সমরোত্তমদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সভাগৃহের দিকে।

তাদের চলার পথ ভরে আছে সকালের উজ্জ্বল রৌদ্রে। বিরাট সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মেঘবর্ণ একবার পিছিয়ে এসে বলল, “অভী, ওরা সৌজন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইছে ঠিকই, কিন্তু আমি যেটুকু চিনেছি, এত সহজে ওরা কিন্তু সে-কাজ করতে পারবে না।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “কেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি খবর পেয়েছি, সৌজন্য যেহেতু বিমোহক জাতির রাক্ষস, ওর পেছনে বিমোহকদের একটা বড়ো অংশের সমর্থন আছে। রাজা পুনর্বসু পত্রতিলক জাতির রাক্ষস; দুই জাতিতে বাইরে থেকে অসম্ভাব না থাকলেও ভেতরে-ভেতরে কেউ কাউকে পছন্দ করে না। সৌজন্য এখন মরিয়া হয়ে গেছে। এই চাপা রেষারেষির ব্যাপারটাকে ও কাজে লাগাবেই, মিলিয়ে নিয়ো।”

ওরা এসে পৌঁছল সাদা পাথরের তৈরি রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষের সামনে। তিনজন সশস্ত্র রাক্ষস-প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে। তারা একবার দেখে নিল ওদের সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না। সভার নিয়ম মেনে তিনজনেই নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছেন। প্রহরীরা বিরাট, ভারী কাঠের তৈরি দ্বার খুলে দিয়ে বলল, “প্রবেশ করুন আপনারা।”

ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। সুবিশাল সভাগৃহের শেষপ্রান্তে রাজা পুনর্বসু বসেছিলেন উঁচু প্রস্তরবেদির ওপর রাখা সিংহাসনে। সিংহাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র দু'জন প্রহরী। তাঁর বেদি পর্যন্ত উঠে গেছে সারি-সারি মর্মরনির্মিত

সোপান। সেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে বসে আছেন সেনানায়িকা প্রজ্ঞা। অভী খেয়াল করে দেখল, প্রজ্ঞার কোমরে তাঁর কোমবন্ধ তরবারিটি ঝুলছে।

রাজার দু'পাশে সারি দিয়ে রাখা আছে জমকালো নকশা করা কাষ্ঠাসন। তাতে অভিজাত রাক্ষসেরা এসে বসেছেন ইতোমধ্যেই। মেঘবর্ণ ফিসফিস করে বলে দিল, “অভী, দেখে রাখো। রাজার ডানহাতের দিকে যে সারি, সেদিকে বসেছে পত্রতিলকরা; আর বামদিকে আছে বিমোহকরা।”

রাজা পুনর্বসু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ওরা প্রবেশ করতেই। বাকিরাও সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার জানিয়ে রাজা বললেন, “সমরগরিমার সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, সমরোত্তম মেঘবর্ণ এবং প্রলয়যোদ্ধা অভী, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এই বিচারসভায়। দয়া করে আপনারা আসন গ্রহণ করুন।”

অকারণেই একটু ভয়-ভয় করছে অভীর। এইরকম রাজকীয় কোনো বিচারসভা দেখার অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। মেঘবর্ণ তাকে চোখের ইশারা করল। পত্রতিলকদের দিকে রাখা তিনটি শূন্য আসনে ওরা বসে পড়ল।

রাজা প্রজ্ঞাকে চোখের ইশারা করলেন। প্রজ্ঞা বললেন, “আজ এই সভায় আমরা সমবেত হয়েছি মাল্যপর্বতের সৌজন্য এবং সমরগরিমার প্রাক্তন নিয়ামক বিনীতেশের বিচারকার্যে। বিগত যুদ্ধ বাধানোর পেছনে এঁদের দু'জনের ভূমিকা খুবই সন্দেহজনক। মাল্যপর্বতের মাননীয় মহারাজ পুনর্বসুর অনুমতিক্রমে আমি আদেশ দিচ্ছি এই দুই ব্যক্তিকে সভায় নিয়ে আসতে।”

বজ্রধরের চোখের ইঙ্গিতে মেঘবর্ণ উঠে দাঁড়াল। “মাননীয় সেনানায়িকা, বিচার শুরুর আগে আমাদের দুটি ছোটো বক্তব্য আছে।”

“বলুন।”

“প্রথমত, বিনীতেশ আমাদের ‘প্রাক্তন’ নিয়ামক নন। এখনও নতুন নিয়ামক নিয়োগ হয়নি; অর্থাৎ, উনি সেই পদে বহাল আছেন, যদিও ওঁর প্রায় সব কার্যক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নিয়ামক যা অপরাধ করেছেন, তার বিচার আমরা সমরগরিমায় করতে ইচ্ছুক। এখানে কেবল সৌজন্য ওঁকে দিয়ে যা যা করিয়েছে, তার সম্বন্ধেই উনি বলবেন, এর বেশি কিছু নয়।”

প্রজ্ঞা রাজার দিকে তাকালেন। রাজা বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনার কথার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি। নিয়ামক বিনীতেশ আমাদের প্রজা নন, আমাদের রাজ্যের অধিবাসী নন, আমাদের যুদ্ধবন্দিও নন। আইনত আমরা ওঁর বিচার এখানে করতে পারি না। আপনার কথা আমরা মেনে নিচ্ছি। আজ বিচার হবে কেবল সৌজন্যের। নিয়ামক বিনীতেশ তাতে সাক্ষীর ভূমিকায় থাকবেন মাত্র।”

ততক্ষণে নিয়ামক আর সৌজন্যকে নিয়ে ঢুকছে প্রহরীরা। কথাগুলো নিয়ামকের কানে যেতেই অভী দেখল তাঁর ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখে যেন একটু রক্ত ফিরে এল। ওদিকে সৌজন্যের ঠোঁটের কোণে সেই ধূর্ত হাসিটি আগের মতোই লেগে আছে, যেন এই সভায় তার বিচারের ফলাফল যা-ই হোক, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

অভী দেখল, সৌজন্যকে আসতে দেখে অভিজাত বিমোহক রাক্ষসদের চোখে নীরব প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল— যেন সে যা করেছে, তাতে তাঁরা বেশ গর্বিত অনুভব করছেন। সৌজন্য ছদ্ম-বিনয়ের সঙ্গে মাথা নীচু করে রাজার উদ্দেশে নমস্কার জানাল, কিন্তু একই সঙ্গে কাঁধের একটা বাঁকুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, এই সভার প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি তার নেই।

বসার জায়গা অবশ্য সে-ও পেল না, নিয়ামকও পেলেন না। তাঁদের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন করে তরবারিধারী রাক্ষস-প্রহরী। প্রজ্ঞা বললেন, “অপরাধী উপস্থিত। সৌজন্য, তোমার কিছু বলার আছে আত্মপক্ষ সমর্থনে?”

সৌজন্য হাসল, “আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, সেটা তো আগে বলুন।”

রাজা তিক্তমুখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে, যেন এখুনি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারলেই তিনি নিশ্চিত হন। প্রজ্ঞা বললেন, “তোমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল দেশদ্রোহের। নিজের স্বার্থে সমরগরিমার সঙ্গে অনাবশ্যক যুদ্ধ বাধিয়ে তুমি বহু রাক্ষসের জীবনহানির কারণ হয়েছ। সমরগরিমার নিয়ামকের কাছ থেকে আমরা এর সত্যতা যাচাই করব। প্রমাণিত হলে এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যু।”

সৌজন্য মাথা নাড়ল। “আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবেন তো?”

প্রজ্ঞা বললেন, “সেই কারণেই এই উন্মুক্ত সভায় তোমাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমি সমরগরিমার মাননীয় নিয়ামক বিনীতেশকে অনুরোধ করব, আপনি দয়া করে বলুন সৌজন্য আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য করেছিল কি না।”

প্রজ্ঞার হাতে ধরা আছে নিয়ামকের লেখা অতি কদর্য ভাষায় রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার চিঠি। এই চিঠির কারণেই গতবারের ভয়ংকর যুদ্ধের শুরু হয়েছিল। নিয়ামক শুকনো মুখে বললেন, “হ্যাঁ, মাননীয়া সেনানায়িকা। সৌজন্য আমার ওপর বজ্রমাণিকের বিষপ্রয়োগ করেছিল। আমি পুরোপুরি ওর ইচ্ছার অধীনে চলে গিয়েছিলাম বেশ কিছুকালের জন্য। ওই সময় ও আমাকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছে। এই চিঠি লেখার কথা আমার আবছাভাবে মনে পড়ছে, কিন্তু এ-চিঠি আমি স্বেচ্ছায় লিখিনি। রক্ষোবৈদ্য আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারবেন যে আমি বজ্রমাণিকের বিষের প্রভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছিলাম।”

মেঘবর্ণ ফিসফিসিয়ে অভীর কানে কানে বলল, “আমি জানতাম, সৌজন্যের ঘাড়েই পুরো দোষটা চাপাবেন উনি।”

বিমোহকদের দিকের একজন অভিজাত রাক্ষস উঠে দাঁড়ালেন। প্রজ্ঞা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “মাননীয় রক্তিমাত, আপনি কিছু বলতে চান?”

রক্তিমাত নামের বিমোহক রাক্ষস বললেন, “সমরগরিমার নিয়ামক আমাদের সৌজন্যকে পুরোপুরি দায়ী করছেন এই যুদ্ধের জন্য এবং সাক্ষী মানছেন রক্ষোবৈদ্যকে। রক্ষোবৈদ্য সমরগরিমার বেতনভুক কর্মচারী। যদিও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিচারে বা দক্ষতায় আমি সন্দেহ করছি না, কিন্তু আর কোনো সাক্ষী কি নেই এ ব্যাপারে? মাল্যপর্বতে না হোক, অন্তত সমরগরিমাতে?”

মেঘবর্ণ পাশ থেকে অভীর পেটে হালকা একটা গোঁচা দিল। অভী বুঝতে পারল, সে তাকে উঠে দাঁড়াতে বলছে।

অভী দাঁড়াল। “আমি আছি।”

রক্তিমভ ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। “প্রলয়যোদ্ধা?”

অভী বলল, “আমি যখন উর্মির সঙ্গে শেষনারের মতো দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে যাই, সেখানে সৌজন্য আমাদের জীবন্ত আঁধারের হাতে মরার জন্য বন্দি করে পালিয়ে এসেছিল। তখন ও আমাদের কাছে নিজমুখে স্বীকার করেছিল যে নিয়ামককে ও-ই বজ্রমাণিকের বিষ প্রয়োগ করে এই চিঠি লিখিয়েছে।”

রক্তিমভ আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন। অভী বসে পড়ল। সে দেখল, রাজা পুনর্বসু একটু খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন। তিনি বোধহয় বুঝতে পারছেন, এইবার সৌজন্যকে বাগে পাওয়া গেছে।

সৌজন্য এখনও মৃদু হাসি হাসছে। অভী বুঝে পেল না, এত সাহস ওর কোথা থেকে আসছে।

প্রজ্ঞা বললেন, “সৌজন্য, তুমি আর কিছু বলবে?”

সৌজন্য বলল, “বলব বইকি। আজ আপনারা আমার বিচার করার জন্য এখানে আমাকে বন্দি করে এনেছেন। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, আমার বিচার করার যোগ্যতা আপনাদের আদৌ আছে কি?”

রাজার কপালে ক্রকুটি ঘনিয়ে এল। গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বললেন, “কী বলতে চাও তুমি?”

সৌজন্য কয়েক পা এগিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু অস্ত্রধারী প্রহরীরা তাকে আটকে দিল। সে ওখান থেকেই জোরগলায় বলে উঠল, “যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আমার বিচার করছেন আপনারা? আমি দেশদ্রোহী? আর এই শত্রুদেশের লোকেরা আপনাদের বন্ধু? এদের সামনে আমার বিচার করতে চান আপনারা? সমরগরিমার এই জঘন্য প্রাণীগুলো আমাদের রাক্ষসদের দেশের বিচারকের আসন পেল কবে থেকে?”

অভী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, বজ্রধর তার হাঁটুতে চাপ দিয়ে তাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করলেন।

সৌজন্য বলে চলল, “এদের আমি দোষ দিচ্ছি না। রাজা পুনর্বসুর আদেশ ছাড়া এই কাণ্ড সম্ভব ছিল না, আমি বেশ জানি। কিন্তু রাজা পুনর্বসুর কী অধিকার আছে আমার বিচার করার? তিনি সমরগরিমার সঙ্গে যুদ্ধে হেরেছেন। রাক্ষস আইন অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সিংহাসনে থাকবার যোগ্যতা হারিয়েছেন তিনি। দিক শত্রুর পদলেহনকারী পরাজিত রাজাকে! দিক মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের! তারা আজ সমরগরিমার মানুষদের আমন্ত্রণ করে এনে নিজেদের জাতের লোকের বিচার করছে!”

উপস্থিত রাক্ষস অভিজাতদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হল। অভী বুঝতে পারছে, সৌজন্য আইনের ফাঁক দেখিয়ে আর রাক্ষসদের জাতিগর্বে আঘাত দিয়ে অবস্থা নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে চাইছে।

রাজা পুনর্বসু কঠোরস্বরে বললেন, “নীরব হোন সবাই।”

তাঁর গম্ভীর আদেশে সবাই চুপ করে গেল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, সৌজন্য বিচারসভার বেশ কয়েকজন রাক্ষসের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করে ফেলেছে এরই মধ্যে।

সৌজন্য আবার বলল, “এই মানুষরা আমাদের শত্রু; এক রাজরক্তধারী বিমোহকের বিচারে এদের কথার কী গুরুত্ব আছে? না কি রাজা পুনর্বসু রাক্ষসদের শেষ আত্মসম্মানটুকুও ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চান? এই সমরগরিমার মানুষেরা আমাদের চরম শত্রু ভাবে, এরা আমাদের হৃদয়হীন হিংস্র একটা জাতির বেশি কিছু মনে করে না। আমার প্রশ্ন, এদের কাছে যুদ্ধে হারার পর রাজা পুনর্বসু কী করতে আজ এই সমরোত্তমদের ডেকে এনেছেন এখানে? মাল্যপর্বতের স্বাধীনতাকেও কি তিনি বিকিয়ে দিতে চান? অসংখ্য রাক্ষসসেনার প্রাণ গেছে এই যুদ্ধে; তাতে পরাজিত হওয়ার পর আর কি তাঁর এই সিংহাসনকে স্পর্শ করবার যোগ্যতাটুকুও আছে?”

এবার বিমোহকদের দিকের গুঞ্জন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু হল। প্রজ্ঞা একবার ভ্রুকুঞ্জন করে তাকালেন রাজার দিকে। সৌজন্য যে খুব চতুরতার সঙ্গে রাজা পুনর্বসুকে অভিজাতদের সামনে একা করে দিচ্ছে, তা সবাই বুঝতে পারছিল।

অধিনায়ক বজ্রধর ফিসফিস করে বললেন, “মেঘবর্ণ, এবার তোমাকে মুখ খুলতে হবে।”

মেঘবর্ণ মৃদু হাসল। “আপনার আদেশেরই অপেক্ষা করছিলাম, অধিনায়ক।”

উঠে দাঁড়াল সে। প্রজ্ঞা তাকালেন তার দিকে। “আপনি কিছু বলতে চান, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

“চাই।”

“বলুন।”

মেঘবর্ণ এক পা এগিয়ে এল সৌজন্যের দিকে। “সৌজন্য বিগত যুদ্ধে মাল্যপর্বতের পরাজয়ের জন্য মহারাজ পুনর্বসুকে দায়ী করছে। কিন্তু এই যুদ্ধটা লাগল কেন, সে-কথা আপনারা ভেবে দেখছেন কি?”

অভী মাথা নাড়ল। মেঘবর্ণ একদম যুক্তির গোড়ার কথাটাই বলছে।

মেঘবর্ণ বলতে লাগল, “সমরগরিমার কোনো হাত এর পেছনে ছিল না। রাক্ষসরাই আগে আমাদের আক্রমণ করেছিল। তার জন্য যে চিঠিটি দায়ী, সেটি যে সৌজন্যের কৌশলেই রাজা পুনর্বসুর কাছে পৌঁছেছিল রাক্ষসদের খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, সে-কথা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে যতগুলি রাক্ষসের প্রাণ গেছে, তার সবক’টির দায় একা এই সৌজন্যের। সে না থাকলে এই যুদ্ধ লাগতই না।”

রাজা পুনর্বসু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তিনি বুঝতে পারছেন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ তাঁর পায়ের তলার হারানো মাটি ফিরিয়ে দিচ্ছে।

মেঘবর্ণ বলে চলল, “যুদ্ধে রাক্ষসপক্ষের যে অন্তর্ঘাত, তার মূল কারিগর তো এই সৌজন্যই। কিন্তু যুদ্ধের বাইরেও কম ক্ষতি সে করেনি মাল্যপর্বতের। আমাদের এবং আরও একজন সমরোত্তমকে বিষ দেওয়ার কথা নাহয় ছেড়েই

দিলাম, রাক্ষস-রাজকন্যা উর্মির মৃত্যুর জন্য সৌজন্য সরাসরি দায়ী। তাঁকে হত্যা করে নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিল সে; তার নিজের মুখে এই কথা প্রলয়যোদ্ধা অভী স্বয়ং শুনেছে। প্রফুল্ল নামের রাজপ্রাসাদের কর্মচারীকে তো সে নিজের হাতে খুন করেছে। আর আজ এখানে এসে সে দেশাত্মবোধিক সাজতে চাইছে! এমন ভান করেছে যেন অসংখ্য রাক্ষসের রক্ত তার হাতে আদৌ লাগেনি। যে যুদ্ধে রাজা পুনর্বসুর পরাজয় দাবি করে সে রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারণের কথা বলছে, সে যুদ্ধ ন্যায়ত প্রকৃত যুদ্ধই নয়; রাক্ষসপক্ষ থেকেই তাতে রাক্ষসদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।”

মেঘবর্ণ চুপ করার পর সভাগৃহ শান্ত হয়ে গেল। কেউ বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। সৌজন্য দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে। রাজা পুনর্বসু একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন মেঘবর্ণের দিকে।

অভী আর একবার উঠে দাঁড়াল; প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ে বলার অনুমতি চাইল। প্রজ্ঞা মাথা ঈষৎ দুলিয়ে সম্মতি দিলেন।

অভী বিচারসভার সব রাক্ষসের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, “আমি মানুষ, আমি সমরগরিমার লোক। আমাকে হয়তো আপনারা রাক্ষসরা শত্রু ভাবেন। কিন্তু আপনাদেরই রাজকন্যা উর্মি রাক্ষস হয়েও এই শত্রু-মানুষ অভীর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাক্ষসদের মধ্যে হৃদয় নেই, এ-কথা আর যে-ই বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। আমি এখনও বেঁচে আছি একটি রাক্ষস-মেয়ের মহত্বের কারণে; আমার আজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাই রাক্ষস জাতির উদারতা প্রমাণ করে। উর্মি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি আমাদের জাতের পরিচয়ের বাইরে গিয়ে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন; তার জন্য তাঁর আত্মসম্মানের হানি কোনোদিন হয়নি, দেশের স্বাধীনতাকেও বিসর্জন দিতে হয়নি।”

আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে বসে পড়ল অভী। মেঘবর্ণ তার পিঠে হাত রেখে আলতো করে চাপ দিল।

অভিজাত রাক্ষসরা নিম্নকণ্ঠে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন নিজেদের মধ্যে। তারপর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “মহারাজ, আমরা মনে করি, সৌজন্য সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার হতে পারত, কিন্তু তার দুষ্ট প্রকৃতির কারণে মাল্যপর্বতের সিংহাসন থেকে তাকে দূরে রাখলেই রাজ্যের মঙ্গল হবে।”

রাজা পুনর্বসু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসলেন। প্রজ্ঞা বললেন, “মহারাজ, আপনার বিচার অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি কী?”

রাজা বললেন, “আমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারলেই আনন্দিত হতাম। আমার কন্যার মৃত্যুর জন্য ও ছাড়া কেউ দায়ী নয়। তবুও আমি ওর জীবনভিক্ষা দিচ্ছি। ও বন্দি থাকবে কারাগারে। আজীবন। মাল্যপর্বতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এ-ই ওর শাস্তি।”

বজ্রধর ফিসফিস করে অভী আর মেঘবর্ণকে বললেন, “রাজা এত সহজে সৌজন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না, আমি অনুমান করেছিলাম। ওর যা

জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে বিমোহকদের মধ্যে, রাজার পক্ষে ওকে প্রকাশ্যে মেরে ফেলা সহজ নয়। সৌজন্য নিজেও কথাটা জানত ভালো করেই।”

রাজার ইশারায় সৌজন্যকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এমন সময় সে বলল, “মহারাজ, আপনার অনুমতি হলে আমি প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে একান্তে দু-একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।”

রাজা অস্বস্তিভরে মাথা নেড়ে একটু অনিচ্ছা সহকারেই যেন বললেন, “আমার অনুমতি আছে।”

বজ্রধরের ইস্তিতে অভী উঠে গিয়ে দাঁড়াল সৌজন্যের পাশে। প্রহরীরা কয়েক পা দূরে সরে গেল।

সৌজন্যের মুখে হাসি এখনও লেগে আছে। সে বলল, “অভী, তোমাদের ধন্যবাদ। তোমরা না থাকলে রাজা আজ আমার মুন্ডু না নিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। তোমরা ছিলে বলে আমি সবার সামনে বিচারসভায় বক্তব্য রাখার সুযোগটুকু পেয়েছি; নয়তো রাজা এইসব অভিজাত রাক্ষসদের সঙ্গে কথা না বলেই আমাকে এতক্ষণে গোপনে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিতেন। তোমাদের তাই একটা পালটা উপকার আমি করব।”

অভী বলল, “থাক, সৌজন্য। উর্মি তোমার জন্যই মারা গেছেন। তোমার কাছ থেকে কোনো উপকার নিতে আমি রাজি নই।”

সৌজন্য বলল, “বোকা ছেলে! এখন মান-অভিমানের সময় নয়। যা বলছি শোনো। ঐশিকদের একেবারে ভেতরের খবর দিচ্ছি তোমাকে। ওঁরা আকাশলোকে একটা দানবকে লালন-পালন করে বড়ো করে তুলছেন, সে-খবর রাখো তোমরা সমরগরিমায়?”

এইবার অভী একটু অবাক হয়ে তাকাল। “দানব? কেমন দানব?”

সৌজন্য নীচু গলায় বলল, “ঐশিকরা দানবটাকে তৈরি করছেন প্রলয়যোদ্ধার প্রতিপক্ষ হিসাবে। তাকে থামানোর ক্ষমতা এই মুহূর্তে এখানের কোনো মায়াধরের নেই। দানবটার অলৌকিক রকমের আগুন ছড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। আমি যেটুকু সংবাদ পেয়েছি, প্রলয়যোদ্ধার হিমকুশলতার পালটা হিসাবে ওটাকে ভয়ানক এক অগ্নিময় মায়াযোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।”

প্রহরীরা এগিয়ে আসছে সৌজন্যকে নিয়ে যেতে। তাদের সঙ্গে যেতে-যেতে সৌজন্য এক চোখ টিপে একটু হেসে অভীকে বলে গেল, “যা বললাম, মনে রেখো। ভবিষ্যতে তোমারই সুবিধা হবে।”

অভী ধীর পদক্ষেপে এসে বসল অধিনায়ক বজ্রধর আর মেঘবর্ণের মাঝখানের কাষ্ঠাসনটিতে। তার দুই শিক্ষককে সৌজন্যের কথাগুলো সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিল সে। বজ্রধর গলার মধ্যে একটা রাগী শব্দ করে বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

মেঘবর্ণ বলল, “যা-ই বলো, অভী, সৌজন্য নিজের স্বার্থ ছাড়া একটা কাজও করে না। এই খবরটা আমাদের জানানোর পেছনে ওর নিজের কিছু একটা স্বার্থ তো আছেই।”

বিচারসভা ভঙ্গ হওয়ায় অভিজাত রাক্ষসবর্গ রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে একে-একে বিদায় নিচ্ছেন। নিয়ামক বিনীতেশকে ইতোমধ্যেই এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন সময় সভাকক্ষের দ্বার খুলে দীর্ঘদেহী এক রাক্ষস এসে রাজার সামনে মাথা নীচু করে অভিবাদন করল।

অভী সঙ্গে-সঙ্গেই চিনে ফেলল তাকে। পর্বতের ভাই আলোকপর্ণ। লোকটাকে তার কোনোদিনই খুব একটা ভালো মনে হয়নি।

অভিজাত রাক্ষসরা ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। রাজা হাত তুলে বললেন, “কী সংবাদ, আলোকপর্ণ?”

সে চারপাশ দেখে নিল একবার। অভীদের তিনজনকে দেখে তার ভ্রু কুঁচকে উঠল। তেতো গলায় সে বলল, “মহারাজ, এই শত্রুদের সামনে গোপন সংবাদ দেওয়া নিরাপদ কি?”

বজ্রধর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, “মহারাজ, আপনার অনুমতি হলে এবার আমরা আসতে পারি।”

রাজা একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন। “আরে, বসুন, বসুন। আলোকপর্ণ, এঁরা এই মুহূর্তে আমাদের শত্রু নন। দেশদ্রোহী সৌজন্যের বিচার এঁদের জন্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেছে। প্রলয়যোদ্ধা অভী তার বিষনিয়ন্ত্রণ মায়া দিয়ে গতকালই আমার বিষহরণ করে আমাকে আরোগ্য করেছে। মহামন্ত্রী মরুময় সবার অজান্তে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে অল্পমাত্রায় বিষ দিয়ে সৌজন্যের পথ পরিষ্কার করছিলেন এতদিন, তুমি তো জানোই। তোমাকে মরুময়ের ব্যাপারে যে সংবাদ আনতে বলেছিলাম, তা তুমি নিঃসংকোচে এঁদের সামনে বলতে পারো।”

আলোকপর্ণ বলল, “মরুময় এখন প্রাসাদে নিজের কক্ষ আর তাঁর মেঘনির্মাণশালা— এই দুটি জায়গা বাদে অন্য কোথাও খুব একটা যাচ্ছেন না, আর যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে সঙ্গে করে দু’জন দেহরক্ষী নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বোধহয় সন্দেহ হয়েছে, আপনি তাঁকে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও গুপ্তহত্যা করাতে পারেন।”

“বুদ্ধিমান লোক!” বলে রাজা বিচিত্র একটা হাসি হাসলেন। সেই হাসি দেখে অভীর মনে হল, রাজা পুনর্বসুও খুব একটা সোজা-সরল লোক আদৌ নন।

প্রজ্ঞা বললেন, “মরুময়কে লোক লাগিয়ে গুপ্তহত্যা করা মোটেই সহজ কাজ নয়। উনি শুধু একটু খুঁড়িয়ে চলেন, কিন্তু সেইটুকু বাদ দিলে উনি নিজে একজন অসামান্য দক্ষ যোদ্ধা, এবং বহু ঐশিকমায়া ওঁর করায়ত্ত। কোনো সাধারণ যোদ্ধার পক্ষে ওঁর অঙ্গস্পর্শ করা একান্তই অসম্ভব।”

রাজা আবার হাসলেন। “শেষমুখও পারবে না বলছেন?”

একসঙ্গে চমকে উঠল সকলে। রাজা নিম্নস্বরে বললেন, “সৌজন্যকে একটা সুযোগ আমি দেব। ওর কাজ হবে, মরুময়কে গোপনে হত্যা করা। যদি সেই কাজ ও করতে পারে, ওকে ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি থেকে মুক্তি দেব আমি। ওর সিংহাসন লাভের আশা আজ শেষ হয়ে গেছে, সে-কথা আশা করি ও

বুঝে গেছে। ও জানে, দীর্ঘদিন কারাবাসের থেকে এই বিপজ্জনক কাজটা করে মুক্তি নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।”

সবাই চুপ করে রইল। অভী ভাবছিল, এইরকম কুটিল মন না হলে বোধহয় সিংহাসনে বসা যায় না। মেঘবর্ণ বলল, “মহারাজ, এই কাজ যদি করেন, আমার মনে হয়, তাতে বিপদের সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। সৌজন্য যে কী ভয়ানক ধূর্ত, তা আমরা এতদিনে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। ওকে মুক্তি দিলে ও আপনারই অনিষ্ট করবে, এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “মহারাজ, আমিও সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে একমত। সৌজন্যকে মুক্তি দেওয়া হয়তো একটু বেশিই বিপজ্জনক হয়ে যাবে আমাদের ক্ষেত্রে।”

রাজা হাত নেড়ে প্রসঙ্গটাকে যেন উড়িয়ে দিতে চাইলেন। “সে আমি আবার ভেবে দেখব নাহয়। এখন আপনারা আসুন, আহালাদ করে বিশ্রাম করুন।”

ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। বজ্রধর প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাদের নিয়ামক মহোদয় কোথায় আছেন এখন?”

প্রজ্ঞা বললেন, “বিচারকার্য শেষ হওয়ার পরেই তাঁকে অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনারা ফিরে গেলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন।”

সভাকক্ষ থেকে বাইরের সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে বেরিয়ে এসে অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “এখানকার কাজ আপাতত মিটল। এবার সমরগরিমায় ফিরতে হবে। আজ বিকেলেই ফিরে যাব আমরা। শ্যামশ্রী, নীলাব্র, স্বর্ণশেখর আর পর্বতকে সবকিছু জানাতে হবে। অভী, তুমি এগোও, আমরা আসছি একটু পরে।”

অতিথিভবনে ফিরে এসে অভী নিজের কক্ষে ঢুকে দেখল, নিয়ামক বিনীতেশ চুপ করে বসে আছেন শয্যার ওপর। তাকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন, “অভী, আমরা ফিরছি কখন?”

অভী তাঁকে নিজের কক্ষে দেখে একটু অবাক হয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু না বলে সে বলল, “বিকেলে। অধিনায়ক বজ্রধর তো তা-ই বললেন।”

“আমি এখনি ফিরতে চাই।”

মনে-মনে একটু বিরক্ত বোধ করল অভী। সে বলল, “তাহলে আপনি অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলুন গিয়ে।”

“কেন? অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে হবে কেন? আমি সমরগরিমার নিয়ামক, আমিই ওখানকার রাজা। আমার ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই?”

আবার তিনি এইসব ‘আমিই রাজা’ জাতীয় কথাবার্তা শুরু করেছেন দেখে অভী রেগে যাচ্ছিল। সে বলল, “আপনাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেননি মাল্যপর্বতের রাজা, সেজন্য আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে। আর সমরোত্তম মেঘবর্ণ আজ আপনার হয়ে কথা না বললে সৌজন্য পুরো দোষটাই আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনার শিরশ্ছেদ করিয়ে ছাড়ত।”

নিয়ামক বিনীতেশ একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। “হ্যাঁ, সৌজন্য খুব খেলা শুরু করেছিল বটে। তবে কী জানো অভী, আমাকে বিষ দেওয়া হলেও আমি

কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম; মস্তিষ্কটা পুরোপুরি ওর অধীনে থাকলেও অর্ধরাক্ষসগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কাণ্ডগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে আমি বরাবর খুব আনন্দ পেয়েছি।”

অভী দেখল, লোকটার চোখ যেন কী এক অস্বাভাবিক পাশবিক আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। তার মনে পড়ে গেল, চঞ্চলের মা-সহ বহু অর্ধরাক্ষস মেয়ের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার একসময় নিয়ামক করেছেন। তখন তো সৌজন্যের আবির্ভাবই হয়নি।

ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। এই লোকটার মুখদর্শন করতেও আর ইচ্ছা করছে না তার।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক মহিলার সঙ্গে তার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল। একেও চিনতে পারল সে। পর্বতের স্ত্রী উত্তরা।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার, এই মহিলার সঙ্গে তার দরকার আছে। পর্বতকে সে কথা দিয়ে এসেছে যে তার স্ত্রীকে সে বিষের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করবে এখানে এসে। দীর্ঘকাল মহাসর্পিণীর বিষ নিজের শরীরে ধারণ করে উত্তরা বোবা হয়ে গেছে।

অভী বলল, “বউদি, একটু দাঁড়াও।”

উত্তরা একটু হেসে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পেরেছে অভী কী করতে চাইছে।

নিজের বাম বাহুতে নিজের ডান হাতের দীর্ঘ নখ দিয়ে একটা আঁচড় টানল উত্তরা। হাতের ওপর একটা অগভীর ক্ষতচিহ্ন বরাবর রক্ত ফুটে উঠল। সেই রক্তের ওপর নিজের হাত রেখে অভী উত্তরার শরীরের বিষকে নিজের দেহে আকর্ষণ করে নিল।

অবাক চোখে উত্তরা নিজের গলায় হাত রাখল। “অভী, গলার মধ্যে এতদিন সবসময় কী প্রচণ্ড একটা জ্বালা করত। এখন যেন হঠাৎ করে সেই জ্বালাটা কোথায় মিলিয়ে গেল।”

অভী হাসল।

উত্তরা বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর কোথায় বলো তো?”

অভী বলল, “আসছেন তিনি একটু পরেই। তাঁর সঙ্গে দরকার আছে তোমার?”

উত্তরা বলল, “দরকার নয়, কিন্তু একবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব মানুষটাকে। আমাদের ঘোর বিপদের দিনে পর্বতকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই উপকার আমরা এ-জীবনে ভুলতে পারব না।”

অভী বলল, “বউদি, তুমি চাইলে আমাদের সঙ্গে সমরগরিমায় ফিরে যেতে পারো পর্বতদার কাছে। যাবে?”

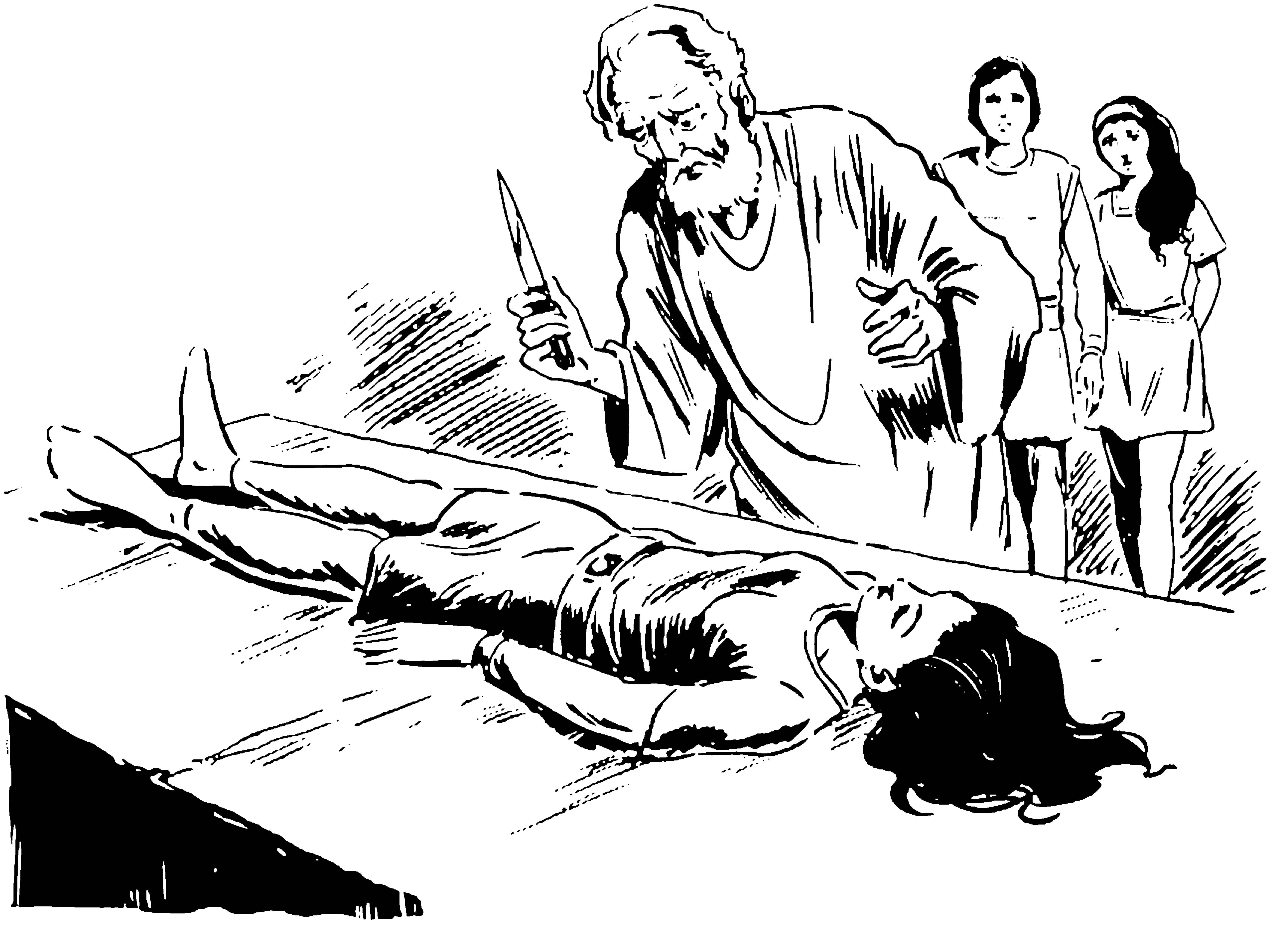
উত্তরা অদ্ভুতভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে; তারপর বলল, “যাব অভী, কিন্তু এখন নয়, আরও কয়েকদিন পরে। এখানে আমার কিছু কাজ বাকি রয়েছে।”

আর কোনো কথা না বলে উত্তরা চলে গেল ওখান থেকে।

কী করবে ভেবে না পেয়ে অতী আস্তে আস্তে হেঁটে এল একটা বিরাট জলাধারের সামনে। একটা পাথরের তৈরি মাছের মুখ থেকে জল বেরিয়ে পড়ছে জলাধারের মধ্যে। সেইদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

হঠাৎ সৌজন্যের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। ঐশিকরা এমন একটা রাক্ষসকে তৈরি করছেন, যে অগ্নি-নিয়ন্ত্রণ মায়ার অধিকারী, যে তার হিমকুশলতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে আগুন দিয়ে, আর যাকে থামানোর ক্ষমতা নেই কোনো জীবন্ত মায়াদরের।

ভাবতে ভাবতেই অদ্ভুত একটা কথা মনে হল তার। “শুধু আমাকে মেরে ফেলার জন্য এত আয়োজন!”



।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

ব্যর্থ হৃদয়

সমরগরিমায় ফেরার পর সমরোত্তমরা সম্মেলন কক্ষে গেলেন, কিন্তু অভী চলল নিধির সঙ্গে দেখা করতে। মাল্যপর্বতের কাহিনি, সৌজন্যের ইতিহাস— সব তাকে না বলা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

মিত্রভবনে পাওয়া গেল নিধিকে; নিজের কক্ষে বসে তরবারিতে শান দিচ্ছিল সে। অভীকে দেখে তরবারি পাশে নামিয়ে একটু হেসে বলল, “বোসো, বোসো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, গুরুতর সংবাদ আছে।”

তার পাশে বসে অভী তাকে অল্প কথায় মাল্যপর্বতের গল্প শুনিয়ে দিল। সৌজন্যের কথা শুনে নিধি বলল, “কেন জানি না, আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ওকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবেন না শেষ পর্যন্ত। দেখো, সেটাই কেমন সত্যি হয়ে গেল।”

অভী নিধির বাড়ির কথা ভাবছিল। গত যুদ্ধের শেষে নীরসেনার জীবন কাটিয়ে ফিরে আসার পর থেকেই তার বাবার সঙ্গে নিধি আর কথা বলে না। বৃদ্ধ দিগ্‌নাগ এ নিয়ে কী ভাবেন, অভী জানে না, কিন্তু নিধি যে তার বাবার ব্যবহারে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ, সে-কথা অভী খুব ভালো করেই জানে।

সে বলল, “তোমার বাড়ির খবর কী?”

নিধি চোখ সরু করে তাকাল। “বাড়ির খবর বলতে যদি বাবার কথা জানতে চাও, তাহলে আমি জানি না। আমি তার সঙ্গে কথাও বলি না, বাড়ি গেলে দেখাও করি না। মা মোটামুটি আছে। সবচেয়ে খারাপ ছিল নীপা, যদিও এখন ধীরে-ধীরে শোক সামলে উঠছে। তরুণের মৃত্যুর পর থেকে একেবারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল বেচারি, তা-ও ইদানীং মাঝেমাঝে আয়তনে আসছে। আমি ওকে বলেছি, ‘বেশি বেশি আয়তনে আসবি; এখানকার পরিবেশ আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো।’ ওর-ও বাড়িতে মন টেকে না, বুঝতে পারি আমি। তুমি ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বোলো তো। অভীদাদাটিকে ও খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তোমার সান্ত্বনা পেলে হয়তো ওর মনটা একটু ভালো হবে।”

অভী বলল, “বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু আয়তনে ও...”

তাকে শেষ করতে না দিয়ে নিধি বলল, “আমি ওকে এখানে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করা শেখাই। আর সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলাম; তিনি ওকে বেশ কিছু ছোটোখাটো মায়াপ্রয়োগ শেখাচ্ছেন। নিজের দুঃখগুলো যতটা ওকে ভুলিয়ে রাখা যায়, এই আর কী! ওর হাতে নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইতোমধ্যেই। সমরোত্তম শ্যামশ্রী আমাকে বলেছেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ওকে এখানে নিয়ে আসবেন। তখন যদি বাবা আপত্তি করে, আমার সঙ্গে জোর ঝগড়া বেধে যাবে তার।”

কক্ষের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অভী। লীনার শয্যা শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু একদম গোছানো, পরিষ্কার শয্যা। দেয়ালে তার ধনুকটা আগের মতোই ঝুলছে; পাশে রাখা আছে তিরপূর্ণ তুণ। নিধির কাজ এ-সব। টানটান করে চাদর পাতা বিছানাটা দেখলে মনে হচ্ছে, লীনা বাইরে কোথাও গেছে, একটু পরেই ফিরে এসে বসবে এখানে।

অভীর মন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, “আচ্ছা, লতাকাকিমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি আর?”

নিধির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। “হুঁ। গতকালই গিয়েছিলাম। কাকিমা যেন অনেক বদলে গেছেন। আমি দেখা করতে গেলাম, কিন্তু উনি আমাকে আর ঘরে ঢুকতেও বললেন না, দরজা থেকেই শুকনো মুখে দু’-চারটে হুঁ-হাঁ করে বিদায় করে দিলেন। জানো, দেখে মনে হল, উনি যেন সবসময় খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। কীসের এত ভয়, জানি না।”

অভী ভাবতে লাগল। লীনার মা সবসময় ওদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। নিধিকে তো তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। হঠাৎ হল কী তাঁর?

নিধি বলল, “অভী, আর একটা কথা।”

“কী?”

“কাল যখন লতাকা কিমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার হঠাৎ কেমন গা-ছমছম করে উঠল। মনে হল যেন এই বাড়ির ভেতরে বা আশেপাশে এমন কিছু একটা আছে, যেটাকে ঠিক বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না।”

বেশ অবাক হল অভী। দুনিয়ায় কোনো কিছুতে আজ পর্যন্ত সে নিধিকে ভয় পেতে দেখেনি। সে কৌতূহলী হয়ে বলল, “ভৌতিক কিছু দেখেছ নাকি?”

নিধি মাথা নাড়ল। “না, ব্যাপারটা ঠিক ভৌতিক নয়। এবং কিছু দেখিওনি। তবে ওই যে বললাম, একটা গা-ছমছমে অনুভূতি হল। কেন ও-রকম হল, আমি বলতে পারব না; অন্তত আমার কাছে ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, লতাকা কিমা ছাড়াও যেন আর কে একজন আমার কথা শুনেছে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না।”

অভী হাসল। “ও-রকম মাঝেমধ্যে হয়। ও তোমার মনের ভুল হবে।”

নিধিও হাসল। “তা-ই হবে! ভূতপ্রেত জাতীয় জিনিস মাল্যপর্বতে কেউ-কেউ দেখেছে, শুনেছি। ওদের ওখানে নাকি ভূত ডেকে এনে তার সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিতে পারে কোনো-কোনো মায়াধর রাক্ষস। তবে আমাদের সমরগরিমায় ভূত-টুতের দেখা কোনোদিন কেউ পেয়েছে বলে শুনি নি।”

কক্ষের দরজা থেকে মিত্রমাসি ডাকলেন, “নিধি, অভী। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে সমরোত্তম মেঘবর্ণ এসেছেন।”

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করল। প্রত্যভিবাদন করে মেঘবর্ণ বলল, “নিধি, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। ত্রিশূল নিয়ে অভ্যাস করা চলছে?”

নিধি বলল, “ত্রিশূল নিয়ে খুব একটা অভ্যাস না করেও আমি ওটাকে বেশ ভালোই আয়ত্ত্ব করে ফেলেছি। সেই ত্রিশূলধর মায়া আর নীরসেনা জীবনের প্রভাব হবে নিশ্চয়ই।”

মেঘবর্ণ বসল শয্যার পাশে রাখা কাষ্ঠাসনে। বলল, “ত্রিশূলধর মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এক আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার আগে এ জিনিস আর কারও সঙ্গে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যাক, যে কথা বলতে এলাম। কাল তোমাদের জনা সাতেক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মায়াবিদ্যার অনুশীলন করাবেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। সেই খবর দিতেই এলাম। অধিনায়ক বজ্রধরের আদেশ, বাইরের রাজনীতি যা-ই চলুক, আয়তনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান যেন ব্যাহত না হয়। শ্যামশ্রী কাল ভ্রমমায়া শেখাবেন তোমাদের। খুব কাজের মায়াবিদ্যা; ভালো করে শিখে রাখলে জীবনে অনেক কাজে লাগবে।”

নিধি একটু ইতস্তত করে বলল, “মেঘবর্ণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?”

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণ সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে ফেলল নিধি কী কথা জানতে চায়। ম্লান হেসে সে বলল, “থাক না, নিধি, আর ওই প্রসঙ্গ না-ই বা তুললে!”

নিধি লজ্জিত মুখে চুপ করে গেল। মেঘবর্ণ বলল, “আচ্ছা, জানতে চাইছ যখন, বলছি। লতার সঙ্গে আমি এখন কিছুদিন হল আর দেখা করছি না। আমাকে দেখলে ওর অশান্তি বাড়ছে বই কমছে না।”

অভী একটু কিস্ত-কিস্ত করে বলল, “লীনার জন্য ওঁর এই পরিবর্তন?”

মেঘবর্ণ বলল, “আর কী জন্য বলো? সে আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছে, ‘তোমাকে দেখলে আমার খুব অভিমান হয়। মহাবীর মেঘবর্ণ, যাকে নাকি শর্বরও ভয় পেত, সে থাকতে আমার মেয়েটাকে বেঘোরে মরতে হল! তুমি এখন কিছুদিন আমার কাছে এসো না; আমি তোমাকে দেখলে অকারণেই হয়তো কটুকথা বলে ফেলব, মনে আঘাত দিয়ে ফেলব; আমি তা চাই না।’ এর পর আর কোন মুখে যাব বলো ওর কাছে? নীল আর শ্যামশ্রী আমাকে বলছিল, মানবমন্দিরে আবার গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে, পাশে থাকতে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করে দূরেই থাকতে চাই।”

অভী আর নিধি চুপ করে রইল। অভীর মনে পড়ছিল তার স্বপ্নে দেখা লীনার বলা কথাগুলো। তার মনে হল, বিষয়টা একবার মেঘবর্ণের সঙ্গে আলোচনা করলে হয়।

সে বলল, “মেঘবর্ণ, মাল্যপর্বতে থাকাকালীন আমি লীনাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।”

মেঘবর্ণ বলল, “সেটা কি নিতান্তই স্বাভাবিক নয়? ও তোমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল, তা-ই না?”

অভী বলল, “না, মানে, সেদিন আমি বালিশের তলায় স্বপ্ন-উপল নিয়ে শুয়েছিলাম।”

এইবার মেঘবর্ণের মুখের ভাব বদলে গেল। “তা-ই নাকি? কী কী দেখেছ, খুলে বলো দেখি।”

অভী তার স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তারিত বলে গেল; মেঘবর্ণ আর নিধি হাঁ করে শুনল। নিধি বলল, “লীনা বলছে, ও বেঁচে আছে?”

অভী বলল, “সে-কথা ও নিজেই জানে না। ও কেবল এইটুকু বলল, ওর সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা করছে। আর জানতে চাইল ও ফিরে এলে আমি ওকে মরে যেতে বলব কি না। এইসব মাথামুণ্ডুহীন কথার মানে কী, আমি জানি না।”

মেঘবর্ণ বলল, “অভী, স্বপ্ন-উপল যে সবসময় সবকিছু সত্যি দেখায়, তা কিস্ত নয়। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে মিশিয়ে যে দৃশ্য ওই পাথরগুলো আমাদের স্বপ্নে তুলে ধরতে পারে, সেগুলো সবসময় সত্যি না-ও হতে পারে। তুমি আর ও জিনিস মাথার কাছে নিয়ে ঘুমিয়ো না। ঘুমের মধ্যে বেশি স্বপ্ন-উপলের ব্যবহার করলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে।”

একটু থেমে মেঘবর্ণ আবার বলল, “একবার অধিনায়ক বজ্রধরকে তোমার স্বপ্নের কথা বলে দেখতে পারো, অভী। বিচিত্র ধরনের নানা মায়াবিদ্যার ব্যাপারে খুবই দক্ষ মানুষ উনি; হয়তো এর কোনো ব্যাখ্যা করে দিতেও পারেন।”

নিধি অভীর দিকে তাকিয়ে বলল, “এখনই একবার যাবে ওঁর কাছে?”

মেঘবর্ণ বলল, “চলো। দেরি করে লাভ কী?”

তিনজনে মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলল আয়তনের দিকে। যেতে যেতে মেঘবর্ণ বলল, “উনি ফিরে আসায় রাক্ষসরা ভেতরে-ভেতরে কিছুটা দমে গেছে। যতই হোক, প্রতিপক্ষ হিসাবে বজ্রধরের নাম শুনলে একটু হলেও কেঁপে ওঠে না, এত বড়ো যোদ্ধা সারা মায়াজগতে নেই।”

নিধি প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, অধিনায়কের যমদণ্ড কি চন্দ্রহাসের মতো দৈবাস্ত্র?”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “না, চন্দ্রহাস স্বয়ং শিবের তরবারি— খাঁটি দৈবাস্ত্র। কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধরের হাতের লৌহদণ্ডটি এককালে নিতান্ত সাধারণ দণ্ড ছিল; তবে এখন ওর মধ্যে যমদণ্ডের আংশিক শক্তি আছে। অতি ভয়ংকর অস্ত্র নিঃসন্দেহে, তবে পুরোপুরি দৈবাস্ত্র নয়। উচ্চমানের মায়াশক্তির অধিকারী যোদ্ধা চাইলে ও জিনিস নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবেন। উনি অবশ্য আমাকে একটি আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন তাঁর যমদণ্ড নিয়ে।”

“কী?” ওরা উৎসুকভাবে জানতে চাইল।

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে আসার পর থেকেই ওটার শক্তি কমছে। আর একবার মাত্র পূর্ণশক্তিতে ওটাকে ব্যবহার করা যাবে, উনি বলছিলেন আমাকে।”

অধিনায়ক বজ্রধরকে পাওয়া গেল গ্রন্থাগারে; রক্ষোবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমরা। রক্ষোবৈদ্য, আপনিও আছেন, ভালোই হল। অভী একটা ব্যাপার আপনাদের জানাতে চাইছিল।”

লীনাকে নিয়ে দেখা তার স্বপ্নটার কথা অধিনায়ককে বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছিল অভী। তা-ও মোটামুটি পুরোটাই বলল সে, দু’-একটি জায়গা বাদ দিয়ে। শুনে বজ্রধর বললেন, “আমি যেটুকু বুঝি, স্বপ্ন-উপলের সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যৎ দেখতে চেষ্টা করা খুবই অস্বাস্থ্যকর কাজ। মাঝেমধ্যে এতে ভবিষ্যতের ঝলক দেখা যায় না, এমন নয়; কিন্তু এত জটিলভাবে দৃশ্যগুলো স্বপ্নের মধ্যে আসে যে, কোনটা আসল আর কোনটা স্বপ্নের কল্পনা— বুঝে উঠতে পারা মুশকিল হয়ে যায়। অভী, লীনা তোমার খুব কাছের একজন মানুষ ছিল; তুমি মনে মনে আবার তার দেখা পেতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক। স্বপ্ন-উপল অনেক সময় সত্যিকারের দৃশ্য দেখায়, আবার অনেক সময় তোমার মনের চাহিদাগুলোকে স্বপ্নে নানা বেশে তুলে ধরে। আমার উপদেশ হল, যদি মানসিক শান্তি চাও, এই বস্তু কাছে নিয়ে ঘুমোনো বন্ধ করো। আপনি কী বলেন, রক্ষোবৈদ্য?”

রক্ষোবৈদ্য তাঁর দীর্ঘ, সাদা দাড়িতে আঙুল বোলাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, “যা বলার আপনিই বলে দিয়েছেন, অধিনায়ক। লীনার কোনোভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। শুধু-শুধু তাই স্বপ্ন-উপল ঘুমের সময় মাথার কাছে রেখে মস্তিষ্কে মায়াবিকিরণ না ঘটানোই ভালো।”

নিধি বলল, “আপনি সেই রক্তপদ্মরাগ মণি দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছেন না কেন? লীনার শরীর তো সংরক্ষিত অবস্থায় আয়তনেই আছে।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, “তাতে লাভ হবে না, নিধি। লীনার প্রাণ তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তার দেহ ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছে। এখন রক্তপদ্মরাগের পক্ষেও তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছ, আমি কাল বিকেলে একবার চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু এখন থেকেই বলে রাখছি, তোমাদের

হতাশ হতে হবে। হুৎপিণ্ডহীন মানবদেহকে পুনরুজ্জীবিত করা চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারেই অসম্ভব।”

ওরা ফিরে গেল মিত্রভবনে। মেঘবর্ণ মনে করিয়ে দিল, “কাল ভোরে অনুশীলন মঞ্চে চলে আসবে সবাই।”

আজ রাতেও অভী একবার ভেবেছিল স্বপ্ন-উপল নিয়ে ঘুমোতে যাবে সবার নিষেধ সত্ত্বেও; কিন্তু নিধি তাকে খুব ভালো করেই চেনে। মিত্রভবনে পৌঁছেই সে বলল, “অভী, তোমার স্বপ্ন-উপলটা আমাকে দাও।”

“কেন?”

“ওসব কেন-টেন’র উত্তর পরে দিচ্ছি। আগে জিনিসটা দাও।”

অভী তার হাতে পাথরটা দিতেই নিধি বলল, “এবার গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ো। রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আমার বন্ধু পাগল হয়ে যাক, এ আমি হতে দিচ্ছি না, বুঝেছ?”

অভী একটু হাসল। “আচ্ছা, তা-ই হোক।”

আজ তার ঘুম অন্যদিনের তুলনায় একটু ভালো হল। ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করে সে বাইরে এসে দেখল, নিধি তৈরি হয়ে বসে আছে। নিধি বলল, “শ্যামশ্রী রেগে যাবেন দেরি করলে। চটপট মুখে-চোখে জল দিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে। উষসীদি, সন্দীপ, মৃগেন্দ্র— ওরা এই একটু আগে অনুশীলন মঞ্চের দিকে গেল, আমি দেখতে পেলাম জানালা দিয়ে।”

মিত্রমাসি চিঁড়ে-কলা আর একবাটি চিনিমেশানো দুধ এনে রেখেছিলেন। কোনোক্রমে তা-ই খেয়ে অভী নিধির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মাঠের ওপর দিয়ে অনুশীলন মঞ্চের উদ্দেশে।

সেখানে ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছে দেবদত্ত, সন্দীপ, উষসী, মৃগেন্দ্ররা। সমরোত্তমদের মধ্যে আছেন শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ। অভী দেখতে পেল, রবিকাকাও আছে একটু দূরে— তার দীর্ঘ লৌহদণ্ড ফুলঝুরি নিয়ে সে আপনমনে অভ্যাস করছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে আর একটি দীর্ঘ লাঠি নিয়ে অভ্যাস করছে নিধির বোন নীপা। অভী একটু অবাক হয়ে নিধির দিকে তাকাল; নিধি নীচুগলায় বলল, “তোমাকে তো বলেইছিলাম, ও এখন প্রায়শই এখানে চলে আসে অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে। এখনও সরাসরি আয়তনের শিক্ষার্থী না হলেও সমরোত্তমরা ওকে খুব ভালোবাসেন।”

শ্যামশ্রী বললেন, “যাক, আজ যে ক’জনকে ডেকেছিলাম, তারা সবাই এসে পড়েছে। আজ তোমাদের যে মায়াবিদ্যা শেখাব, সেটিকে কাজে লাগানো খুব একটা কঠিন নয়। নিখুঁতভাবে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে এর প্রয়োগ করতে পারলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই মায়া তোমার প্রাণরক্ষাও করতে পারে। দেবদত্ত, এগিয়ে এসো।”

দেবদত্ত একটু ভীরা-ভীরা হাসি হেসে এগিয়ে গেল। শ্যামশ্রী তার হাতে একটি তামার জলপাত্র ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “এই মায়ার নাম ‘ভ্রমমায়া’। এর

দ্বারা কোনো জড়বস্তুকে অন্য জড়বস্তুর রূপ দেওয়া যায়। জীবিত বস্তুর ওপর এই মায়া কাজ করে না। মায়ার প্রভাবে এই জলপাত্রকে একটা বাক্সের রূপ দিতে হবে তোমাকে।”

দেবদত্তকে তিনি দেখিয়ে দিলেন কীভাবে পাত্রটিকে মুখের সামনে তুলে ধরে তার ওপর মনঃসংযোগ করতে হবে। “এইভাবে হাতটা তুলে রাখবে, আর চোখ বন্ধ করে মনে-মনে হাতে ধরা জিনিসটাকে কল্পনা করবে। তারপর যে-ই মুহূর্তে পুরো বস্তুটার আকৃতি মনের চোখে দেখতে পাবে, কল্পনা করবে খুব দ্রুত তার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সেই কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করবে হাতের বস্তুটার ওপর পূর্ণশক্তিতে।”

দেবদত্ত বার পাঁচেক চেষ্টা করার পর কাজটা সত্যিই করতে পারল। অতীরা অবাক হয়ে দেখল, তার হাতের তামার পাত্রটা হঠাৎ একটা পুরোনো ধুলোভরতি ছোট বাক্সের আকৃতি গ্রহণ করল। নিধি, উষসী, সন্দীপরা হাততালি দিয়ে উঠল।

শ্যামশ্রী খুশি মুখে বললেন, “বাহ! দেখতেই পাচ্ছ, মায়াটা আদৌ কঠিন নয়। তবে মনে রাখবে, এ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর মায়া। যদি মায়াপ্রয়োগকারী বাদে অন্য কেউ একে স্পর্শ করে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে মায়া ভেঙে গিয়ে বস্তুটা আগের রূপ ধারণ করবে। আর যদি এই অবস্থায় এটাকে রেখে দেওয়া যায়, তাহলেও দুই দণ্ডকাল পরে জিনিসটা তার আসল রূপে ফিরে যাবে।”

মেঘবর্ণ পাশ থেকে বলল, “হাতেকলমে দেখে নাও তোমরা। উষসী, এগিয়ে এসে বাক্সটাকে ছুঁয়ে দেখো।”

উষসী হাত বাড়িয়ে দেবদত্তের হাতে ধরা বাক্সটাকে স্পর্শ করতেই সেটা নিমেষের মধ্যে তাম্রপাত্রের রূপ ধারণ করল। চোখে বিস্ময় আর মুখে হাসি নিয়ে উষসী তাদের দিকে তাকাল।

শ্যামশ্রী তিনটে দলে ওদের ভাগ করে দিলেন। অতীর সঙ্গে রইল নিধি। মায়া অভ্যাস করতে-করতে অতী বুঝতে পারল, সে নিজে খুব ভালো না পারলেও নিধি এই মায়া অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করছে।

মায়াচর্চা করতে করতে অতী বলল, “কিছুটা এই ধরনের মায়া গতবার আকাশলোকে গিয়ে দেখেছিলাম আমি, লীনা আর উর্মি। ঐশিকরা পায়ের তলার মাটিকে সমুদ্র করে দিয়েছিলেন।”

সে-কথা শুনতে পেয়ে মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, এই মায়ারই অনেক জটিল, আর অনেক উন্নত প্রয়োগ ছিল ওটা। ‘মায়াদর্শন’ বলে ওকে। সে যা-ই হোক, সন্দীপ, তুমি নতুন একটি মায়ার অধিকারী হয়েছ শুনলাম নীলাব্রর কাছে?”

অতীরা একটু বিস্মিত হয়ে সন্দীপের দিকে তাকাল। সন্দীপ ওদের দিকে একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তাকিয়ে বলল, “তোমাদের বলবার সুযোগ পাইনি এখনও। হ্যাঁ, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। এই মায়া প্রকট হওয়ার পর সমরোত্তম নীলাব্রর সঙ্গে কথা হয়েছিল একবার।”

নিধি বলল, “কী মায়া আয়ত্ত করলে, সন্দীপ?”

তার হয়ে শ্যামশ্রী বললেন, “অস্ত্র-আবাহন মায়া। মনুষ্যমায়া এটা— রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস বা ঐশিকরা এই মায়ার অধিকারী হতে পারেন না কখনও। কেবলমাত্র মানুষেরাই এই মায়ার আধার হয়— তবে সবাই নয়, কেউ কেউ। এই মায়া শরীরে বিকশিত হলে মায়াধর তার পছন্দমতো কোনো একটি অস্ত্রকে নিজের ইচ্ছাবলে আহ্বান করতে পারে। নীলাভ্রর কাছে আমিও তোমার এই সুসংবাদ শুনেছি, সন্দীপ। গদা-আহ্বানশক্তি পেয়েছ তুমি, না? একবার দেখাও আমাদের তোমার মায়াপ্রয়োগ।”

সন্দীপ মাথা নেড়ে ফিরে দাঁড়াল অনুশীলন মঞ্চের এককোণে রাখা স্তূপাকার অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভারের দিকে। সেদিকে হাত বাড়াতেই একটি মাঝারি আকারের গদা উড়ে তার হাতের মধ্যে চলে এল। অভী অবাক হয়ে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত মায়াক্ষমতা দেখে।

শ্যামশ্রী বললেন, “কোনো কোনো মানুষ-যোদ্ধার এই ক্ষমতা থাকে। কাছাকাছি ওই বিশেষ অস্ত্রটি থাকলে সেটি আর কষ্ট করে তুলে আনতে হয় না যোদ্ধাকে; হাত বাড়িয়ে ডাকলেই কাছে আসে। তবে সবসময় এ-মায়া খুব কাজে লাগে, এমন নয়। দৃষ্টিসীমার মধ্যে গদা অস্ত্রটি না থাকলে এই মায়া কোনো কাজ করবে না, বুঝেছ সন্দীপ?”

সন্দীপ মাথা নাড়ল। মেঘবর্ণ বলল, “অস্ত্র-আবাহন মায়াটা বিরল ঠিকই, তবে আমি বেশ কয়েকজনের মধ্যে এর প্রকাশ দেখেছি। আমাদের অধিনায়ক বজ্রধরই তো তরবারি-আহ্বান মায়ার ধারক। আর আছে আমাদের স্বর্ণশেখর— অভী, তোমার রবিকাকা। ওর ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা— অস্ত্র-আবাহন মায়া অনেক উন্নত এবং জটিল রূপে আছে ওর মধ্যে। শরীরের মধ্যকার তেজ ওই ফুলঝুরিতে চালনা করে ও যুদ্ধ করে। এই ক্ষমতা অন্য কারও মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখিনি।”

শ্যামশ্রী জোরগলায় ডাকলেন, “স্বর্ণশেখর, একবার তোমার ফুলঝুরি এখানে নিয়ে এসো না। এদেরকেও একবার দেখিয়ে দাও।”

নীপাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণশেখর উঠে এল অনুশীলন মঞ্চে। হাতের লাঠিটাকে সে দাঁড় করিয়ে রাখল মঞ্চের একপ্রান্তে। একটু দূরে গিয়ে হাত বাড়াতেই লাঠিটা উড়ে এসে ঢুকে পড়ল তার হাতের মধ্যে। ওদের দিকে ফিরে রবিকাকা বলল, “এই হল আমার অস্ত্র-আবাহন মায়া। কিন্তু তারপরে এই যে ফুলঝুরি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করা— এর জন্য দীর্ঘ অভ্যাস প্রয়োজন।”

মৃগেন্দ্র বলল, “আমরাও কি পারব এটা অভ্যাস করলে?”

স্বর্ণশেখর মাথা নেড়ে বলল, “অভ্যাস করলে লাঠিখেলা শিখতে অবশ্যই পারবে। কিন্তু ফুলঝুরিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা কঠিন। ভেতরে অস্ত্র-আবাহন মায়া থাকলেই শুধু হবে না। আমরা সমরোত্তমরা অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে শিখেছি কীভাবে নিজের শরীরের তেজ বাইরে প্রক্ষেপ করতে হয়। সেই শক্তিকেই এই দণ্ডে চালনা করে আমি এটা দিয়ে যুদ্ধ করি। কিন্তু তোমরা এখনও মায়াযুদ্ধে অতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারোনি।”

শ্যামশ্রী অভীর দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটু কেশে বললেন, “তবে আমার মনে হয়, অভী চাইলে...”

স্বর্ণশেখর অভীর দিকে ফিরে একটু হাসল। “হ্যাঁ, অভীর হিমকুশলতা অনেকটা এই ধরনের শক্তিই বটে। তাতেও তো অন্তরের শক্তিকে বাইরে নিষ্ক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে হয়। ঠিকই বলেছ, শ্যামশ্রী; একবার অভীকে দিকে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। অভী, এদিকে আয় তো। লাঠিটা ধরে দেখ, আগুনের ফুলকি বার করতে পারিস কি না।”

ফুলঝুরি নিয়ে অভ্যাস করতে পারার খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে অভী একদৌড়ে গিয়ে বাঁশের দীর্ঘ দণ্ডটা হাতে তুলে নিল। স্বর্ণশেখর বলল, “প্রথমেই লাঠি ঘোরাতে যাস না। আগে দেখ, এটার মধ্য দিয়ে নিজের ভেতরের শক্তিকে প্রবাহিত করতে পারছিস কি না।”

অভী বলল, “পারছি কি না, বুঝব কী করে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “চেষ্টা করলেই বুঝবি। যদি মনে হয়, অস্ত্রটা তোর হাতে জ্যান্ত প্রাণীর মতো গরম হয়ে উঠেছে আর খুব কাঁপতে শুরু করেছে, তাহলে বুঝবি, অস্ত্র তোর কথা শুনবে।”

অভী একবার লাঠিটা নিয়ে ঘুরিয়ে নিল দু’হাতে। তারপর লাঠির গায়ে মনঃসংযোগ করতেই বুঝতে পারল, জিনিসটা সত্যিই কাঁপছে। কিন্তু গরম হচ্ছে কি? অভীর মনে হল, গরম হওয়ার পরিবর্তে লাঠি তার হাতে যেন আরও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

তবু মনকে যথাসম্ভব সংহত করে সে লাঠিটার মধ্য দিয়ে তার মনের শক্তিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করতেই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। রবিকাকার ফুলঝুরির সারা গায়ে বরফ জমে গিয়ে সাদা হয়ে গেল; অভীর হাতে ধরা অবস্থায় তার থেকে সুতীব্র বেগে বেরিয়ে এল জমা বরফের স্রোত। সেই ধাক্কায় অভী মাটিতে উলটে পড়ে গেল, আর তার হাতের লাঠি থেকে প্রবল বেগে বরফের বিপুল পিণ্ড বেরিয়ে এসে ছিটকে গেল আকাশের দিকে। মেঘবর্ণ চিৎকার করে উঠল, “রবি, ওটা সরিয়ে নাও ওর হাত থেকে!”

স্বর্ণশেখর সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ফুলঝুরিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিল। মাটিতে পড়ে থাকা অভীর হাত থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। স্বর্ণশেখরের হাতে আসতেই তার গায়ে জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে তার লৌহনির্মিত আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য অভী চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। অসম্ভব দুর্বলতায় তার মাথা টলছিল। শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ মিলে তাকে টেনে তুললেন। অভী মেঘবর্ণের কাঁধ ধরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার এত দুর্বল লাগছিল যে, মনে হচ্ছিল এই অবলম্বনটুকু সরে গেলেই সে পড়ে যাবে।

স্বর্ণশেখর গম্ভীরমুখে বলল, “শ্যামশ্রী, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অভীকে এতখানি অনিয়ন্ত্রিতভাবে হিমকুশলতা প্রয়োগ করতে দেওয়া যাবে না। ফুলঝুরি

ওর ভেতরে ওই অস্ত্র-আবাহন মায়াকে জাগিয়ে তুলেছিল, আর ওর ভেতরের শক্তি এর মধ্য দিয়ে হিমপ্রবাহ রূপে বেরিয়ে এসেছিল। এত জটিল মায়াপ্রয়োগ আমি এতদিনের সমরোত্তম জীবনে কখনও দেখিনি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “হুঁ। এর পর থেকে অভীকে দিয়ে এত কঠিন মায়া অভ্যাস করানো যাবে না। তাতে ওর প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আমি মিত্রভবনে বলে পাঠাচ্ছি, ওর জন্য গরম দুধের ব্যবস্থা করে রাখতে।”

নীপা এগিয়ে এসেছিল। সে বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আমি গিয়ে মিত্রমাসিকে বলে আসব?”

শ্যামশ্রী বললেন, “তুমি যাবে? তাহলে তো ভালোই হয়। কিন্তু তার আগে একবার এদিকে এসো তো। তোমার হাতটা দেখাও আমাকে। দেখি, চিহ্নটা কতখানি স্পষ্ট হল।”

অভী এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল নীপার দিকে। শ্যামশ্রী ততক্ষণে নীপার ডান বাহু তুলে ধরে দেখাচ্ছেন বাকিদের। অন্য ছাত্রছাত্রীরাও এগিয়ে এল কাছে।

অভী দেখল, নীপার বাহুতে একটা নীলচে গোল চিহ্ন দেখা দিয়েছে। বেশ স্পষ্ট চিহ্নটা। সে বলে উঠল, “নিয়তিলাঞ্ছন।”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ। এর মানে, নীপার এবার আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের আয়তনের শিক্ষার্থী হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের বাড়ি যাব, নীপা; গিয়ে তোমার বাবা-মা-র আশীর্বাদ-সহ তোমাকে এখানে নিয়ে আসব।”

নিধি আতঙ্কিত সুরে বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আমার বাবা...”

দেখা গেল, শ্যামশ্রী তার বাড়ির অবস্থা ভালো করেই জানেন। তিনি একটু হেসে বললেন, “দিঙনাগকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তিনি যত দুর্মুখই হোন, একজন সমরোত্তমের মুখের ওপর দুর্ব্যবহার করার সাহস তাঁর হবে না।”

অভী সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। সে-ও জানে, নিধি-নীপার বাবা বৃদ্ধ দিঙনাগ আয়তনকে অপছন্দ করলেও তিনি মনে-মনে সমরোত্তমদের ভয় পান।

মেঘবর্ণ বলল, “নীপা, তুমি যে এখানে রোজ এসে অস্ত্র-অভ্যাস করো, তোমার বাবা জানেন? তাঁর এ-সবে অমত নেই তো?”

নীপা ফিকফিক করে হাসল। “বাবা জানেই না যে আমি এখানে আসি। আমি দিদির রূপ ধরে বেরিয়ে চলে আসি। বাবা তো দিদির সঙ্গে কথা বলে না আর; তাই আমাকে দেখেও চিনতে পারে না, আর আমি দিব্যি পালিয়ে আসি।”

শ্যামশ্রী অবাক হয়ে বললেন, “দিদির ‘রূপ ধরে’ মানে? তুমি এইটুকু মেয়ে— এখনই এত ভালো রূপান্তর মায়া আয়ত্ত করে ফেলেছ?”

নীপা মুচকি হেসে পোশাকের মধ্য থেকে একটা উজ্জ্বল নীল রত্ন বার করে তাঁর হাতে দিল। “এইটা অভীদাদা আমাকে কিছুদিন আগে উপহার দিয়েছিল। এটা কাছে থাকলে অন্যের রূপ ধরতে খুব সুবিধা হয়।”

জিনিসটা দেখেই স্বর্ণশেখরের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মেঘবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল, “এ তো ঐশিকশ্রেষ্ঠের মুকুটের মণি!”

শ্যামশ্রী বললেন, “হুঁ, নীলকান্ত মণি। খুবই শক্তিশালী রূপান্তর মায়া সৃষ্টি করা যায় এ দিয়ে। ঐশিকশ্রেষ্ঠ নিজেও তাই করতেন।”

স্বর্ণশেখর পাশ থেকে বলল, “শুধু রূপান্তর মায়া নয়, অন্য অনেক ধরনের ঐশিকমায়ারও আধার এই মণি। নীপা বাচ্চা মেয়ে; এর আসল ক্ষমতা না বুঝেই এতদিন ব্যবহার করছে ও। অজান্তেই এতখানি শক্তিশালী মায়াবস্তুর ব্যবহার করা বোধহয় ওর উচিত হচ্ছে না। ঐশিকরা ইচ্ছা করলে এই জিনিস কাজে লাগিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে পারেন।”

মেঘবর্ণ তার দিকে তাকাল। “রবি, আমি যা ভাবছি, তুমিও কি তা-ই ভাবছ?”

স্বর্ণশেখর বলল, “হ্যাঁ, বোধহয়। এই মণির মধ্যে খুব শক্তিশালী ঐশিকমায়া আছে, শ্যামশ্রী, তুমিই বললে সে-কথা। সেই ধরনের সব মায়া আমাদেরও জানা নেই। এর সাহায্যে ঐশিকরা গোপনে আমাদের সমরগরিমার ভেতরের খবর পেয়ে যেতে পারেন, সে আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।”

নীপার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, “এটা কি আপনারা নিয়ে নেবেন?”

তার কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে শ্যামশ্রীর বোধহয় দয়া হল। তার মাথার ঝুঁটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, “আচ্ছা, আমরা নেব না; তুমিই রাখো তোমার উপহারের জিনিস। তবে আমরা যদি কখনও চাই, আমাদের মণিটা দিয়ো, কেমন?”

নীপা একগাল হেসে মাথা নাড়ল।

শ্যামশ্রী ঘোষণা করলেন, “আজকের মতো পাঠদান এখানেই শেষ হল। পরবর্তী অনুশীলনের দিন তোমাদের পরে জানানো হবে। আজ সবাই ফিরে যাও। তবে বাসভবনে ভ্রমমায়া নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করবে সকলে।”

অভীর তখনও মাথাটা বেশ টলমল করছিল। নিধি আর মৃগেন্দ্র দু’দিক থেকে তাকে ধরে ধরে মিত্রভবন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। নীপাও চলল সঙ্গে।

অভীর চোখের দৃষ্টি অবশ্য পরিষ্কার হয়ে এসেছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাকে ভেতরে-ভেতরে বেশ ভাবাচ্ছিল। বিগত কিছুদিন ধরে মাঝেমধ্যেই তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হিমকুশলতা প্রয়োগ করলে এটা বেশি হচ্ছে, খেয়াল করে দেখেছে সে।

মিত্রভবনের দরজা পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিয়ে মৃগেন্দ্র ফিরে গেল। নিধি বলল, “নীপা, তুইও ফিরে যা। অনেকক্ষণ তাকে দেখতে না পেলে বাবা আবার মায়ের ওপর রাগারাগি করবে। তুই যা, মায়ের খেয়াল রাখ।”

নীপা চলে যাওয়ার পর ওরা অভীর কক্ষে এসে বসল। মিত্রমাসি দুধের বাটি এনে অভীর সামনে রেখে বললেন, “আগে পুরোটা খাও, তারপর আমি যাব এখান থেকে।”

মুখ বিকৃত করে অভী বাটির পুরো দুধ শেষ করল। বাটিটা তুলে নিয়ে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে মিত্রমাসি বেরিয়ে গেলেন।

খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে অভী চুপ করে বসে ছিল। নিধি বলল, “অভী, কী এত ভাবছ?”

অভী বলল, “লীনার কথা। আজ বিকেলে রক্ষোবৈদ্য ওকে রক্তপদ্মরাগ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। কী মনে হয় তোমার? উনি পারবেন?”

নিধি বলল, “রক্তপদ্মরাগের ক্ষমতা তো চোখের সামনেই দেখলাম। অধিনায়ক বজ্রধরের ফিরে আসাটা মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। আমার ধারণা, লীনাকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে ওই মায়ামণি।”

অভী আর কিছু বলল না। তার নিজের খুব একটা ভরসা হচ্ছিল না। যদি লীনাকে সত্যিই ফিরিয়ে আনা যেত, তাহলে কি রক্ষোবৈদ্য এতদিনে সে চেষ্টা করতেন না?

অধীরভাবে বিকেলের অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সময় যেন কাটছেই না।

অভী ভাবার চেষ্টা করতে লাগল, লীনা ফিরে এলে কত খুশি হবে সে। কিন্তু মনটা যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না যে এই অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে।

নিধি চলে গেল নিজের কক্ষে। উন্মুক্ত জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে শুয়ে অভী ভাবতে লাগল লীনার কথা। সেই আকাশলোকের অরণ্যে ঐশিকদের মায়ানেকড়ের সামনে তার হৃদয়শর নিক্ষেপ করার মুহূর্তটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। লীনা তিরটা ছুড়ল আর পরক্ষণেই নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে— দৃশ্যটা ক্রমাগত ফিরে আসছে স্মৃতিতে। অভী বুঝতে পারছে, ওই ঘটনাটা তার মনে একটা চিরস্থায়ী বেদনা আর আতঙ্কের দাগ রেখে গেছে।

অবশেষে বিকেল হতেই সে আর নিধি ছুটল রক্ষোবৈদ্যের সেবাকক্ষের উদ্দেশে।

রক্ষোবৈদ্য তখন দু’জন অর্ধরাক্ষসের চিকিৎসা করছিলেন সেখানে। তিনদিন ধরে জ্বর তাদের কাটছেই না। রক্ষোবৈদ্য একটু রাগী সুরে বলছেন, “জ্বরটা যখন প্রথম হয়েছিল, তখনই যদি চলে আসতে, তাহলে এত দুর্ভোগ পোয়াতে হত না।”

অপরাধীর মতো মুখ করে লোকদুটো মুখ নীচু করে রইল। নিধি অভীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, “আমাদের অর্ধরাক্ষসদের অনেকে এখনও এইসব আধুনিক চিকিৎসাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। তা ছাড়া, ওরা আয়তনে আসতে ভয়ও পায়।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “ভয় পায়? কেন?”

“এতদিন নিয়ামক বিনীতেশ ওদের ওপর যা অত্যাচার করেছেন, ওরা মনে করে এখানে কেউ ওদের পছন্দ করে না।”

অর্ধরাক্ষস দু’জনকে বিদায় দিয়ে রক্ষোবৈদ্য ওদের দিকে তাকালেন; একটু ম্লান হেসে তিনি বললেন, “লীনার জন্য এসেছ তো? আমি আগেই বলে রাখছি, খুব বেশি অবাস্তব ফল কিন্তু আশা কোরো না। কষ্ট পেতে হবে তাহলে।”

নিধি বলল, “আশা করছি না, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, রক্তপদাঙ্গ দিয়ে হয়তো অলৌকিক কিছু আপনি ঘটিয়ে ফেলতেও পারেন।”

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে রক্ষাবৈদ্য বললেন, “নিধি, মনে রেখো, লীনা স্বেচ্ছায় তার হৃদয়কে বিসর্জন দিয়েছিল নিজের শরীর থেকে। এখন আর তাকে ফিরিয়ে আনা এককথায় অসম্ভব। হৃদয় ছাড়া একটা জীবন্ত মানুষের দেহ কীভাবে বেঁচে থাকবে?”

অভী ব্যগ্রভাবে বলল, “রক্ষাবৈদ্য, আমার হৃদয় নিন, কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে তুলুন। পারবেন না আপনি?”

রক্ষাবৈদ্য একটু হাসলেন। “চিকিৎসাবিদ্যা এখনও অতখানি উন্নতি করেনি, অভী। লীনার নিজের হৃদয়টি পাওয়া গেলে একবার তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত। কিন্তু এক মানুষের হৃদয় অন্য মানুষের দেহে বসানো যায় না। তোমাদের সমরোত্তম মেঘবর্গ আগেই আমার কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তোমরা বোধহয় জানো না।”

ওরা চমকে উঠল। “মেঘবর্গ?”

“হুঁ। লতাকে তার মেয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মেঘবর্গ আমাকে বলতে এসেছিলেন যেন তাঁর শরীর থেকে তাঁর হৃদয় বার করে লীনার শরীরে বসিয়ে দেওয়া হয়। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হলেও লতাকে তার হারানো সন্তান ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম, এ-কাজ করা যায় না, আর গেলেও আমি করব না। একটা মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আর একটা মানুষের প্রাণ দেওয়া— এ-কাজ অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ।”

অভী আর নিধি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। লীনার জন্য, লতাকাকিমার জন্য মরতে চেয়েছিল মেঘবর্গ? কতটা ভালোবাসা থাকলে এমন করে ভাবা যায়?

সেই মুহূর্তে তার প্রতি শ্রদ্ধাটা যেন আরও বেড়ে গেল অভীর।

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “এসো পাশের কক্ষ।”

ওদের দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বার খুলে পাশের কক্ষটিতে একটি মর্মরবেদির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। লীনার নিখর শরীর শোয়ানো আছে তার ওপর। দেখলে মনে হয়, সে ঘুমোচ্ছে। রক্ষাবৈদ্য বললেন, “শরীরে অনেক রকম ঔষধপত্র মাখিয়ে এখনও পচন রোধ করা গেছে। কিন্তু আর বেশিদিন নয়। এবার ওকে সমাধি দিয়ে দেওয়াই ভালো।”

অভীর বৃকের ভেতর থেকে অবরুদ্ধ কান্না ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। এই মেয়েটার সঙ্গে তাদের কত সুমধুর মুহূর্তের স্মৃতি জড়িয়ে আছে! নিধি হাত বাড়িয়ে অভীর একটা হাত শক্ত করে ধরে রইল। অভী দেখল, নিধির অবস্থাও ভালো নয়; নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে কোনোক্রমে কান্না চেপে রেখেছে সে-ও।

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “জীবিত অবস্থায় সংগ্রহ করা লীনার রক্ত আছে কি?”

ওরা মাথা নাড়ল। নেই।

“তাহলে আরও কঠিন হয়ে গেল কাজটা।”

ডান হাতে একটা ছুরি হাতে নিয়ে রক্ষাবৈদ্য এসে দাঁড়ালেন লীনার মৃতদেহের পাশে। গতবার বজ্রধরের পুনরুজ্জীবনের পরে রক্তপদ্মরাগ মণিটা তাঁর কাছেই ছিল। সেটি তিনি ধরে রেখেছেন বাম হাতে।

ছুরি দিয়ে লীনার বাম হাতের ওপরের চামড়া একটুখানি কেটে দিলেন তিনি। তারপর হাতের সেই অংশের ওপর রক্তপদ্মরাগ মণি বসাতেই মণিটা উজ্জ্বল সাদা আলো বিকিরণ করতে শুরু করল। বজ্রধরের পুনরুজ্জীবনের কথা মনে পড়ে গেল অভীর। সেবারও ঠিক এইরকম করেই মণিটা আলো দিতে শুরু করেছিল। মনে-মনে মৃত দেবতাকে ডাকতে লাগল অভী— লীনা যেন মৃত্যুকে জয় করে ফিরে আসে!

কিন্তু সেবার বক্রপুচ্ছের শরীর থেকে নেওয়া রক্তের ফোঁটা ফেলতে হয়েছিল মণিটার ওপর, আর তখন এই আলোর সাদা রং বদলে লাল হয়ে গিয়েছিল। এবার তো সেই রক্তপ্রয়োগের কোনো উপায় নেই। আদৌ কাজ হবে তো এতে?

মণির সাদা আলো ম্লান হতে হতে নিভে গেল। রক্ষাবৈদ্য এতক্ষণ লীনার হাতটা নিজের হাতে ধরে রেখেছিলেন। এবার তিনি সেটা আস্তে-আস্তে ওর শরীরের পাশে রেখে দিলেন। শিথিল হাতটা পড়ে রইল শীতল বেদির ওপরে।

শুকনো মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রক্ষাবৈদ্য মাথা নীচু করে নিলেন। “অভী, নিধি, আমি দুঃখিত। মায়া-চিকিৎসা শাস্ত্রে যেটুকু আমার জ্ঞান, তার দ্বারাই বলছি, আর আমাদের কিছু করার নেই। লীনা তার সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, এ-ই আমাদের সান্ত্বনা।”

নিধি দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। অভী বোবার মতো তাকিয়ে রইল লীনার মৃতদেহের দিকে। সে খুব আশা করেছিল, রক্ষাবৈদ্য হয়তো সত্যিই অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে ফেলবেন।

আর কান্না আসছে না তার। তার বদলে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা যেন গ্রাস করতে চাইছে তাকে। নিধির হাত ধরে টানল সে; আর এখানে না থাকাই ভালো।

সেবাক্ষের বাইরে এসে অভী স্থিরদৃষ্টিতে অপরাহ্নের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। দিনের শেষ আলো মুছে যাচ্ছে; ঘনকৃষ্ণ সন্ধ্যা নেমে আসছে আয়তনের ওপরে।



।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

উড্ডীনখর

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “আমাদের আয়তনের কাজকর্ম আইন মেনে করার জন্য নিয়ামক পদে একজনকে কিন্তু দরকার হবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কাকে পাই? তোমরা কী বলো?”

ওঁরা বসেছিলেন অনুশীলন মঞ্চের সামনে। সমরোত্তমদের মধ্যে অধিনায়ক নিজে ছাড়া আছেন শ্যামশ্রী আর নীলাদ্র। স্বর্ণশেখর আর মেঘবর্ণ পর্বতকে নিয়ে গেছে আয়তনের সংগ্রহশালাকে নতুন করে সাজাতে। নিধিকে কিছু না বলে অভী এসেছিল বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে। সে এসে দেখল, অধিনায়ক গম্ভীরমুখে প্রশাসনিক ব্যাপার আলোচনা করছেন দুই সমরোত্তমের সঙ্গে।

শ্যামশ্রী বললেন, “আমার মতে, বিনীতেশই আপাতত থাকুন। গত যুদ্ধ লাগানোর পেছনে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছে, যদিও আমরা সকলেই জানি মানুষ হিসাবে তিনি কেমন। তবুও ওই পদের উপযুক্ত কেউ এখন আমাদের হাতে নেই বলেই আমার মনে হয়।”

নীলাদ্র মাথা নেড়ে বলল, “ঠিকই বলেছ তুমি। আমরা সমরোত্তমরা সবাই আয়তনে উপস্থিত আছি এই মুহূর্তে। সর্বোপরি, অধিনায়ক, আপনি এখানে

আছেন। মনে-মনে কোনো দুরভিসন্ধি থাকলেও নিয়ামক এখন খুব একটা গন্ডগোল পাকাতে পারবেন বলে মনে হয় না।”

বজ্রধর চুপ করে রইলেন। শ্যামশ্রী বললেন, “অধিনায়ক, আপনি কি অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত?”

বজ্রধর বললেন, “একটা ঘটনা আমাকে সত্যিই একটু ভাবাচ্ছে। ঐশিকরা বেশ কিছুদিন চুপচাপ; তাঁদের দিক থেকে কোনো সংবাদ আমরা পাচ্ছি না। অথচ আমি বেশ ভালো করেই জানি, চুপ করে বসে থাকার পাত্র তাঁরা নন। সৌজন্যের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে অভীর ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁরা মায়া দিয়ে অগ্নিদানব নির্মাণ করছেন। ওটাকে কীভাবে তাঁরা আয়তনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারেন, সেই চিন্তাই করছি।”

নীলাভ বলল, “অধিনায়ক, এখানে আমার দুটো প্রশ্ন আছে। এক, এই দানবটাকে তাঁরা কী উপাদান বা কী ধরনের মায়া দিয়ে তৈরি করছেন যে সে অভীর হিমকুশলতাকে ঠেকাতে পারবে? এবং দুই, সৌজন্য আগ বাড়িয়ে এই খবর আমাদের দিল কেন? ও যে নিতান্ত আমাদের উপকার করার জন্যই এই সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিল, সে-কথা আমার বিশ্বাস হয় না।”

অভী চুপ করে বসে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিল। সে বুঝতে পারল, বাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্ন তুলেছে।

শ্যামশ্রী বললেন, “তোমার প্রথম প্রশ্নটার উত্তর আমি অনুমান করার চেষ্টা করতে পারি। অভীর হিমকুশলতা এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতা তোমার মধ্যেও আছে নীলাভ, যদিও তা অভীর মতো তীব্র নয়। কিছুটা এই মায়া আয়ত্তে থাকার কারণেই তোমরা দু’জন নরকের মতো অগ্নিময় জায়গা থেকেও জীবন্ত ফিরে আসতে পেরেছিলে। হিমকুশলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য যখন ওই দানবকে তৈরি করা হচ্ছে, তাহলে আমার ধারণা, তাকে নরকাগ্নির অধিকারী করেই তৈরি করছেন ঐশিকরা, কারণ একমাত্র ওই আগুনেরই হিমকুশলতার বরফকে আটকানোর ক্ষমতা আছে।”

অভী বলল, “কিন্তু নরকাগ্নি তো আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।”

নীলাভ বলল, “তার একটা কারণ, হিমকুশলতার শীতলতার ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবেই ওই আগুনের উত্তাপের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু ঐশিকরা ওই দানবকে তৈরি করছেন ধ্বংসকার্য চালাতে। তাই আমার মনে হয়, ওকে মায়াবলে সেই উচ্চক্ষমতা দান করেই তৈরি করা হবে যাতে ও অভীর হিমকুশলতার বরফকে গলিয়ে দিতে পারে। অগ্নি ও হিমের এই মহাযুদ্ধ যদি সত্যিই কোনোদিন বাধে, তার ফলে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে, সে-কথা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।”

বজ্রধর বললেন, “তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটার একটা উত্তর আমার মাথায় আসছে। সৌজন্য কখনোই উপযাচক হয়ে আমাদের উপকার করার জন্য এই খবর দেয়নি। কিন্তু আমার ধারণা, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এত বড়ো ব্যাপারে মিথ্যা বলার ছেলে সৌজন্য নয়, কারণ ও জানে, এর সত্যতা আমরা শীঘ্রই যাচাই

করে নিতে পারব। তাহলে এই খবর ও আমাদের দিল কেন? কারণ, নিকট ভবিষ্যতে আমাদের কোনো একটা সাহায্য ওর লাগবে। আমরা মাত্রে এখন থেকেই ওর কাছে ঋণী থাকি, ও সেই ব্যবস্থা করে রাখল।”

নীলাভ বলল, “হ্যাঁ, এটা বেশ বলেছেন। আমার এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতে আমাদের কোনো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা সংবাদ পরিনেশন করার কথা ভাবছে সৌজন্য। এই খবরটা আমাদের দিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িতে রাখতে চাইছে ও।”

অভী বুঝতে পারছে, সৌজন্য ধূর্ত বটে, কিন্তু সমরোত্তমরা ওর অন্তরটা অনেকখানি পড়ে ফেলেছেন। এত সহজে আর ওঁদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না ও।

রক্ষোবৈদ্যকে আসতে দেখে বজ্রধর বললেন, “ভালোই হয়েছে, উনি এসে পড়েছেন। অভী, তুমি বাবা-মা-র সঙ্গে কথা বলো। আমি একটু ওঁকে নিয়ে সুদক্ষিণসারি থেকে ঘুরে আসি। ওখানে ভাবছি ওঁকে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন করে যেতে অনুরোধ করব।”

অভী বোকার মতো বলে ফেলল, “কেন?”

বজ্রধর তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। “রক্ষোবৈদ্য যা সবচেয়ে ভালো পারেন, সেই কাজের জন্যই। ইতোমধ্যেই তিনি ওখানে যাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা-ও আমার মনে হয়, এটা নিয়মিত করতে পারলে আরও ভালো হয়।”

বিষয়টা অভী ঠিক ধরতে পারল না, কিন্তু এই নিয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করল না সে। রক্ষোবৈদ্য এসে দাঁড়াতে সবাই তাঁকে নমস্কার করলেন।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি বললেন, “অভী, চোখের অবস্থা কীরকম?”

সবার সামনে এ-কথা জানতে চাওয়ায় অভী একটু বিব্রত বোধ করছিল। সে যে চোখে বেশ ভালোমতোই কম দেখছে মাঝে-মাঝে, এ-কথা সে নিধি ছাড়া কাউকে জানায়নি— বাবা-মাকেও না। রক্ষোবৈদ্যকে অবশ্য বলেছিল মাল্যপর্বত থেকে ফিরে এসে।

শ্যামশ্রী তার দিকে ফিরে তাকালেন। “চোখে কী হল তোর?”

অভী একটু ইতস্তত করে বলল, “ইয়ে, কিছুদিন ধরে মাঝেমাঝেই একদম দেখতে পাচ্ছি না; সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।”

নীলাভ অবাক হয়ে বলল, “সে কী? তুই তো কিছু বলিসনি এতদিন? কবে থেকে হচ্ছে এটা? কতক্ষণ থাকছে এই অবস্থাটা?”

অভী মাথা নীচু করে বলল, “গত যুদ্ধের পর থেকে। হঠাৎ করেই কিছুক্ষণের জন্য চোখ থেকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণের জন্য।”

বজ্রধর গম্ভীর মুখে বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। এই ঘটনা ঘটার আগে কোনো আভাস পাচ্ছ, অভী?”

অভী মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “না, অধিনায়ক। এটা যখন হয়, তখন চোখের সামনে আলো কমে যেতে থাকে, যেন হঠাৎ করে সন্ধ্যা নেমে আসছে। তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাই। বেশ

কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি ফিরে আসে ঠিকই, কিন্তু এটা দিনে-দিনে বাড়ছে, আমি বুঝতে পারছি।”

শ্যামশ্রী আতঙ্কিত স্বরে বললেন, “রক্ষোবৈদ্য, আপনি কী বুঝছেন? কেন হচ্ছে এ-রকম?”

সাদা দাড়িতে একবার আঙুল বুলিয়ে নিয়ে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “খুব সম্ভবত নরকবিষের প্রভাবে। গত যুদ্ধের পর থেকেই এটা হচ্ছে, তার মানে ওই বিষ অতীত শরীরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। নিজের মধ্যে ওই প্রচণ্ড বিষ ধারণ করে রাখার একটা খারাপ প্রভাব তো পড়বেই।”

নীলাভ্রর মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল। সে বলল, “একে সারানোর উপায়?”

রক্ষোবৈদ্য কিছু না বলে শুধু একটু মাথা নাড়লেন। শ্যামশ্রী ব্যাকুলভাবে বললেন, “হতেই পারে না। আমার ছেলে অন্ধ হয়ে যাবে? রক্ষোবৈদ্য, আপনি পৃথিবীর সব রোগের নিরাময় জানেন। আপনি বলুন, এই রোগের ওষুধ কী।”

রক্ষোবৈদ্য চুপ করেই রইলেন। বজ্রধর বললেন, “রক্তপদ্মরাগের প্রয়োগে আপনি মৃত মানুষকেও বাঁচিয়ে তুলেছেন। ওই মণি দিয়ে এই অন্ধত্বের কোনো চিকিৎসা করা যাবে না?”

রক্ষোবৈদ্য ধীরে-ধীরে বললেন, “আমি এখানে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে চাই না, অধিনায়ক। কেন, আশা করি আপনি বুঝবেন।”

অভী স্থির হয়ে এতক্ষণ সবার কথা শুনছিল। সে বলল, “আপনি দয়া করে স্পষ্ট করেই সবকিছু বলুন, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়। আমার সামনেই বলুন। আমি ভয় পাব না। মৃত দেবতা আমাকে নরকের মধ্যে বলেছিলেন, আমার সময় হয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে যা-ই ঘটুক না কেন, তার জন্য আমি তৈরি। আর আমার মা-বাবা দুজনেই সমরোত্তম; কঠিন সত্য শোনার সাহস তাঁদেরও আছে বলেই আমার ধারণা।”

রক্ষোবৈদ্য বজ্রধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নরকে গিয়ে অগ্নিময় বিষের নদীর উৎস থেকে পান করেছিল অভী। তার শরীর যতক্ষণ ওই বিষ বহন করে চলেছে, ততক্ষণ পৃথিবীর কোনো মায়া ওই বিষের প্রভাব নিরাময় করতে পারবে না— রক্তপদ্মরাগও নয়। অভী নিজে এখন একজন বিষনিয়ন্তা; এই মুহূর্তে কোনো জাগতিক ঔষধ ওর ওপর আর কাজ করবে না।”

অভী বলল, “অর্থাৎ এই অন্ধত্ব বাড়তেই থাকবে?”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “আমার তা-ই ধারণা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে তোমার হিমকুশলতার ক্ষমতা। কেন জানো? ওই শক্তিকে তুমি তোমার অন্তরের প্রবল ঘৃণাবোধ দ্বারা চালিত কর। আর এখন তোমার ভেতরে বয়ে যাচ্ছে মায়াজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী তরল বিষ। এই দুই বিষাক্ত বস্তুর মিশ্রণে তোমার হিমকুশলতার ক্ষমতা আরও বাড়বে, যতদিন না...”

চুপ করে গেলেন তিনি। অভী তাঁর অসমাপ্ত কথাটা শেষ করল, “যতদিন না আমার মৃত্যু হয়, তা-ই তো?”

রক্ষোবৈদ্য নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। শ্যামশ্রী পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। এই অত্যন্ত অস্বস্তিকর আলোচনাটা শেষ করতেই সেন নীলাভ বলল, “অধিনায়ক, আপনি রক্ষোবৈদ্য মহোদয়কে নিয়ে সুদক্ষিণসারি যাবেন বলছিলেন না?”

বজ্রধর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। “হ্যাঁ, সেইরকমই তো ভাবছিলাম। রক্ষোবৈদ্য, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।”

ওদের তিনজনকে অনুশীলন মঞ্চের কাছে রেখে বজ্রধর রক্ষোবৈদ্যকে নিয়ে চললেন মাঠের ওপর দিয়ে। নীলাভ এক হাত রাখল অভীর পিঠে, আর এক হাত রাখল শ্যামশ্রীর কাঁধে। অভী দেখল, মায়ের চোখে জল।

নীলাভ বলল, “অভী, এখন আমাদের সামনে অনেক বড়ো বিপদ। ঐশিকরা আমাদের বিরুদ্ধে নির্ঘাৎ কোনো অশুভ পরিকল্পনা করছেন। রাক্ষসরা আমাদের মিত্র নয়, কোনোদিনই ছিল না; সেখান থেকেও যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে। এই অবস্থায় আমাদের সাহস হারালে চলবে না।”

অভী একটু হাসল। “আমি সাহস হারাচ্ছি না, বাবা। আমি মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখেছি যে আর মরার ভয় পাই না আমি।”

শ্যামশ্রী অস্থিরভাবে বললেন, “চুপ কর তুই।”

নীলাভ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “না শ্যামা, অভী ভুল কিছু বলেনি। আমরা যোদ্ধা, আমরা জানি আমাদের জীবন কতটা অনিশ্চিত। অভীও তার মতো করে যুদ্ধ করেই বেঁচেছে এতদিন। নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ওর এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস।”

শ্যামশ্রী কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। নীলাভ বলল, “অভী, রক্ষোবৈদ্য অতি উত্তম চিকিৎসক, কিন্তু উনি যোদ্ধা নন। তোর হিমকুশলতা কিন্তু আসলে একটা যুদ্ধক্ষমতা। আর যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা সমরোত্তমরা যা জানি, তা রক্ষোবৈদ্য জানবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক।”

অভীর আগে শ্যামশ্রীই বলে উঠলেন, “কী বলতে চাইছ তুমি?”

নীলাভ বলল, “তুমি যে-কথা আগে বহুবার অভীকে বলেছ, আমি সেই কথাই বলতে চাইছি। হিমকুশলতার আসল বিষয় হল আবেগ নিয়ন্ত্রণ। সেই কাজটি করতে অভী তোর সমস্যা হয়, আমরা দেখেছি। রবির ফুলঝুরি হাতে নিয়ে তুই আগের দিন যে কাণ্ড ঘটিয়েছিস, সেই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত আবেগকে সংহত করতে হবে তোকে। তোর শরীরের নরকবিষের ওপর তোর নিয়ন্ত্রণ নেই ঠিকই, কিন্তু নিজের ঘৃণাবোধকে তুই চাইলে নিজের ইচ্ছার অধীনে আনতে পারিস। তাতে তোর এই হঠাৎ-অন্ধত্বের ওপরও নিয়ন্ত্রণ আসবে বলে আমার ধারণা।”

শ্যামশ্রী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “মায়াযুদ্ধের মূল কথাটাই তুমি বলছ, নীলাভ। অভী, এতদিন তুই খালি আবেগকে প্রয়োগই করেছিস, সংবরণ করা শিখিসনি। সেটাই এখন তোকে শিখতে হবে।”

নীলাভ্র আদর করে তার মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলল, “দেখ বাবা, আমাদের জীবন-মৃত্যু আমাদের হাতে নেই। মৃত্যু সবার জন্যই একদিন না একদিন আসবে, কিন্তু তার আগেও তো আমাদের একটা গোটা জীবন পড়ে আছে। মরে যাওয়ার আগে এই বেঁচে থাকার যেটুকু বাকি আছে, সেইটুকুকে তো আমরা তেতো হয়ে যেতে দিতে পারি না। আমরা সমরগরিমার যোদ্ধারা কোনোদিন যুদ্ধ ছেড়ে পালাইনি। তুই...”

অভী বলল, “আমিও সমরগরিমার যোদ্ধা, বাবা। যুদ্ধ ছেড়ে আমিও পালাব না। আমাকে তোমরা শেখাও কীভাবে এই প্রচণ্ড ঘৃণার আবেগকে নিজের বশে নিয়ে আসতে পারা যায়। কী দিয়ে জয় করা যায় এই ঘৃণাকে?”

নীলাভ্র একবার শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর অভীর কাঁধে হাত রেখে বলল, “ভালোবাসা দিয়ে।”

একদিন আগে নিয়ামক বিনীতেশ ফিরে এসেছেন তাঁর পুরোনো পদে, পুরোনো বাসভবনে। এসেই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন রক্ষীপ্রধান চক্রবাককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

এই নিয়েই অভী আর নিধির সঙ্গে কথা বলছিল স্বর্ণশেখর। অভী বলছিল, “এই চক্রবাক মোটেই সুবিধার লোক নয়, রবিকাকা। এর আগে সুদক্ষিণসারিতে গিয়ে নিয়ামকের আদেশে অনেকবার ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করেছে এ, আমি বাবার কাছে শুনেছি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “ঠিকই শুনেছিস। লোকটা নিয়ামকের অনুগত, এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু ওর চরিত্রের আর একটা দিক হয়তো তোরা জানিস না। অন্যদের কষ্ট দিয়ে, বিশেষ করে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে মজা পায় লোকটা— অদ্ভুত এক মানসিক বিকৃতি আছে ওর। নিয়ামক বিনীতেশের উপযুক্ত সহচরই বটে!”

নিধি মুখ গম্ভীর করে এতক্ষণ শুনছিল। সে বলল, “অভী, সেদিন তুমি তখনও এসে পৌঁছওনি, কিন্তু আমি তো ছিলাম ওই যুদ্ধক্ষেত্রে। তরুণের মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ওই লোকটা।”

এ-কথা নিধির বোন নীপার কাছে আগেও শুনেছিল অভী। নিধি বলল, “সমরোত্তম নীলাভ্রকে অনায়াসে সেদিন আড়াল করতে পারত চক্রবাক। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো ছিল না; একসময় তিনি উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন ওকে। তাই ওই আক্রমণের মুখে তাঁকে খুব চালাকি করে একলা করে দিয়ে সরে গিয়েছিল ও। তরুণ সেই মুহূর্তে আর কোনো উপায় না দেখে তাঁকে বাঁচাতে গিয়েই মারা গিয়েছিল। ওইসময় চক্রবাক ওই ছোট বিশ্বাসঘাতকতাটা না করলে ছেলেটা হয়তো আজও বেঁচে থাকত।”

মেঘবর্ণ এসে যোগ দিল ওদের আলোচনায়। “কী কথা হচ্ছে তোমাদের, রবি? সবার মুখ এত গম্ভীর কেন?”

স্বর্ণশেখর বলল, “চক্রবাকের কথা হচ্ছে। নিয়ামক ক্ষমতায় বসেই গতকাল চক্রবাককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং দু’জনে মিলে বহুক্ষণ রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথাবার্তা হয়েছে। দুর্জন দুর্জনকে ঠিক চিনে নেয়, তাই না?”

মেঘবর্ণ বলল, “তাহলে বলি শোনো। আজ এই একটু আগে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। সুচিত্রকে চেনো তো তোমরা?”

নিধি মাথা নাড়ল। “চিনি। আমাদের সুদক্ষিণসারিতে ফলের রসের দোকান আছে তার।”

নামটা অভীর চেনা-চেনা লাগছিল, নিধির কথা শুনে তারও মনে পড়ে গেল। দূর থেকে দেখেছে সে লোকটিকে। মেঘবর্ণ বেশ কিছুদিন আগে বলেছিল, এ তার বন্ধু।

স্বর্ণশেখর মাথা নেড়ে বলল, “আমি তো অনেকদিন এ তল্লাটে ছিলাম না; আমি চিনতে পারছি না। কে লোকটা, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমার বন্ধু একজন অর্ধরাক্ষস। সুদক্ষিণসারিতে গেলে এর দোকানে মাঝেমধ্যেই আমি ফলের রস খেতাম। আজ লোকটাকে আয়তনে দেখলাম।”

নিধি অবাক হয়ে বলল, “সুচিত্রকাকা আয়তনে এসেছিল? এদিকে তো কখনও আসতে দেখিনি তাকে। কার কাছে এসেছিল?”

মেঘবর্ণ বলল, “সেটাই তো বলছি। চক্রবাক।”

অভী আর নিধি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। স্বর্ণশেখর বলল, “ফলের রসের দোকানি আমাদের নিয়ামকের প্রিয় রক্ষীপ্রধানের কাছে কী দরকারে আসতে পারে?”

মেঘবর্ণ বলল, “সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা আরও সন্দেহজনক লাগছে এই কারণে যে আমাকে আসতে দেখেই হঠাৎ চক্রবাকের সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে কেমন যেন চোরের মতো মুখ নামিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল সুচিত্র। নিশ্চয়ই ভেতরে কিছু গভীর ব্যাপার আছে, নতুবা এই আচরণের কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।”

স্বর্ণশেখর বলল, “অধিনায়ককে জানাবে কথাটা?”

মেঘবর্ণ মাথা নেড়ে বলল, “তোমাকে সত্যি বলছি, রবি, আমি এই মুহূর্তে অধিনায়কের ওপর আর নতুন একটা চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো আমাদের নিজেদেরকেই সমাধান করে নিতে হবে। অধিনায়ক রোজ নতুন-নতুন দুশ্চিন্তা নিয়ে এমনিতেই জর্জরিত। মানুষটাকে আর বিব্রত করতে ইচ্ছা করছে না আমার।”

অভী বলল, “আরও কোনো নতুন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে নাকি?”

মেঘবর্ণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “এই ব্যাপারটা শিক্ষার্থীদের সামনে বলার নিষেধ ছিল, তবু আমি বলে রাখছি তোমাদের। অভী, নিধি, তোমরা আর এই নিয়ে কারও সামনে মুখ খুলো না। অধিনায়ক বজ্রধর উড্ডীনখরদের নিয়ে ভীষণ চিন্তিত।”

স্বর্ণশেখর চমকে উঠল। “সে কী? কেন? তারা তো ওঁর আজ্ঞাধীন ছিল।”

“ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। অধিনায়ক যে সংগত কারণেই চিন্তিত, বুঝতেই পারছ।”

অভী বলল, “উড্ডীনখর আবার কারা? এ-রকম কোনো জাতির লোকের নাম তো কখনও শুনিনি!”

নিধি বলল, “আমিও শুনিনি।”

মেঘবর্ণ বলল, “শোননি ঠিকই, কিন্তু দেখেছ। অন্তত নিধি তো দেখেইছে। কিন্তু ওরা কোনো জাতির ‘লোক’ নয়। শেষ যে বার শর্বর এই আয়তন আক্রমণ করেছিল, সে-বারের কথা মনে আছে?”

অভী আর নিধি দু’জনেই মাথা নাড়ল। সে-সব কথা কি ভোলা যায়?

মেঘবর্ণ বলল, “বিশালাকৃতির কিছু বাদুড়জাতীয় জীব সে-বার অধিনায়ক বজ্রধরের ইঙ্গিতে নেমে এসেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল রাক্ষসেরা। অভী, তুমি ততক্ষণে নরকগহ্বরে পড়ে গেছ, তাই তুমি ওদের দেখতে পাওনি, কিন্তু নিধি নিশ্চয়ই মনে করতে পারছ? ওরাই উড্ডীনখর; ওরা মায়াজগতের অসম্ভব হিংস্র জন্তু; সাধারণত দল বেঁধে ওরা আক্রমণ করে। অধিনায়ক বজ্রধর যখন মৃত দেবতাকে সন্তুষ্ট করে যমদণ্ডের অংশশক্তি ধারণ করার আশীর্বাদ পান, তারপর থেকে একটু-একটু করে ওই জন্তুগুলো তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। প্রথম শর্বরযুদ্ধের সময়েও পুরোপুরি ওরা বশ মানেনি, কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে তিনি ওদের নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর আদেশে ওরা যে-কোনো প্রতিপক্ষকে হিন্তাভিন্তা করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত।”

নিধি আতঙ্কিত সুরে বলল, “ও বাবা! ওই বাদুড়গুলোকে আমার খুব মনে আছে। আকাশ থেকে যখন ওরা রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল শক্ত ঠোঁট আর ধারালো নখে করে ওদের গলা কেটে মাথা ছিঁড়ে ফেলছিল, সে দৃশ্য দেখে আমারই ভয় করছিল।”

স্বর্ণশেখর বলল, “ওরা দল বেঁধে আক্রমণ করলে গোটা মায়াজগতে কারও সাধ্য নেই ওদের ঠেকায়। অধিনায়ক বজ্রধরের যমদণ্ডকে ওরা ভয় পেত বলে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু মেঘবর্ণ, তুমি তো বলছ...”

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর সদ্য ওদের আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু ওরা আগের মতো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আর আসেনি। অধিনায়কের ধারণা, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ওদের আনুগত্য নষ্ট হয়ে গেছে। মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে আসার পর তাঁর ডাক ওরা আর চিনতে পারছে না, বা চিনতে চাইছে না।”

নিধি বলল, “তাতে ক্ষতি কী? ওদের ছাড়াই আমরা সমরগরিমায় যে-কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর ক্ষমতা রাখি।”

মেঘবর্ণ ম্লান হেসে চুপ করে রইল। অভী হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চক্ষু বিস্তারিত করে বলল, “অধিনায়ক ভয় পাচ্ছেন ওই ভয়ংকর জন্তুগুলোকেই আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করবেন ঐশিকরা। আমি কি ঠিক বলছি, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “বুঝে ফেলেছ দেখছি। আমি দায়িত্ব সহকারে বলছি অতী, ওরা যদি দল বেঁধে আক্রমণ করে, তাহলে আমরা কোনোমতেই ওদের থামাতে পারব না। হ্যাঁ, চন্দ্রহাসের মতো দৈবাস্ত্র থাকলে অবশ্য কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারবে; কিন্তু ওই একটি অস্ত্র দিয়ে হাজার-হাজার উড্ডীনখরকে কীভাবে সামলাবে তুমি?”

স্বর্ণশেখর গম্ভীরমুখে বলল, “অধিনায়কের যমদণ্ডের কী সংবাদ?”

মেঘবর্ণ বলল, “যমদণ্ডের ক্ষমতা কমছে, এ-কথা উনি আগেও বলেছিলেন। ওই আংশিক দৈবাস্ত্রটি উনি আর আগের মতো পূর্ণশক্তিতে ব্যবহার করতে পারবেন না। কোনো একটা বড়ো কাজে ব্যবহারের জন্য ওর ক্ষমতাকে উনি সংরক্ষিত রাখছেন, এ-কথা অধিনায়ক নিজে আমাকে বলেছেন।”

“কিন্তু ওই জন্তুগুলোকে যে ঐশিকরা আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবেন, তার কী নিশ্চয়তা?” নিধি প্রশ্ন করল।

স্বর্ণশেখর বলল, “ঐশিকদের সঙ্গে যে আমাদের যুদ্ধ অবশ্যস্বাবী, তা কি তোমরা বুঝতে পারছ না? সৌজন্য ইতোমধ্যেই খবর দিয়েছে, ওঁরা অতী হিমকুশলতার পালটা হিসাবে এক আগুন-দানব তৈরি করছেন। যুদ্ধদেব ঐশিকশ্রেষ্ঠের মৃত্যুর পর আমাদের সমরোত্তমদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে ওঁরা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নামবেন না, এ আমরা ভালো করেই জানি। তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে ওঁদের হয়ে যুদ্ধ করবে কে? গোটা মায়াজগতে কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যোদ্ধা এ-কাজ করতে রাজি হবে না। রাক্ষসরা করতে পারত, কিন্তু তাতে দুটো অসুবিধা। এক, তাদের এতে আপাতত কোনো লাভ নেই; এবং দুই, রাক্ষসরা জানে, আমরা পাঁচজন সমরোত্তম একদিকে থাকলে তারা কোনোমতেই জিততে পারবে না। তাহলে ঐশিকদের হয়ে লড়বে কে? এমন কেউ, যারা কেবল অন্ধের মতো নির্বিচারে হত্যার আদেশ পালন করবে, এবং যাদের প্রাণের ভয় নেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর তাঁর যমদণ্ড ব্যবহার করে ওদের আহ্বান করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ডাক সম্ভবত ওদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। অর্থাৎ ওরা এই সমরগরিমায় বা মাল্যপর্বতে নেই। তাহলে ওই খুনে পাখিগুলোর পুরো ঝাঁকটা গেল কোথায়? এর একটাই উত্তর হয়— আকাশলোকে! ঐশিকমায়া দিয়ে ঘেরা ওই জায়গায় অধিনায়কের আহ্বান না পৌঁছনোই স্বাভাবিক।”

গতবার তার আকাশলোকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মনে পড়তেই অতী একবার কেঁপে উঠল। যে দু'জন সে-বার তার সঙ্গে ছিল, তারা কেউই আজ আর নেই।

মনে অনেকগুলো দূর্চিত্তা নিয়ে সমরোত্তমদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিত্রভবনে ফিরে এল অতী। দুপুরে নিধি আর মিত্রমাসির সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু চিন্তাগুলো কিছুতেই যেন তার পিছু ছাড়ছে না। নিধি তার মুখ দেখে তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল, কিন্তু মিত্রমাসির সামনে সে-ও আর কিছু বলল না। সমরগরিমার অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজেদের

আতঙ্কের ভাগ এই নিরীহ প্রৌঢ়াকে দিয়ে তাঁর মন খারাপ করে দেওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অভী নিজের কক্ষে চুপ করে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। জানালা দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা যাচ্ছে— সবুজ ঘাসগুলো বালমল করেছে দুপুরের রোদে। সেই বিস্তীর্ণ উদাস মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অভীর মনে হল, জীবনটা যেন হঠাৎ করেই কী ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। রবিকাকার সঙ্গে কাটানো নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছিল তার— সেই নির্ভর, নিশ্চিত দুপুরগুলো তারা দু'জন সামান্য খাবার খেয়ে কেমন অনায়াসে কাটিয়ে দিত। আর সেই দু'জনে মিলে বৈকালির জঙ্গলে যাওয়া! অভী বুঝতে পারছিল, সেই নিখাদ আনন্দের দিনগুলো আর কখনও ফিরে আসবে না।

লীনা, উর্মি— মানুষগুলো অল্পদিনের জন্য এল তার জীবনে, তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। কী দুর্নিবার মায়ায় যে ওরা তাকে বেঁধেছিল, অভী যেন এখনও তার তল খুঁজে পায় না।

যে একবার যায়, সে আর ফেরে না কেন?

অভী ভাবল, ‘অধিনায়ক বজ্রধর তো ফিরেছেন।’

তারপর তার মনে পড়ল, অধিনায়ক কয়েকদিন আগেই বলছিলেন, মৃত দেবতা তাঁকে অল্পদিনের ছুটিতে পাঠিয়েছেন। আবার ছুটি ফুরোলেই ফিরতে হবে তাঁকে।

অভীকেও তো দেবতা বলে রেখেছেন, তার সময় হয়ে আসছে। এইবার মৃত্যু এলে দেবতার সঙ্গে তার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে। তার অন্ধত্ব যেভাবে বার-বার ফিরে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে, বিষটা তার শরীরে ভালোমতোই কবজা করে ফেলেছে।

বাবা-মায়ের সামনে একটু আগেই সে বলেছে, মরতে আর সে ভয় পায় না। তাদের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করতে সে চায়নি বলেই কি ও-কথা বলেছিল সে? কথাটা কতটা সত্যি?

“মৃত্যুকে কি আমি ভয় পাই?” নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল অভী।

অদ্ভুতভাবে তার ভেতর থেকে উত্তর এল, “হ্যাঁ।”

বড়ো অস্থির লাগছে ভেতরে-ভেতরে। স্বয়ং মৃত দেবতার দেখা যদি পাওয়া যেত, তাঁর কাছে সে জেনে নিত, আর কতদিন আয়ু আছে তার। বাইরে মাঠের ওপর দুপুরের রোদ মরে আসছে; দূরে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে।

উঠে পড়ল অভী। একা-একা একবার মৃত দেবতার নদীর তীর থেকে ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হয় না।

দরজা খুলে বেরোতেই সে দেখল, নিধি বসে আছে বাইরে। নিধি বলল, “কোথাও বেরোচ্ছ?”

“একটু হেঁটে আসব ভাবছি।”

“আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?”

অভী ‘না’ বলতে পারল না। “চলো তাহলে।”

নিধি এখন যেখানেই যায়, প্রায় সবসময়ই ত্রিশূলটি তার সঙ্গে থাকে। এগন ও ওটা নিয়েই সে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল; অভী বলল, “ত্রিশূলটা রেখে যাও এখানে।”

নিধি ভ্র তুলে প্রশ্ন করল, “কেন?”

“যেখানে যাব ভাবছি, সেখানে সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষেধ।”

একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল নিধি। অস্ত্র নিয়ে কোথায় যাওয়া নিষেধ, সে-কথা সমরগরিমার প্রতিটি লোকই জানে।

নিধি বলল, “ওখানে তোমার কী কাজ?”

“কোনো কাজ নেই। যেতে ইচ্ছে করছে বলে যাচ্ছি।”

ত্রিশূলটা নিজের কক্ষে রেখে দিয়ে এসে নিধি বলল, “চলো।”

দু’জনে ওরা বেরিয়ে এল মিত্রভবন থেকে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সন্দীপ আর উষসী বসে বসে গল্প করছে গাছের নিচে বসে। সমরোত্তম শ্যামশ্রী অনুশীলন মঞ্চের কাছে একদল শিক্ষার্থীকে মায়াযুদ্ধের প্রাথমিক পাঠ শেখাচ্ছেন— তাদের মধ্যে নীপাও আছে। পর্বত তার কুকুর বক্রপুচ্ছকে নিয়ে মাঠে পায়চারি করছে। ওদের দেখে হাত নাড়ল সে।

“অভী, নিধি, কোথায় চললে?” পর্বত উচ্চকণ্ঠে জানতে চাইল।

নিধি বলল, “কোথাও না। এই এমনি একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।”

বক্রপুচ্ছকে রেখে পর্বত এগিয়ে এল ওদের দিকে। “অভী, মাল্যপর্বতে তোমার সঙ্গে উত্তরার দেখা হয়েছিল?”

অভী মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল। তারপরও পর্বত জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অভী বুঝতে পারল সে কী জানতে চাইছে। একটু হেসে সে বলল, “চিন্তা কোরো না, পর্বতদা। তার বিষহরণ করে নিয়েছি আমি। মহাসর্পিণীর বিষের কুপ্রভাব থেকে এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। দিব্যি এখন কথাবার্তা বলছে বউদি।”

তার হাত ধরে অশ্রুসজল চোখে পর্বত বলল, “অভী, অধিনায়ক বজ্রধরের পরে কারও কাছে যদি আজীবন আমরা ঋণী থাকি, সে তুমি।”

অস্বস্তিভরে অভী বলল, “আহ্, পর্বতদা! এ-সব কী কথা! তোমরা আমার নিজের লোক; তোমাদের জন্য করব না তো কার জন্য করব?”

পর্বত নিধির দিকে তাকিয়ে বলল, “নিধি, আমি জানি না তুমি অভীর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে কতটা জানো, বা ও তোমাকে কতটা বলেছে। নিজের শরীরে নরকবিষ ধারণ করার পর থেকেই ওর চোখের দৃষ্টি মাঝে-মাঝেই চলে যাচ্ছে। আমি রক্ষাবৈদ্যের কাছে গুনেছি, এর পরে অন্যের শরীর থেকে বিষহরণ করে নিজের শরীরে নেওয়ার মতো কাজ ও যত করবে, ততই ওর মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। তবু ছেলেটা বারবার এই ধরনের কাজ করে চলেছে।”

নিধি কিছু না বলে তাকিয়ে রইল অভীর দিকে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অভী বলল, “পর্বতদা, আমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে, আমিও জানি। তার আগে যদি কারও একটু হলেও কাজে লাগতে পারি, তাতে ক্ষতি কী বলো!”

পর্বত মাথা নেড়ে বলল, “সে-ই তো! এ দুনিয়ার বড়ো অদ্ভুত নিয়ম গো। বিষকে যে ধারণ করতে পারে, আমরা আমাদের সব বিষের ভার তার কাঁধে তুলে দিয়েই নিশ্চিত থাকি; সেই মানুষটার কতখানি কষ্ট হয়, সে কথা আর কে ভাবে? তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোটো করব না, অভী। দেখো, আমরা সবাই যোদ্ধা; কাকে কখন চলে যেতে হবে, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি আমার আগে চলে যাও, আমি তোমাকে মনে রাখব সেই ছেলেটা হিসাবে, যে অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে দু’বার ভাবেনি।”

তার কাঁধে আলতো একটা থাপ্পড় দিয়ে আবার বক্রপুচ্ছের কাছে চলে গেল পর্বত। অভী নিধির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিভরে হাসল।

নিধি গম্ভীরমুখে শুধু বলল, “হাঁটতে থাকো।”

ওরা হেঁটে চলল মাঠের ওপর দিয়ে সুদক্ষিণসারির রাস্তা যেখান থেকে ডানদিকে বেঁকেছে, সেইদিকে। বামদিকের পথটা যাচ্ছে পীতপত্রবনের দিকে। এই বন পেরিয়ে গেলে তবে দেখা পাওয়া যাবে মৃত দেবতার নদীর হলুদ জলের।

জঙ্গলের পথে রাশি-রাশি শুকনো পাতা পড়ে আছে। বিশাল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে শেষবেলার নরম আলো এসে পড়েছে। মাথার ওপর আকাশ ম্লান; পাখিরা কলরব করতে করতে ফিরে আসছে জঙ্গলের গাছে গাছে। বিকেলের বাতাসে একটি আরামদায়ক স্নিগ্ধতা লেগে আছে। খচমচ শব্দ করে পাতা মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর নিধি বলল, “অভী, লীনা আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তারপর তুমি এলে মিত্রভাবে। আমার নিজের বাড়িতে আমার বাবার কাছ থেকে তেমন ভালোবাসা আমরা দু’বোন কোনোদিনই পাইনি। কিন্তু তোমাদের দুটির মতো খাঁটি বন্ধু আমার ভাগ্যে জুটবে, এ-কথা এখানে আসার আগে আমি কখনও ভাবিনি। তোমরা দু’জন আমার বেঁচে থাকার কতটা জুড়ে আছ, তা তুমি হয়তো আন্দাজ করতেও পারবে না। আমরা যোদ্ধা, আমাদের মৃত্যু যে-কোনো দিন আসবে, এ-সব কথা কি আমি জানি না? আমি নিজে কি মৃত্যুর একদম দরজা থেকে ফিরে আসিনি? তোমাকে আমার একটাই অনুরোধ— লীনা তো ফিরবে না, কিন্তু তুমি আর দয়া করে বারবার ‘চলে যাব, চলে যাব’ বলে আমায় জ্বালিয়ে না।”

রীতিমতো ঝাঁঝের সঙ্গে শেষ ক’টা কথা বলে নিধি চুপ করে গেল। তার রাগ দেখে অভী হেসে ফেলল। নিধি ঞ্চ কুঁচকে বলল, “হাসির কী হল, শুনি?”

অভী বলল, “তোমার রাগ দেখে হাসছি।”

“আমার রাগ কি একটা হাসির জিনিস?”

অভী বলল, “না, সে-জন্য হাসিনি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তুমি চাইছ আমি যেন বেঁচে থাকি, আর ওদিকে ঐশিকরা আমাকে মারার জন্যই মায়া দিয়ে অগ্নিদানব তৈরি করছেন।”

নিধি বলল, “আর এ-সব কথা ভালো লাগছে না। চলো, চুপচাপ হাঁটি।”

গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ওরা গাছের সারির ফাঁকে নদীটা দেখতে পেল। বিকেলের আলো চিকমিক করছে তার হালুদ জলে। শুকনো পাতার রাশি পেরিয়ে অভী এগিয়ে গেল নদীর তীরের দিকে। যোত-যোত মাথা ঘুরিয়ে সে দেখল জঙ্গলের একটা গাছে বিশাল একটা মৌচাক হয়েছে; নিধি মুখ তুলে হাঁ করে সেটা দেখছে।

পীতপত্রবনের সীমানা থেকে প্রায় পঁচিশ হাত দূরত্বে নদী শুরু হচ্ছে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল অভী।

আনমনে বহতা জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বুঝতেও পারেনি কী বিপদ নেমে আসছে তার ওপর।

চোখটা হঠাৎ জ্বালা করে উঠল তার। অভীর বুকের ভেতর ‘ধক্’ করে উঠল। এইরকম জ্বালা যখনই শুরু হয়, তার কয়েক মুহূর্ত পর থেকেই চোখে সে আর কিছু দেখতে পায় না। অভ্যাসবশত চোখে হাত দিয়ে ঘষতে লাগল অভী। বৃথা চেষ্টা, সে জানে, তবু...

“অভী, সাবধান!”

নিধির ভয়াত চিৎকার কানে আসতেই সে ফিরে দাঁড়াল বনের দিকে মুখ করে। তার দৃষ্টি এরই মধ্যে ঝাপসা হতে শুরু করেছে। তবু সে দেখতে পেল, বনের গাছগুলোর পেছন থেকে নিধি পাগলের মতো ছুটে আসতে চাইছে তার দিকে, তার চোখ আকাশে।

মুখ তুলে তাকাতেই অভী দেখতে পেল জীবটাকে। মহাকায় বাদুড়টা ডানা ছড়িয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেমে আসছে তার ওপর। অভীর মনে হচ্ছে, তার চোখের দৃষ্টি এই মোক্ষম সময়েই আঁধার হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবে সে।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তারা। মৃত দেবতার নদীর তীরে আসবে বলে কেউই অস্ত্র নিয়ে আসেনি। এই অসহায় অবস্থায় তাদের পরিপূর্ণভাবে বাগে পেয়েছে ওই হিংস্র উড্ডীনখরটা। অস্পষ্টভাবে সে দেখতে পাচ্ছে, তার মাথার ওপর দীর্ঘ, ধারালো চঞ্চু নেমে আসছে, নেমে আসছে বাজপাখির মতো বাঁকানো, শক্ত নখ।

পলকের মধ্যে অভী বুঝে ফেলল, ঐশিকরা এই মৃত্যুদূতকে পাঠিয়েছেন তাকে হত্যা করতে।

সেই মুহূর্তেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ‘আমার যা হয় হোক, নিধিকে বাঁচাতে হবে।’

নিধি জঙ্গলের মধ্যে থাকায় উড়ন্ত বাদুড়টা এখনও তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু যেভাবে সে ছুটে আসছে, একবার খোলা আকাশের তলায় চলে এলে ওরা দু’জনেই মরবে এর হাতে। চোখের দৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে অভী মনে-মনে তার হিমকুশলতার শক্তিকে প্রাণপণে আহ্বান করল। তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেল পলকের মধ্যে; আর দেরি না করে জঙ্গলের মধ্যে ছুটন্ত নিধির পা লক্ষ করে একখণ্ড বরফ সজোরে পাঠিয়ে দিল সে। মুহূর্তের মধ্যে নিধির দুই পা জমিয়ে দিল সেই বরফের আস্তরণ। জঙ্গলের মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল নিধি।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল অভী। যতক্ষণ নিধি জঙ্গলের মধ্যে থাকে, আশা করা যায় এই উড়ুকু খুনে জীবটা ওকে দেখতে পারে না।

মাথার ওপর এসে পড়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তার বিরাট পাখার আওয়াজ পাচ্ছে অভী। উড্ডীনখর বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসছে তার ওপর। অভী তার কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছে সে।

যোদ্ধার প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই নিজের ডানহাতটা মুখের সামনে তুলে ধরেছিল সে। সেই হাতে গভীর আঁচড় কেটে গেল বিশালকায় উড্ডীনখর। তার ধাক্কায় অভী গড়িয়ে পড়ল নদীতীরের বালিতে।

এই এক আঘাতেই অভী বুঝে ফেলল, প্রাণীটার শরীরে দানবীয় শক্তি। চোখে দৃষ্টি আর হাতে চন্দ্রহাস থাকলে হয়তো সে এই মৃত্যুদূতের মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু এই দৃষ্টিবিহীন এবং নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে? এখন হিমকুশলতা প্রয়োগ করলেও এই অন্ধ অবস্থায় ওটাকে আঘাত করা একান্তই অসম্ভব।

নিধির চিৎকার কানে এল, “আবার আসছে! অভী, ডানদিকে সরে যাও।”

অভী অনুমান করতে পারল, নিধি তার চোখের করুণ অবস্থা বুঝে ফেলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বালির ওপর গড়িয়ে ডানদিকে সরে গেল সে। একদম কাছেই একটা ভোঁতা আওয়াজে সে আন্দাজে বুঝল, উড্ডীনখর ঝাঁপ দিয়েছিল তার শরীর—সম্ভবত গলা লক্ষ করে; একটুর জন্য বেঁচে গেছে সে।

কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ লড়া যায়? অভী বুঝতে পারছে, আজ আর রক্ষা নেই তার। এই হিংস্র প্রাণীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াই করার ক্ষমতা শুধু তার বা নিধির কেন, কোনো মানুষ বা রাক্ষসেরই নেই।

নিধির চিৎকার কানে এল তার। “অভী, শিগগির শাঁখটা বাজাও।”

শাঁখ?

এক মুহূর্ত অভীর সময় লাগল নিধির কথাটা বুঝতে। তারপরেই তার মুখ একটুকরো হাসি খেলে গেল।

কী বুদ্ধি মেয়েটার!

উড্ডীনখরের ডানার আওয়াজ আবার নেমে আসছে তার ওপর। নিধি আবার তাকে চোঁচিয়ে নির্দেশ দিল, “বামদিকে সরে যাও।”

তার কথামতো বালির ওপর সঙ্গে-সঙ্গে বামদিকে গড়িয়ে গিয়ে জামার মধ্য থেকে তার মহানীলগৃধ্রকে আত্মানের শঙ্খটি বার করে এনে ফুঁ দিল অভী।

এক মুহূর্তের মধ্যে বিস্তারিত ডানায় আকাশ ঢেকে নেমে এল অপরাজিতা। অভী দেখতে পেল না, কিন্তু নিধি বনের ধারে মাটিতে শুয়ে শুয়ে দেখল, অপরাজিতার পালকে ঢাকা সুবিশাল শরীরে তরবারির মতো দীর্ঘ চঞ্চু দিয়ে আঘাত করছে উড্ডীনখরটা। মহানীলগৃধ্রের শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। কিন্তু এত সহজে হার মানার পাত্র সেও নয়। উড্ডীনখরের চেয়ে দেহে অনেক বেশি শক্তি ধরে সে। নিধি বিড়বিড় করে বলল, “অপরাজিতা, জয়ী হও!”

বাদুড়ের মতো দেখতে প্রাণীটা আবার তীব্রবেগে আঘাত করতে আসছে। কিন্তু তার আগেই নিজের শক্ত পাঞ্জায় তার গলা ধরে মুচড়ে দিল অপরাজিতা। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বাদুড়টার মৃতদেহ এসে পড়ল নদীর বালির তীরে।

অপরাজিতা আস্তে-আস্তে পাখা মেলে এসে বসল দৃষ্টিহীন অভীর পাশে। অভী হাতড়ে-হাতড়ে তার গায়ে হাত দিতেই তার হাত ভিজে গেল রক্তে। অস্থিরভাবে অভী বলে উঠল, “নিধি, অপরাজিতা কি খুব আহত?”

নিধির পায়ের বরফ তখনও গলেনি; একটা পাথর দিয়ে ঠুকে-ঠুকে নিজের পায়ের বাঁধন ভাঙতে-ভাঙতে সে বলল, “বেশ আহত, এইটুকু বুঝতে পারছি। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছ তোমরা দু’জনেই। তোমার নিজেরও তো হাত দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়ছে।”

অভী অসহায়ের মতো বলল, “এবার কী করব আমরা?”

নিধি ততক্ষণে পায়ের বরফ পুরোটা ভেঙে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, “এই বনের মধ্যে নতুন করে গড়ে তোলা ছায়াভবন সরাইখানাটা কাছাকাছিই আছে। তোমরা থাকো, আমি ওখানে যাচ্ছি। সঞ্জীবদা হয়তো ওখানে থাকবে। তাকে পাঠিয়ে আয়তনে খবর দিচ্ছি।”

নিধি চলে গেল। অভীর চোখে জল এসে পড়েছিল। অপরাজিতার যদি কিছু হয়ে যায়...?

বিরাট মহানীলগৃধ্র তার মাথা ঘষে দিচ্ছিল অভীর গালে। এতক্ষণের অসহায়তা অভীর কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সে অপরাজিতার পালকে ঢাকা গলা জড়িয়ে চোখ মুছে বলল, “আজ তুমি না থাকলে আমি আর বেঁচে ফিরতাম না।”

অভী দেখেছে, অপরাজিতা তার সব কথা বুঝতে পারে। পাখিটা তার গায়ে ঠোঁট ঘষে দিল। দু’জনে ওরা বসে রইল অনেকক্ষণ। অভীর চোখের অন্ধকার এখনও কাটেনি।

তারপর নিধি ফিরে এল রক্ষোবৈদ্য আর মেঘবর্ণকে নিয়ে। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “দেখি অভী, কতখানি আহত হয়েছে তুমি উড্ডীনখরের নখের আঁচড়ে।”

অভী বলল, “না, আগে আপনি অপরাজিতাকে দেখুন। আগে ওর শুশ্রূষা করুন, তারপর আমাকে দেখবেন।”

রক্ষোবৈদ্য অপরাজিতার জন্যও ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন। তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলেন তিনি। তারপর অভীর দিকে ফিরে বললেন, “তোমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। এত রক্ত বেরোলে যে-কোনো মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। এই শরীর নিয়ে ফিরবে কী করে তুমি?”

মেঘবর্ণ বলল, “কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। আমি ওকে কাঁধে করে নিয়ে চলে যাব।”

নিধি ছায়াভবনে সঞ্জীবকে পায়নি। তখন নিজেই ছুটে গিয়েছিল সে আয়তনে। সেখানে সেবাকক্ষে মেঘবর্ণের সঙ্গে গল্প করছিলেন রক্ষোবৈদ্য। তার

কাছে সংক্ষেপে ঘটনা শুনেই দু'জনে দৌড়ে এসেছেন এখানে; অন্য কাউকে খবর দেওয়ার আর সুযোগ হয়নি।

কিন্তু অভীর চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা গেল, নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তার রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। রক্ষোবৈদ্য যতই ওষুধ মাখিয়ে বন্ধনী দেন, ততই বারবার নতুন করে রক্ত বেরিয়ে এসে তাকে ভিজিয়ে দেয়। তার চোখের দৃষ্টিও ফিরে আসেনি এখনও। মেঘবর্ণ চিন্তিতভাবে বলল, “উড্ডীনখরের নখে এমন একটা উপাদান থাকে, যেটা রক্তকে জমাট বাঁধতেই দেয় না, আমি অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে আগে একবার শুনেছিলাম।”

নিধি বলল, “তাহলে অপরাজিতার রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল কী করে?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অপরাজিতা মহানীলগৃধ্র— অত্যন্ত শক্তিশালী মায়াজীব। তার শরীরের নিজস্ব আরোগ্য মায়া আছে। কিন্তু অভী তো সাধারণ মানুষ। ওকে এই আঘাত থেকে সারিয়ে তোলা অত সহজ হবে না।”

নিধি বলল, “কিন্তু রক্তটা তো কোনো না কোনো ভাবে বন্ধ করতেই হবে। রক্ষোবৈদ্য, আপনার কাছে কি এখন রক্তপদ্মরাগ মণিটা আছে?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আছে। আমার নাতনির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ওটা সবসময় সঙ্গেই রাখি।”

“ওই মণি দিয়ে অভীর এই ক্ষত পুরোপুরি সারিয়ে তোলা যায় না?”

রক্ষোবৈদ্য একটু ভেবে বললেন, “আসলে অভীর শরীরের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক নরকবিষ আছে। তাই রক্তপদ্মরাগ আমি চট করে ওর ওপর ব্যবহার করতে চাই না। সুতসোমের ঘটনা আমি শুনেছি। কী থেকে কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না।”

অভী বলল, “আপনি আমার ওপর রক্তপদ্মরাগ প্রয়োগ করতে পারেন। সুতসোম আমার মতো বিষনিয়ন্তা ছিল না, তাই আশা করি আমার পরিণতি তার মতো হবে না। তবু এ-কাজের জন্য যদি কিছু ঝুঁকি নিতে হয়, তাহলে আমি সে ঝুঁকি নিতে রাজি। কিন্তু এই অঝোরে রক্তপাত বন্ধ না হলে আমি এখানেই মরে যাব।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, “কথাটা ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।”

পোশাকের মধ্য থেকে মণিটি বার করে এনে তিনি অভীর হাতের ক্ষতস্থানে চেপে ধরলেন। আশ্চর্যজনকভাবে সঙ্গে-সঙ্গে তার রক্তপড়া বন্ধ হয়ে ক্ষত জুড়ে গেল।

চোখ ঘষতে লাগল অভী। চোখের জ্বালাভাবটা কমে গিয়ে তার হঠাৎ যেন খুব ঘুম পাচ্ছে। দৃষ্টির সামনে যে অন্ধকার পরদাটা বুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা যেন ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে। অভী বুঝতে পারছে, তার দৃষ্টি ফিরে আসছে।

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অভী, এখনই চোখ খুলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তোমার শরীরের মধ্যে এখন নরকবিষ আর রক্তপদ্মরাগের দুই বিপরীত মায়ার

সংঘর্ষ চলছে। একটু সময় দাও এই আরোগ্যপ্রক্রিয়াকে। এর ফলে হয়তো স্বপ্নের মতো কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাবে। তাতে ভয় পোয়ো না যেন।”

অভী অপেক্ষা করতে থাকল। রক্তপদ্মরাগ এখনও তাকে স্পর্শ করে আছে বাহ্যতে। তার বন্ধ চোখের সামনে যেন সারি-সারি মেঘ ভেসে যাচ্ছে, দেখতে লাগল অভী।

হঠাৎ সেই মেঘের মধ্যে ‘দপ্’ করে জ্বলে উঠল একটা মুখ। অভী চমকে উঠল।
উর্মি!



।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

হৃদয়শরের সন্ধানে

“এই ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, উড্ডীনখরদের আনুগত্য বদলে গেছে,” বজ্রধর বললেন। “ওদের সম্পূর্ণরূপে বশে এনে ফেলেছেন ঐশিকরা।”

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক, আপনার আশঙ্কাই সত্যি হল।”

সম্মেলন কক্ষে বসেছিলেন ওঁরা। সমরোত্তমরা সবাই আছেন, স্বর্ণশেখর বাদে। সে রক্ষোবৈদ্যের সঙ্গে সেবাকক্ষে কয়েকজন রোগীর তত্ত্বাবধান করছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে; কক্ষের মধ্যে সাত-আটটা মশাল জ্বলছে। অভীর রক্তপাত বন্ধ হয়েছে; তবে দুর্বলতা পুরোপুরি কাটেনি এখনও।

সে ভাবছিল, ‘আজ হঠাৎ উর্মিকে দেখলাম কেন? এই রক্তপদ্মরাগ একসময় তাঁর অংশ ছিল বলে?’

তার চিন্তায় বাধা পড়ল বাবার একটা কথায়। নীলাভ বলছে, “আমার মনে হয়, অভীর ওপর আজকের আক্রমণটা ঐশিকরা করিয়েছিলেন প্রলয়যোদ্ধার শক্তি মেপে নিতে। অভী ওই হিংস্র বাদুড়গুলোর বিরুদ্ধে কতখানি লড়াই করে উঠতে পারে, সেটা বুঝে নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে উদ্দেশ্য বার্থ হয়েছে তাঁদের। তাঁরা সম্ভবত উড্ডীনখরের ওপরে হিমকুশলতার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু অতীত আজ হিমকুশলতা প্রয়োগ করেইনি। কাজেই তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হল না।”

নিধি বলল, “আমি একটা প্রশ্ন করব?”

বজ্রধর মাথা নেড়ে সম্মতি দিতে সে বলল, “আজ স্বচক্ষে দেখলাম, মহানীলগৃধ্রের মতো বিরাট পাখিকে ব্যবহার করে উড্ডীনখরকে পরাস্ত করা যায়। ভবিষ্যতে যদি উড্ডীনখর দিয়ে ঐশিকরা আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আমরা জটায়ুবাহিনীর গৃধ্রদের দিয়ে সে আক্রমণ ঠেকাতে পারি না?”

বজ্রধর ম্লান হেসে বললেন, “না, নিধি। মহানীলগৃধ্র খুবই দুর্লভ মায়াপক্ষী। তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এদিকে উড্ডীনখররা আক্রমণ করে হাজারে-হাজারে। আমাদের জটায়ুবাহিনীর সবক’টি পাখিকে একজায়গায় আনলেও তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আগেই ওই হিংস্র বাদুড়গুলো ওদের শেষ করে ফেলবে। আমি আবার বলছি, সংঘবদ্ধ উড্ডীনখর-আক্রমণের মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।”

কক্ষের রুদ্ধদ্বারে বাইরে থেকে করাঘাতের শব্দ এল। নীলাভ উঠে গিয়ে দরজা খুলতে পর্বত এসে ভেতরে ঢুকল।

সবাইকে নমস্কার জানিয়ে সে বলল, “অধিনায়ক, একটি চমকপ্রদ সংবাদ আছে।”

বজ্রধর বললেন, “আজ দেখছি চমকপ্রদ সংবাদেরই দিন। বলে ফেলো, পর্বত; দেরি কোরো না।”

পর্বত বলল, “উত্তরা একটা চিঠি লিখেছে আমাকে। তাতেই সংবাদ পেলাম, সৌজন্য পালিয়েছে ওখান থেকে।”

কক্ষের সবাই চমকে উঠল। শ্যামশ্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, “পালিয়েছে মানে?”

পর্বত বলল, “রাজা পুনর্বসু তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন মরুময়কে গুপ্তহত্যা করানোর উদ্দেশ্যে। সৌজন্য সে-পথ মাড়ায়নি। মুক্তি পেতেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। মাল্যপর্বতে সবাই অনুমান করছে, সে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আকাশলোকে— খোদ ঐশিকদের কাছে।”

খবরটা এতই অদ্ভুত যে তা পরিপাক করতে সকলেরই কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। তারপর বজ্রধর বললেন, “ভ্রম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন রাজা ওকে মুক্তি দিয়ে।”

নীলাভ বলল, “রাজা পুনর্বসু এত হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আমি ভাবতেই পারছি না।”

পর্বত বলল, “আমি কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি না। রাজা নিজের সিংহাসন রক্ষায় যথেষ্ট তৎপর। তাঁর উদ্দেশ্য, যেনতেনপ্রকারে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। ঐশিক মরুময়কে সরাসরি কিছু বলার সাহস তাঁর নেই। তাই তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা

তোলার পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন। শুধু সৌজন্যকে বিশ্বাস করে চালে একটু ভুল করে ফেলেছেন তিনি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এটা ভালো বলেছ, পর্বত। রাজা পুনর্বসু বরাবর ভুল লোককে বিশ্বাস করে এসেছেন। মিলিয়ে নিয়ো, এটাই একদিন তাঁর পতনের কারণ হবে। একসময় তিনি মরুময়কে বিশ্বাস করে ঠকেছেন। আজ আবার সৌজন্যকে বিশ্বাস করে ঠকলেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমরা। ঐশিকরা আকাশলোক থেকে উড্ডীনখর পাঠালেন অভীর ওপর আক্রমণ করতে; সৌজন্য প্রথম সুযোগেই পালিয়ে গিয়ে ঠাঁই নিল আকাশলোকে; আবার ওই আকাশলোকেই ভয়াবহ একটা অগ্নিময় মায়াদানব বানাচ্ছেন তাঁরা। সবগুলো ঘটনার সুতো গিয়ে ওই একটা জায়গাতেই মিশছে, বুঝতে পারছ? বিষয়টা কি আমাদের একটু অনুসন্ধান করে দেখলে হত না?”

অভী আর নিধি নীরবে বসে সবার কথা শুনছিল। অভী ভাবছিল, ‘ঐশিকরা কেনই বা সৌজন্যকে সাহায্য করবেন? তাতে ওঁদের কী স্বার্থ চরিতার্থ হবে?’

কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে চুপ করে রইল। রাজনীতি সমরোত্তমরা তার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন; এখানে কথা বলা সে উচিত মনে করল না।

বজ্রধর বললেন, “মেঘবর্ণ, তুমি একদম খাঁটি কথা বলেছ। আর যে কথাটা তুমি বললে না, সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি।”

একগাল হেসে মেঘবর্ণ বলল, “ওহ্ অধিনায়ক! আপনার কাছে কিছু লুকোবার উপায় নেই!”

বজ্রধরও মৃদু হাসলেন। “তুমি এই প্রস্তাব দেবে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।”

নিধি ফিসফিস করে অভীর কানে কানে বলল, “কী প্রস্তাবের কথা বলছেন উনি? আমি তো কাউকে কোনো প্রস্তাব দিতে শুনলাম না! কিছু বুঝতে পারছ?”

অভীও ফিসফিস করে বলল, “উঁহু, আমিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।”

বজ্রধর বললেন, “ঠিক আছে, আজকের সভা এখানেই ভঙ্গ হল। অভী, নিধি, তোমরা মিত্রভবনে ফিরে যাও। মেঘবর্ণ, তুমি কাল সকালে অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।”

মেঘবর্ণ মাথা নেড়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অভী আর নিধির মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। তারাও উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে আর একবার নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল সম্মেলন কক্ষ থেকে।

বাইরে এসে নিধি চাপা গলায় বলল, “ওই যে, ওইদিকে যাচ্ছে।”

অভী বলল, “জলদি চলো। এখুনি ধরতে হবে ওকে।”

দু’জনে ছুটল মেঘবর্ণের পিছু পিছু। সে ততক্ষণে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। নিধি পেছন থেকে ডাকল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ!”

মেঘবর্ণ পেছন ফিরে তাকিয়ে ওদের দেখে হাসল। “আমি ভাবছিলাম তোমরা আসতে এত দেরি করছ কেন।”

অভী বলল, “তুমি জানতে আমরা আসব?”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “আকাশলোকের কথা শুনলে আর স্থির থাকতে পারবে না, এ আমি বুঝতে পারব না?”

অভী বিস্ফারিত চোখে বলল, “কাল তুমি আকাশলোকে যাচ্ছ, মেঘবর্ণ?”
“হুঁ।”

“কেন?”

“একবার ঐশিকদের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করে আসতে চাই।”

“তাতে লাভ কী হবে?”

মেঘবর্ণ চুপ করে রইল। নিধি বলল, “সত্যি কথা বলো আমাদের। আমার মনে হচ্ছে, তুমি কিছু একটা লুকোতে চাইছ। কেন যেতে চাও তুমি ওখানে?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেঘবর্ণ আন্তে আন্তে বলল, “লীনার জন্য।”

অভী আর নিধি হাঁ হয়ে গেল। “মানে?”

“লীনা আর তার মায়ের জন্য একবার ঐশিকদের জগতে যেতে চাই আমি। নিধি, আমি সত্যি বলছি, লতার বিষণ্ণ মুখটা আর আমি সহ্য করতে পারছি না। লীনার জন্যও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম, যদি লীনার ছোড়া সেই হৃদয়শরটা ওখান থেকে উদ্ধার করা যায় এবং যদি তার মধ্যে ওর হৃদয়টা এখনও থেকে থাকে, তাহলে হয়তো রক্ষাবৈদ্য রক্তপদ্মরাগ দিয়ে ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন। হয়তো সবই ব্যর্থ হবে, তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে চাই আমি।”

এরা দু’জন একসঙ্গে বলল, “আমরা তোমার সঙ্গে যাব।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু ঐশিকরা লোক ভালো নয়। তোমাদের দু’জনকে, বিশেষ করে প্রলয়যোদ্ধাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেলে ওঁরা ক্ষতি করতে চাইবেন-ই। অভী, তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। নিধি, তুমিও না গেলেই ভালো।”

অভী দৃঢ়স্বরে বলল, “ঐশিকদের জন্য আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি, মেঘবর্ণ। তোমাকে আর মা-কে বাগে পেয়ে ঐশিকরা কী করেছিলেন, সে-কথাও আমি ভুলিনি। গতবার তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলে এসেছি আমি; তাই ভয় দেখিয়ে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না।”

নিধি বলল, “আমরা তো যাবই। লীনার জন্য কিছু করতে পারার অধিকার যদি তোমার থাকে, মেঘবর্ণ, তাহলে তা আমাদেরও আছে। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে আমরা দু’জন।”

মেঘবর্ণ বলল, “সত্যি কথা বলব? তোমরা যদি সঙ্গে যাও, তাহলে আমি খুশিই হব। যেখানে লীনা গতবার ওই তিরটা ছুড়েছিল, অভী সেই জায়গাটা সামনে থেকে দেখিয়ে দিতে পারবে তো?”

অভী হাসল। “পারব। কাল কখন বেরোচ্ছি আমরা?”

“সূর্যোদয়ের পরেই। তোমার অপরাজিতা এখন সুস্থ তো? সে আমাদের তিনজনের ভার বহন করতে পারবে তো?”

অভী বলল, “হ্যাঁ, আমি একটু আগেই তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আমরা তাহলে অপরাজিতাকে নিয়ে যাব?”

মেঘবর্ণ বলল, “সেটাই ভালো হবে। মহানীলগৃধ্র অত্যন্ত শক্তিশালী মায়াজীব। তার সাহায্য ছাড়া আকাশলোকে প্রবেশ করা কঠিন হবে। ঐশিকরা তো আর আমাদের জন্য রথ পাঠাবেন না।”

নিধি বলল, “তাহলে তা-ই হোক। কাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আমরা যাত্রা শুরু করব অনুশীলন মঞ্চের সামনে থেকে।”

মেঘবর্ণ চলে যাওয়ার পর নিধি গম্ভীরমুখে বলল, “চন্দ্রহাস সঙ্গে নিয়ে যাবে?”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “চন্দ্রহাস সঙ্গে থাকলে অনেকটা নিরাপদ বোধ করতাম ঠিকই, কিন্তু ওই দৈবাস্ত্র নিয়ে গেলে ঐশিকরা আমাদের ওখানে ঢুকতেই দেবেন না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য, লীনার হৃদয়শরটা খুঁজে বার করা। আকাশলোকের সীমানা পেরোতে না পারলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই ইচ্ছা থাকলেও চন্দ্রহাস না নিয়ে যাওয়াই সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ হবে।”

দু’জনে মিত্রভবনে এসে তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে নিল। মিত্রমাসি একবার জানতে চাইলেন, “কী হয়েছে? আজ এত তাড়া কীসের?”

নিধি বলল, “কাল আমরা আকাশলোকে যাচ্ছি, মিত্রমাসি।”

একসময় মিত্রমাসি ঐশিকদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু বিগত কিছুদিনের ঘটনায় ঐশিকদের সম্পর্কে সমরগরিমার বেশিরভাগ লোকের মতোই তাঁরও মোহভঙ্গ হয়েছে। নিধির কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে তিনি বললেন, “ওখানে আবার তোমাদের মতো দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ের কী দরকার?”

অভী বলল, “আমরা একা নই, সমরোত্তম মেঘবর্ণ থাকছেন আমাদের সঙ্গে।”

“আচ্ছা, তা-ই বলো!” মিত্রমাসি একটু নিশ্চিত হলেন। “কিন্তু কেন যেতে হচ্ছে তোমাদের ওখানে?”

অভী আর নিধি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল; আসল কথাটা বলবে কি বলবে না ভাবতে লাগল। তারপর অভীর মনে পড়ল, লীনাকে উনি কী ভীষণ ভালোবাসতেন। সে মনস্থির করে বলল, “লীনা ওখানেই মারা গিয়েছিল হৃদয়শর নিক্ষেপ করার পরে। যদি আমাদের ভাগ্য ভালো হয়, তাহলে আমরা ওই তিরটা উদ্ধার করতে পারব। তাতে যদি এখনও ওর হৃদয় থেকে থাকে, তাহলে একটা ক্ষীণ আশা আছে যে রক্ষোবৈদ্য হয়তো ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন।”

চক্ষু বিস্ফারিত করে তার কথা শুনছিলেন মিত্রমাসি। অভী চুপ করার পর তাঁর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, “অভী, নিধি, আমি চাই তোমরা ওকে ফিরিয়ে আনো। লীনা চলে যাওয়ার পর থেকে এই বাড়িটা আমার কাছেও বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।”

নিধি একবার তাঁর হাতটা মুঠো করে ধরল নিজের হাতের মধ্যে; মিত্রমাসি নিজের আর একটি হাত দিয়ে নিধির হাত স্পর্শ করে রইলেন। চুপ করে

কিছুক্ষণ বসে থেকে চোখের জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, “নাও, এবার শুয়ে পড়ো তোমরা। কাল ভোর হওয়ার আগেই আমি তোমাদের তুলে দেব।”

নিজের কক্ষে এসে অভী শুয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে আদখানা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। হাওয়া বইছে না একদম; বাইরে গুমোট গরম। মনের মধ্যে নানা দৃশ্যস্তা খেলে যাচ্ছে তার। ঘুম আসতে চাইছে না। আগেরবার আকাশলোকে ঐশিকদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার। ওখানেই লীনা...

আরও কিছুক্ষণ অস্বস্তিভরে ছটফট করার পর অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল অভী। বেশ কিছু অদ্ভুত স্বপ্নও দেখল সে। তার স্বপ্নের মধ্যে নরকগহ্বর, সৌজন্য, লীনা, সুতসোম, উর্মির মুখ দেখা দিয়ে গেল, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর সে আর কিছুই মনে করতে পারল না।

ভোররাতে মিত্রমাসি দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাকে ডেকে তুললেন। “অভী, চটপট উঠে পড়ো। নিধি উঠে পড়েছে। তুমিও হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।”

আরও কিছুক্ষণ পরে ওরা যখন মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে অনুশীলন মঞ্চের দিকে হাঁটা দিল, তখন পূর্ব আকাশ সবেমাত্র ফরসা হতে শুরু করেছে। নিধি সঙ্গে ত্রিশূল নিয়েছে, অভী চন্দ্রহাস না নিলেও তার ময়ূরবজ্র তরবারি ঝুলিয়ে নিয়েছে কোমরে। একদম নিরস্ত্র হয়ে ঐশিকদের বাসস্থানে যাওয়াটা দু’জনের কেউই উচিত মনে করেনি।

মেঘবর্ণ অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ওদের দেখে অনুশীলন মঞ্চের সামনে থেকে হাত তুলে ডেকে নিল সে।

মেঘবর্ণ বলল, “কিছুটা এগিয়ে চলো। আয়তনের অনেকেই খুব ভোরে ওঠে। এই মাঠের মাঝখানে তোমার জটায়ুকে ডেকে তার পিঠে চাপলে কারও-কারও কৌতূহলের উদ্বেক হতে পারে। আমরা যে ঐশিকদের কাছে যাচ্ছি, সে-কথা সমরোত্তমরা ছাড়া কেউ জানে না এবং আমরা আপাতত অন্য কাউকে জানাতেও চাই না।”

অগত্যা ওরা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল পীতপত্রবনের রাস্তার দিকে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বাতাসে বেশ আরামদায়ক শৈত্যের স্পর্শ অনুভব করা যাচ্ছে এখনও, যদিও অভী জানে, বেলা বাড়লে গরম বাড়বে। মাঠের ধারের গাছগুলোতে পাখিদের কলতান শুরু হয়ে গেছে।

যেতে-যেতে মেঘবর্ণ বলল, “নিধি, তোমাকে একটা কথা সমরোত্তম হিসাবে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি। তোমার বোন নীপাকে আমি একটি গোপন কাজ দিয়েছিলাম। কাজটি সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।”

নিধি অবাক হয়ে বলল, “নীপা? কই, ও তো আমাকে কিছু বলেনি! কী কাজ করছে ও?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমিই কাউকে কিছু বলতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওর অভিভাবক হিসাবে তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার, কারণ ও স্বীকৃতভাবে এখনও আমাদের শিক্ষার্থী নয়, এবং তোমার বাবার সঙ্গে এ-সব

ব্যাপারে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভালো। আমি ওকে নজর রাখতে বলেছিলাম সুচিত্রর দোকানটার ওপর। ও কাল সন্ধ্যায় আমাকে খবর দিয়ে গেছে, চক্রবাক আবার গিয়েছিল ওই দোকানে।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “তার মানে, ভেতরে-ভেতরে একটা ব্যাপার চলছে। চক্রবাক কোনো বদ উদ্দেশ্য ছাড়া অর্ধরাক্ষসদের এলাকায় যাওয়ার লোক নয়।”

নিধি বলল, “তাহলে চোখ বুজে এ-কথাও বলে দেওয়া যায়, এর পেছনে নিয়ামক আছেন। তাঁর দুষ্টবুদ্ধি ছাড়া চক্রবাক এক পা-ও ফেলবে না।”

মেঘবর্ণ বলল, “তোমাদের ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম। এই নিয়ে অধিনায়ককে এখনও কিছু বলিনি। পুরোটার অনুসন্ধান শেষ করে তারপর তাঁকে জানাব। আগে আকাশলোক থেকে অক্ষত ফিরে আসি।” বলে একটু হাসল সে।

এরা দু’জনও তার সঙ্গে হাসল। নিধি বলল, “তাহলে গোপনে-গোপনে তোমরা অনেক কিছুই করছ, যার খবর শিক্ষার্থীরা পায় না।”

মেঘবর্ণ বলল, “রাজ্যের সব চিন্তার ভার সাধারণ নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কোনো লাভ আছে কি? তার চেয়ে এটাই কি আমাদের কাছে কাম্য নয়? এমন অনেক সিদ্ধান্তই আমাদের নিতে হয়, যেগুলো শুধু শিক্ষার্থী কেন, সমরগরিমার কোনো মানুষ বা অর্ধরাক্ষসকেই জানানো হয় না।”

অভী বলল, “যেমন?”

মেঘবর্ণ বলল, “যেমন ধরো, অধিনায়ক বজ্রধর আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষবার মাল্যপর্বতে গিয়ে তিনি রাজা পুনর্বসুর সঙ্গে একটা মৌখিক চুক্তি করে এসেছেন এবং নিয়ামক এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না।”

অভী আর নিধি অবাক হয়ে বলল, “রাক্ষসরাজের সঙ্গে চুক্তি করে এসেছেন অধিনায়ক? কী চুক্তি?”

মেঘবর্ণ বলল, “আজ তোমরা আমার সঙ্গে ঐশিকদের কাছে যাচ্ছ বলেই তোমাদের কাছে এই নিয়ে মুখ খুলছি। চুক্তিটা ঐশিকদের নিয়েই। অনাক্রমণ চুক্তি।”

“অর্থাৎ?”

“অর্থাৎ সমরগরিমা এবং মাল্যপর্বত কেউই আপাতত আগ বাড়িয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করবে না। এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান শত্রু রাক্ষসরা নয়, বরং ঐশিকরা। যদি আমাদের কোনো এক পক্ষ তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, অন্য পক্ষ সেনা দিয়ে সাহায্য করবে। চুক্তির মূল কথা এ-ই।”

অভী চমৎকৃত হয়ে গেল। এত কাণ্ড ভেতরে-ভেতরে হয়ে গেছে, তারা কিছু জানতেই পারেনি।

নিধি মাথা নেড়ে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তা সবার মঙ্গলের কথা ভেবেই নিয়েছেন, এই ভরসা আমার আছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “আসলে অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। গতবার সৌজন্য খুব চালাকি করে আমাদের দু’পক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলেছিল, আর তাকে সাহায্য করেছিলেন ঐশিক মরুময়। এই ধরনের ঘটনা

যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ঐশিকরা যে-কোনো দিন যে-কোনো রকমের আক্রমণ হানতে পারেন আমাদের ওপর। তখন রাক্ষসদের সাহায্য আমরা যদি না-ও পাই, অন্তত ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে না।”

নিধি বলল, “কিন্তু রাক্ষসরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কি?”

“না, নেই। সেই কারণে আমরা খুব একটা নিশ্চিত্তে বসেও নেই। আর এদিকে সৌজন্যও যে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমি সে-কথা আগেই অনুমান করেছিলাম। ওর স্বভাবের মধ্যেই এই দু-মুখো ব্যাপারটা আছে।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, সৌজন্যের কাছে এটাই প্রত্যাশিত।”

মেঘবর্ণ বলল, “আসলে কী জানো, খারাপ লোকেরা খারাপ কাজ করবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; এ-বিষয়ে ওদের বদ স্বভাবের ওপর ভরসা রাখতে পারো। আমাদের আশ্চর্য করে দেয় কারা বলো তো? যারা ভালো লোক, তারা। অন্তরটা ভালো হওয়ার কারণে তারা চাপের মুখে এমন সব কাজ করে বসে, যেগুলো আমরা আগে থেকে আন্দাজ করে উঠতেই পারি না। লীনা হৃদয়শর ছুড়ে দিল, তুমি আর নীলাভ্র এককথায় নরকে চলে গেলে। এগুলো আগাম আঁচ করা মুশকিল। কিন্তু সৌজন্য? আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ও ব্যাটা বিশ্বাসঘাতকতা করবেই।”

কথা বলতে বলতে ওরা এসে পড়েছিল বনের প্রান্তে। অভী তার নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটি বার করে তাতে ফুঁ দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল ডানা ঝটপটিয়ে নেমে এল অপরাজিতা। অভী তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। পাখিটা “কঁ-অঁ-অঁ” শব্দ করে তার হাতে মাথা ঘষে আদর জানাল। এরই মধ্যে উড্ডীনখরের আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে সে।

অভী বলল, “আমরা আকাশলোকে যাব। তুমি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে তো, অপরাজিতা?”

অপরাজিতা একবার চোখের পলক ফেলে ‘হ্যাঁ’ বুঝিয়ে দিল। প্রথমে মেঘবর্ণ উঠল, তারপর অভী, তারপর নিধি। তার পিঠে চেপে বসা মাত্রই অপরাজিতা ডানা ঝাপটে শূন্যে উঠে পড়ল।

অভী আর নিধি আগেও মহানীলগৃধ্রের পিঠে চেপেছে, তবু এখনও যতবারই এই রকমের আকাশভ্রমণের সময় আসে, ততবারই যেন নতুন করে রোমাঞ্চ জাগে। অপরাজিতা বিরাট পাখা আন্দোলিত করে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে; নিচের মাঠ, বন, আয়তন সব ছোটো হয়ে আসছে; প্রভাতসূর্যের লাল আলো এসে পড়ছে ওদের চোখেমুখে; হু-হু করে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভোরের ঠান্ডা হাওয়া।

আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে সুবিশাল পাখিটা; নিচের দৃশ্য আর কিছু দেখাই যাচ্ছে না। ওদের গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সাদাটে ধূসর ধোঁয়ার মতো

মেঘ। অভী জানে, মহানীলগৃধ্রের পিঠ থেকে কেউ পড়ে না, মায়া দিয়ে আরোহীকে নিজের সঙ্গে আটকে রাখে এই জটায়ুরা। তা-ও তার বুক দূরদূর করতে লাগল।

তীব্র হাওয়ার শব্দে কান ভোঁ-ভোঁ করছে। তবু সে মাথা ফিরিয়ে চিৎকার করে নিধিকে বলে দিল, “এখুনি সব অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয় পেয়ো না।”

গতবার আকাশলোকে আসার অভিজ্ঞতা তার খুব ভালো করেই মনে আছে।

কথাটা বলতে বলতেই আকাশের মায়াসুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ল অপরাজিতা। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশে যেন গভীর রাত্রি নেমে এল পলকের মধ্যে। ওরা ভেসে রইল দিকচিহ্নহীন অন্ধকার শূন্যে। যে বাতাস এতক্ষণ কানের পাশে গর্জন করে চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বাতাস হঠাৎ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। সেই বিপুল, নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উড়ে চলল অপরাজিতা। নিধি পেছন থেকে শক্ত করে অভীর কাঁধ খামচে ধরে রইল।

তারপর আবার এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল আলো, ফিরে এল বাতাস। নিচে দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ বনভূমির বিস্তীর্ণ উপরিভাগ। এতক্ষণ বন্ধ করে থাকা নিশ্বাস একসঙ্গে ‘ফোঁস’ করে ছাড়ল অভী আর নিধি।

মেঘবর্ণ একটু হেসে বলল, “এবার আমরা নামব। তৈরি হও সবাই।”

অপরাজিতা গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগল সেই বনের প্রান্তে। অভীর মনে পড়ল, গতবার ফেরার সময় ঐশিকরা ওকে বলেছিলেন, এই বনের পথে কোনো জটায়ু ঢুকতে পারে না। সম্ভবত কোনো ঐশিকমায়া এই বনটাকে আকাশসুরক্ষা দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

যেখান থেকে বনভূমি শুরু হচ্ছে, তার ঠিক সামনে ওদের নামিয়ে দিল অপরাজিতা। সবুজ বনের মধ্য দিয়ে একটা লাল পাথুরে পথ চলে গেছে। ঐশিকদের প্রাসাদ পর্যন্ত এই পথটুকু হেঁটে যেতে হবে।

অভী বলল, “অপরাজিতা, তুমি এখানে অপেক্ষা করো; আমরা একটু পরেই ফিরে আসছি।”

অপরাজিতা একবার মাথা নেড়ে সায় দিল। তাকে ওখানে রেখে অভীরা তিনজন এগিয়ে চলল বনপথে।

দু’পাশে সারি-সারি গাছ; কিন্তু কোনো পাখির ডাক কানে আসছে না। অভী মনে করার চেষ্টা করতে লাগল, ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে লীনা গতবার সেই নেকড়েটার উদ্দেশে তিরটা ছুড়েছিল।

অনেক খুঁজেও সে সঠিক জায়গাটা চিহ্নিত করতে পারল না। জঙ্গলটা যেন অনেক বদলে গেছে এই ক’দিনে। তা ছাড়া, গতবার সে এতখানি দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যে, কোনোকিছুই ঠিকমতো আর সে মনে করতে পারছে না।

তবু যে দু’-একটা জায়গা চেনা-চেনা লাগছিল, সেই জায়গাগুলোয় গাছের ফাঁকে, ঝোপেঝাড়ে খুঁজে দেখল অভী। নাহ্, লীনার হৃদয়শরের চিহ্নমাত্র নেই। এত বিশাল জায়গায় ওইটুকু তিরটাকে খোঁজা আক্ষরিক অর্থেই খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো কঠিন।

সামনে ঐশিকদের বাসস্থানের বিরাট প্রবেশদ্বার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দরজা বন্ধ; ভেতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। অভী আগে এসেছে এখানে; সে জানে, ভেতরে অতি মনোরম উদ্যান আছে।

নিধি বলল, “আমরা ভেতরে যাব কী করে? দরজা তো কেউ খুলতে আসবে বলে মনে হচ্ছে না? চিৎকার করে ডাকব? না কি দরজায় ঘা দেব? ওরা জানবে কী করে যে আমরা এসেছি?”

অভী একটু হেসে বলল, “যে মুহূর্তে এই বনের প্রান্তে পা দিয়েছ, নিশ্চিত জানবে যে ঐশিকরা তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ দেখছেন। দরজার সামনে যেতে হবে না, ওঁরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এসেছি। তবে হ্যাঁ, দরজা খুলবেন কি না, সে নিতান্তই ওঁদের মরজির ওপর নির্ভর করছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু ভেতরে যাওয়ার থেকেও লীনার হৃদয়শরটা খুঁজে বার করা কি আমাদের আগে উচিত নয়?”

অভী বলল, “মেঘবর্ণ, আমার মনে হয়, ঐশিকরা ওটা এতদিনে সরিয়ে ফেলেছেন। যদি ওঁদের কাছে জিনিসটা থেকে থাকে, তাহলে আমাদের তা চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু এই বিরাট অরণ্যে এক বছর ধরে খুঁজলেও ওই ছোট্ট একটা তির আমরা কোনোমতেই খুঁজে পাব না।”

অভীর কথা শেষ হতে হতেই সামনে একটা আন্দোলন দেখা গেল। সুবিশাল ফটক খুলে যাচ্ছে আকাশলোকের ঐশিক এলাকার। আর সেই দরজার পেছন থেকে হাসিমুখে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে...

“সৌজন্য!”

ওরা তিনজনই আর না এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সৌজন্য দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে এগিয়ে এল। এসেই কোনো ভণিতা না করে একটা জিনিস বাড়িয়ে দিল সে মেঘবর্ণের দিকে। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, দেখুন তো আপনারা এটাই খুঁজছেন কি না!”

মেঘবর্ণ যে দারুণ অবাক হয়ে গেছে, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সে অভীর দিকে তাকাল। অভী মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, এটাই লীনার হৃদয়শর, আমি চিনতে পারছি।”

সৌজন্যের চোখে দুষ্টুমিভরা হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। “স্বাগত উপহার হিসাবে জিনিসটা মন্দ নয়, কী বলো অভী?”

অভী স্বীকার করতে বাধ্য হল, “হ্যাঁ, তা ঠিক।”

সৌজন্য বলল, “তোমরা যা খুঁজতে এসেছিলেন, পেয়ে গেলে। এবার চাইলে তোমরা ফিরে যেতেও পারো। কিন্তু এতদূর থেকে এসে একবার দেখা না করে গেলে ঐশিকরা হয়তো মনে দুঃখ পাবেন। এসো, ভেতরে এসে ওঁদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেই যাও নাহয়।”

অভী আর নিধি মেঘবর্ণের দিকে তাকাল। সে বলল, “এসে ঐশিকদের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়ার মানে হয় না। চলো, যাওয়া যাক।”

সৌজন্য খুশি হয়ে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফটক পেরিয়ে বিরাট বড়ো বাগান; সেই বাগানের মধ্যে কত অজস্র ফুলগাছ— অভী তাদের সবক'টার নামও জানে না। একদিকে মাঝারি আকৃতির একটি সরোবর; তার মধ্যেও ফুল ফুটে আছে। কিন্তু পরিবেশ যত সুন্দরই হোক, এখানে যারা বাস করে, তারা যে মোটেই ভালো লোক নয়, তা এরা তিনজনই খুব ভালো করে জানে।

মেঘবর্ণ চাপাগলায় অভী আর নিধিকে বলে দিল, “ওখানে একদম মাথা গরম করবে না। ঐশিকরা হয়তো আমাদের উত্তেজিত করে রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। ওই ফাঁদে পা দিয়ো না। মানুষের ক্রোধ, ঘৃণা এই জাতীয় আবেগগুলো ওঁদের শক্তিশালী করে।”

অভী আর নিধি মাথা নাড়ল।

যেতে-যেতে সৌজন্য বলল, “আমাকে এখানে দেখে আপনারা অবাক হয়েছেন, না?”

মেঘবর্ণ বলল, “তুমি এখানেই পালিয়ে এসেছ, আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু তুমি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে প্রধান প্রবেশদ্বারে হাজির হবে, সে-কথা ভাবিনি। কাজেই, একটু অবাক হয়েছি বলতে পারো। তবে হ্যাঁ, মাল্যপর্বতের রাজার সঙ্গে যে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তাতে আমি একটুও অবাক হইনি, কারণ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারটা তোমার স্বভাবেই মিশে আছে, সৌজন্য।”

সৌজন্য অপমানটা গায়েই মাখল না। “প্রজ্ঞা, রাজাকে নিষেধ করেছিলেন আমাকে মুক্তি দিতে; কিন্তু রাজা শোনে ননি। তিনি তখন শেষমুখকে দিয়ে মরুময়কে গুপ্তহত্যা করার দুরাশায় মগ্ন। কাজটা নিতান্তই অপরিণামদর্শী হয়েছে, এ-কথা আপনারা মানবেন নিশ্চয়ই। রাজার জায়গায় আমি থাকলে আমি অন্তত নিজেকে মুক্তি দিতাম না।”

নিধি বলল, “কিন্তু তুমি এখানে কেন? ঐশিকরা তোমাকে আশ্রয় দিলেন কি বিনা কারণে? তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে ওঁদের কী স্বার্থ পূরণ হবে?”

সৌজন্য বলল, “ওঁদের স্বার্থ আছে, ঠিকই বলেছ। আবার আমারও ওঁদের কাছে আসায় কিছু লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এ-ও সত্যি। কিন্তু সব কথা আমি তোমাদের বলতে পারি না, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, নিধি। যাকগে, এই যে আমরা চলে এসেছি। তোমরা এখানে বোসো; ওঁরা আসছেন। আমি আপাতত চললাম; তোমরা বিদায় নেওয়ার আগে আবার আসব। যাওয়ার আগে তোমাদের জন্য একটা দারুণ চমক আছে, এইটুকু আগাম বলে যাই।”

শ্বেতশুভ্র মর্মরবেদির সামনে ওদের নিয়ে এসেছিল সৌজন্য। ওরা তিনজন ঠান্ডা বেদির ওপর বসল; সৌজন্য হাত নেড়ে দূরে কোথায় যেন চলে গেল।

“স্বাগতম, প্রলয়যোদ্ধা। স্বাগতম, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। স্বাগতম, প্রাক্তন নীরসেনা নিধি।”

সেই পুরোনো রূপে আবির্ভূত হয়েছেন ঐশিকরা; তাঁদের একটাই দেহ, কিন্তু দেহের কাঁধের ওপর জেগে আছে পাঁচটা মাথা। অভী আগে এইরূপে তাঁদের

দেখেছে, কিন্তু নিধি এই বিকট চেহারা প্রথমবার দেখে একটু চমকে উঠল। মেঘবর্ণ অবশ্য পাকা লোক; সে যদি আশ্চর্য হয়ে গিয়েও থাকে, তা তার মুখের ভাবে প্রকাশ পেল না। ভদ্রতা করেই উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজন।

ঐশিক এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। “বসুন সবাই।”

ওরা আবার বসল ঠান্ডা মর্মরবেদির ওপরে। ঐশিক বললেন, “লীনার হৃদয়শর উদ্ধার করতে আপনারা এখানে আসছেন, আমরা জানতাম। সেই বস্তু আমরাই আপনাদের উপহার দিলাম, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, কারণ আমরা জানি, ওটা দিয়ে আপনাদের কোনো কাজ হবে না।”

অভী আর নিধি সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তার মানে, এই তিরটা দিয়ে লীনাকে বাঁচিয়ে তোলার কোনো আশাই নেই। ঐশিকরা সব জেনেবুঝেই এই অকাজের জিনিসটা ওদের উপহার দিয়েছেন।

মেঘবর্ণ বলল, “কাজ হবে কি না, সে আমরা বুঝে নেব। অন্য একটা কথা বলি। আপনারা প্রলয়যোদ্ধার প্রাণনাশের জন্য উড্ডীনখর পাঠিয়েছিলেন। সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। আপনাদের এ-ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া?”

ঐশিকরা হেসে উঠলেন। “প্রলয়যোদ্ধার প্রাণনাশ করতে চাইলে একটিমাত্র উড্ডীনখর পাঠাব কেন? আমরা তো চাইলেই হাজার-হাজার উড্ডীনখর পাঠিয়ে পুরো সমরগরিমাকেই শেষ করে দিতে পারি।”

নিধি বলল, “তাহলে দিচ্ছেন না কেন?”

“কারণ আমরা যুদ্ধ ভালোবাসি। যুদ্ধ, হিংসা, রক্তপাত আমাদের পুষ্টি জোগায়। একবারেই সব শেষ করে দিতে এখনই আমরা চাই না। প্রলয়যোদ্ধাকেও আমরা প্রাণে মারতে চাইনি, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আমরা উড্ডীনখরের বিরুদ্ধে তার শক্তিমত্তার একটা আন্দাজ পেতে চেয়েছিলাম মাত্র। যদিও তাকে হিমকুশলতা প্রয়োগ করতে হয়নি এবং একটি মহানীলগৃধ্র অপ্রত্যাশিতভাবে এসে তাকে রক্ষা করেছে, তবুও আমরা এই ফলাফলে খুশি। আমরা বজ্রধরকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে ওই ভয়ানক প্রাণীদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সে চিরতরে হারিয়েছে। তার জন্য সে যে ভেতরে-ভেতরে আতঙ্কিত, তা আমরা জানি।”

অভী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করল, “অধিনায়ক বজ্রধর মোটেই আতঙ্কিত নন। তিনি কাউকে ভয় পান না।”

ঐশিক বললেন, “ভুল করছ, অভী। বজ্রধর ভয় পায়— নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য। পুরো আয়তন-সহ সমরগরিমার রক্ষাকর্তা ভাবে সে নিজেকে; তাই তার মনের গোপনে ভয় আছে বইকি। সে জানে, উড্ডীনখররা যদি দল বেঁধে নেমে আসে, তাহলে তাদের আটকানোর ক্ষমতা গোটা মায়াজগতে কোনো যোদ্ধার নেই।”

অভী বলল, “আপনারা আমার মৃত্যু চান, আমি জানি। তাহলে সেদিনই অনেকগুলো উড্ডীনখর পাঠিয়ে আমাকে মেরে ফেললেন না কেন?”

“কারণ এত সহজে তোমাকে মৃত্যু দেব না আমরা। প্রলয়যোদ্ধার মতো মানুষের মৃত্যুতে আমাদের যদি কোনো লাভ না-ই হয়, তাহলে তাকে শুধু-শুধু হত্যা করতে যাবই বা কেন?”

“আমার মৃত্যুতে কী ধরনের লাভ করতে চাইছেন আপনারা?”

ঐশিক এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। “তবে শোনো, অভী। দ্রষ্টাদেবী তোমাকে আগে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো দৈবাস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে— এ-কথা আমরা সৌজন্যের মুখে শুনেছি। শিব যে অস্ত্রে জগৎ সংহার করেন, সেই ধরনের কোনো অস্ত্র সম্ভবত তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে। সৌজন্যের সঙ্গে দ্রষ্টাদেবীর ছেলে প্রফুল্লের একসময় খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, জানো নিশ্চয়ই।”

অভী চুপ করে রইল। ঐশিক বলে চললেন, “সৌজন্য আগেও তোমাদের জানিয়েছে, তীব্র অগ্নিমায়াসম্পন্ন একটি দানবকে আমরা এখানে তৈরি করছি। আমাদের নির্দেশেই ওই কথা সে তোমাদের জানিয়েছিল এবং কথাটা মিথ্যা নয়। আজ এখান থেকে যাওয়ার আগে চাইলে তাকে একঝলক দেখে যেতেও পারো তোমরা।”

মেঘবর্ণ বলল, “এইসব কথা আমাদের বলছেন কেন আপনারা?”

“কারণ, অভী জানতে চেয়েছিল আমরা ওকে মেরে ফেলিনি কেন এবং ওকে মারতে পারলে আমাদের কী লাভ। দুটো প্রশ্নের উত্তর একই। আমরা চাই, অভী সেই দৈবাস্ত্রকে আহ্বান করুক; আমরা চাই, প্রলয়যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত প্রলয় ঘটাক।”

অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, “কিন্তু, যুদ্ধদেব তো প্রলয় ঘটলে ঐশিকদের অমরত্ব চলে যাবে, এই ভয়েই আমাকে মারতে চেয়েছিলেন।”

“এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাবনার পার্থক্য। প্রলয় ঘটলে ঐশিকদের অমরত্ব চলে যাবে, এই ভবিষ্যৎবাণী আমরাও শুনেছি। আমরা অনুমান করছি, দ্রষ্টাদেবী সম্ভবত শিবের পাণ্ডপত অস্ত্রের কথা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু অভী, সেই প্রলয়ের দৈবাস্ত্র তোমার নিয়ন্ত্রণে এলেও প্রলয় ঘটতে তুমি পারবে কি?”

অভী চুপ করে রইল। ঐশিকরা কী বোঝাতে চাইছেন, এখনও ধরতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে, মেঘবর্ণ বা নিধিও এখনও কিছু বুঝতে পারেনি।

ঐশিক বললেন, “তুমি নরকবিষ পান করেছিলে; সেই বিষ তোমার শরীর ছেড়ে কোথাও যায়নি। যত দিন যাচ্ছে, ওই বিষ ততই তোমার শরীরকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। পাণ্ডপতের মতো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো মন্ত্রমুক্ত দৈবাস্ত্রকে মুক্ত করতে হলে যোদ্ধার শরীর-মন দুইই অত্যন্ত সতেজ, সক্ষম থাকতে হয়। তোমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় তুমি হয়তো সেই অস্ত্রের অগ্নি কিছু তেজকে নিষ্কাশন করতে পারবে, কিন্তু তারপর ওই অস্ত্রের তেজেই তার বিষজর্জর আধার, অর্থাৎ তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া, অতখানি শক্তি প্রয়োগ করতে গেলেই তোমার হিমকুশলতা প্রবলবেগে বেরিয়ে আসবে তোমার শরীর থেকে; ওই বিপুল শক্তি শরীর থেকে নির্গত হলে কোনো মায়াধরের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়— প্রলয়যোদ্ধারও নয়। তাতে আমাদের লাভ কী জানো? ওই ধরনের প্রলয়ংকর

অস্ত্রের তেজ এতটাই বিধ্বংসী যে তা অল্প পরিমাণে নির্গত হলেও সেই জায়গা বহু বছরের জন্য বৃষ্টিহীন হয়ে যায়। আর আমাদের অগ্নিদানবকে থামাতে গেলে ওই ভয়ানক দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া তোমার উপায় থাকবে না।”

মেঘবর্ণ বলল, “সমরগরিমা বৃষ্টিহীন হয়ে গেলে তখন আপনারা মরুমায়ের মেঘনির্মাণ মায়া ব্যবহার করে পুরো রাজ্যটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন, এ-ই তো?”

“আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। একটা ছোটো বিষয়ে ভুল ভেবেছেন অবশ্য। আমরা শুধু সমরগরিমা নয়, রাক্ষসদের মাল্যপর্বতকেও এই পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছি। জল বস্তুটা মানুষ, রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষসদের জীবনধারণের জন্য যতটা অত্যাবশ্যক, আমাদের জন্য তা নয়। আমরা চাই যুদ্ধ, হানাহানি। গোটা মায়াজগতের জলকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তখন আমরা ওদের জলের জন্য লড়াই করাব। এই ধরুন, রোজ বিকেলে দশটা মানুষ আর দশটা অর্ধরাক্ষস বা রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিজেদের মধ্যে আমরণ লড়াই করবে। যে জিতবে, তার পুরস্কার হবে এক সপ্তাহের পর্যাপ্ত জল। আর যারা মরবে, তাদের মৃত্যু, ছটফটানি— এগুলো আমাদের পুষ্টি দেবে। মানুষের মৃত্যুদৃশ্যের চেয়ে বেশি উত্তেজক খাদ্য আর কী-ই বা আছে!”

শুনতে-শুনতে অসহায়ভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করছিল অভী। সে দেখল, মেঘবর্ণ প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছে; ঐশিকদের এই পৈশাচিকতার সামনে নিজের আবেগকে সে প্রকাশ করতে চাইছে না। কিন্তু নিধি চেষ্টা করে উঠল, “আপনারা পশুরও অধম!”

ঐশিক হাসলেন; তাঁর দেহ যেন নতুন শক্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠল। “আমরা জানি আমরা কী, নিধি। তোমাদের এবার ফিরে যাওয়ার সময় হল। ওই যে সৌজন্য আসছে। যাওয়ার আগে ও তোমাদের একবার দানবটাকে দেখিয়ে দেবে। বিদায়।”

ঐশিক চলে গেলেন। সৌজন্য এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। “কী, মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওঁদের কথা তোমাদের খুব একটা মিষ্টি লাগেনি?”

নিধি রাগে ফুঁসছিল, অভী তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে শান্ত হতে ইশারা করল। এখানে ঐশিকদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ নেই।

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের ফেরার সময় হল, সৌজন্য। কিন্তু যাওয়ার আগে...”

সৌজন্য হাত তুলে বলল, “হ্যাঁ, আমি জানি। ঐশিকরা আমাকে আগেই বলে রেখেছেন। এসো আমার সঙ্গে।”

সৌজন্যের পিছু-পিছু হেঁটে চলল ওরা তিনজন। এই সুন্দর ফুলে-ভরা উদ্যানের পেছন দিকে যত এগিয়ে চলল ওরা, ততই জায়গাটার মলিন, অশুভ রূপটা যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল ওদের চোখের সামনে। সামনে বিস্তৃত ধূ-ধূ ঘাসহীন ধূসর প্রান্তর, বিরাট-বিরাট কালচে পাথরের চাঁই ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। সেখানেই উঁচু-উঁচু পাথর দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার দিকে

ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সৌজন্য। বলল, “কাছে যাওয়া যাবে না। এই পাথরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পারো। ওই যে, ওইখানে একটা সরু ফাটল আছে; ওটা দিয়ে ভেতরটা দেখতে পাবে।”

পাথরগুলো প্রায় তিন মানুষ উঁচু। প্রথমে মেঘবর্ণ এগিয়ে গেল। পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে কাঠবিড়ালের দক্ষতায় উঠে গেল সে ওপরের দিকে। পাথরের ফাঁকে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে দেখল ভেতরে, তারপর গম্ভীর মুখে নেমে এল।

নিধি আগ্রহভরে বলল, “কী দেখলে?”

মেঘবর্ণ বলল, “তুমি নিজেই দেখে এসো।”

নিধি পাথর বেয়ে উঠে গেল ওপরে। বেশ কিছুক্ষণ জ্রু কুঁচকে পাথরের গায়ের ফাটলে চোখ রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নেমে এল নিচে। বলল, “পেছন ঘুরে বসে আছে। মুখটা দেখতে পেলাম না।”

এবার অভীর পালা। পাথরের খাঁজে পা রেখে শরীরটাকে সে টেনে তুলল ওপরের দিকে। এরকম বেশ কয়েক ধাপ পাথরের বাধা উপকে সে উঠে গেল ফাটলটার কাছে। তারপর উঁকি মারতেই ভেতরের দৃশ্য দেখতে পেল সে।

উঁচু পাথরে ঘেরা জায়গাটার ওপরে পাথরের ছাদ, তাই ভেতরটা অন্ধকার হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু রক্তিম আগুনের আভায় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নরকের ভেতরের আগুন যেমন তার দেয়ালগুলোকে লালচে আলোয় ভরিয়ে রাখে, তেমনই এখানেও মেঝের ওপর সেই রকম লাল আলোময় বিরাট একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। সেই গর্তের ভেতর লাভার মতো তরল আগুন ফুটছে টগবগ করে। আর গর্তে নিজের শরীর অর্ধেক ডুবিয়ে বসে আছে দানবটা।

ভালো করে দেখতে দেখতে অভী বুঝতে পারল, দানবটার শরীর এখনও সুগঠিত নয়। তার অগ্নিময় শরীর তৈরি হচ্ছে নরকগহ্বরের লাভা দিয়ে; অভী অনুমান করল, সৌজন্যের শরীরের অন্তর্লীন বজ্রমাণিক ব্যবহার করে এটাকে বানাতে আরও সুবিধা হচ্ছে ঐশিকদের। সম্ভবত সেই কারণেই ওকে আশ্রয় দিয়েছেন ওঁরা, কারণ ওই অগ্নিস্রোতকে কিছুটা আকর্ষণ করার ক্ষমতা সৌজন্যের আছে, সে আগেও দেখেছে।

দানব উঠে দাঁড়ালে তার উচ্চতা অন্তত চার-পাঁচটা মেঘবর্ণের সমান হবে, তার শরীরের ওপরের অংশ দেখে আন্দাজ করে নিল অভী। দানবটা মুখ ফিরিয়ে বসে আছে চুপ করে; দেখে মনে হয় কী যেন চিন্তা করছে সে।

অভী ভাবছিল, ‘এর বিরুদ্ধে চন্দ্রহাস আদৌ কাজ করবে তো?’

ঠিক সেই মুহূর্তেই নড়ে উঠল সে— অগ্নিগহ্বরের মধ্যে ফিরে বসল অভীর দিকে মুখ করে। সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো ব্যাপার হল।

অভী দেখতে পেল, দানবটার সারা শরীর অগ্নিময় হলেও তার চৌকো আকৃতির বুকটা তৈরি ধূসর পাথর দিয়ে। আর ওটার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য অভীর চোখাচোখি হয়ে গেল। তার মনে হল, তাকে দেখে একপলকের জন্য যেন

বিস্ফারিত হয়ে উঠল দানবের আগুনরঙা চোখদুটো। সম্ভবত কেউ যে ওই জায়গা দিয়ে তার ওপর নজর রাখছে, এটা সে আশা করেনি। অভী সঙ্গে-সঙ্গে সরে গেল ওখান থেকে; নেমে এল ছড়মুড় করে।

সৌজন্য একটু অবাক হয়ে বলল, “কী হল?”

অভী বলল, “আমাকে দেখে ওটা চমকে উঠল।”

সৌজন্য একটু হেসে বলল, “ভয় নেই। ও এখন বেরোবে না। আক্রমণ করার মতো জোর ওর শরীরে এখনও হয়নি। আপাতত ও শুধু বেরোয় রক্ত খাওয়ার জন্য।”

অভীদের হাঁ করা মুখটা দেখে সৌজন্য আবার হাসল। “হ্যাঁ, ওটাই ওর খাদ্য। একটি বিশেষ ধরনের রক্ত দরকার ওর বেঁচে থাকার জন্য।”

মেঘবর্ণ বলল, “ঐশিকরা নিশ্চয়ই নিজেদের রক্ত ওকে খাওয়াচ্ছেন না। আর তুমিও নিশ্চয়ই ওকে রক্ত দিচ্ছ না। তাহলে ও সেটা পাচ্ছে কোথা থেকে?”

“ও চাইলে নিজেকে অনেকটাই ছোটো করে নিতে পারে, নিজের দাহিকাশক্তিও কমিয়ে ফেলতে পারে। সেই অবস্থায় ওকে রক্ত দিতে চায়, এমন লোকের অভাব নেই, সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “স্বেচ্ছায় এই দানবকে নিজের রক্ত খাওয়ায়, এমন মানুষ কোথায় আছে?”

সৌজন্য বলল, “চলুন সবাই। এবার আপনাদের বিদায় দিতে হবে।”

উদ্যানের মধ্য ওরা ফিরে চলল সেই বিশাল ফটকের দিকে। সৌজন্য বলল, “আপনাদের গৃধ্র অপেক্ষা করছে বনের মধ্য দিয়ে লাল পাথরের পথটা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেইখানে। এই রাস্তাটা আপনাদের হেঁটে যেতে হবে।”

অভী বলল, “জানি।”

মেঘবর্ণ কী যেন ভাবছিল। সে বলল, “সৌজন্য, একটা কথা বলো। আজ ঐশিকদের কথা শুনে মনে হল, মরুময়ের পথেই চলছে তাঁদের চিন্তাধারা। জল নিয়ন্ত্রণ করে সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের ওপর কবজা করতে চাইছেন তাঁরা। ঠিক বলছি?”

সৌজন্য দাঁত বার করে হাসল। “একদম ঠিক বলছেন। মরুময় নিজে একজন ঐশিক এবং যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন তিনি। রাজা পুনর্বসুর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই অবস্থায় আমি যে তাঁর হয়ে মরুময়কে গুপ্তহত্যা করব না, এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, এটা আমরা সবাই বুঝেছিলাম, কেবল তিনিই বোঝেননি। যার কাছে তোমার ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধি হবে, তার ক্ষতি তুমি করবে না, এ আমরা ভালো করেই বুঝে গেছি।”

সৌজন্য চোখ সরু করে তাকাল। “বুঝে গেছেন তো? বেশ, তাহলে আর একটা কথা বলি। আপনাদের দিয়েও আমার ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধি হবে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ; তাই একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখছি নিতান্তই নিজের স্বার্থে। আমার কাছে

সব জায়গার সব খবরই থাকে, জানেন নিশ্চয়ই? আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য এইটুকুই— আপাতত মরুময়ের চিন্তা ছাড়ুন; মাল্যপর্বতের উন্মাদের হাত থেকে পারলে সমরগরিমাকে রক্ষা করুন।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “মাল্যপর্বতের উন্মাদটা আবার কে?”

সৌজন্য একটু বিরক্ত মুখে বলল, “মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা সবসময় কী নিয়ে উন্মাদ থাকে, জানো না?”

অভী বলল, “যুদ্ধ।”

“তাহলে যুদ্ধ নিয়ে ওদের দেশে সবচেয়ে বড়ো উন্মাদ কে আছে, সেইটি ভাবলেই আমার কথার উত্তর পেয়ে যাবে। বিদায়।”

ওরা ফটকের বাইরে এসে পড়েছিল। সৌজন্য ভেতরে দাঁড়িয়ে রইল। দ্বার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা হেঁটে চলল বনের মধ্যকার লাল পথটা দিয়ে। অভীর হাতে ধরা আছে লীনার হৃদয়শর। চলতে-চলতে সৌজন্যের শেষ কথাগুলোই ভাবছিল সে।

নিধি প্রশ্ন করল, “মেঘবর্ণ, সৌজন্য কী বলতে চাইল বলো তো?”

মেঘবর্ণ ভ্রুকুটি করে বলল, “ও ছোকরার পেটে কী আছে, বুঝতে পারা অত সহজ নয়।”



।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

প্রেতচর্চা

বজ্রধর বললেন, “অভী, ভূত দেখার ইচ্ছা আছে নাকি?”

অভী অবাক হয়ে বলল, “ভূত? এখানে? কোথায় আছে?”

বজ্রধর, নীলাভ্রর সঙ্গে অভী বসেছিল অনুশীলন মঞ্চে। বেশ বেলা হয়েছে; সূর্য ধীরগতিতে উঠে আসছে মাথার ওপরে। বাবার সঙ্গে কথা বলছিল অভী এখানে বসে; অধিনায়ক বজ্রধর ওদের কাছে এসে বসেছেন একটু আগে। এইমাত্র এক জটায়ু এসে বজ্রধরকে একটি চিঠি দিয়ে গেছে; এখানে বসে সিলমোহর খুলে সেটাই মন দিয়ে পড়ছিলেন তিনি।

নীলাভ্র বলল, “পাখিটাকে দেখে মাল্যপর্বতের জটায়ু মনে হল। ব্যাপার কী, অধিনায়ক? ওখানে আবার ভৌতিক কাণ্ডকারখানা শুরু হল নাকি?”

বজ্রধর বললেন, “ওখানে এরকম কিছু প্রেতচর্চাকারী লোক আছে; তারা অর্থমূল্যে রাক্ষসদের মৃত আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারে বলে দাবি করে। তবে আমার ধারণা, এগুলো প্রায় সবই ভণ্ডামি; সরল, সাধারণ রাক্ষসদের বোকা বানিয়ে কিছু লোক এইভাবে অর্থ উপার্জন করে। এইরকম

একটি ঘটনার সাক্ষী থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছি আমি আর অভী, যদিও ঘটনাটা কতখানি খাঁটি হতে চলেছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অভী, ভূত-টুতের দেখা পেতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

অভী একটু হেসে বলল, "ভূতের দেখা আমি এর আগেও পেয়েছি। নরকে ওদের কয়েকজনের সঙ্গে এই তো কিছুদিন আগেই সাক্ষাৎ হয়েছে।"

নীলাভ বলল, "হ্যাঁ, অভীর কল্যাণে তাদের আমরাও দেখে ফেলেছি। কিন্তু, অধিনায়ক, মাল্যপর্বত থেকে আপনাদের দু'জনকে চিঠি পাঠিয়ে ভূত দেখার এই আমন্ত্রণটি করল কে?"

"প্রজ্ঞা। এই নাও, পড়ে দেখো তাঁর আমন্ত্রণপত্র।"

নীলাভর হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন তিনি। অনুচ্চস্বরে পুরোটা পড়ল সে।

সমরগরিমার মাননীয় অধিনায়ক বজ্রধর,
একটি বিশেষ অনুরোধ নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। আপনি হয়তো ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন, আমার একমাত্র পুত্র সুতসোম কিছুকাল পূর্বে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। বিষয়টি মা হিসাবে আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হলেও আমি এই নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা করিনি। কিন্তু সদ্য ঘটে যাওয়া একটি অদ্ভুত ঘটনার পরে আমি আপনাকে চিঠি লিখছি।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের দেশে রাক্ষসদের মধ্যে কেউ-কেউ দাবি করে, তারা মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে। গতকাল মাল্যপর্বতের ঘনবসতিপূর্ণ একটি অঞ্চল দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এমনই এক ব্যক্তি উপযাচক হয়ে আমাকে ডেকে বলল, "আপনি যদি আপনার মৃত ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চান, তাহলে আমার গৃহে আসুন। মাত্র দুই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব।"

এই ধরনের বুজরুকি ব্যাবসা আমাদের এখানে বেশ ভালোই চলে। রাক্ষসদের অনেকের মধ্যেই শিক্ষার অভাব আছে, চেতনার অভাব আছে; তারা এ-জাতীয় প্রতারকদের সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে। আমি নিজে মনে করি, মৃত ব্যক্তি কখনও ফিরে আসে না; আসা সম্ভবই নয়। গতকালও আমি লোকটিকে উপেক্ষা করেই চলে আসছিলাম, তখন আমার আপনার কথা মনে পড়ল।

আমার মনে পড়ল, আপনি স্বয়ং ওপার থেকে ফিরে এসেছেন। তাহলে হয়তো 'ওপার' বলে সত্যিই কিছু আছে।

আপনাকে ডাকছি, কারণ আমি সুতসোমের মা; নিজের ওপর আমার ভরসা আছে ঠিকই, কিন্তু আমি চাই, আপনার মতো একজন ঠান্ডা মাথার বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার সঙ্গে থাকুন। মৃত ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে গিয়ে আমি যদি আবেগের বশে প্রতারিত হয়েও পড়ি, আপনি তা হবেন না। আর অভীকেও ডাকছি, কারণ সুতসোমের সঙ্গে তার ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ছিল; আমার ছেলের জীবনের শেষ মুহূর্ত তার সান্নিধ্যই কেটেছিল। আমার মনে হয়, যদি সত্যিই ওই লোকটির দাবি সত্য হয়, তাহলে অভীও হয়তো একবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।

রাজা পুনর্বসুর সম্মতি নিয়েই এই চিঠি লিখছি। কোনো রাক্ষসকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না, কারণ আগেই বলেছি, রাক্ষসরা এইসব ব্যাপারে অত্যন্ত অন্ধবিশ্বাসী। তাদের ওপর আমার খুব একটা ভরসা নেই। তা ছাড়া, রক্ষোপুরীর সেনানায়িকা নিজের মৃত ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রেতচর্চার আসরে যাচ্ছে, এইটুকু মানসিক দুর্বলতার কথাও আমি রাক্ষসদের কাউকে জানতে দিতে চাই না। বিশেষত বিমোহকরা জানতে পারলে এখনই রাজা পুনর্বসুর বিরুদ্ধে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করবে।

নিতান্ত অদম্য কৌতূহলের বশেই একবার আমি লোকটির মুখোমুখি বসতে চাইছি। আপনাদের সাহায্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

আপনাদের আগমনের প্রত্যাশায় রইলাম। যদি অসম্মত হন, তাহলে অনুগ্রহ করে একটি জটায়ু পাঠিয়ে আপনার মতামত জানিয়ে দেবেন।

প্রজ্ঞা।

পড়া শেষ করে নীলাভ বলল, “অধিনায়ক, আমার মন বলছে, আপনি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।”

বজ্রধর বললেন, “ঠিকই ধরেছ। ঘটনাটা আমার বেশ কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। অনেক অভিজ্ঞতা জীবনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সামনা-সামনি বসে ভূত দেখার অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। প্রজ্ঞার কল্যাণে যদি সেটা হয়ে যায়, মন্দ কী?”

অভী ভাবছিল সুতসোমের কথা, তার মৃত্যুর কথা। মরার আগে তাকে ‘ভাই’ বলে ডেকেছিল বাচ্চাছেলেটা। তার মতো অসামান্য যোদ্ধা অভী আজ পর্যন্ত দেখেনি; বিপক্ষ আক্রমণ করার আগেই সে বুঝে ফেলত, কীভাবে আক্রমণ আসতে চলেছে। এতদিন পরে আবার তার কথা মনে পড়তে অভী শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করল, নিজে একজন ভয়ংকর যোদ্ধা হয়েও সুতসোম অন্য রাক্ষসদের মতো যুদ্ধোন্মাদ ছিল না কোনোদিনই।

সে বলল, “অধিনায়ক, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। যদি সত্যিই ওর সঙ্গে আর একবার দেখা হয়, তাহলে আমারও ভালো লাগবে।”

নীলাভ বলল, “একটা ব্যাপার আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছেন, অধিনায়ক। প্রজ্ঞা যে নিজের দেশের রাক্ষসদের কাউকে না ডেকে আপনাদের দু’জনকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এতেই অনুমান করা যাচ্ছে, যাঁরা ওদের দেশের বুদ্ধিমান রাক্ষস, যাঁরা সত্যিই দেশটার মঙ্গল চান, তাঁরা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করার চেয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই আগ্রহী।”

বজ্রধর মাথা নেড়ে বললেন, "আমি প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি, খুন স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মহিলা উনি। কার ওপরে কখন বিশ্বাস রাখা উচিত, সেটা উনি ভালোই বুঝেন। রাজা পুনর্বসু ভাগ্য করে এমন একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমত্তী পরামর্শদাত্রী পেয়েছেন।"

অভী বলল, “কিন্তু রাজা সবসময় ওঁর কথা শোনেন না। শুনলে সৌজন্যকে গোপনে মুক্তি দিতেন না। প্রজ্ঞা কিন্তু এ-ব্যাপারে ওঁকে নিষেধ করেছিলেন।”

নীলাদ্র বলল, “রাজা ভুলই করেছেন। ওদেশে ওঁর সবচেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ যদি থাকে, তবে সে ওই সেনানায়িকা প্রজ্ঞাই।”

বজ্রধর বললেন, “তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একটা জিনিস মাথায় রেখো সবাই। প্রজ্ঞাকে চেনে না, ওদেশে এমন কেউ নেই— রাজার অত্যন্ত কাছের লোক এবং পুরো মাল্যপর্বতের সেনানায়িকা হিসাবে যথেষ্ট বিখ্যাত রাক্ষস তিনি। কাজেই যে লোকটি তাঁকে আলাদাভাবে ডেকে তাঁর মৃত ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে বলেছে, তার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব নয়। রাজা নিজে পত্রতিলক রাক্ষস এবং বিমোহকদের মধ্যে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় নন। এর পেছনে বিমোহক রাক্ষসদের কোনো অভিসন্ধি থাকার সম্ভাবনাও আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না। প্রজ্ঞার মতো ক্ষমতাধর একজন রাক্ষসকে হঠাৎ রাস্তায় ডেকে এই ধরনের কথা বলার সাহস কোনো সাধারণ প্রেতচর্চাকারীর হত কি?”

নীলাভ্র জ্রুটি করে বলল, “আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে?”

বজ্রধর বললেন, “থাকতেও পারে। সময়টা ভালো যাচ্ছে না আমাদের কারও জন্যই। আমাকে তো ওখানে অনেকেই চেনে; বিগত কিছুদিনের ঘটনার পর এখন অভীও মাল্যপর্বতে বেশ পরিচিত মুখ। আমরা যখন প্রজ্ঞার সঙ্গে যাব, তখন মুখ ঢেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে মনে হচ্ছে। অভী, গিয়ে তৈরি হয়ে নাও। সূর্যাস্তের সময় বেরিয়ে পড়ব আমরা।”

মিত্রভবনে ফিরে এসে ঘটনাটা নিধিকে বলতেই সে বলে উঠল, “ইশ্শ, কী ভাগ্য তোমার! স্বয়ং অধিনায়কের সঙ্গে যাচ্ছ এইসব অভিযানে! সুতসোমের সঙ্গে সত্যিই যদি দেখা হয়, কী বলবে ভেবে রেখেছ?”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “না, সে-সব কিছুই ভাবিনি। আগে তো যাই, তারপর অবস্থা বুঝে মুখ খুলব।”

সূর্যাস্তের কিছু আগেই আয়তনে গিয়ে হাজির হল সে। তাকে দেখে বজ্রধর বললেন, “চন্দ্রহাসকে সঙ্গে নিয়ে নাও আজ। কোথায় যেতে হবে, কাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে তার আসল অস্ত্রটি থাকলে আমাদেরই সুবিধা।”

সংগ্রহশালায় গিয়ে চন্দ্রহাসকে তুলে নিল অভী। একবার তার মসৃণ ধাতব শরীরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে অস্ত্রটাকে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর

সে বেরিয়ে আসতে দরজা বন্ধ করে বজ্রধর বললেন, “আমার মহাগৃধ্র সুসভ্যকে ডাকছি। মাঠে এসো।”

ততক্ষণে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে— তাদের গায়ে দিনের শেষ আভা লেগে আছে তখনও। সমরগরিমার প্রান্তরে এরই মধ্যে নির্নির্নাক ডাকতে শুরু করেছে। তাঁর শঙ্খধ্বনি হওয়ামাত্র আকাশ বাতাস মথিত করে নেমে এল সুবিশাল পাখিটা। দু’জনে উঠে পড়লেন তার পিঠে।

বজ্রধর বললেন, “আমি ইতোমধ্যেই প্রজ্ঞাকে জটায়ুর মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে রেখেছি, মাল্যপর্বতের রাজপ্রাসাদে আমরা এখনই ঢুকব না; তিনি যেন প্রাসাদের দ্বারের বাইরে অপেক্ষা করেন। আমার সঙ্গে মাথাটাকা পোশাক আছে; ওখানে পৌঁছে ওই পোশাক পরে তবে আমরা ওই প্রেতবিশেষজ্ঞ রাক্ষসের কাছে যাব। আমরা সমরগরিমার দুই যোদ্ধা ওদের সেনানায়িকার সঙ্গে কোথাও বেরোচ্ছি, এটা দেখলে অনেক রাক্ষসের মনে অনাবশ্যক সন্দেহের উদ্বেক হতে পারে।”

অভী মনে মনে অধিনায়কের বুদ্ধির প্রশংসা করল।

ডুবে যাওয়া সূর্যের আলো পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার একটু পরেই অধিনায়কের দ্রুতগামী মহাগৃধ্র সুসভ্য তাদের এনে নামিয়ে দিল রক্ষোপুরীর দুর্গপ্রাকারের একটু দূরের পাহাড়ঘেরা প্রান্তরে। বজ্রধর একটা থলি থেকে আলখাল্লাজাতীয় একটা পোশাক বার করে অভীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। “চটপট এটা পরে নাও। তাতে তোমার মুখটাও সহজে কেউ দেখতে পাবে না, আর চন্দ্রহাসও ঢাকা পড়ে যাবে।”

বাধ্য ছেলের মতো অভী দ্রুত পোশাকটা গলিয়ে নিল। পোশাকের মাথা থেকে বেশ একটা ঢালু ঘোমটার মতো আবরণ নেমে এসে তার কপাল পর্যন্ত ঢেকে দেওয়ায় আর তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সর্বাস্ত ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বেশ গরম লাগছে, কিন্তু কিছু করার নেই; এইটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে।

বজ্রধরও ততক্ষণে তাঁর পোশাক পরে নিয়েছেন। অভী দেখল, তাঁর যমদণ্ডটি তিনি সঙ্গে এনেছেন; সেটিকে সাবধানে আলখাল্লার ভেতর কোমরবন্ধে আটকে নিলেন তিনি।

মনে মনে সে ভাবল, ‘অধিনায়ক কি তবে আমাদের ওপর কোনো আক্রমণ হতে পারে ভাবছেন?’

বজ্রধর বললেন, “ওই যে প্রজ্ঞা আসছেন।”

দূরের অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে আসা অস্পষ্ট নারীমূর্তিটা যে আসলে প্রজ্ঞা, অভী প্রথমে বুঝতেই পারেনি। সবসময় তাঁকে রাক্ষসবাহিনীর যোদ্ধার বেশেই দেখে এসেছে সে; আজ তাঁর অন্যরকম সাজ। গরিব রাক্ষস-মেয়েদের মতো অত্যন্ত সাধারণ একটি সুতির শাড়ি পরেছেন প্রজ্ঞা; বরাবর মাথায় শক্ত করে খোঁপা করে বেঁধে রাখা চুল আজ খুলে রেখেছেন তিনি। বজ্রধর প্রীত হয়ে মাথা নাড়লেন। “ওঁকে জানিয়ে রেখেছিলাম, সবাই ওঁকে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত,

তার থেকে যেন কিছুটা অন্যরকম বেশে উনি আজ আসেন। ভিড়ের মধ্যে যতটা কম দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, ততই মঙ্গল।”

প্রজ্ঞা এসে দাঁড়ালেন ওঁদের সামনে; নমস্কার করে বললেন, “অনেক ধন্যবাদ অধিনায়ক বজ্রধর। আমি জানতাম, আপনার কাছে সাহায্য চাইলে আপনি বিমুখ হবেন না।”

বজ্রধর বললেন, “আপনি আমাদের শত্রু নন, সেনানায়িকা। আপনার কাজে লাগতে পারলে আমাদের ক্ষতি কিছু নেই।”

প্রজ্ঞা অভীর দিকে ফিরে বললেন, “অভী, তোমাকেও ধন্যবাদ। সুতসোম যদি আজ সত্যিই আসে, তোমার উপস্থিতিতে আমি একটু নিশ্চিত্ত বোধ করব।”

অভী বলল, “আমিও আজকের ঘটনাটা দেখার জন্য কৌতূহলী। এই লোকটি কি সত্যিই মৃতদের ফিরিয়ে আনতে পারে?”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমি তো আগেই বলেছি, এইধরনের কাণ্ডকারখানা যারা করে, তারা বেশিরভাগই ভণ্ড হয়। কিন্তু তবু...! লোকটা যেচে আমাকে ডেকে কথাটা বলল যখন, তখন কিছু সত্যি এর মধ্যে থাকতেও পারে।”

বজ্রধর বললেন, “আপনাকে এইভাবে ফাঁদে ফেলতে চাইছে না তো কেউ? ব্যাপারটা যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, আশা করি আপনিও বুঝতে পারছেন। আপনি সশস্ত্র হয়ে যাচ্ছেন তো?”

প্রজ্ঞা হাসলেন। “অধিনায়ক বজ্রধর, কেউ যদি আমাকে ফাঁদে ফেলতেও চায়, আমি এত সহজে সেই ফাঁদে পড়ার পাত্রী নই। এই দেখুন।”

দু’হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত চুড়ির গোছা সরিয়ে বাহুতে আটকানো দুটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ওদের দেখিয়ে দিলেন প্রজ্ঞা। চুড়ির সম্ভারের আড়ালে এমনভাবে অস্ত্রদুটো আটকানো আছে, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

বজ্রধর খুশি হয়ে বললেন, “যাক, নিশ্চিত্ত হলাম। চলুন, এবার যাওয়া যাক।”

আর কোনো কথা না বলে তিনজন চুপচাপ এগিয়ে চললেন মাল্যপর্বতের বাজার এলাকার দিকে। প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই বাজার। উত্তেজনা অভীর বুক দুরুদুরু করছে— যতটা না ভূত দেখার উৎসাহে, তার চেয়ে অনেক বেশি একটা আক্রমণের প্রত্যাশায়। অধিনায়ক তাকে চন্দ্রহাস আনতে বললেন, নিজেও যমদণ্ড নিয়ে এসেছেন, এ-দিকে প্রজ্ঞাও সঙ্গে অস্ত্র এনেছেন। তার মানে, জোরদার একটা লড়াইয়ের আশা ওঁরা দু’জনেই করছেন।

মাল্যপর্বতের বাজার এলাকা এই সন্ধ্যায় আলোয় ঝলমল করছে। অভী এদিকে আগে কখনও আসেনি। সে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে চলল।

বেশিরভাগ দোকানেই নানা ধরনের ধারালো অস্ত্র বুলছে। পঁচিশ পা যাওয়ার মধ্যেই চারখানা তরবারির দোকান অভীর চোখে পড়ল; তাদের ভেতরে বুলছে সারি-সারি ছোটো-বড়ো ছুরি ও তরবারি; দোকানের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে তাদের গায়ে— হঠাৎ দেখলে চোখ ঝাঁপিয়ে যায়। তিরধনুকের দোকানে গদা, মুষল, মুদগর ইত্যাদিও রাখা আছে। সেইসব দোকানে ক্রেতারও অভাব নেই।

কয়েকজন দোকানদার রাক্ষস চিৎকার করে ডাকছে, “আসুন, আসুন, হাতে নিয়ে দেখে যান। আসল চক্রচিহ্নযুক্ত অসি। যুদ্ধ লাগলে আপনার সমরগরিমার শত্রুকে মাখনের মতো কাটতে পারবেন এই অসি দিয়ে।”

প্রজ্ঞা অস্বস্তিভরে একবার বজ্রধরের দিকে তাকিয়ে নিলেন। বজ্রধর মৃদু হেসে পরিবেশটা সহজ করে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, “চলুন, চলুন, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ নেই।”

অস্ত্রবাজার পেরিয়ে অলংকার বিপণি। নানা ধরনের গয়নাগাঁটি সজ্জিত আছে ঝকঝক দোকানগুলোর কাচঢাকা প্রদর্শনী বাঞ্চে। অভী জানেই না, গয়না এত রকমের হয়। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, “এ-সব সোনার?”

প্রজ্ঞা একটু হেসে বললেন, “না, সব নকল। সাধারণ রাক্ষসরা বেশিরভাগই খুব গরিব। আসল সোনার অলংকার কেনার সাধ্য নেই তাদের। কিন্তু সাজতে তারা খুব ভালোবাসে। তাই নকল সোনার গয়নার দোকানের ছড়াছড়ি এখানে। আসল সোনার দোকানও গুটিকয়েক আছে, তবে অন্যদিকে।”

এর পরে পোশাকের দোকানগুলোতে প্রচুর কমবয়সী রাক্ষস ছেলেমেয়ের ভিড় দেখে অভীর চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করে প্রজ্ঞা বললেন, “আমাদের রাজা পুনর্বসুর সিংহাসন আরোহণের আরও একটি বর্ষপূর্তি আসছে। ওই সময় এখানে বিরাট বড়ো উৎসব হয়। তাই এখন জামাকাপড়ের দোকানে ভিড়টা একটু বেশি হচ্ছে।”

কিছুটা দূরে নানাধরনের খাবারের দোকান থেকে মনকাড়া গন্ধ আসছিল। অভী সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রজ্ঞা তার হাত ধরে টানলেন। “না, ওদিকে নয়, আমরা এইদিকে যাব।”

একটা কাপড়ের দোকান পেরিয়ে বামদিকের একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে গেলেন তাঁরা। এতক্ষণ উজ্জ্বল আলোয় অভীর চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; হঠাৎ এই প্রায়াক্ষকার সরু গলিতে এসে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল চারপাশ দেখার মতো দৃষ্টি ফিরে পেতে।

ওরা এসে দাঁড়িয়েছে একটা সাদা বাড়ির সামনে। মাল্যপর্বতের বেশিরভাগ বাড়ির মতো এটাও পাথরের তৈরি। তার ওপরে সাদা রং করা হয়েছিল অনেককাল আগে; এখন বহু জায়গাতেই সেই রং ফিকে হয়ে গিয়ে পাথরের আসল কালচে রংটা বেরিয়ে পড়েছে। বাজারপাড়া এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু বাজারের সেই কলরব এখানে আদৌ পৌঁছেছে না। গলিটা অদ্ভুত রকমের শান্ত।

থমথমে রাস্তা থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

প্রজ্ঞা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দরজার সামনে; তিনবার ঠক্ ঠক্ করে দরজায় আঘাত করলেন।

যে লোকটি দরজা খুলল, তার চেহারা বেশ রোগা, মাথায় যত্ন করে আঁচড়ানো লম্বা চুল, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক। প্রজ্ঞাকে দেখে একটু হেসে সে বলল, “অভিবাদন, সেনানায়িকা। আমি জানতাম, আপনি আসবেন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমার সঙ্গে দু’জন সঙ্গী আছেন। ওঁরাও আজকের ঘটনাটা দেখতে চান।”

লোকটা একটু চমকে গেল। বোঝাই যাচ্ছে, প্রজ্ঞা ছাড়া আর কাউকে আশা করেনি সে।

বজ্রধর আর অভী এগিয়ে এলেন। একটু নাক টেনে সে বলল, “এঁরা তো রাক্ষস নন। গন্ধটা অন্যরকম লাগছে যেন।”

প্রজ্ঞা শান্তভাবে বললেন, “ওঁরা অর্ধরাক্ষস, কিন্তু আমার বিশ্বস্ত লোক। তোমার এতে আপত্তি আছে? তাহলে আমি যাই।”

লোকটা একমুহূর্ত সময় নিল ভাবতে। ততক্ষণে অভী এগিয়ে এসেছে। সে বলল, “আমার শরীরে রাক্ষসরক্তও আছে। আপনি গন্ধে বুঝতে পারছেন না?”

প্রজ্ঞা তাকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিলেন। “আমি আদেশ করছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়?”

প্রেতবিশারদ আর তর্কে গেল না। “না, সেনানায়িকা। আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ। আপনারা সকলেই ভেতরে আসুন।”

দরজা খুলে রেখে একপাশে সরে গেল সে। ভেতরে ঢোকার সময় প্রজ্ঞা চাপাগলায় বললেন, “বোকামি করছিলে, অভী। ওর খুব কাছে গেলে তোমার শরীরের মানুষ আর ঐশিকরক্তের গন্ধও পেয়ে যেত ও। সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝে ফেলত, তুমি প্রলয়যোদ্ধা ছাড়া আর কেউ নও। তুমি যে ত্রিরক্তসম্পন্ন এক ব্যক্তি এবং একদিন তুমিই প্রলয় এনে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে, এই ভবিষ্যৎবাণীর কথা মাল্যপর্বতেও সবাই জানে।”

বজ্রধর মাথা নেড়ে প্রজ্ঞাকে সমর্থন করলেন। “অভী, যতক্ষণ না আমাদের দরকার হয়, আমরা মুখ খুলব না; সেনানায়িকা প্রজ্ঞাকেই পুরো বিষয়টা সামলাতে দেব। খুব প্রয়োজন না হলে আমাদের ভূমিকা আজ দর্শকের— বুঝতে পেরেছ?”

অভী বলল, “বুঝতে পেরেছি, অধিনায়ক।”

যে ঘরে ওদের নিয়ে এল লোকটা, সেখানে পাথুরে মেঝের ওপর বিরাট বড়ো বৃত্ত আঁকা রয়েছে সাদা রং দিয়ে। সেই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে জ্বলছে একটি লালরঙের মোমবাতি। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই সম্ভবত জ্বলছে বাতিটা, কারণ তার গা বেয়ে লালরঙের গলন্ত মোম এসে জমেছে বাতির তলার দিকে। ধূপদানিতে জ্বলছে একগোছা ধূপ; গন্ধটা খারাপ নয়, কিন্তু এই বন্ধ ঘরে ধোঁয়ার প্রাবল্যে অভীর যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

চারপাশ কেমন অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ; তার ওপর ধূপের ধোঁয়ায় ঘরের একমাত্র আলোর উৎস মোমবাতিটিকেও যেন অস্পষ্ট লাগছে। অকারণেই অভীর বুক দূরদূর করতে লাগল। প্রেতবিশারদ বলল, “এই বৃত্তের বাইরে আপনারা বসে পড়ুন। সেনানায়িকা, আপনার পুত্রকে আপনি দেখতে চান?”

“চাই। আপনি তাকে দেখাতে পারেন, মহাশয়?”

“পারি। আমার নাম সুমন্ত; ওই নামেই আমাকে ডাকতে পারেন আপনারা। আপনার পুত্র সুতসোমকে আমি যদি আহ্বান করি, সে আসবে, কথাও বলবে। কিন্তু একটাই শর্ত, আপনারা কেউ এই বৃত্তসীমানা লঙ্ঘন করে ভেতরে ঢুকবেন না। তাতে আপনাদেরও ক্ষতি এবং যে আসবে তারও ক্ষতি।”

অভীর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন বজ্রধর, যেন বলতে চাইলেন, ‘ভয় নেই।’ অভী অবশ্য ভয় পায়নি, কিন্তু এই আলো-আঁধারি, ধোঁয়ায় ভরা পরিবেশটাই এমন যে একটু গা-ছমছম করে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। প্রজ্ঞার মুখ ভাবলেশহীন; তাঁকে দেখে তাঁর মনের মধ্যে কী চলছে, বোঝার উপায় নেই।

প্রেতবিশারদ সুমন্তর কথামতো মেঝের ওপর আঁকা বৃত্তকে ঘিরে বসলেন ওঁরা তিনজন— প্রজ্ঞা মাঝে, তাঁর দু’পাশে অভী ও বজ্রধর। সুমন্ত বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে প্রজ্ঞার দিকে মুখ করে বসে মোমবাতিটিকে হাতে তুলে নিল।

“আপনারা এই মুহূর্তে আছেন জীবিতদের জগতে। এই বৃত্ত আপনাদের আলাদা করে রেখেছে মৃতদের জগৎ থেকে। আমি আছি এই দুই জগতের সংযোগকারী হিসাবে। সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, আপনি কি এই মোমবাতির আলো দেখতে পাচ্ছেন?”

“পাচ্ছি।”

“এই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকুন। এ-ঘরে কোনো বাতাস নেই; তাই দীপশিখা একটুও কাঁপছে না। তাকিয়ে থাকুন এর দিকে একমনে— দেখবেন, মন একদম স্থির হয়ে গেছে।”

প্রজ্ঞা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আলোকশিখার দিকে। সুমন্ত বলল, “সেনানায়িকার সঙ্গীরা, আপনারা সুতসোমকে চিনতেন তো?”

বজ্রধর চুপ করে রইলেন। অভী মাথা নেড়ে বলল, “চিনতাম।”

“তাহলে আপনারাও একই রকম ভাবে তার কথা ভাবুন এই নিষ্কম্প অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে। দেখতে থাকুন, কল্পনা করতে থাকুন, এই আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে তার ছায়াশরীরটা।”

অভী ভাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সুতসোমকে কোনোভাবেই ছায়াশরীর হিসাবে কল্পনা করে উঠতে পারল না সে। একসময় কত কথা হয়েছে ছেলেটার সঙ্গে; এই মুহূর্তে তাকে ছায়া হিসাবে কল্পনা করা বড়ো কঠিন কাজ। বারবার সুতসোমের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময়টা মনে পড়তে লাগল তার।

সুতসোম মরার আগে তাকে বলেছিল, “মা-কে বোলো, আমি সত্যিই তাকে ভালোবাসি।” আচ্ছা, এখন কি তার সে-সব কথা মনে আছে? সত্যিই যদি ছেলেটা এখন আসে, তাহলে সে কি তার মা-কে কথাটা নিজের মুখে বলতে পারবে না? এই পার্থিব জীবনের ভালোবাসা কি মৃত্যুর পরেও থাকে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অভী হঠাৎ খেয়াল করল, মোমবাতির শিখাটা যেন কাঁপতে শুরু করেছে। বৃত্তের মধ্যে সুমন্ত বসে আছে অর্ধনিম্নলিত চোখে; তার বুকের কাছে সে ধরে রেখেছে জ্বলন্ত বাতিটাকে। প্রজ্ঞা তাকিয়ে আছেন

স্থিরদৃষ্টিতে সেই আলোর দিকে। অভী একবার সন্তর্পণে মাথা ঘুরিয়ে অধিনায়ক বজ্রধরকে দেখে নিল। তিনিও আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন বটে, কিন্তু তাঁর কপালে ভ্রুকুটি।

“আসছে! সে আসছে!” ফিসফিস করে বলে উঠল সুমন্ত।

অভী তাকিয়ে রইল। মোমবাতির ধোঁয়াটা এতক্ষণ স্থিরভাবে উঠে যাচ্ছিল ওপরের দিকে, এবার সেটা যেন পাক খেতে শুরু করেছে। ধোঁয়াটা ঘুরে চলেছে বৃত্তের ভেতরে, কিন্তু কিছুতেই বাইরে আসছে না। প্রজ্ঞা দেখছেন ধোঁয়ার কুণ্ডলীটাকে; অভী দেখল, বজ্রধর তাঁর আলখাল্লার ভেতরে হাত ঢোকাচ্ছেন। সে জানে, ওখানে যমদণ্ডটা লুকানো আছে।

অধিনায়ক কি কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করছেন এখনই?

তাঁর মুখের ভাব অবশ্য শান্ত। অভী দেখল, তাল পাকাতে পাকাতে ধোঁয়াটা একটা মানুষের আকৃতি নিচ্ছে। ওই তো সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঈষৎ বাঁকা হাসি— মুখের আদলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ধূমকুণ্ডলীর মধ্যে।

প্রজ্ঞা অনুচ্চস্বরে বললেন, “সুতসোম!”

সুতসোমের ছায়াটাও ফিসফিস করে বলল, “মা।”

হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করতে গেলেন তিনি; বৃত্তের ভেতর থেকে সুমন্ত সতর্ক করে দিল, “উঁহু, আপনি এই বৃত্তের মধ্যে কোনোভাবেই ঢুকবেন না।”

বজ্রধরের কপালের ভ্রুকুটি গভীরতর হয়েছে, অভী লক্ষ করল। সুতসোম বলল, “মা, কেমন আছ তুমি?”

প্রজ্ঞা ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, “ভালো নেই রে। তুই কেমন আছিস?”

সুতসোম বলল, “মৃতের কোনো কষ্ট নেই। আমি ভালোই আছি। কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো।”

“কেন?”

“রাজা পুনর্বসুর সভা তোমার জন্য আর নিরাপদ নয়। সেখানে তোমার জন্য খুব বড়ো বিপদ আসতে চলেছে।”

অভী দেখল, প্রজ্ঞার মুখ হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অভীর দিকে ফিরলেন। “তুমি ওকে কিছু প্রশ্ন করতে চাও?”

অভী বুঝতে পারছে, প্রজ্ঞা এই ছায়ামূর্তিকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। সে বলল, “সুতসোম, আমাকে চিনতে পারছ তুমি?”

ছায়ামূর্তিটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, “চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছি না। মৃত্যুর পর অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায়।”

অভী বলল, “মৃত্যুর আগে তুমি আমাকে কী বলে ডেকেছিলে, তোমার মনে নেই?”

“না।”

ধোঁয়ার মধ্যে সুতসোমের মুখটা স্থির হয়ে রইল। প্রজ্ঞা বললেন, “আমার কী ধরনের বিপদ আসতে চলেছে রাজসভায়?”

এইবার সে বলল, “খুব বড়ো ধরনের বিপদ। অল্পদিনের মধ্যেই রাজার পতন হবে; তোমার প্রাণসংশয় হবে তখন ওখানে থাকলে। তুমি অন্য কোথাও চলে যাও, মা; রাজা পুনর্বসুর কাছাকাছি মোটেই থেকো না।”

বজ্রধর হঠাৎ বলে উঠলেন, “প্রজ্ঞা, আপনি যা সন্দেহ করছিলেন, এ নিঃসন্দেহে তাই।”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমিও তা-ই ভাবছিলাম।”

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দৃষ্ট পদক্ষেপে ঢুকে পড়লেন সাদা বৃত্তের মধ্যে। সুমন্ত চেঁচিয়ে উঠল, “এই বৃত্তের ভেতরে মৃতদের এলাকা! আপনি বাইরে যান, সেনানায়িকা; এখানে আপনার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়।”

প্রজ্ঞা সজোরে একটি চড় মারলেন তার গালে। কাতর একটা শব্দ করে মেঝের ওপর উলটে পড়ল সে। হাতের চুড়ির গোছার আড়াল থেকে একটি ছুরি বার করে তার গলায় ঠেকালেন তিনি; কঠোরস্বরে বললেন, “কার হুকুমে আজকের এই নাটক সাজিয়েছ, সুমন্ত?”

সুমন্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল; তার মুখে আর কথা ফুটছে না।

বজ্রধরের চোখের ইঙ্গিতে অভী গিয়ে হ্যাঁচকা টানে লোকটার হাতের লাল মোমবাতিটা ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে সুতসোমের ধূমনির্মিত মূর্তি বিলীন হয়ে গেল।

অভী বলে উঠল, “এ তো ভ্রমমায়া মনে হচ্ছে!”

বজ্রধর বললেন, “হুম, সেই জন্যই মায়াপ্রয়োগকারী ভিন্ন অন্য একজন স্পর্শ করতেই মায়া ভেঙে গেল। খুঁজে দেখলে ওই মোমবাতির মধ্যে লুকোনো একটা স্বপ্ন-উপলব্ধি পাওয়া যাবে, মনে হচ্ছে আমার। নাটকীয় পরিবেশে স্বপ্ন-উপলব্ধির দৃশ্য-প্রতিফলন ক্ষমতার সঙ্গে ভ্রমমায়াকে মিশ্রণ করে বেশ উন্নতমানের দৃষ্টিবিভ্রম তৈরি করেছিলেন আমাদের প্রেতবিশারদ সুমন্ত মহোদয়!”

অভী বলল, “আর প্রেতের কথাগুলো?”

প্রজ্ঞা বললেন, “স্বরক্ষিপণ বিদ্যা। খুব একটা কঠিন নয়; কিছুদিন অভ্যাস করলেই আয়ত্ত্ব করা যায়। মাল্যপর্বতের অনেক মেলায় কিছু রাক্ষস এই স্বরক্ষিপণ বিদ্যার সাহায্যে পুতুলকে কথা বলায়।”

অভী বলল, “কিন্তু আপনার সঙ্গে এইসব করে ওর লাভ কী হচ্ছিল?”

প্রজ্ঞা বললেন, “সেটাই এখন ওর পেট থেকে বার করে তারপর আমরা যাব।”

তাঁর ছুরির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ফুটল সুমন্তের গলায়। ভয়ে চম্ফু বিস্ফারিত করে সে হাতজোড় করে বলে উঠল, “দোহাই সেনানায়িকা, আমাকে মেরে ফেলুন আপনারা! আমি ব্যর্থ হয়েছি জানলে উনি আমাকে আরও ভয়ংকর মৃত্যু দেবেন।”

“উনি মানে কে?” গর্জন করে উঠলেন প্রজ্ঞা। “কার কথায় এই ভণ্ডামি করতে চাইছিলে আমার সঙ্গে?”

“সৌজন্য।”

এঁরা তিনজনই হাঁ হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বজ্রধর বললেন, “সৌজন্য তোমাকে বলেছিল সেনানায়িকাকে ডেকে এই নাটক করতে?”

সুমন্ত তখন ভয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। সে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। সৌজন্য বলেছিলেন, রাজা পুনর্বসুর কাছ থেকে সেনানায়িকাকে সরিয়ে দিতে পারলে রাজার শক্তিশালী শুভাকাক্ষী আর বিশেষ কেউ থাকবে না। তখন তাঁর ওপর আক্রমণ করা অনেক সহজ হবে। বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই; সৌজন্য স্বয়ং শেষমুখ— তাঁর কথা না মানলে তিনি আমাকে অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দেবেন।”

বজ্রধরের দিকে তাকিয়ে প্রজ্ঞা বললেন, “তার মানে, সৌজন্য এখনও রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আমি রাজার কাছে থাকলে ওর তাতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমার মরা ছেলের ভূত ডেকে এনে আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।”

বজ্রধর বললেন, “কী অসম্ভব কূটবুদ্ধি লোকটার!”

অভী বলল, “যখন ছায়ামূর্তিটা আমাকে চিনতেই পারল না, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সেনানায়িকা, আপনি বুঝলেন কী করে?”

প্রজ্ঞা বললেন, “সুতসোম খুব ভালো করেই জানত, বিপদের কথা বলে তার মা-কে ভয় পাওয়ানো যায় না। রাজার কাছ থেকে ও যখনই আমাকে সরে যেতে বলল, তখনই বুঝেছিলাম, এ আমার ছেলে হতেই পারে না।”

বজ্রধর বললেন, “আপনার বুদ্ধিকে ধন্য! এদিকে প্রেত-আবির্ভাবের সময় আমি যমদণ্ডকে স্পর্শ করে ছিলাম। মৃত ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওই দণ্ডে সামান্য হলেও কম্পন হত। কিন্তু যখন দণ্ডটি একদম স্থির হয়ে রইল, তখন আমিও বুঝতে পারছিলাম, পুরো ব্যাপারটাই বুজরুকি চলছে।”

সুমন্ত কেঁদে উঠল, “আমাকে ক্ষমা করুন, সেনানায়িকা।”

প্রজ্ঞা অবজ্ঞাভরে তাঁর অস্ত্র সরিয়ে নিলেন। “ক্ষমাই করলাম তোমাকে। তোমার প্রাণ নিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না, সুমন্ত।”

“এই ব্যর্থতার শাস্তি হিসাবে সৌজন্য আমাকে ভয়াবহ মৃত্যু দেবেন। আমার প্রার্থনা, আমাকে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু দিন আপনারা।”

“না, তাতে আমি রাজি নই। আমার বিচারে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো অপরাধ তুমি করেনি। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।”

সুমন্ত অধীরভাবে বলল, “আমি যন্ত্রণাকে ভয় পাই। সৌজন্য আমাকে ভয়ংকর শাস্তি দেবেন। এখন আমি কী করব, দয়া করে বলে দিন আপনি।”

প্রজ্ঞা বললেন, “অন্য কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকো। এমন কোনো জায়গায়, যেখানে সৌজন্য তোমার সন্ধান পাবে না। এর চেয়ে ভালো উপদেশ আর আমার মনে আসছে না।”

বিশ্বস্ত সুমন্তকে ঘরের মধ্যে রেখে ওঁরা বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওই বন্ধ পরিবেশ থেকে খোলা রাস্তায় এসে অভী এতক্ষণে প্রাণভরে শ্বাস নিল।

ফেরার পথে আর বাজারের রাস্তায় গেলেন না ওঁরা; অন্য একটা কম জনবহুল রাস্তা দিয়ে ওঁদের নিয়ে চললেন প্রজ্ঞা। হাঁটতে হাঁটতে বজ্রধর বললেন,

“সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, আপনার নাম সার্থক। আপনার প্রজ্ঞা ও বাস্তবনোপ দেগে আমি মুগ্ধ। যে-কোনো মায়ের সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গা তার সন্তান। কঠিন মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রেখে সেই দুর্বলতাকেও আপনি জয় করেছেন দেগে ভালো লাগল। আমার শ্রদ্ধা রইল আপনার এই আত্মজয়ী অটল বিচারবুদ্ধির জন্য।”

প্রজ্ঞা স্নান হাসলেন। “এক মুহূর্তের জন্য আমিও যে দুর্বল হয়ে পড়িনি, তা তো নয়। যতই হোক, সুতসোম তো আমারই ছেলে ছিল। কিন্তু মৃত্যুর ওপার থেকে সবাই ফিরে আসে না, সমরগরিমার অধিনায়ক। সবাই তো আর বজ্রধর হয় না। আমার কপাল যে এত ভালো কোনোদিন হবে না, কপালের ওপর ওইটুকু ভরসা আমার আছে।”

বজ্রধরও হাসলেন। “একে কি আর ফিরে আসা বলে? অল্পদিনের ছুটিতে এসেছি আমি, সেনানায়িকা। মৃত দেবতা আমার সময় বেঁধে দিয়েছেন। এবার যখন যাব, আর ফিরব না।”

প্রজ্ঞার সঙ্গে ওঁরা হেঁটে এলেন রক্ষোপুরী পর্যন্ত। দুর্গপ্রাকারে রক্ষীরা ছিল বটে, কিন্তু স্বয়ং সেনানায়িকার সঙ্গে থাকায় কেউ আর মুখের আবরণ সরিয়ে ওঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল না। প্রজ্ঞা বললেন, “আজ রাতটা অতিথিশালাতেই থাকুন আপনারা। কাল সকালে একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদায় নেবেন। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। ভবিষ্যতে যদি আমার দ্বারা কোনো উপকার হয়, দয়া করে জানাবেন। আপনাদের এই ঋণ আমি শোধ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।”

অতিথিশালায় উত্তরাকে ওঁদের আতিথেয়তার দায়িত্ব সমর্পণ করে তিনি চলে যাওয়ার পর আলখাল্লাটা খুলে অভী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। গরম আবহাওয়ার মধ্যে এই আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক যেন সারা শরীর সিদ্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল।

বজ্রধর বললেন, “অভী, একবার স্নান করে নাও। শরীর তাজা হবে, ঘুমও ভালো হবে।”

তাঁর কথা শুনে স্নান করে এসে নিজের শয়্যায় বসে অভী দেখল, অধিনায়ক বজ্রধর বাতায়নপথে বাইরের অন্ধকারের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছেন। তার আসার শব্দ পেয়ে তিনি ফিরে তাকালেন; বললেন, “কী ভাবছি জানো?”

“কী, অধিনায়ক?”

“আমাদের সমরোত্তমদের অনেকেরই দিন ফুরিয়ে আসছে, এ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এদিকে নিয়ামক বিনীতেশের ওপরেও আর ভরসা করার জায়গা নেই। সমরগরিমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত। এই পরিস্থিতিতে একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছে— প্রজ্ঞার মতো ঠান্ডা মাথার সৎ মহিলাকে আমাদের সমরগরিমার প্রশাসনিক পদে পেলে বড়ো ভালো হত।”

অভী ‘কিন্তু-কিন্তু’ করে জিজ্ঞাসা করল, “অধিনায়ক, একটা কথা বলব?”

“বলো।”

“আপনি একটু আগে সেনানায়িকা প্রজ্ঞাকে বললেন, মৃত দেবতা আপনার সময় বেঁধে দিয়েছেন; এবার যখন যাবেন, আর ফিরবেন না। কেন এ-কথা বললেন আপনি?”

বজ্রধর সস্নেহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “অভী, যেতে তো সকলকেই হবে— কাউকে দু’দিন আগে, কাউকে দু’দিন পরে। মৃত দেবতার সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমাকে তিনি জানিয়ে রেখেছেন, অল্প দিনের মধ্যেই ভয়াবহ প্রলয় আসতে চলেছে এবং সেই সময় আমার প্রিয় অনেক মানুষকে নিয়ে আমাকেও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কী ভূমিকা, তা তিনি আমাকে বলেননি; শুধু এইটুকু বলেছেন, সেই মুহূর্ত এলে আমি নিজেই বুঝতে পারব। আমার কাজ সমাপ্ত হলে মৃত্যু তখন আমার কাছে আসবেন এবং আমার সঙ্গে আরও অনেককে নিয়ে যাবেন। আমি আমার ভবিষ্যৎ জানি, অভী; আমার মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে, এবং তার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আর ফিরবে না, তা-ও আমি জানি। সেই কারণেই সমরগরিমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত।”

অজানা এক ভয়ে অভীর বুক কেঁপে উঠল। অধিনায়ক কি তবে অন্য সমরোত্তমদেরও মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়েছেন?

তার শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বজ্রধর বললেন, “এখনই অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমরগরিমা আয়তন আমার নিজের হাতে গড়া। যা-ই ঘটুক, তাকে একেবারে অভিভাবকহীন করে আমি যাব না, এইটুকু ভরসা আমি তোমাকে এই মুহূর্তেই দিতে পারি। নাও, এবার ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করে আমরা ঘরে ফিরব।”

অভী ঘুমোল বটে, কিন্তু ঘুমটা ভালো হল না— অনেকগুলো ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন এসে হানা দিয়ে গেল ঘুমের মধ্যে। একবার যেন স্বপ্নে লীনাকে দেখল সে; আর একবার দেখল রবিকাকাকে। উর্মির মৃত্যুদৃশ্যটাও দেখতে পেল সে— জীবন্ত আঁধারের সামনে তীব্র আলোর বিস্ফোরণে হারিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তারপর স্বপ্নে ভোরের বেলা সে দেখল, সুতসোম আর উর্মি দু’জনেই মৃত্যুর আগে যে হিরার ছুরি দিয়ে নিজেদের আঘাত করেছিল, সেই ছুরিটা নিয়ে নিধি যেন লাফ দিয়ে দীর্ঘদেহী একটা অস্পষ্ট আকৃতিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এইসব স্বপ্ন দেখে অস্বস্তিভরে তার ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে।

অধিনায়ক বজ্রধর ইতোমধ্যেই উঠে পড়েছেন। তাকে জেগে উঠতে দেখে তিনি বললেন, “উত্তরা এসেছিল। রাজা এখনই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন— নিভূতে সাক্ষাৎ করতে চান। তুমি বোসো, উত্তরা এসে একটু পরেই প্রাতরাশ দিয়ে যাবে। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে সৌজন্যের ষড়যন্ত্রের সংবাদটা দিয়ে আসি, যদিও আমার ধারণা, প্রজ্ঞা ইতোমধ্যেই সে-ব্যাপারে তাঁকে জানিয়ে রেখেছেন। রাজার কাছ থেকে ফিরে এসে আমরা সমরগরিমায় ফিরব দুপুরের আগেই।”

অধিনায়ক চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার সকালের খাবার নিয়ে উত্তরা প্রবেশ করল কক্ষে। অভীর খাওয়া হয়ে গেলে উত্তরা বলল, “অভী, একটা কথা ছিল।”

“হ্যাঁ বউদি, বলো।”

“একবার আমার সঙ্গে রাজকন্যা উর্মির সেবাকক্ষে আসবে?”

“কেন বলো তো?”

“এসো না। একটা জিনিস তোমাকে দেখানোর আছে।”

অগত্যা অভী উঠে পড়ল। উর্মির সেবাকক্ষ! মানুষটা নেই, কতদিন হয়ে গেল! তাঁর সেবাকক্ষটি এখনও রয়ে গেছে। আর ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। গেলে শুধু পুরোনো স্মৃতিগুলো তাকে কষ্টই দেবে, অভী জানে। আজ উত্তরা না ডাকলে সে কোনোমতেই আর ওই কক্ষে পা দেওয়ার কথা ভাবত না।

অলিন্দপথে যেতে যেতে কয়েকজন প্রহরী তাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকাল। সেটা অস্বাভাবিক নয়, অভী জানে। সে যে এখানে এসেছে, সে-সংবাদ রক্ষোপুরীর বেশিরভাগ রাক্ষস এখনও জানেই না।

যেতে-যেতে অভীর চোখে পড়ল আর একটা জিনিস। উত্তরার আঁচলের একপ্রান্তে কী যেন গিঁট দিয়ে বাঁধা আছে।

সেবাকক্ষে প্রবেশ করে উত্তরা বলল, “বোসো ওখানে। আমি আনছি জিনিসটা।”

একটি নাতিউচ্চ মর্মরবেদির ওপর বসে পড়ল অভী। উত্তরা বলল, “রাজকন্যা চলে যাওয়ার পর আমি এই সেবাকক্ষের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। কাজটা সময়সাপেক্ষ, জিনিসপত্রের সম্ভার দেখেই বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। দু’-তিনদিন আগেই রাজকন্যার রেখে যাওয়া অনেক খাতাপত্রের মধ্যে এই জিনিসটি পেয়েছি।”

একটা মোটা খামে ভরা জিনিস অভীর হাতে তুলে দিল উত্তরা। “মুখটা সিলমোহর দিয়ে বন্ধ করা। আমি তাই আর খুলিনি; তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমার হাতেই দেব বলে রেখে দিয়েছিলাম। এখানে বসে বসে এটা দেখে নাও, তারপর রেখে দিয়ো।”

অভী মুখবন্ধ খামটা হাতে নিয়ে দেখল, বেশ ভারী। তার ওপরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে— ‘অভী’। উত্তরা বলল, “তোমার নাম লেখা আছে মানে রাজকন্যা হয়তো এটা তোমাকেই দিতে চেয়েছিলেন। হাতের লেখাটা তাঁরই বটে।”

অভী খামটা খুলতে শুরু করল। উত্তরা আবার বলল, “আমি একটু পরে আসছি।”

সে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। খামের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা খাতা। পাতা ওলটাতে দিয়ে অভী বুঝল, তার হাত অকারণেই যেন কাঁপছে।

খাতার পাতায়-পাতায় নানা মায়া-ঔষধের বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখে রেখেছেন উর্মি। কোন ঔষধে কতটা কী ধরনের উপাদান মেশাতে হবে, কোনটাকে কত তাপমাত্রায় গরম করতে হবে, কোন ঔষধের সঙ্গে কোন ঔষধের মিশ্রণে বিষক্রিয়া হতে পারে— এইসব বিষয়ে প্রচুর লেখা পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে। উর্মির হাতের লেখা চমৎকার, কিন্তু বিষয়ের প্রাচুর্য থাকলেও বিষয়বিন্যাস একটু অগোছালো। মাঝে-মাঝে ঔষুধপত্র ছাড়াও নিজের মনের এলোমেলো চিন্তাগুলোকেও লিখে রেখেছেন তিনি।

পড়তে-পড়তে সে খেয়াল করল, রাজকন্যার লেখায় মাঝেমাঝেই তার নাম এসেছে।

এক জায়গায় লেখা আছে, “অভী রাক্ষসদেশে জন্মালে ভালো হত। তাহলে আমি...”— এই পর্যন্ত লিখে আবার কেটেছেন তিনি। তারপর লেখা, “এখানে ও জন্মায়নি, ভালোই হয়েছে। ওর মন কোমল; এ-দেশের এই অতিরিক্ত যুদ্ধ-যুদ্ধ করে পাগলামি ওকে হয় ভীষণ কষ্ট দিত, বা ওকেও হয়তো এদের মতোই নৃশংস করে দিত।”

আর এক জায়গায় তার চোখে পড়ল, “এক অর্ধরাক্ষস বৃদ্ধা আজ জল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। অভী আর তার বন্ধুরা তাকে মুক্ত করে দিল। সমরগরিমার মানুষদের এই মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমারও মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। আমাদের দেশের কারও হাতে যদি ওই বৃদ্ধার বিচারের ভার থাকত, তাহলে তার কপালে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড ছিল।”

এইরকম অজস্র ছোটো-ছোটো লেখা ছড়িয়ে আছে খাতার দু’মলাটের মধ্যে। আর এক জায়গায় অভীর চোখে পড়ল, উর্মি লিখেছেন—

“অভীকে আমি বলেছিলাম, ঘৃণাকে কীভাবে ভালোবাসা করে তোলা যায়, সেই মায়ার কথা। ওকে বলেছিলাম, ‘ভালোবাসার সামনে সব ঘৃণা শক্তিহীন হয়ে যায়।’ ওর মধ্যে তীব্র হিমকুশলতা আছে, আর সেই মায়া ও প্রয়োগ করে ঘৃণা দিয়ে। ওই মায়ার মূল কথা ওকে এখনও বলে ওঠা হয়নি; বলতে গিয়ে দেখলাম, ও অস্বস্তি বোধ করছে, তাই চুপ করে গেলাম। কিন্তু কথাগুলো লিখে রাখতে ইচ্ছা করছে এখানে।

“অশুভ কাজ করার ক্ষমতা, অন্যের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা আমাদের সবার মধ্যে আছে। কিন্তু আমার মধ্যে কী আছে, তা নয়; আমি কী করতে চাই, তা-ই আমার আসল পরিচয়। আমরা নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে যা করতে চাই, তা সব অন্ধকারকে আলো করে তুলতে পারে, সব বিষকে অমৃত করে তুলতে পারে, সব ঘৃণাকে ভালোবাসা করে তুলতে পারে।”

পড়তে পড়তে অভীর দু’চোখ সজল হয়ে উঠল। তাকে ভালোবেসে তার প্রাণরক্ষার জন্য এই মেয়েটি নিজের জীবন দিয়ে গিয়েছিল; তার বদলে সে কী-ই বা দিতে পারল তাকে? খাতাটা রেখে দেওয়ার আগে শেষ পৃষ্ঠায় চোখ পড়ল তার। খুব যত্ন করে সেখানে পরপর লেখা আছে দুটি শব্দ— “অভী। ভালোবাসি।”

চোখের জল মুছে খাতাটা হাতে ধরে রাখল অভী। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইল সে সেবাকক্ষে; অদ্ভুত একটা কষ্ট হতে লাগল তার বুকের মধ্যে।

“লজ্জা করে না তোমার?”

কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলো কানে যেতেই চমকে উঠে চোখ খুলল সে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী রাক্ষস আলোকপর্ণ।

অভী জানে, আলোকপর্ণ সমরগরিমার লোকেদের ঘোরতর অপছন্দ করে। উর্মির খাতাটা দেখতে দেখতে তার মনে যেটুকু কোমলভাব এসেছিল, লোকটাকে দেখে তা নিমেষের মধ্যে উবে গেল।

উঠে দাঁড়াল অভী। তার হাতে ধরা উর্মির খাতাটার দিকে তাকিয়ে আলোকপর্ণ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, “তোমার মতো তুচ্ছ একটা মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে রাক্ষসদের রাজকন্যা প্রাণ দিয়েছেন, এ-জন্য তোমাকে আমি ঘৃণা করি। রাজকন্যা উর্মি নির্বোধ ছিলেন, আবেগপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু তুমি? তুমি স্বার্থপর। তুমি নিজের স্বার্থে আমাদের রাক্ষসদের ব্যবহার করেছ। আর মূর্থ রাজকন্যা তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন।”

অভী গর্জন করে উঠল, “আমাকে যা বলেছ, আমি তার একটা কথারও উত্তর দিতে চাই না। কিন্তু রাজকন্যা উর্মিকে নিয়ে আমার সামনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে ফল ভালো হবে না, আলোকপর্ণ!”

আলোকপর্ণ মুখ বিকৃত করে বলল, “ভয় দেখাচ্ছ নাকি আমাকে?”

কোমরের কোষ থেকে ঝকঝকে তরবারি টেনে বার করল সে; প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে সেই তরবারির অগ্রভাগ সে স্পর্শ করল অভীর গলায়।

রাগে, ঘৃণায় অভী যেন মুহূর্তের মধ্যে খেপে গেল। একলাফে পেছনে সরে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে চন্দ্রহাসকে মুক্ত করল সে। তার স্পর্শে ধকধক করে সাদা আগুনের মতো জ্বলে উঠল চন্দ্রহাসের ধাতব বন্ধিম ফলক।

তার সর্বসত্তায় বয়ে যাওয়া প্রবল ঘৃণাকে সে অনুভব করেছে তীব্রভাবে। এত বড়ো সাহস হতভাগার— তার সামনে তার জীবনদাত্রী রাজকন্যার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে! মুহূর্তের মধ্যে তার দু’হাত বরফশীতল হয়ে গেল, আর তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করল। সেই প্রচণ্ড ঘৃণার হিমস্রোতকে নিজের হাতের মধ্য দিয়ে চন্দ্রহাসে সঞ্চারিত করল অভী।

অহংকারী আলোকপর্ণ পিছিয়ে আসার পাত্র নয়, কিন্তু অভীর এই ভয়াবহ রূপের সামনে তার অস্ত্রবিদ্যা খাটবে না, সে নিজেও বুঝতে পারছিল। সে উদ্যত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করতে গেল, কিন্তু চন্দ্রহাসের ফলা তার অস্ত্রস্পর্শ করতেই সেই তরবারি জমে হিম হয়ে গেল। তারপর অভী তার ওপর দ্বিতীয় আঘাত করতেই অস্ত্রটা আলোকপর্ণের হাতে ধরা অবস্থাতেই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে ঝনঝন শব্দে মেঝেতে এসে পড়ল।

অভী ক্রোধান্বিত হয়ে চন্দ্রহাস বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল প্রতিপক্ষের বুকে, কিন্তু উত্তেজিত নারীকণ্ঠের নিষেধটা দ্বারের সামনে থেকে ভেসে আসতে সে থমকে গেল।

“অভী, থামো, থামো!”

উত্তরা এসে প্রবেশ করেছে কক্ষে; সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখে পড়েছে দৃশ্যটা। সে আবার বলল, “অভী, ওকে মেরো না তুমি। তোমাদের মধ্যে এখন কী হয়েছে, আমি জানি না, কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছি, দোষ পুরোপুরিই এই বদমাশটার। তবু বলছি, ওর প্রাণভিক্ষা দাও তুমি।”

পরাজিত আলোকপর্ণ তখন জানু পেতে বসেছে অভীর উদ্যত অস্ত্রের সামনে। অভী বলল, “বউদি, এই লোকটাই তো তোমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। কম কষ্ট পেয়েছ তুমি এর জন্য? আজ একে মারতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?”

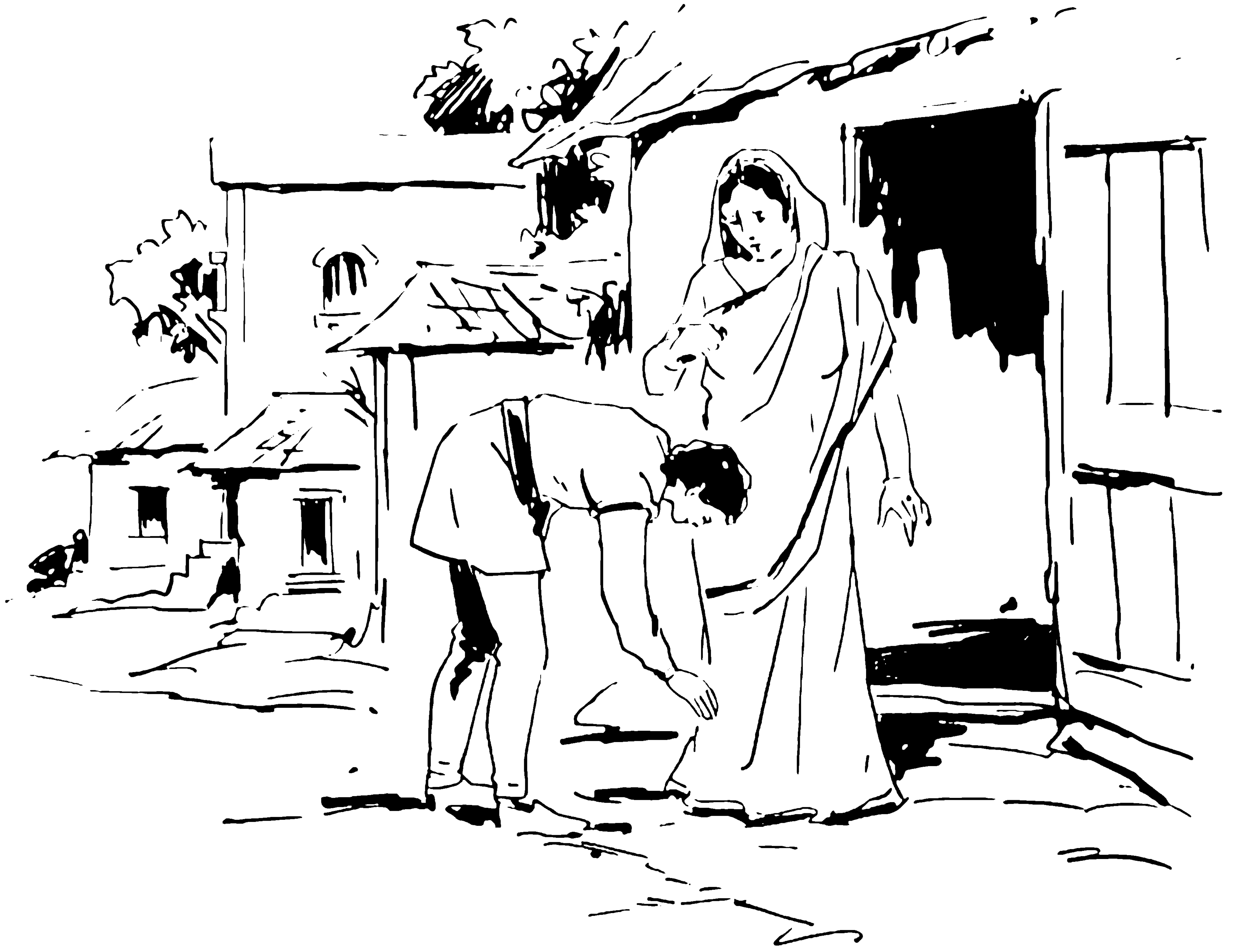
উত্তরা বলল, “ন্যায়যুদ্ধে বীরের মৃত্যু ওর প্রাপ্য নয়। প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে সম্মুখসমরে গৌরবের মৃত্যু বরণ করার যোগ্যই নয় ও। ওকে ছেড়ে দাও, আমার অনুরোধ। ওর শাস্তির ব্যবস্থা নিয়তি করবেন।”

অভী তার অস্ত্র সরিয়ে নিল; সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতের শীতলভাব কমে গিয়ে শরীর উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল, চোখের দৃষ্টিও পরিষ্কার হতে লাগল। চন্দ্রহাসকে আবার কোমরবন্ধে আটকে রেখে সে বলল, “যাও, আলোকপর্ণ। বউদি আমার গুরুজন, তার কথায় ছেড়ে দিলাম তোমাকে। ভবিষ্যতে নিজের জিভকে সংযত রেখো।”

আলোকপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “আজ যতই আমার জীবন বাঁচাও, আমি চিরকাল বলব, তুমি একটা সাপ, উত্তরা! তুমি আমাদের রাক্ষসদের সঙ্গে বরাবর বিশ্বাসঘাতকতাই করে এসেছ। তোমাকে সেদিন অভিশাপ দিয়ে আমি ঠিকই করেছিলাম।”

আঁচলের প্রান্তে বাঁধা সেই জিনিসটা একবার হাতে নিয়ে উত্তরা হাসল। “না আলোকপর্ণ, আমি শুধু সাপ নই, ভুল করছ তুমি। আমি মহাসর্পিণী।”

কারও দিকে না তাকিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল উত্তরা।



।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

দানবের আবির্ভাব

নিধি খুশি হয়ে অভীর পিঠ চাপড়ে দিল। “এই তো চাই! রাক্ষসদের প্রাসাদে ঢুকে স্বয়ং আলোকপর্ণকে উচিত শিক্ষা দিয়ে এসেছ— খবর শুনেই মন ভালো হয়ে গেল। পর্বতদাকেও সংবাদটা দিতে হবে; সে-ও খুব খুশি হবে শুনলে।”

মনে-মনে আলোকপর্ণের ওপর এখনও খাপ্লা হয়ে ছিল অভী। সে এই প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল। “চলো, এখনই যাওয়া যাক। এত ভালো খবর সবার আগে তাকেই দেওয়া দরকার।”

ওরা মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে পড়ল পর্বতের সন্ধানে; অভীর কোমরে ময়ূরবজ্র তরবারি, নিধির হাতে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ত্রিশূল। দুপুর শেষ হয়ে বিকেল নামছে, তবে রোদের তেজ এখনও যথেষ্টই আছে। অনুশীলন মঞ্চের দিকে যেতে-যেতে পথেই দেখা হয়ে গেল শ্যামশ্রীর সঙ্গে। তাঁকে হতুদন্ত হয়ে ছুটে যেতে দেখে অভী অবাক হয়ে ডাকল, “মা!”

তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ওরা দ্রুতগতিতে হেঁটে গেল তাঁর দিকে। অভী বলল, “এমনভাবে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ কোথায়?”

শ্যামশ্রী মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, “মানবমন্দিরের খবর শুনিসনি?”

“না তো। কী খবর?”

“সমরোত্তম মেঘবর্ণের কাছে সংবাদ এসেছে, কাল রাতে মানবমন্দির এলাকায় ঐশিকদের সেই অগ্নিদানবকে দেখা গেছে। কথাটা কতটা সত্যি, জানা নেই। মেঘবর্ণ খবরটা পেয়েই মৃগেন্দ্রকে আয়তনে পাঠিয়েছিল অধিনায়ককে খবরটা দিতে। তিনি একটু ব্যস্ত আছেন বলে আমাকে পাঠালেন খবরের সত্যতা যাচাই করতে। আমি মানবমন্দির যাচ্ছি। তোরা যাবি আমার সঙ্গে?”

অভী আর নিধি তো এককথায় রাজি। এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে?

ওঁরা তিনজন এসে পৌঁছলেন অনুশীলন মঞ্চের কাছে। সেখানে মেঘবর্ণ কথা বলছিল নীলাব্রর সঙ্গে। ওঁদের দেখে ভণিতা না করে মেঘবর্ণ সরাসরি আসল কথায় চলে এল। “শ্যামশ্রী, মানবমন্দিরে দুটি বাচ্চা মেয়ে একটা অদ্ভুত আকৃতি দেখেছে। দানবিক তার আকার; দু’চোখ জ্বলছিল আগুনের মতো। আমি নিজে বাচ্চাদুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। বর্ণনাটা আমাদের দেখা আকাশলোকের অগ্নিদানবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। নীলাব্রকে এখনি এই কথাই বলছিলাম। তোমরা একবার মানবমন্দিরে গিয়ে বিষয়টার খোঁজখবর করে দেখবে?”

শ্যামশ্রী প্রশ্ন করলেন, “তুমি যাবে না?”

“না।”

ক্র তুলে তার দিকে তাকালেন শ্যামশ্রী। নীলাব্র বলল, “শ্যামা, আমার মনে হয়, মেঘকে এখন ওদিকে না পাঠানোই ভালো।”

মেঘবর্ণ অস্বস্তিভরে বলল, “যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে যেতেই হবে। কিন্তু যদি তোমরা ব্যাপারটা সামলে দিতে পার, তাহলে আমাকে আর ওখানে যেতে হয় না।”

মাথা নাড়লেন শ্যামশ্রী। “বুঝেছি। ওখানে ওর মুখোমুখি হতে চাইছ না তুমি, তা-ই তো?”

মেঘবর্ণ শুকনো মুখে বলল, “ঠিকই ধরেছ। ওটাকে শুনছি দেখা গেছে লীনার বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলেই। ওই এলাকায় এখন যাওয়া মানে লতার মুখোমুখি হওয়া। স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ তো করতেই হবে। তুমি আর নীল যাচ্ছ, সঙ্গে এরা দু’জন থাকছে, আপাতত এ-ই যথেষ্ট। লতা আমাকে দেখলে হয়তো অসন্তুষ্ট হবে। কী দরকার শুধু শুধু কষ্ট বাড়িয়ে?”

শ্যামশ্রী একবার তার কাঁধে চাপড়ে দিলেন; তারপর বললেন, “সত্যিই দরকার নেই। আমরা যাচ্ছি, আমরা সামলে নেব সব। তুমি ভেবো না।”

মেঘবর্ণকে পেছনে রেখে ওঁরা হাঁটা দিলেন মানবমন্দিরের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে শ্যামশ্রী একবার বললেন, “অভী, অধিনায়কের কাছে আমি ইতোমধ্যেই খবর পেয়েছি, তুই আলোকপর্ণকে দারুণ ওষুধ দিয়েছিস।”

নিধি হি-হি করে হাসল। অভীও হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, “মাথাটা এমন গরম করে দিয়েছিল ব্যাটা!”

নীলাভ বলল, “ভালো করেছিস। ও লোকটা সবসময় আগ বাড়িয়ে নামেলা পাকাতে চায়। একটা শিক্ষা পাওয়া ওর দরকার ছিল। কিন্তু তোর সঙ্গে ওর ঝগড়াটা শুরু হল কী নিয়ে?”

অভী বলল, “আমাকে কয়েকটা বাজে কথা বলছিল বটে, যদিও সেগুলো আমি গায়ে মাখতাম না। কিন্তু তারপরে ও রাজকন্যা উর্মিকে নিয়ে অপমানজনক কথা বলতে শুরু করল। তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “ঠিক কাজ করেছিস। প্রকৃত বন্ধু হলে কেউ কোনোদিন বন্ধুর অপমান মেনে নেয় না। কিন্তু নীলাভ, আমি অধিনায়কের কাছে বাকি ঘটনা শুনেছি ইতোমধ্যেই। তুমি খবর পেয়েছ?”

“কী খবরের কথা বলছ?”

“সৌজন্য।”

নীলাভ অবাক হয়ে বলল, “কই, না তো! অধিনায়ক ফিরে আসার পর ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখনও। সৌজন্য আবার কী করল?”

শ্যামশ্রী তখন বজ্রধরের কাছে শোনা পুরো ঘটনাটা নীলাভকে শুনিয়ে দিয়ে বললেন, “সৌজন্য চাইছিল প্রজ্ঞাকে ফাঁদে ফেলতে। কিন্তু এতে ওর কী লাভ হবে?”

নীলাভ বলল, “প্রজ্ঞাকে সরিয়ে দিতে পারলে ওর লাভ কম নয়। তিনি রাক্ষসদের সেনানায়িকা; মাল্যপর্বতের মতো যুদ্ধকেন্দ্রিক রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে যে নিয়ন্ত্রণ করে, আসল ক্ষমতা সবসময় তারই হাতে থাকে। আমি নিশ্চিত, প্রজ্ঞাকে সরিয়ে দিতে পারলে সৌজন্য ভেতরে-ভেতরে কলকাঠি নেড়ে কোনো বিমোহকের হাতে বাহিনীর ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করত। ওখানে যে ওর প্রচ্ছন্ন সমর্থকের অভাব নেই, সে-কথা তো আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি।”

নিধি বলল, “আমি একটা কথা বলব?”

শ্যামশ্রী বললেন, “বলো।”

“মানবমন্দিরে কাল রাতে ওই অগ্নিদানবকে দেখা গেছে— এই ঘটনার পেছনেও সৌজন্য নেই তো? সে আকাশলোকে ঐশিকদের কথায় দানবটার তত্ত্বাবধান করছে, এ তো আমরা নিজেদের চোখে দেখে এসেছি।”

অভী মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, তা কিন্তু হতেই পারে। সৌজন্য মাল্যপর্বতে আর সমরগরিমায় একসঙ্গে তার কাজ চালাচ্ছে, এটা আমরা গতবারও সেই শেষমুখ-কাণ্ডের সময় দেখেছি।”

নীলাভ বলল, “এর পেছনে ওর হাত থাকা অসম্ভব নয় বলে আমারও মনে হচ্ছে। কিন্তু পুরো ঘটনাটা খুঁটিয়ে না দেখলে ওর উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না।”

মানবমন্দিরে এসে পড়েছিলেন ওঁরা। যে মেয়েদুটি গতকাল রাতে দানবটাকে দেখেছিল, তাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন সমরোত্তমরা। বাচ্চাদুটোর বয়স নিধির বোন নীপার মতো হবে। তাদের বাবা-মা খুব আপ্যায়ন করে ওঁদের সবাইকে বাড়ির ভেতরে ডাকছিলেন, কিন্তু সমরোত্তমরা আর ভেতরে যেতে

চাইছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেল, কাল অনেক রাতে তারা জানালা দিয়ে দেখেছে, বিরাট আকারের একটা দানবীয় মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে মানবমন্দিরের রাস্তায়। তার চোখের মণির জায়গায় ছিল দুটো জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড, আর বুকের মাঝখানে ছিল একটা চৌকো পাথরের মতো জিনিস।

শুনেই অভী বুঝে ফেলল, তারা যাকে আকাশলোকে দেখে এসেছিল, এ সে-ই বটে। কিন্তু ঐশিকদের এই দানব সমরগরিমায় কী করছে?

অভী দেখল, তার মায়ের কপালে ক্রকুটি গভীর হয়ে উঠেছে। একবার আড়চোখে নীলাব্র দিকে তাকিয়ে নিলেন তিনি; ফিসফিস করে বললেন, “কিন্তু সুরক্ষামায়া?”

দু’জনের চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল। তারপর নীলাব্র গম্ভীরমুখে একবার মাথা নাড়ল। অভী বুঝে গেল, এখন অন্যদের সামনে বাবা আর কিছু বলবে না। কিন্তু সে ওঁদের চিন্তার কারণটা বুঝতে পারছে। সমরগরিমাকে শ্যামশ্রী ঢেকে রেখেছেন সুরক্ষামায়া দিয়ে। এখানকার অধিবাসী ছাড়া বাইরের কারও পক্ষেই সে-মায়ার আবরণ ভেদ করে ঢোকা সহজ নয়। তাহলে এই দানবটা সে-কাজ এত সহজে করছে কী করে?

মেয়েদুটির বাবা-মা আবার সমরোত্তমদের অনুরোধ করছেন একবার গৃহমধ্যে এসে সামান্য কিছু আহার্য গ্রহণ করতে। অভীর এ-সব ভালো লাগছিল না। সমরোত্তমরা অবশেষে তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তখন অভী বলল, “বাবা, মা, তোমরা কথা বলো। আমি একটু ঘুরে আসছি।”

শ্যামশ্রী একবার ক্র তুলে তাকে দেখলেন, তারপর বললেন, “আচ্ছা, যা। এখান থেকে আমরা একবার লতার ওখানে যাব। তোর কাজ হলে ওখানে একবার যাস।”

নিধি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আবার বেরিয়ে আসা অশোভন দেখায় বলে সে সমরোত্তমদের সঙ্গেই রয়ে গেল। অভী একা-একা চলল মানবমন্দিরের পথ দিয়ে।

মেঘবর্ণ কেন এখানে আসতে সংকোচ করছিল, সে ভালোই বুঝতে পারছে। লীনার মৃত্যুর পর থেকে লতাকাকিমার সামনে দাঁড়াতে তারও প্রবল অস্বস্তি হয় এখন। কেবল একটা কথাই তার মনের মধ্যে পাকিয়ে উঠতে থাকে, ‘আমার জন্যই মরতে হল লীনাকে!’ কাকিমার সামনে দাঁড়ালে তাঁর নীরবতায় নিজের অন্তরের সেই দোষীভাবটা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে তার।

মন থেকে এই চিন্তাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে চাইছিল অভী। তখনই এক পরিচিত মুখ দেখে হঠাৎ থমকে গেল সে।

বাড়িটার সামনে উদাসচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন শুকনো মুখের ভদ্রমহিলা। তাঁকে দেখেই অভীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল।

তরুণের মা!

যাবে কি যাবে না ভাবতে-ভাবতেই তার পা-দুটো যেন নিজে থেকেই তাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর দিকে।

এর আগে তাঁকে একবারই দেখেছিল অভী; তরুণ তখন বেঁচে। আজ সে খেয়াল করে দেখল, ভদ্রমহিলার মাথার চুলগুলো এই ক'দিনেই যেন অর্ধেকেরও বেশি পেকে গেছে; অন্তরের শোক যেন তাঁর বাহিরকে পাথর করে দিয়েছে।

কোনোদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি সে। তবু আজ মনে হচ্ছে, একবার অন্তত কিছু বলা উচিত তার। অভী আস্তে-আস্তে ডাকল, “কাকিমা।”

একটু চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন মহিলা। অভী বলল, “আপনি আমাকে চিনবেন না...”

তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, “কেন চিনব না? তুমি তো অভী। তোমাকে কে না চেনে সমরগরিমায়?”

অভী ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাঁকে; বলল, “কাকিমা, আমি তরুণকে চিনতাম। ওর মতো বীর যোদ্ধা আয়তনে কমই ছিল।”

ম্লান হাসলেন তিনি। “অভী, তোমার কথা অনেক শুনেছি ওর কাছে। একসময় ও তোমাকে কম জ্বালায়নি, আমি তা-ও জানি। কিন্তু পরে তোমার প্রতি ওর যে শ্রদ্ধাবোধ এসেছিল, তাও খাঁটি ছিল, এইটুকু আমি তোমাকে বলতে পারি।”

অভী বলল, “তরুণ সমরগরিমার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা ছিল, আমি জানি। আমার সঙ্গে প্রথমের দিকে তার কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরে তার মতো ভালো বন্ধু আমি কমই পেয়েছি। সে না থাকলে বিগত যুদ্ধে আমার বাবার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।”

তরুণের মা বললেন, “জানি। শুধু তোমার বাবা নন, এই সমগ্র আয়তনকে রক্ষা করার জন্য আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে। তার সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে সে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরণ তার কর্তব্য পালন করে গেছে। আমি শোক পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু মা হিসাবে আমি কম গর্বিত নই আমার ছেলের জন্য। তুমি দায়িত্ব নিয়ে, যে জনপদের কল্যাণের জন্য আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছে, তার মানুষ আর অর্ধরাক্ষসরা যেন সর্বদা সুরক্ষিত থাকে।”

অভী মৃদুস্বরে বলল, “আমি কথা দিচ্ছি, আমার সাথে যেটুকু কুলোয়, আমি জীবন দিয়েও তা করব।”

সন্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন তরুণের মা; বললেন, “অভী, তরুণ আমার একমাত্র ছেলে ছিল। ওর বাবা অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। এখন এই বাকি জীবনটা কতখানি শূন্যতা নিয়ে কাটাতে হবে আমাকে, তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না।”

অভী চুপ করে রইল। তিনি বললেন, “নীপা মাঝেমধ্যে আসে, গল্প করে যায়, সান্ত্বনা দিয়ে যায়। দু'জনে একসঙ্গে কাঁদি আমরা। মনটা একটু হালকা হয়। বড়ো ভালো মেয়েটা।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, ওরা দু'বোনই খুব ভালো।”

তিনি বললেন, “সম্ভব হলে তুমিও কখনও এসো। আমার তো নিজের বলে আর কেউ রইল না। তোমরা বাচ্চারা এলে তবু একটু ভালো লাগবে। সত্যি বলছি, অভী, তুমি আজ নিজে থেকে এসে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে মনটা। আমার তরুণও যখন বাড়ি আসত, এইভাবে রাস্তা থেকে ডাকতে ডাকতে...”

বলতে বলতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি। অভী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

“আরে, অভী যে! এখানে কী করছ?”

পেছন থেকে ডাকটা আসতে অভী একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। রক্ষোবৈদ্য আসছেন এদিকেই; তাঁর হাতে একটা কাঠের বাক্স।

তিনি আসতে একটু স্বস্তি পেল সে। এই ক্রন্দনরতা মহিলাকে কী বলে সাহুনা দেবে, সে ভেবে পাচ্ছিল না।

রক্ষোবৈদ্যকে দেখে আঁচলে চোখ মুখে নিজেকে সামলে নিলেন তরুণের মা। রক্ষোবৈদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি— এই কান্নাকাটির কারণ জিজ্ঞাসার ধারেকাছেও গেলেন না।

অভী বলল, “আমি সমরোত্তমদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন?”

রক্ষোবৈদ্য হেসে বললেন, “প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে সুদক্ষিণসারি আর মানবমন্দিরে আসি এখন। বহু মানুষ এবং অর্ধরাক্ষস সংকোচের কারণে আর নিয়ামকের ভয়ে আয়তনে আসতেই চায় না। এদিকে রোগ হলে বেচারারা অনেক সময় সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা পায় না। তাই অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাধারণ রোগের আশু প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো এই বাক্সে নিয়ে টহল দিতে বেরোই; বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সবার খোঁজখবর নিই। অবশ্য রোগ জটিল হলে আর এই বাক্সের ওষুধে সারানো সম্ভব হয় না; তখন আয়তনে আমার সেবাকক্ষে নিয়ে যেতে বলি।”

অভী প্রশংসার সুরে বলল, “এটা সত্যিই খুব ভালো কাজের কথা ভেবেছেন। অর্ধরাক্ষসদের মধ্যে অনেকেই নানা কারণে চিকিৎসা করাতে চায় না, নিধি একবার বলেছিল আমাকে। ওদের খুব উপকার হবে।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নেড়ে তরুণের মা-কে বললেন, “সুদক্ষিণসারিতে গিয়েছিলাম; ওখানে নীপার কাছে শুনলাম, আপনার নাকি সবসময় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। তাই একবার দেখতে এলাম।”

তরুণের মা একটু হেসে বললেন, “ওই মেয়েটা আছে বলে এখনও বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলিনি। হ্যাঁ, সত্যিই মাথাটা সবসময় যেন ধরে রয়েছে এই ক'দিন। আসুন, ভেতরে আসুন, রক্ষোবৈদ্য। অভী, তুমিও এসো।”

চিকিৎসক এবং রোগীর কথোপকথনের মধ্যে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা অভীর ছিল না। সে বলল, “না, কাকিমা, আমি পরে একদিন আসব আবার। আজ চলি।”

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কিছুদূর যেতেই নিধির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নিধি বলল, “আরে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। চলো, চলো। সমরোত্তমরা লীনার বাড়ি চলে গেছেন এরই মধ্যে।”

তার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে অভী বলল, “যাচ্ছি বটে ওখানে, কিন্তু গিয়ে কাকিমাকে কী বলব, বুঝে উঠতে পারছি না।”

নিধি বলল, “কিছুই বলতে হবে না। কথা বলার জন্য দু’জন সমরোত্তম আছেন তো।”

অভীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, নিধি এই কয়েকদিন আগেই তাকে বলেছিল, লতাকাকিমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তার হঠাৎ গা-ছমছম করে উঠেছিল।

কথাটা মনে করিয়ে দিতে নিধি বলল, “হ্যাঁ, সেদিন ও-রকম একবার মনে হয়েছিল বটে। মনে হচ্ছিল, কে যেন আমাকে দেখছে, আমার কথা শুনছে, কিন্তু আমি তার উপস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না।”

একটু দূরে লতাকাকিমার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ওরা দেখল, তিনি বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন সমরোত্তমদের সঙ্গে। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও লতা গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে আছেন। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকল অভীর কাছে।

নিধি ফিসফিস করে বলল, “আগে সবসময় বলতেন, কিন্তু আজ কাকিমা সমরোত্তমদের একবারও ভেতরে যাওয়ার কথা বলেনইনি।”

এটা একটু রুঢ়তা বলেই অভীর মনে হল। সমরোত্তমরা কারও বাড়ি গেলে সবাই তাঁদের ভেতরে আসতে বলেন। এর আগে এই লতাকাকিমাই কতবার দুঃখ করতেন সমরোত্তম মেঘবর্ণ ঘরের ভেতর এসে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না বলে। আজ সেই মানুষটার হল কী?

নিধি বলল, “আমার মনে হচ্ছে, কাকিমা কিছু একটা লুকোচ্ছেন। মুখের ভাবটা কেমন যেন লাগছে না?”

অভী বলল, “আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। উনি সম্ভবত চান না কেউ ওঁর ঘরের মধ্যে ঢুকুক।”

দু’জনের চোখেই এক ইঙ্গিত খেলে গেল। নিধি বলল, “চলো, তাহলে এর একটা ব্যবস্থা করা যাক।”

ওরা এগিয়ে গেল লীনার বাড়ির দরজার সামনে। শ্যামশ্রী ও নীলাভ কথাবার্তা বলছেন লতার সঙ্গে। অভী আর নিধিকে দেখে তিনি একটু হাসলেন। “ভালো আছ তোমরা?”

“হ্যাঁ কাকিমা, ভালো আছি” বলে ওরা একসঙ্গে প্রণাম করতে ঝুঁকে পড়ল তাকে। আর সেই সুযোগে নিধির হাতে ধরা ত্রিশূলে নিজের হাত ইচ্ছা করে খুঁচিয়ে দিল অভী।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল তার বাম বাহু থেকে। একবার “উহ্” করে উঠল সে।

নিধি চৈঁচিয়ে উঠল, “আরে গাধা, কী করে ফেললে? আমার হাতে ত্রিশূলটা দেখতে পাওনি?”

সমরোত্তমরা অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়েই চমকে গেলেন। সত্যিই ত্রিশূলের আঘাতে অভীর হাতে বেশ গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। প্রচুর রক্ত পড়ছে।

শ্যামশ্রী বললেন, “তাড়াতাড়ি! ওকে রক্ষাবৈদ্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে।”

অভী ডানহাত দিয়ে বামহাতের ক্ষতটা চেপে ধরে আছে শক্ত করে। নিধি বলল, “ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। অভী, চট করে ভেতরে এসো। লীনা তার প্রাথমিক চিকিৎসার একটা বাক্স এখানে রাখত সবসময়, আমি দেখেছিলাম একবার। ওষুধে তুলো ভিজিয়ে আগে একটা বন্ধনী না দিলে রক্ত থামানো যাবে না।”

লতাকাকিমা বাধা দেওয়ার আগেই দু’জনে তাঁকে পাশ কাটিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

লীনা যে ঘরটায় থাকত, সেখানে এসে ওরা চট করে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। না, সন্দেহজনক কিছু তো চোখে পড়ছে না। কোনো অস্বাভাবিক বা অলৌকিক অস্তিত্ব যদি থেকেও থাকে, তার উপস্থিতি আপাতত অনুভব করা যাচ্ছে না। দেয়ালে লীনার বাবার ছবির পাশে লীনার একটা বাঁধানো ছবি ঝুলছে— দুটো ছবির গলাতেই মালা। ঘরের কোণে আলনার ওপর কিছু পোশাক রাখা আছে, তাদের মধ্যে কয়েকটা মেঘবর্ণের বলে চিনতে পারল অভী। আর বিছানার চাদরের ওপর এক জায়গায় অল্প একটু কালচে দাগ— হঠাৎ গরম কিছু স্পর্শে কাপড় পুড়ে গেলে যেমন হয়, কিছুটা সেইরকম।

বাইরে রক্ষাবৈদ্যের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত এদিক দিয়ে যেতে যেতে সমরোত্তমদের দেখে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

লতাকাকিমা ছুটতে-ছুটতে এসে ঢুকলেন ভেতরে। তাঁর হাবভাব এবার বেশ সন্দেহজনক মনে হল অভীর; যেন ওরা পাছে কিছু গোপন তথ্য আবিষ্কার করে বসে, সেই ভয়ে তিনি পড়িমরি করে ছুটে এসেছেন।

এসেই ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন তিনি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “লীনার বাক্সটা পাওনি তো? ওটা আমি অনেকদিন আগেই ফেলে দিয়েছি। তোমাদের সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তোমরা ভেতরে চলে এলে।”

অভী আর নিধি একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। অভীর হাত থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসে পড়ছে ঘরের মেঝেতে। সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “কাকিমা, আপনার ঘরটা নোংরা করে দিলাম।”

লতা বললেন, “না না অভী, সে কী কথা! নোংরা কেন হবে? আগে রক্তটা বন্ধ করা দরকার। তোমরা বাইরে এসো। রক্ষাবৈদ্য এসেছেন, উনি ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।”

আর কিছু করার নেই, অগত্যা দু’জনে গুটিগুটি পায়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। নীলাভ্র বলল, “রক্ষাবৈদ্য মহোদয়, আমার পুত্রের হাতটা একটু দেখুন। অসাবধানতাবশে ত্রিশূলের খোঁচায় বেশ কিছুটা কেটে গেছে।”

রক্ষাবৈদ্যের ওষুধের বাস্কেই তুলো, কাপড়ের বন্ধনী সবই ছিল; তিনি সময়ে অতীত হাতে রক্ত বন্ধ হওয়ার ওষুধ লাগিয়ে একটা মোটা বন্ধনী জড়িয়ে দিলেন। বললেন, “কাল বিকেলের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। ততক্ষণ এই হাতটা বেশি নাড়াচাড়া করবে না।”

ততক্ষণে লতাকাকিমাও এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন, “আহা, দেখো তো, ছটফট করতে গিয়ে কেমন কাণ্ড বাধিয়ে বসলে!”

অতী মুখ তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে সে স্থির হয়ে গেল।

ভেতর থেকে আসার সময় সম্ভবত ভুল করেই লতাকাকিমা তাঁর গায়ের মোটা চাদরটা খুলে চলে এসেছেন, আর তার ফলে তাঁর নিজের হাতটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে সবার সামনে। লতাকাকিমার ডান হাতে একটা মোটা কাপড়ের বন্ধনী জড়ানো আছে।

অতী বলল, “কাকিমা, আপনার হাতে কী হয়েছে?”

লতা চমকে উঠে খেয়াল করলেন, চাদরটা তিনি খুলে রেখে এসেছেন। রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, “ও... ও কিছু না, এমনি একটু...!”

নিধি বলল, “কিছু না বলে তো মনে হচ্ছে না। বন্ধনী তো বেশ মোটা দেখছি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কী হয়েছে লতা? কোথায় চোট পেলো?”

আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, “কাঠের উনুনে রান্না করতে গিয়ে সেদিন ছাঁকা লেগেছিল।”

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “ছাঁকা লেগেছিল বলে এইরকম বন্ধনী দিয়ে রেখেছেন? ক্ষতটায় কোনো ওষুধ লাগিয়েছিলেন? দেখি একবার।”

লতাকে দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন ফাঁদে পড়া ইঁদুর— কীভাবে এখান থেকে পালাবেন, বুঝতে পারছেন না।

তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, “না, ছাঁকা নয়, বুঝলে নিধি? আমারই মাথা খারাপ হয়েছে। ওখানে একটা কুকুর— তোমাদের ওই পর্বতের কুকুর কামড়ে দিয়েছিল আমাকে। সেটাই একটু ওষুধ দিয়ে বেঁধে রেখেছি।”

নিধি বলল, “পর্বতদার বক্রপুচ্ছ? সে তো অতি নিরীহ কুকুর! সে কামড়ে দিল আপনাকে?”

“হুঁ। দিলে আর কী করা যাবে? ও মাঝে-মাঝেই এদিকে আসে। তখন ওকে কিছুমিছু খেতে দিই। এ-রকম খেতে দেওয়ার সময়ই একদিন দিল কামড়ে। জন্তু তো, ওদের বিশ্বাস নেই।”

অতী মনে হচ্ছিল, লতাকাকিমা কিছু একটা লুকোনোর প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কান্না? না, তা তো নয়। উনি যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। কাকে এত ভয় তাঁর? কিছু একটা তিনি লুকোতে চাইছেন, এটা তো পরিষ্কার।

রক্ষাবৈদ্য তিরস্কারের সুরে বললেন, “কুকুরের কামড় এতদিন ধরে শুধু বেঁধে রেখেছ, লতা? ওষুধ লাগাওনি? বিষক্রিয়া হয়ে যাবে যে! আমি তো

দু'একদিন ছাড়াই আসি এখানে— একবার তো বলতে পারতে আমাকে। দেগি, আর দেরি কোরো না, খোলো বন্ধনীটা।”

নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রক্ষোবৈদ্য দ্রুতহাতে বন্ধনী খুলে দিতেই তাঁর ক্ষতচিহ্নটা দেখা গেল।

সত্যিই একসার দাঁতের দাগ পড়েছে হাতে। রক্ত জমাট বেঁধেছে সবে। কালচে খয়েরি রঙের হয়ে জমাট রক্ত একটা কুশ্রী দাগ করে দিয়েছে বাহুর ওপরে।

দগদগে হয়ে আছে জায়গাটা।

রক্ষোবৈদ্য ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “কুকুরের কামড়?”

“হুঁ।”

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন তিনি; তারপর বাক্স থেকে ওষুধ বার করে জায়গাটা তুলো দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দিলেন। লতাকাকিমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওষুধ লাগিয়ে বন্ধনী দিয়ে তিনি বললেন, “এখন ক’দিন আর কুকুরটার কাছে যেয়ো না। পর্বতকে বলে দিচ্ছি, ওটাকে নজরে রাখতে। সাবধানে থেকো; এই বন্ধনীতে জল লাগিয়ো না। আমি পরশু এসে আবার দেখে যাব।”

লতাকাকিমা কম্পিত হাতে তাঁকে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর ওঁরা সবাই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আয়তনে ফেরার পথ ধরলেন।

হেঁটে আয়তনের দিকে যেতে যেতে অভী বলল, “দানবটা সম্পর্কে আর নতুন কিছু জানা গেল, বাবা? কী উদ্দেশ্যে দানবটা আসছে এখানে?”

নীলাভ্র বলল, “না, আর কিছু জানা যায়নি। যে বাচ্চা মেয়েদুটো ওটাকে দেখেছে, তারা এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে আর কিছু তারা বলতেই পারছে না। দানবটার উদ্দেশ্য যা-ই হোক, আমরা এখন চিন্তিত সমরগরিমার সুরক্ষামায়া নিয়ে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সমরগরিমার চারপাশে যে মায়ার আবরণ আমি দিয়ে রেখেছি, তাকে স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠও ভাঙতে পারতেন না, তাই ছলচাতুরি করে গতবার ঢুকেছিলেন তিনি। ওই আবরণ ভেদ করে সমরগরিমার লোক ছাড়া কেউ এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না— বিশেষ করে কোনো ঐশিক তো নয়ই। তবে একবার শত্রুভাবাপন্ন কেউ ঢুকে পড়লে তার পক্ষে ওই আবরণ ভেতর থেকে সরিয়ে দেওয়া কঠিন কাজ নয়। আমার চিন্তা, ঐশিকদের দানবটা ভেতরে ঢুকছে কী করে? সে অত্যন্ত শক্তিশালী মায়াপ্রাণী, এটা তো নিশ্চিত। সুরক্ষা-আবরণের পক্ষে তাকে সহজেই চিহ্নিত করে আটকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সেটা হয়নি। তাহলে কি আমারই মায়াপ্রয়োগে কোথাও ভুল রয়ে গেল?”

নীলাভ্র বলল, “আমার তা মনে হয় না, শ্যামা। আমরা যদি বুঝতে ভুল করে না থাকি, তাহলে সমরগরিমায় এই রাক্ষসের আগমনের পেছনে সৌজন্য বা ঐশিকদের কূটবুদ্ধি আছেই। তোমার মায়াপ্রয়োগে ভুল আছে, এ হতেই পারে

না। কিন্তু ওরা সম্ভবত কোনো একটা উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে তোমার দেওয়া সুরক্ষামায়াকে পাশ কাটিয়ে এখানে ঢুকে পড়া যায়।”

শ্যামশ্রী চিন্তিতভাবে বললেন, “কিন্তু তাতে ফল তো একই। সমরগারিমার নিরাপত্তা কোথায় রইল তাহলে? রক্ষোবৈদ্য, আপনার কী মনে হয়?”

লতাকাকিমার বাড়ি থেকে ফেরার সময় এতটা পথ রক্ষোবৈদ্য একটি কথাও বলেননি। তিনি এবার বললেন, “দানবটার ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু জানি না, শ্যামশ্রী; সুরক্ষামায়া সম্বন্ধেও আমার অতটা জ্ঞান নেই। চিকিৎসাবিদ্যার বাইরে যুদ্ধবিদ্যাসংক্রান্ত মায়াগুলোতে আমি কোনোদিনই খুব একটা আগ্রহবোধ করিনি। আমাকে ভাবাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয়।”

নীলাভ্র বলল, “আপনি যে কিছু একটা নিয়ে খুব ভাবছেন, এইটুকু আপনার মৌনতা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপার কী বলুন তো।”

“লতার কথা ভাবছি আমি। কিন্তু ভেবেও কোনো সমাধান পাচ্ছি না।”

অভী আর নিধি দু’জনেই অবাক হয়ে তাকাল। শ্যামশ্রী বললেন, “লতার কিছু ব্যবহার আমাদের চোখেও আজ একটু অদ্ভুত লেগেছে। কিন্তু আপনি ঠিক কীসের কথা বলছেন, খুলে বলুন দয়া করে।”

রক্ষোবৈদ্য একটু ইতস্তত করে বললেন, “কীভাবে বলব ভেবে পাচ্ছি না। এরকম ঘটনা আমি আগে দেখিনি।”

“ঘটনাটা কী?” অধীরস্বরে জানতে চাইলেন শ্যামশ্রী।

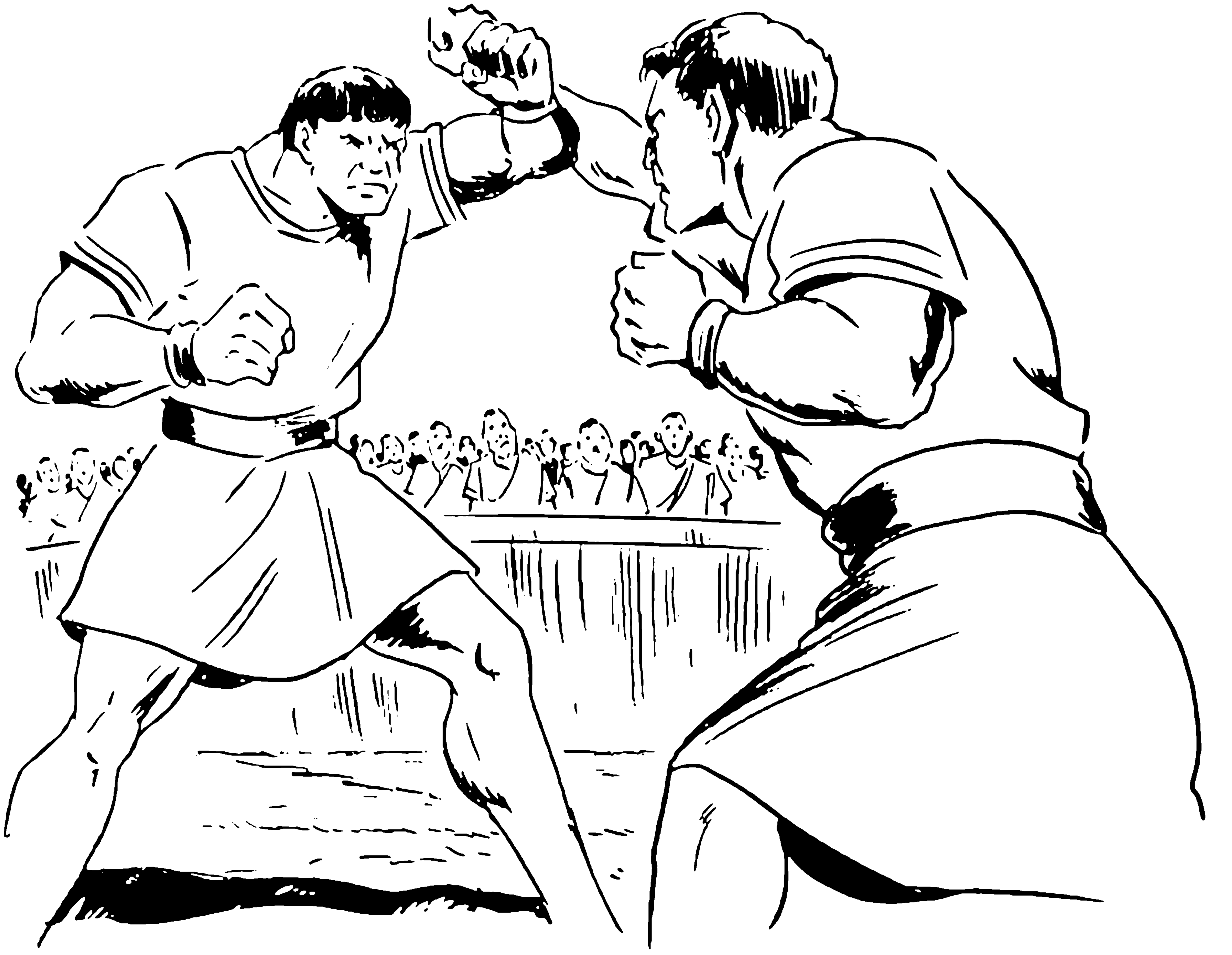
রক্ষোবৈদ্য আস্তে আস্তে বললেন, “ওর হাতের কামড়ের ওই দাগ কুকুরের নয়। হতে পারে না।”

“তাহলে?”

“কুকুর দাঁতের সারির গঠন, আকার সবই ভিন্নরকমের। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, ও দাগ কুকুরের কামড়ে হয়নি, শ্যামশ্রী। দাঁতগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড়ো-বড়ো, সন্দেহ নেই। কিন্তু গঠন দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দাঁতগুলো আসলে...”

“আসলে?”

“মানুষের।”



।। সপ্তম অধ্যায় ।।

ভ্রমমায়া

পরের দিন সকালে আয়তনের গ্রন্থাগারে স্বর্ণশেখরের সঙ্গে বসে বই পড়ছিল অভী। রক্ষোবৈদ্য একটু দূরে একটা খাতায় চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু তথ্য লিখে রাখছেন। স্বর্ণশেখরের বাঁশের লাঠি ‘ফুলঝুরি’ রাখা আছে তার পাশেই।

বই নিয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু অভী কিছুতেই তাতে মন বসাতে পারছিল না। স্বর্ণশেখর সেটা লক্ষ করে বলল, “কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি রে, অভী?”

বইটা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রেখে অভী বলল, “রবিকাকা, কালকের ঘটনাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না। অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। সুরক্ষামায়া এড়িয়ে ওই বিশাল দানব এখানে আসছে কী করে? লতাকা কিমা কাকে এত ভয় পাচ্ছেন? ওঁর হাতে ওই মানুষের কামড়ের চিহ্ন কোথা থেকে এল? কেনই বা তিনি সে-কথা লুকোতে চাইছেন? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এই ঘটনাগুলো কি একটার সঙ্গে আর একটা কোনোভাবে যুক্ত?”

স্বর্ণশেখর বলল, “দেখ, আমার মনে হয়, লতাসংক্রান্ত খবরগুলো জানতে পারত একমাত্র মেঘবর্ণ, কিন্তু লীনার ঘটনাটা হওয়ার পর লতার সঙ্গে ওর একটা

দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ও নিজেকে আয়তনের কাজে ডুবিয়ে রাখতে চাইছে বটে, কিন্তু ওর মন ভালো নেই, আমি জানি। তোর বাবাও আমাকে বলছিলেন, মেঘবর্ণ তাকে বলেছে, লীনা চলে যাওয়ার পর থেকে লতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার এখন নিজেকে অপরাধী বোধ হয়।”

অভীর মনে পড়ে গেল গতকাল কেমন শুকনো মুখে মেঘবর্ণ তাদের সঙ্গে মানবমন্দির যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে বলল, “কিন্তু সে এখন আছে কোথায়?”

স্বর্ণশেখর বলল, “এখন কোথায় আছে, জানি না। কাল রাতে একবার দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। তখনই শুনলাম, আমাদের নিয়ামক নাকি রক্ষীপ্রধান চক্রবাককে সুদক্ষিণসারি পাঠাচ্ছেন মাঝেমধ্যেই; ওখানে সে সুচিত্র নামে এক দোকানির সঙ্গে বেশ ভালোই আলাপ জমিয়েছে। চক্রবাক নিয়ামকের আদেশ ছাড়া যে কিছু করে না, এ তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক, বুঝলি?”

অভী মাথা নাড়ল। নিয়ামক এমনিতে অর্ধরাক্ষসদের আদৌ পছন্দ করেন না। এর আগে তিনি ওদের নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছেন। এখন হঠাৎ তাঁর খাস লোককে সুচিত্রের কাছে পাঠিয়ে তিনি যে ঠিক কী করতে চাইছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

স্বর্ণশেখর আবার বলল, “মেঘবর্ণ ও-দিকের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। এদিকে আমি দিনকয়েক আগে আমাদের বাড়িটায় গিয়েছিলাম, তুই জানিস?”

অভী অবাক হয়ে গেল। মানুষদের জগতে তাদের যে বাড়িতে সে বড়ো হয়ে উঠেছে, সেই বাড়িতে রবিকাকা গিয়েছিল? সে বলল, “আমাকে বলতে পারতে তো। আমিও যেতাম তাহলে। কতদিন যাইনি ওখানে!”

স্বর্ণশেখর বলল, “তুই তখন অন্য কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলি, তাই আর তোকে ডাকা হয়নি। আমি মারীচের দোকানেও গিয়েছিলাম। সেখানে অদ্ভুত একটি খবর পেলাম।”

“কী খবর?”

“ওর দোকানে রাক্ষসরা মাঝেমধ্যেই যাতায়াত করে, তুই তো জানিস। মারীচের কানে তাদের নানারকম আলোচনা আসে। ও শুনেছে, এক বিমোহক রাক্ষস বলছে, খুব শীঘ্রই মাল্যপর্বতের সিংহাসনে বিমোহক বংশ স্থাপন করা হবে। তারপর সমরগরিমাকে ওরা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।”

অভী চুপ করে রইল। বিমোহক রাক্ষসরা পত্রতিলকদের মতো ঠান্ডামাথার তো নয়ই, বরং ভয়ানক যুদ্ধবাজ। তারা যদি রাজা পুনর্বসুকে সরিয়ে মাল্যপর্বতের ক্ষমতা দখল করে, তাহলে সেটা সমরগরিমার জন্য সুখবর নয়।

সে বলল, “কিন্তু সিংহাসনে বসার মতো বিমোহক রাজবংশের আছে কে?”

প্রশ্নটা করেই উত্তরটা তার মাথায় চলে এল। স্বর্ণশেখর তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে নিজেই বলে উঠল, “সৌজন্য!”

“একদম ঠিক ধরেছিস। আর এইসবের পেছনে ওকে মদত দিচ্ছে মরুময়। মরুময়কে ভুলে যাস না; সে চট করে সামনে আসে না বটে, কিন্তু লোকটার অসীম ক্ষমতা। এতটাই তার প্রভাব যে, রাজা পুনর্বসু তার অতীতের সব কার্যকলাপ জেনে ফেলা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিশেষ কোনো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলেন না। পুরো মাল্যপর্বতের মেঘ ওর হাতে। ওকে চটালে সারা দেশে ভয়াবহ জলসংকট দেখা দেবে, রাজা খুব ভালো করেই জানেন। আর মরুময়ও জানে, রাজা প্রকাশ্যে ওর কিছুটা করতে পারবেন না।”

অভী কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় উষসী আর দেবদত্ত ছুটতে ছুটতে গ্রন্থাগারে এসে ঢুকল। “সমরোত্তম স্বর্ণশেখর, এখনই একবার অনুশীলন মঞ্চে চলুন। অভী, তুমিও চলো।”

স্বর্ণশেখর অবাক হয়ে বলল, “ব্যাপার কী? তোমরা এত হাঁফাচ্ছ কেন?”

উষসী বলল, “রাক্ষসদের সেনাবাহিনী এসেছে। তাদের নেতৃত্বে আছে আলোকপর্ণ। সমরোত্তম মেঘবর্ণ আর সমরোত্তম নীলাভ্র আছেন ওখানে; ওঁরা আপনাকে ডাকতে বললেন।”

ভয়ানক চমকে উঠে স্বর্ণশেখর ফুলঝুরি তুলে নিয়ে ছুটল ওদের সঙ্গে; যাওয়ার আগে বলে গেল, “অভী, ওরা কী মতলবে এসেছে, বুঝতে পারছি না। আমরা তো কাউকে ডাকিনি, তবু আলোকপর্ণ বাহিনী নিয়ে এসেছে মানে ওদের উদ্দেশ্য ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম। অধিনায়ক বজ্রধর আর শ্যামশ্রী এখন আয়তনে নেই; ওঁরা গেছেন পীতপত্রবনের গাছগুলোর সমীক্ষা করতে। আমি এগোচ্ছি, তুই সংগ্রহশালা থেকে চন্দ্রহাসকে নিয়ে এখুনি আয়। উষসী, দেবদত্ত, তোমরা গিয়ে পর্বতকে খবর দাও, তাকেও আসতে বলো।”

তার অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল স্বর্ণশেখর। রক্ষোবৈদ্যের কাছে বিদায় নিয়ে অভী চলল সংগ্রহশালার দিকে। সেখান থেকে চন্দ্রহাসকে তুলে নিয়ে সে দ্রুতগতিতে চলল অনুশীলন মঞ্চের মাঠে।

উত্তেজনায় ফুটছে অভী। আলোকপর্ণ বিনা আমন্ত্রণে এসেছে কেন? তা-ও রাক্ষস সেনাবাহিনী নিয়ে? রাজকীয় কোনো দরকার থাকলে তো রাজা প্রজ্ঞাকে পাঠাতেন। আলোকপর্ণকে যে রাজা কূটনৈতিক ব্যাপারে খুব একটা ভরসা করেন, তা তো কখনও মনে হয়নি।

যেতে-যেতে পথেই পর্বতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। তার হাতে চন্দ্রহাস দেখে পর্বত খুশি হয়ে বলল, “এই তো, তৈরি হয়ে যাচ্ছ দেখছি। বেশ, বেশ, খুব ভালো। আমার ভ্রাতারত্নটি সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসেছেন মানে বেশ একটা গা-গরম করা যুদ্ধের আশা আমরা করতেই পারি, কী বলো?”

অভী হেসে ফেলল। “কী মতলবে সে এসেছে, সেটা তো এখনও জানি না, পর্বতদা। চলো, গিয়ে দেখা যাক।”

অনুশীলন মঞ্চের বিরাট মাঠে জমায়েত হয়েছে মাল্যপর্বতের রাক্ষস-সেনারা। সংখ্যায় খুব বেশি নয় তারা— জনা পঞ্চাশেক হবে। একটু দূর থেকে তাদের মুখগুলো

দেখতে দেখতে পর্বত মন্তব্য করল, “আশ্চর্য ব্যাপার! এদের মধ্যে প্রায় সবকটাই জাতিতে বিমোহক। আলোকপর্ণ কি তাহলে বেছে-বেছে নিয়ে এসেছে এদের?”

অভী ভিড়টা কাটিয়ে এগিয়ে গেল। সমরোত্তম নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের ওপর। রবিকাকা গিয়ে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। অভী খেয়াল করে দেখল, আগত রাক্ষসরা সবাই নিরস্ত্র— অন্তত তরবারি, গদা বা তির-ধনুকের মতো বৃহৎ আকারের অস্ত্র কারও সঙ্গেই নেই। তার মনে একটু আশা হল, হয়তো শান্তিপূর্ণ কোনো আলোচনার জন্যই এসেছে ওরা।

আলোকপর্ণ মঞ্চের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পর্বত তার পেছনে গিয়ে হুংকার দিল, “আরে, কী ব্যাপার, ছোটোভাই? গতবার সমরগরিমার কাছে মার খেয়ে আশ মেটেনি, তাই আবার যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে এসেছ নাকি?”

আলোকপর্ণ মুখে একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

আবার ব্যঙ্গ করল পর্বত। “আরে, শুনলাম প্রলয়যোদ্ধার পেছনে লাগতে গিয়েছিলে দিনকয়েক আগে? তোমার অস্ত্র নাকি জমিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছে আমাদের অভী?”

আলোকপর্ণ আবার একটা বিষাক্ত দৃষ্টি হানল পর্বতের দিকে, কিন্তু মুখে কিছুটা বলল না।

একটু হতাশ হয়ে পর্বত অভীকে বলল, “হলটা কী বলো তো ছোটোভাইয়ের? বেশ অন্যরকম লাগছে না? কোনো কথার উত্তর দিচ্ছে না কেন?”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এসে বলল, “আলোকপর্ণ, আমাদের অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়ক— দু’জনেই জরুরি কাজে বাইরে গেছেন; কখন ফিরবেন, ঠিক নেই। তোমার যা বলার, আমাদের বলতে পারো। আমি, সমরোত্তম নীলাভ্র এবং সমরোত্তম স্বর্ণশেখর আপাতত আয়তনের দায়িত্বে আছি।”

আলোকপর্ণ বলল, “রাজার আদেশে আমি খড় নিয়ে এসেছি।”

খড়! অভী অবাক হয়ে তাকাল পর্বতের দিকে। সে নীচুগলায় বুঝিয়ে দিল, “এটা আমাদের দেশের পুরোনো প্রথা। কোনো একটা যুদ্ধের পর একপক্ষ যদি মনে করে তার অন্যপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করা উচিত, তখন তারা অপরপক্ষের কাছে এক আঁটি খড় নিয়ে যায়। খড় দিয়ে যেহেতু মৃত রাক্ষসদের মুখাঙ্গি করা হয়, তাই খড়ের আঁটি রাক্ষসদের কাছে মৃতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের প্রতীক। তোমাদের সমরোত্তমরা সবাই রাক্ষসদের এই নিয়ম জানেন।”

একজন রাক্ষস সৈন্য বিরাট একটি তামার থালার ওপর নিয়ে এসেছে এক আঁটি হলদে রঙের খড়। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে নিধি এসে দাঁড়াল অভীর পাশে; চাপাগলায় বলল, “এত ভালো কাজে এই বদমাশটা কেন এল? রাক্ষসদের রাজা যদি দুঃখপ্রকাশ করতেই চান, তাহলে তাঁর সেনানায়িকা বা মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনো পদস্থ রাক্ষসকে পাঠানোই কি যুক্তিযুক্ত হত না?”

অভীও চাপাগলায় বলল, “তা ছাড়া, আমরা তো সদ্য ওখান থেকে ফিরেছি। সত্যি বলতে কী, গত কয়েকদিনে একাধিকবার মাল্যপর্বতে আমাদের এখান থেকে কেউ না কেউ গেছে— স্বয়ং অধিনায়কই গেছেন দু’বার। রাজা পুনর্বসু তো এই খড় পাঠিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্পর্কে এতদিনে একবারও তাঁর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। আজ হঠাৎ এরা হাজির হল কেন?”

আলোকপর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভালো হত।”

স্বর্ণশেখর বলল, “ভালো হত, বুঝতে পারছি। কিন্তু অধিনায়ক কখন ফিরবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনারা চাইলে অপেক্ষা করতে পারেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, তাহলে আমাদের অতিথিশালায় আপনাদের আতিথ্যগ্রহণের ব্যবস্থা করব।”

আলোকপর্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “না, আমরা বেশিক্ষণ দেরি করতে পারব না। রাজার আদেশ, খড়প্রদান অনুষ্ঠান দ্রুত সম্পন্ন করে রক্ষোপুরীতে ফিরে যেতে হবে।”

মঞ্চের ওপর তিনজন সমরোত্তম পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর নীলাভ বলল, “তা-ই হোক। আপনারা সমরোত্তম মেঘবর্ণকে খড়গুলি হস্তান্তর করতে পারেন।”

আলোকপর্ণের মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। “আসলে আমরা পাঁচজন সমরোত্তমকেই এই সম্মান প্রদান করতে চাইছিলাম। কিন্তু আপাতত আপনারা তিনজন আছেন যখন, তখন আমার অনুরোধ, আপনারা তিনজনই এই খড় গ্রহণ করুন।”

মেঘবর্ণ বাকিদের সম্মতিসূচক মাথানাড়া দেখে নিয়ে বলল, “অতি উত্তম। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দয়া করে মঞ্চ উঠে আসুন।”

যে রাক্ষসসেনা বিরাট থালায় খড়ের গোছা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে আলোকপর্ণ বলল, “কই হে, তুমি আবার ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছ কেন? এদিকে এসো জলদি।”

নিধি তীক্ষ্ণচোখে পুরো কাণ্ডটা লক্ষ্য করছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, “অভী, আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।”

“কী ব্যাপার?”

“খড় প্রদানের অছিলায় ওরা সমরোত্তমদের আলাদা করে দিয়েছে বাকিদের থেকে। এই পঞ্চাশজন রাক্ষসের বাহিনী পুরো ঘিরে নিয়েছে ওঁদের।”

অভী বলল, “আরে, এতে ভয়ের কী আছে? রাক্ষসদের কারও হাতেই তো অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই। কী আর করবে ওরা?”

পর্বত পাশ থেকে বলল, “না, না, ব্যাপারটা আমারও ভালো লাগছে না। ওই হতচ্ছাড়া আলোকপর্ণটাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না।”

নিধি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে খড়ের থালাধারী রাক্ষসটার দিকে। সে বলে উঠল, “আরে, ভালো করে দেখো, ওই রাক্ষসটা থালায় করে নিয়ে এসেছে

খড়গলো, কিন্তু নিজে ও একবারও আঁটিটাকে স্পর্শ করছে না; খুব সাবধানে থালার তলায় হাত দিয়ে ধরে রাখছে, পাছে ছুঁয়ে ফেলে।”

আলোকপর্ণ ততক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছে খড়ের আঁটিটা তুলে নিতে। শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে নীলাভ্র, মেঘবর্ণ, স্বর্ণশেখর। মঞ্চের ওপর ফুলঝুরি রাখা আছে বেশ কিছুটা দূরে। অভী সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে ফেলল, নিধি কী বলতে চাইছে।

এ অসম্ভব! আলোকপর্ণের এতখানি দুঃসাহস হবে না।

কিন্তু নিধি থামবার পাত্রী নয়। হাতের ত্রিশূল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, “সরে যাও সবাই! সরে যাও বলছি!”

তার চোঁচানোয় কাজ হল। মঞ্চের ওপর আলোকপর্ণ থমকে গেল, সমরোত্তমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন, আর সে লাফ দিয়ে পড়ল রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে; চিৎকার করে উঠল, “অভী! চন্দ্রহাস!”

আর ভাবনাচিন্তা করার সময় নেই, কোমর থেকে চন্দ্রহাসকে মুক্ত করে ছুটে এল অভী। শিবের বক্ষিম তরবারির ফলা জ্বলে উঠল তীব্র সাদা আলোয়; সে আলোর সামনে সকালের ঔজ্জ্বল্যও যেন ম্লান হয়ে গেল।

ওরা দু’জন ছুটে আসছে মঞ্চের দিকে। আলোকপর্ণ বিপদ বুঝে চোঁচিয়ে উঠল, “আটকাও, সেনারা! ওদের আটকাও!”

রাক্ষস-বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলার উপক্রম করল বটে, কিন্তু নিধি তার দীর্ঘ ত্রিশূল উদ্যত করে ভিড়ের মধ্যেই একপাক ঘুরে গেল। রাক্ষসরা কাছে আসতে গিয়েও পিছিয়ে গেল।

অভী গর্জন করে উঠল, “কেউ যদি এগিয়ে আসার চেষ্টা করো, সঙ্গে-সঙ্গে চন্দ্রহাস দিয়ে তাকে দশ টুকরো করে ফেলব।”

রাক্ষসরা যুদ্ধবাজ বটে, কিন্তু এখনও তারা নিরস্ত্র, এবং চন্দ্রহাসকে সামনে থেকে দেখে একটু হলেও তারা ভয় পেয়েছে। অভী আর নিধিকে পথ ছেড়ে দিল রাক্ষসদল; ওরা দু’জন উঠে এল অনুশীলন মঞ্চে।

সমরগরিমার বাকি শিক্ষার্থীরা ততক্ষণে অস্ত্র নিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে পঞ্চাশজন রাক্ষসকে। তাদের আর পালানোর উপায় নেই। মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো আলোকপর্ণের বুকের দিকে ত্রিশূল উঁচিয়ে দাঁড়াল নিধি, আর থালায় খড় ধরে রাখা রাক্ষসটার দিকে চন্দ্রহাস তুলে ধরল অভী।

নীলাভ্র হাত তুলে বলল, “অভী, নিধি, একটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে, বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা কী?”

অভী নিধির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমিই বলো।”

নিধি আলোকপর্ণের দিক থেকে অস্ত্র না সরিয়েই বলল, “সমরোত্তম নীলাভ্র, আমার ঘোরতর সন্দেহ, ওই খড়গলো আসলে খড় নয়।”

সঙ্গে-সঙ্গে সমরোত্তমরা বুঝে ফেললেন নিধি কী বলতে চাইছে। মেঘবর্ণ এগিয়ে এসে বলল, “তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক।”

আলোকপর্ণ বিস্মারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে।

থালায় রাখা খড়্গলোকে মেঘবর্ণ স্পর্শ করা মাত্রই সেগুলোর আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। পঞ্চাশটি তরবারি আত্মপ্রকাশ করল তামার বিরাট পাত্রটির ওপর।

নীলাভ সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে আদেশ দিল, “শিক্ষার্থীরা, বন্দি করো এদের।”

রাক্ষসরা অল্প একটু যুদ্ধ করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সমরগরিমার শিক্ষার্থীরা সকলেই সশস্ত্র। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাক্ষস-সেনারা বুঝে ফেলল, এই অসম লড়াইতে জেতার কোনো আশা নেই। অস্ত্রগুলো হাতে পেলে তারা মরণপণ লড়াই করত, কিন্তু সেগুলো যার কাছে আছে, তাকে চন্দ্রহাস নিয়ে পাহারা দিচ্ছে অভী; তাকে পেরিয়ে তরবারিগুলোর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। অগত্যা আত্মসমর্পণ করল তারা।

আলোকপর্ণ-সহ তাদের প্রত্যেককে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল শিক্ষার্থীরা। অবরুদ্ধ রাগে ফুলতে লাগল বন্দি আলোকপর্ণ।

মেঘবর্ণ বলল, “ধন্য সমরোত্তম শ্যামশ্রীর শিক্ষা! নিধি, তুমি ভ্রমমায়া বিদ্যা অসামান্য শিখেছ। রাক্ষসদের তৈরি মায়াবিভ্রম ধরে ফেলা কিন্তু মুখের কথা নয়।”

নিধি একটু হাসল। “সমরোত্তম শ্যামশ্রী সত্যই অসামান্য শেখান।”

নীলাভ বলল, “মেঘ, রবি, এবার এই মর্কটগুলোকে নিয়ে কী করা উচিত, বলো।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আপাতত এইরকমই থাকুক। অধিনায়ক এলে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই হবে। কী বলো, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ মাথা নেড়ে বলল, “সে-ই ভালো। ততক্ষণ এরা আমাদের সমরগরিমার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করুক দড়িবাঁধা অবস্থায়।”

অভী বলল, “কী কারণে এরা এই অতর্কিত আক্রমণ করতে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করবে না? রাক্ষসদের সঙ্গে তো আমাদের অনাক্রমণ চুক্তি হয়ে আছে শুনেছি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “চুক্তি যা-ই থাক, উদ্দেশ্য তো এদের পরিষ্কার হয়ে গেছে। সবার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ খুব কাছে এসে সমরোত্তমদের হত্যা করাই এদের লক্ষ্য ছিল। নিধি ভ্রমমায়াটা ধরে না ফেললে কী হত, বলা যায় না।”

পর্বত ততক্ষণে উঠে এসেছিল অনুশীলন মঞ্চে। সে বলল, “এখন থাক খোলা মাঠে পড়ে। রোদে সঁকা হোক অধিনায়ক আসা পর্যন্ত। তারপর তিনি এলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু কোরো বরং।”

রাক্ষস-বাহিনীকে বেঁধে ফেলে রাখা হল সমরগরিমার মাঠে। শিক্ষার্থীরা অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতে লাগল, যাতে একজনও পালাতে না পারে।

সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে নিয়ে অধিনায়ক বজ্রধর ফিরলেন দ্বিপ্রহরের একটু আগে। সমরগরিমার মাঠে পা দিয়ে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেই তিনি চমকে উঠলেন।

পীতপত্রবনের যাওয়ার পথ যেখানে শুরু হচ্ছে, সেখানে নীলাভ অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য। অনুশীলন মঞ্চ পর্যন্ত হেঁটে আসতে আসতে সে পুরো ঘটনাটা শুনিয়ে দিল তাঁদের।

শুনতে শুনতে বজ্রধরের মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। ভ্রমমায়া প্রয়োগ করে আলোকপর্ণ রাক্ষসসেনা নিয়ে সমরগরিমায় হত্যাকাণ্ড চালাতে এসেছিল, এ-বৃত্তান্ত শুনে তিনি গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা বন্দি আলোকপর্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। অভী দেখল, অধিনায়কের নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। এতখানি রাগতে তাঁকে সে কখনও দেখেনি।

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “আলোকপর্ণ।”

আলোকপর্ণ মুখ তুলে তাকাল। এতক্ষণ রোদে থেকে তার মুখ ঘোমে উঠেছে।

বজ্রধর বললেন, “মৃগেন্দ্র, ওর বাঁধন খুলে দাও।”

মৃগেন্দ্র একটু কিস্ত-কিস্ত করছিল; তা দেখে বজ্রধর আবার বললেন, “ও নিরস্ত্র। ওর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই আমি। যত বড়ো অন্যায়ই করে থাকুক ও, আমি ওর সম্মানহানি করতে চাই না। ওর বাঁধন খুলে দাও; ওকে অনুশীলন মঞ্চে বসতে জায়গা দাও।”

তাঁর কথামতো আলোকপর্ণের বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে বসানো হল মঞ্চে। বজ্রধর বললেন, “এবার বলো আলোকপর্ণ, আজকের এই আক্রমণ কি রাজা পুনর্বসুর আদেশে?”

আলোকপর্ণ ঘৃণাভরে বলল, “আমাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দেবেন জানি। তাই মরার আগে আমার দেশের খবর আপনাদের দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না। আপনাদের যা খুশি তা-ই করতে পারেন।”

বজ্রধর বললেন, “তোমাকে মৃত্যুদণ্ড আমরা দেব না। সম্মুখসমরে না পেরে অতর্কিতে চোরাগোষ্ঠা আক্রমণ যারা করে, সম্মানের মৃত্যু তাদের প্রাপ্য নয়।”

“কী করবেন আপনি?”

“বলছি। তার আগে তোমার কাছে শুনতে চাই, আজকের এই অভিযান কেন হল? রাজার আদেশে?”

আলোকপর্ণ চুপ করে রইল। বজ্রধর আবার বললেন, “প্রজ্ঞার আদেশে?”

এবার মাথা নাড়ল সে। “না, সেনানায়িকা কিছু জানেন না।”

বজ্রধর বললেন, “তার মানে, রাজাও কিছু জানেন না। ঠিক বলছি?”

আলোকপর্ণ আবার চুপ, কিন্তু এই মৌনতা সম্মতির লক্ষণ বলে বুঝতে অসুবিধা হল না। পর্বত বলে উঠল, “রাজার না জানাই সম্ভব। খেয়াল করে দেখুন, অধিনায়ক, এদের প্রায় সবগুলোই বিমোহক রাক্ষস; পত্রতিলক কেউ নেই। রাজা নিজে সেনা পাঠালে এমনটা হত না। ভুল বলছি, ছোটোভাই? এরা সব তোমার বাছাই করা অনুগত সেনা, তা-ই না?”

পর্বত যে একেবারে ঠিক বলছে, অভী-সহ সকলেই তা বুঝতে পারছিল।

শ্যামশ্রী রাগে ফুলছিলেন; তিনি বললেন, “আমরা আগে থেকে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাইনি কিন্তু, আলোকপর্ণ। এর পূর্বে নানা বিষয়ে আমরা রাক্ষসদের প্রতি সহনশীলতাই দেখিয়েছি। কিন্তু আমাদের ভদ্রতাকে যদি আমাদের দুর্বলতা ভেবে থাকো, তাহলে ভুল করবে।”

আলোকপর্ণ নির্বাক। মেঘবর্ণ এগিয়ে এল সামনে; আলোকপর্ণের নত মুখের চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরল সে; বলল, “সত্যি কথা বলো,

আলোকপর্ণ। তুমি সেনা নিয়ে এলে সমরগরিমায় গুপ্তহত্যা চালাতে, আর তোমাদের সেনানায়িকা সে-কথা জানেন না, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?"

এইবার আলোকপর্ণকে একটু বিব্রত মনে হল। "সত্যি বলছি, প্রজ্ঞা এ-সবের কিছুই জানেন না; জানলে উনি কিছুতেই এর অনুমতি দিতেন না। রাজা পুনর্বসু যে গোপনে আমাদের পুরোনো শত্রু সমরগরিমার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে বসে আছেন, তাতে বিমোহকদের অনেকেই খুশি নয়। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?"

"তা ছাড়া, গতবার সমরগরিমা আক্রমণ করে পরাজয়ের অপমান প্রজ্ঞা ভুললেও আমি ভুলতে পারিনি। আমাদের নেতৃত্বেই গতবার বাহিনী এসেছিল, তাই পরাজয়ের দায় আমাদেরই। সেই কারণেই রক্ষোপুরীতে কাউকে না জানিয়ে আজকের এই অভিযান করতে আমি এসেছিলাম বাহিনীতে আমার বিশ্বস্ত সেনাদের নিয়ে। সমরোত্তমদের তো বটেই, তার সঙ্গে এই জনপদের যতজনকে পারতাম, শেষ করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমরা এসেছিলাম আজ। আমি জানতাম, আজকের এই আক্রমণ থেকে আমাদের বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি সমরোত্তমদের কয়েকজনকেও হত্যা করতে পারতাম, তাহলে সমরগরিমাকে এমনভাবে পঙ্গু করে দিয়ে যেতাম যে আপনারা সহজে আর উঠে দাঁড়াতে পারতেন না।"

মেঘবর্ণ বাঁকা হাসি হেসে বলল, "বাহ্, সাধু উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের! কিন্তু বাপু আলোকপর্ণ, একটা কথা বলো দেখি। রক্ষোপুরীতে কাউকে না জানালেও সৌজন্যের সঙ্গে এই নিয়ে তোমার কথা হয়েছিল, তা-ই না?"

আলোকপর্ণ চমকে উঠল। "আপনি কী করে জানলেন?"

উত্তর না দিয়ে মেঘবর্ণ ফিরল অধিনায়কের দিকে। "এবার আপনি বিচার করুন, অধিনায়ক।"

বজ্রধর একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেঘবর্ণকে দেখে নিয়ে আলোকপর্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। "বাহিনীর কৃতকর্মের দায় অধিনায়ককে নিতে হয়— আশা করি সেনাবাহিনীর এই নিয়ম তুমি জানো, আলোকপর্ণ। নিয়তির ইচ্ছায় তোমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য তোমাদের অসৎ উদ্দেশ্য তো মিথ্যা হয়ে যায় না। এর প্রতিফল তোমাকে পেতে হবে।"

আলোকপর্ণ কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। বজ্রধর বাকি সমরোত্তমদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি বিশ্বাস করি, রাজা পুনর্বসু বা প্রজ্ঞা এদের মানসিকতা এবং পরিকল্পনা জানতেন না; পুরো কাণ্ডটাই আলোকপর্ণের নেতৃত্বে ঘটেছে। এখন প্রশ্ন, এদের আমরা যুদ্ধবন্দি হিসাবে বিচার করব, না কি রাজার কাছে ফেরত পাঠাব?"

শ্যামশ্রী বললেন, "বাকিদের ব্যাপারে আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাতেই আমার সম্মতি আছে। কিন্তু আলোকপর্ণের বিচার এখানেই হোক, এই আমার মত।"

অন্য সমরোত্তমরাও শ্যামশ্রীকে সমর্থন করলেন। বজ্রধর বললেন, “বেশ, তা-ই হবে। আলোকপর্ণ, তুমি শঠতা করে আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে তবু একটা সুযোগ দিতে চাই। মুখোমুখি লড়াই করতে আপত্তি আছে তোমার?”

“লড়াই? তাতে আমার জীবনে কোনোদিন আপত্তি হয়নি,” উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল আলোকপর্ণ।

“অতি উত্তম। এই লড়াইতে তুমি জিতলে বা সম্মানের সঙ্গে পরাজয় বরণ করলে তোমার অধীনস্থ সেনাদলকে আমরা কোনো শাস্তি না দিয়েই মাল্যপর্বতে ফেরত পাঠাব। সেখানে রাজা পুনর্বসু তোমাদের যা-ই বিচার করুন, আমরা তাতে কোনো কথা বলব না। তুমি এই শর্তে সম্মত?”

“সম্মত।”

“পর্বত।”

পর্বত চুপ করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সমরোত্তমদের পেছনে। অধিনায়কের ডাক শুনে সে এগিয়ে এল। বজ্রধর বললেন, “তুমি রাজি ওর সঙ্গে লড়াই করতে?”

পর্বত ঘৃণাভরে একবার তাকাল তার ভাইয়ের মুখের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “অবশ্যই রাজি, অধিনায়ক। অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কয়েকটা পুরোনো ব্যাপারে আমারও হিসাব মেটানোর আছে ওর সঙ্গে।”

বজ্রধরের আদেশে আলোকপর্ণের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। দর্শকাসনে গিয়ে বসলেন সমরোত্তমবৃন্দ-সহ অনেক শিক্ষার্থী। অভী আর নিধিও গিয়ে বসল আসনে। ততক্ষণে সমরগরিমার সেনাদল এসে গেছে। চক্রবাককে ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন বজ্রধর। চক্রবাক তার বাহিনী নিয়ে বন্দি রাক্ষসদের পাহারা দিতে লাগল।

বজ্রধর বললেন, “ন্যায়যুদ্ধের নিয়মমতো আমি তোমাকেই বলতাম পছন্দের অস্ত্র বেছে নিতে, আলোকপর্ণ। কিন্তু তুমি তো ন্যায়যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসোনি। তাই অস্ত্র নির্বাচন করার দায়িত্ব আমি পর্বতকে দিচ্ছি। তার বেছে নেওয়া অস্ত্র নিয়েই লড়তে হবে দু’পক্ষকে।”

পর্বত হাসল। “অস্ত্র চাই না, অধিনায়ক। খালি হাতে লড়তে চাই আমি।”

সমরগরিমার দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। নিধি অভীকে বলল, “পর্বতদাকে খালি হাতে লড়াই করতে দেখেছ কখনও? ওর মতো নিযুক্তবিশারদ গোটা মায়াজগতে খুব বেশি নেই।”

বজ্রধর বললেন, “তা-ই হোক। দু’জনে মঞ্চে মুখোমুখি এসে দাঁড়াও।”

পর্বত আর আলোকপর্ণ মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল; দু’জনের মধ্যে ব্যবধান আড়াই হাতের।

আলোকপর্ণকে দেখে মনে হচ্ছে না সে একটুও ভয় পেয়েছে। সে বলল, “লড়াই আমরা তো?”

বজ্রধর বললেন, “না, আমরণ লড়াইয়ের বর্বরতা এই মঞ্চে কখনও হয়নি, হবেও না। অবশ্য সব রকমের শারীরিক আঘাত করতে বাধা থাকছে না।”

পর্বতের মুখ পাথরের মতো কঠিন। আলোকপর্ণ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নিল। বন্দি রাক্ষস-সেনারাও দেখছে এই লড়াই। সমরগরিমার শিক্ষার্থীরা একবার “পর্বত! পর্বত!” বলে জয়ধ্বনি দিল।

অধিনায়ক বজ্রধর ঘোষণা করলেন, “লড়াই শুরু হোক।”

পর্বত সতর্ক চোখে দেখছে প্রতিপক্ষকে। নিধি ফিসফিস করে অভীকে বলল, “দেখো, আলোকপর্ণ প্রথম আঘাত করবে।”

বাস্তবিকই তা-ই। মুষ্টিবদ্ধ দু’হাত সামনে তুলে পর্বতের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল আলোকপর্ণ। পর্বতও তার দু’হাত সামনে তুলে রেখেছে, তবে তার আঙুলগুলো খোলা। এগিয়ে যেতে যেতেই প্রবলশক্তিতে একটা ঘুষি ছুড়ল আলোকপর্ণ। পর্বত সতর্ক ছিল; সে বাম হাত তুলে ঘুষিটা আটকে দিল।

পরক্ষণেই দ্বিতীয় ঘুষিটা এত দ্রুত ছুটে এল যে পর্বত সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার ডানগালে সজোরে এসে পড়ল আলোকপর্ণের মুষ্টি; পর্বতের মাথা হেলে পড়ল একপাশে, মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রক্তমিশ্রিত লাল।

কিন্তু অত সহজে হার মানার পাত্র সে-ও নয়। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে ফিরে দাঁড়াল পর্বত; তার দু’চোখে ক্রোধ। আলোকপর্ণ হাসছে; শত্রুকে আঘাত করতে পেরে তার যে প্রবল আনন্দ হচ্ছে, তা লুকোনোর কোনো চেষ্টাই করল না সে।

পর্বত কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণে গেল না। অভী বুঝতে পারল, পর্বত সুযোগ খুঁজছে, বিপক্ষের দুর্বল স্থান অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে।

আবার ছোটো-ছোটো পায়ে এগিয়ে আসছে আলোকপর্ণ। নিধি অভীকে বলল, “ভালো করে দেখো। আলোকপর্ণ পর্বতের শরীরের মাঝ-বরাবর নিজের সামনের পা রাখছে সবসময়। সুযোগ পেলেই তার বুকের নিচের দিক লক্ষ করে ঝাঁপ দেবে সামনের দিকে।”

বলতে বলতেই দেখা গেল, নিধির ভবিষ্যৎবাণী মিলে গেল। আলোকপর্ণ সামনে ঝুঁকে পড়ে পর্বতের বুক লক্ষ করে ঝাঁপিয়েছিল বটে, কিন্তু পর্বত প্রস্তুত ছিল; সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে আলোকপর্ণকে ধরে মাটিতে আছাড় মারল।

অভী অবাক হয়ে নিধিকে বলল, “আরে, তুমি ওর মতলবগুলো এত ভালো বুঝতে পারছ কী করে?”

নিধি বলল, “একসময় আমি সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে বেশ কিছুদিন নিযুক্ত শিক্ষা করেছি। তখন তুমি আয়তনে আসনি বোধহয়। তোমার মা বেশ কিছু মেয়েকে খালিহাতে লড়াইয়ের কৌশল শেখাতেন। দারুণ শেখাতেন, সে-কথা আশা করি না বললেও চলে।”

আলোকপর্ণ ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পর্বত তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “আজ অধিনায়কের আদেশ না থাকলে তুমি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে না।”

মঞ্চের ওপরে খুতু ফেলল আলোকপর্ণ। “লজ্জা করে না তোমার, বিশ্বাসঘাতক? নিজে একজন রাক্ষস হয়ে এই শত্রুদেশের মানুষকে ‘অধিনায়ক’ সম্বোধন করতে লজ্জা করে না তোমার?”

পর্বত বলল, “কাপুরুষ গুপ্তহত্যাকারীর মুখে এত বড়ো-বড়ো কথা আসে কোথা থেকে? লজ্জা বস্তুটার যে এতখানি অভাব হয়েছে মাল্যপর্বতে, আজ জানলাম।”

খাপা ষাঁড়ের মতো তার ওপর লাফিয়ে পড়ল আলোকপর্ণ। পর্বত খুবই শক্তিশালী রাক্ষস, কিন্তু আলোকপর্ণ যেন যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত কায়দায় নিজের শরীরটাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে পর্বতের পেটে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল সে। সেই আঘাতে পর্বত ছিটকে গিয়ে পড়ল বেশ কয়েক হাত দূরে।

তাকে আর ওঠার সুযোগ না দিয়ে তার বুকের ওপর চড়ে বসে তার মুখে পরপর ঘুষি মারতে লাগল আলোকপর্ণ। পর্বত না হয়ে অন্য কোনো সাধারণ মানুষ হলে এই উপর্যুপরি প্রচণ্ড আঘাতে তার খুলি ভেঙে যেত। গলগলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তার মুখ থেকে; মারের চোটে নাকের একপাশ বেঁকে গেছে তার। তবু অভীর মনে হল, পর্বত ইচ্ছে করেই মারটা খাচ্ছে, ওকে রক্তের নেশায় অসাবধান করার সুযোগ খুঁজছে।

পরপর প্রায় সাত-আটখানা ঘুষি খাওয়ার পর হঠাৎ আঘাত হানল পর্বত; এক হাত নিজের মুখের সামনে রেখে অন্য হাতের একটা আঙুল তীব্রগতিতে আলোকপর্ণের চোখে ঢুকিয়ে দিল সে। কাদামাটিতে পা দিলে যেমন চটচটে একটা শব্দের সঙ্গে পা মাটির ভেতরে ঢুকে যায়, তেমন করেই পর্বতের আঙুলটা ঢুকে গেল আলোকপর্ণের চোখে। আতর্জনাদ করে তার দেহের ওপর থেকে মেঝোতে উলটে পড়ল আলোকপর্ণ।

গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার চোখ থেকে, তবু তার তেজ কমেনি। একটা হাত চোখে চেপে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল আলোকপর্ণ; তার মুখ রক্তে মাখামাখি, তা-ও দাঁতে দাঁত ঘষে বন্য কুকুরের মতো গর্জন করছে সে। অতী বুঝতে পারছে, আলোকপর্ণ যুদ্ধতৃষ্ণায় উন্মাদ হয়ে গেছে।

তবু একটা চোখ চলে যাওয়ার পর সে যে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পর্বত একটু ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে এল তার সামনে। আলোকপর্ণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে লাফ দিল তার পা লক্ষ করে। আলোকপর্ণের সামনে এগিয়ে থাকা বাম পা-কে পর্বত দু’হাতে বেঁটন করে চেপে ধরল নিজের বুকের সঙ্গে, আর নিজের শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল পেছনের দিকে। দর্শকাসন থেকে নিধি বলে উঠল, “দেখো, দেখো অতী। নিযুদ্ধের একদম প্রাথমিক একপদী আক্রমণ এটা। শত্রুর পা আটকে দিয়ে তাকে পেছনে ঠেলে ফেলা— পর্বতদার মতো এত নিখুঁতভাবে এটা কাউকে আগে করতে দেখিনি।”

আলোকপর্ণের সামনের পা পুরোপুরি বন্দি হয়ে গেছে; পর্বত তাকে যেভাবে বেকায়দায় ধরেছে, সেখান থেকে নিজেকে ছাড়ানো তার অসম্ভব। ব্যর্থ প্রতিরোধ

করার চেষ্টা করল সে কয়েক মুহূর্ত; তারপর প্রবল ঠেলায় বেসামাল হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে “পর্বতের জয়” বলে চিৎকার করে উঠল।

নিধি বলল, “এইভাবে কাউকে মাটিতে ফেলে দেওয়া মানে নিযুদ্ধে তার পরাজয় হয়।”

শ্যামশ্রী বজ্রধরের দিকে তাকালেন। “অধিনায়ক, যুদ্ধ তো শেষ। পর্বতকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন না?”

বজ্রধর শান্তকণ্ঠে বললেন, “আজকের এই লড়াই নিযুদ্ধের নিয়ম মেনে হবে, এমনটা তো ঘোষণা হয়নি, শ্যামশ্রী। এইরকম একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের সুযোগ পর্বত অনেকদিন খুঁজছিল। দেখো, এখনও ওদের দু’জনের একজনও কিন্তু যুদ্ধ থামানোর আবেদন করেনি; কেউ দয়া চেয়ে অপরপক্ষকে থামতে অনুরোধ করেনি। কাজেই, প্রথামতো লড়াই এখনও শেষ হয়নি।”

মাটিতে পড়ে রীতিমতো কাতরাচ্ছে আলোকপর্ণ। দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বত এগিয়ে গেল তার দিকে। সমরগরিমার মাঠজুড়ে প্রতিটি চোখ স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

“নিজের অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধদক্ষতা নিয়ে খুব গর্ব তোমার, না আলোকপর্ণ? এই হাতে তরবারি ধরে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করে এসেছ চিরকাল। এই হাত তুলেই তুমি মহাসর্পিণীতে চিরস্থায়ী রূপান্তরের অভিশাপ দিয়েছিলে উত্তরাকে।”

আলোকপর্ণ পড়ে আছে অবশভাবে; আর তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। নিজের চোখের রক্তে তার সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। পর্বত তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার ডানহাতটা তুলে নিল নিজের উরুর ওপর।

“এটা আমার স্ত্রীর জন্য। আমার যে সন্তানকে তুমি পৃথিবীতে আসতে দিলে না, তার জন্য!”

সমরগরিমার মাঠজুড়ে দর্শকরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল নীরব হয়ে বিস্ফারিত চোখে। দু’হাতে আলোকপর্ণের হাতটা ধরে নিজের উরুতে বসিয়ে সজোরে উলটোদিকে চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে দিল পর্বত। ‘মট্’ করে শব্দটায় ভেতরে-ভেতরে একবার যেন কেঁপে উঠল অভী।

বিকট আতর্জনাদ করে উঠল আলোকপর্ণ; ছটফট করতে লাগল অনুশীলন মঞ্চের ওপর। পর্বত তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল; ঘৃণাভরে ফেলে দিল তার হাতটা। সেটা শিথিল হয়ে অদ্ভুত রকমের বাঁকাভাবে এসে পড়ল মাটিতে। অভী বুঝতে পারছে, ওই হাত একদম ভেঙে গেছে কনুইয়ের ওপর থেকে।

বজ্রধর কণ্ঠের মুখে পুরো ঘটনাটা দেখছিলেন। এবার তিনি বললেন, “আমি এই যুদ্ধের সমাপ্তিতে পর্বতকে বিজয়ী ঘোষণা করছি। স্বর্ণশেখর, তুমি একবার রক্ষোবৈদ্যকে খবর দাও। আলোকপর্ণের চোখের চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে দয়া করে বলে দিয়ো, ওকে তিনি ব্যথা কমার ওষুধ দিতে পারেন, কিন্তু ওই ভাঙা হাতের চিকিৎসা যেন না করেন। এটা ওর এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমরগরিমার তরফ থেকে উপহার রইল।”

এতখানি নির্দয়ের মতো কথা বলতে অধিনায়ককে আগে শোনেনি অভী; বরাবর তাঁকে বেশ কোমল হৃদয়ের মানুষ বলে মনে করত সে। অভী বুঝতে পারছিল, তাঁর সমরোত্তমদের ওপর এই অন্যায় আক্রমণে অধিনায়ক অসম্ভব রেগে গেছেন। তাঁর এই রূপ দেখে একটু যেন ভয় করছিল তার।

বজ্রধর বললেন, “পর্বত, তুমি যুদ্ধক্লান্ত। রক্ষাবৈদ্যের কাছে গিয়ে ঔষধ নিয়ে নিয়ো। তোমার যুদ্ধবিদ্যা আমাদের গর্বিত করেছে। তুমি আপাতত গিয়ে বিশ্রাম করো; পরে আবার কথা হবে তোমার সঙ্গে।”

পর্বত মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, “শ্যামশ্রী, তুমি রাজা পুনর্বসুকে একটি জরুরি পত্র পাঠিয়ে দাও জটায়ুমাধ্যমে। এদের বিচার এখানে করলে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি হবে। এই যুদ্ধবন্দিদের আমরা তাঁর হাতেই তুলে দিতে চাই।”

শ্যামশ্রী বললেন, “যথা আজ্ঞা, অধিনায়ক।”

বজ্রধর বললেন, “মেঘবর্ণ, নীলাভ্র, বিকেলের মধ্যে আশা করছি এই ঝামেলা মিটে যাবে; রাজার বাহিনী এসে এদের নিয়ে চলে যাবে। আজ সূর্যাস্তের সময় সম্মেলন কক্ষে সব সমরোত্তমের উপস্থিতি চাইছি... না, শিক্ষার্থীরা কেউ নয়, এমনকি যোদ্ধানায়কেরাও নয়। শুধু পাঁচজন সমরোত্তমকে নিয়ে একটি আলোচনাসভা ডাকছি। পীতপত্রবনের গাছ এবং একটি বিপজ্জনক যুদ্ধমায়া নিয়ে কয়েকটা ব্যাপার তোমাদের জানাতে চাই। অসুবিধা নেই তো?”

নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ দু’জনেই একসঙ্গে বলল, “না অধিনায়ক, কোনো অসুবিধা নেই।”

বজ্রধর বললেন, “আপাতত তোমরা এখানেই থাকো। শ্যামশ্রী জটায়ু পাঠিয়ে খবর দিলে আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই মাল্যপর্বতের বাহিনী চলে আসবে এদের বন্দি করে নিয়ে যেতে। আমি একটু আয়তনে যাচ্ছি। ওরা এলে আমাকে সংবাদ দিয়ো।”

অধিনায়ক চলে যাওয়ার পরে মাঠে ভিড়টা পাতলা হয়ে এল। অভী আর নিধি গুটিগুটি এগিয়ে গেল মেঘবর্ণের দিকে।

অভী বলল, “মেঘবর্ণ, একটা কথা।”

সে বলল, “হ্যাঁ, বলো।”

“তুমি কী করে জানলে সৌজন্যের সঙ্গে আজকের অভিযান নিয়ে আগেই কথা বলেছে আলোকপর্ণ?”

মেঘবর্ণ হেসে উঠল। “ওটা স্রেফ আন্দাজ করেছিলাম; কপালগুণে আন্দাজটা লেগে গেছে। কীসে আমার সন্দেহ হল জানো? আকাশলোকে সৌজন্য আমাদের একটা কথা বলেছিল, মনে আছে? ‘মাল্যপর্বতের উন্মাদের হাত থেকে পারলে সমরগরিমাকে রক্ষা করুন।’ এই উন্মাদটি কে জানতে চাওয়ায় ও বলেছিল, যুদ্ধ নিয়ে ওদের দেশে সবচেয়ে বড়ো উন্মাদ কে আছে, সেইটি ভাবতে। আজকে আলোকপর্ণের এই কাণ্ড দেখে আমার সৌজন্যের ওই কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ওকে বলতে ও দিব্যি স্বীকারও করে নিল।”

নীলাভ্র বলল, “কিন্তু মেঘ, তার মানে, এই নিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে আলোকপর্ণের এই কথাগুলো সৌজন্য আভাসে আমাদের আগাম জানিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? এর পেছনে সৌজন্যের কী স্বার্থ আছে?”

মেঘবর্ণ বলল, “সেটা এখনও পুরোটা বুঝতে পারছি না রে, নীল। সৌজন্য বলেছিল, আমাদের দিয়েও নাকি ভবিষ্যতে ওর স্বার্থসিদ্ধি হবে। সেই স্বার্থসিদ্ধিটি যে কেমন, আমরা এখনও সে বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে।”

অভী বলল, “সৌজন্যের স্বার্থ বলতে তো রাজা পুনর্বসুকে সরিয়ে মাল্যপর্বতের সিংহাসন দখল। সেই ব্যাপারে আমরা ওকে সাহায্য করতে যাবই বা কেন?”

নীলাভ্র বলল, “জানি না। সৌজন্যের ব্যাপারে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যে সোজা নয়, সে তো আমরা সবাই জানি। যা-ই হোক, আজ পর্বত পুরো পাগলা হাতি হয়ে গিয়েছিল।”

নিধি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, “পর্বতদা যা করেছে, আমি বলব একদম ঠিক করেছে। ওই হতভাগা ওর সঙ্গে আর ওর পরিবারের সঙ্গে যা করেছে, তার পরে এই শাস্তিটাও যেন কম হয়ে গেল।”

অভী বলল, “অধিনায়ক যদি ওই একপদী আক্রমণের পরেই আলোকপর্ণ পড়ে যেতে যুদ্ধ থামিয়ে দিতেন, তাহলে এই রক্তারক্তি-ভাঙাভাঙি কাণ্ডটা হত না। মা তখন একবার ওঁকে বলেছিল যুদ্ধ থামিয়ে পর্বতদাকে বিজয়ী ঘোষণা করে দেওয়ার কথা, কিন্তু উনি সে-কথা শোনেননি।”

মেঘবর্ণ হাসল। “কেন শোনেননি, জানো?”

“কেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “নীল, তোর ছেলেকে বোঝা তুই।”

নীলাভ্রও একটু হেসে বলল, “শোন অভী, এই সমরগরিমা আয়তন আমাদের অধিনায়কের সারা জীবনের স্বপ্ন আর পরিশ্রমের ফসল। এখানের অধিবাসীদের, শিক্ষার্থীদের, সমরোত্তমদের উনি অসম্ভব ভালোবাসেন। সেই জায়গায় আলোকপর্ণ চুপিসারে ঢুকেছিল আমাদের ক্ষতি করতে। সম্মুখসমরে সমরগরিমা নিয়ে যদি আমাদের কারও মৃত্যু হত, উনি শোক পেতেন নিশ্চিত, কিন্তু ক্রোধান্বিত হতেন না। আলোকপর্ণ আজকের ঘটনায় ওঁর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে বসেছিল— ওঁর ভালোবাসার মানুষগুলিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, ওঁর সমরগরিমাকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। আর দুর্বল জায়গায় আঘাত পেলে মানুষ তো সজোরে প্রত্যাঘাত করবেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “যখনই উনি পর্বতকে ডাকলেন ওর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, তখনই আমি বুঝেছিলাম, আজ উনি আলোকপর্ণের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করতে চলেছেন। তা, উচিত শাস্তিও হয়েছে ব্যাটার; ওই হাত নিয়ে এ-জীবনে আর যুদ্ধ করতে পারবে না।”

দুই সমরোত্তমকে ওখানে রেখে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরে এল মিত্রভবনে। ফেরার পথে নিধি গম্ভীর হয়ে রইল; কোনো কথা বলল না।

স্নান-খাওয়া সেরে অভী, নিধিকে ডেকে বলল, “কিছু হয়েছে নাকি? এত চিন্তিত কেন?”

নিধি বলল, “আয়তনের জরুরি ব্যাপারে খবর সংগ্রহের ইচ্ছা আছে, না নেই?”

অভী অবাক হয়ে বলল, “কোন ব্যাপারের কথা বলছ?”

নিধি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, “উফ, আচ্ছা গাধা বটো। অধিনায়ক বজ্রধর একটু আগেই বললেন না আজ সূর্যাস্তের সময় শুধু সমরোত্তমদের নিয়ে একটা সভা ডাকছেন তিনি?”

“হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তো আমাদের থাকা নিষেধ।”

“আরে বুদ্ধিমান, সেই কথাই তো বলছি। পীতপত্রবনের গাছ আর বিপজ্জনক যুদ্ধমায়া— এই হচ্ছে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এমন আলোচনাটা না শুনলে চলে?”

“কী করে শুনবে?”

নিধি তার হাতের মুঠোয় ধরে থাকা স্বপ্ন-উপলের জোড়াটা অভীর সামনে মেলে ধরল। “এই জোড়ার একটা শোনে, অন্যটা শোনায়। ভুলে গেছ?”

অভী উত্তেজিত হয়ে বলল, “সম্মেলন কক্ষে এদের একটাকে রেখে আসবে বলছ?”

“ধন্য বুদ্ধি! এতক্ষণ তো সেটাই বলতে চাচ্ছি। সূর্যাস্তের আগে ওখানে কেউ আসছে না। ততক্ষণে এগুলোর একটাকে আমরা ভেতরে লুকিয়ে রেখে স্বচ্ছন্দে পালিয়ে আসতে পারি। তারপর সভায় যখন ওঁরা কথা বলবেন, আমরা বাইরে বসে অন্যটা দিয়ে ভেতরের সব কথা শুনে ফেলব। হি হি হি!”

অভীও ষড়যন্ত্রকারীর মতো হি-হি করে করে হাসল। তারপর মিত্রমাসিকে কিছুটা না বলে ভবন থেকে বেরিয়ে এসে দু’জনে চলল আয়তনের দিকে।

সম্মেলন কক্ষের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু তালা দেওয়া ছিল না। নিধি বাইরে পাহারায় রইল; আস্তে-আস্তে ভেতরে ঢুকে অভী কক্ষের এককোণে রাখা নানা জিনিসপত্রের মধ্যে জোড়ার একটা স্বপ্ন-উপল লুকিয়ে রেখে চটপট বাইরে চলে এল। নিধি মনে করিয়ে দিল, “দরজাটা লাগিয়ে দাও।”

দরজার পাল্লা টেনে দু’জনেই চুপিচুপি আবার পালিয়ে এল ওখান থেকে। ফেরার পথে নিধি বলল, “সূর্যাস্তের একটু আগেই আমরা চলে আসব এখানে। জোড়ার পাথরগুলো একটা থেকে আর একটা খুব দূরে চলে গেলে ওদের শ্রবণ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, একটু আগে এসে নজর রাখতে হবে সমরোত্তমরা কখন ভেতরে ঢোকে। তারপরেই আমরা এসে বসব বাইরে।”

দুপুরটা দু’জনে খুব উত্তেজনায কাটল। তারপর বিকেল নামতেই আবার ওরা ছুটল আয়তনের দিকে।

বুদ্ধিমানের মতোই আয়তনে এসে সম্মেলন কক্ষের ধারেকাছে গেল না ওরা; শুধু সমরোত্তমদের গতিবিধি নজর রাখতে লাগল। সহ-অধিনায়িকা শ্যামশ্রী আছেন গ্রন্থাগারে; নীলাভ, মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখর বসে-বসে গল্প করছে সংগ্রহশালায়; অধিনায়ক কোথায় আছেন, ওরা খুঁজে পেল না।

সূর্যাস্তের একটু আগেই সকলে এক-এক করে এসে ঢুকল সম্মেলন কক্ষে। সবার শেষে অধিনায়ক বজ্রধর এলেন এবং এসেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। অভী আর নিধি দূর থেকে পরিস্থিতির ওপর লক্ষ রেখেছিল। এবার ওরা চুপিচুপি এসে বসল দরজা বাইরে, কক্ষ থেকে একটু দূরে অলিন্দে।

নিধি তার পোশাকের মধ্য থেকে বার করল দ্বিতীয় স্বপ্ন-উপলটা। সঙ্গে-সঙ্গে তা থেকে ভেসে এল অধিনায়কের কণ্ঠস্বর। “গাছগুলোর অবস্থা আমি ভালো বুঝছি না। কিন্তু এর পেছনে কারণ কী, তা এখনও আমরা বুঝতে পারছি না। পীতপত্রবনের গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেলে কার লাভ, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই।”

স্বর্ণশেখর বলল, “মরুময়।”

বজ্রধর বললেন, “ঠিক। এর আগেও সমরগরিমার অরণ্যকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে সে। এবারের এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির পেছনে তার কথাই সবার আগে মাথায় আসছে। যদি ওই বৃষ্টি-আকর্ষণকারী গাছদের ও ক্ষতি করে দিতে পারে, তাহলে কিন্তু পুরো সমরগরিমাকে ওর আনা বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে হবে।”

মেঘবর্ণ বলল, “আর তার মানেই ঐশিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া। তখন সামান্য পরিমাণ জলের জন্য মানুষে-মানুষে বা মানুষে-অর্ধরাক্ষসে মরণপণ লড়াই করানো হবে, তাঁদের এই পরিকল্পনা আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছি।”

বাইরে অভী আর নিধি পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। কথাটা ভুল বলছে না মেঘবর্ণ। তারাও ঐশিকদের এই পরিকল্পনা শুনেছে। অভী ভাবল, কিন্তু ঐশিকরা কি চাইলেই সমরগরিমার সীমার মধ্যে ঢুকে পীতপত্রবনের গাছগুলোর ক্ষতি করতে পারেন?

নিধি যেন তার মনের কথা পড়ে নিয়েই ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, “এখানের কেউ ঐশিকদের সাহায্য করছে না তো?”

অধিনায়ক বজ্রধর আবার বলা শুরু করলেন, “তোমাদের এর আগেও একবার আভাসে বলে রেখেছিলাম, আমাদের চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। যদি সেরকম পরিস্থিতি আসে, তখন ওই বিশেষ মায়াটি প্রয়োগ করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না। তার পরিণতি কী হতে পারে, তা আমরা সবাই জানি। আমাকে শুধু বলো, তোমরা প্রস্তুত তো?”

নীলাভ্র বলল, “অধিনায়ক, গত যুদ্ধের শেষে যে নীরসেনা এসেছিলেন, তিনিও আমাদের বলে গিয়েছিলেন, সমরোত্তমরা যেন প্রস্তুত থাকেন, কারণ তাঁদের কাছে মৃত্যু শীঘ্রই আসবে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমরা মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকি। আমাদের জীবনের যে কোনো নিশ্চয়তা নেই, এবং এই সমরগরিমার সেবায় আমরা আমাদের জীবন আক্ষরিক অর্থেই উৎসর্গ করে রেখেছি, সে-কথা আমাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে?”

বাকিদের করতালির শব্দে বোঝা গেল, সবাই নীলাভ্রকে সমর্থন করছেন।

বজ্রধর প্রশংসার সুরে বললেন, “অতি উত্তম। আমার অকুতোভয় সমরোত্তমদের জন্য আমি সত্যই প্রীত এবং নিশ্চিত। জেনে রাখো তোমরা সনাই, যদি ঐশিকরা আমাদের সেই পরিস্থিতিতে টেনে আনেন, তাহলে একমাত্র এই মায়াটি প্রয়োগ করে আমরা এদের সবাইকে রক্ষা করতে পারব। মায়াটি সহজ নয়, এবং পাঁচজন একসঙ্গে প্রয়োগ না করলে ঈঙ্গিত ফল পাওয়া যাবে না; তাই একসঙ্গে এর প্রয়োগ আমাদের অভ্যাস করে রাখতে হবে, নতুবা কার্যক্ষেত্রে আমরা হয়তো একে কাজে লাগাতেই পারব না।”

স্বর্ণশেখর বলল, “এখনই একবার অভ্যাস করি, চলুন।”

নীলাভ বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু পুরো শক্তির প্রয়োগ করা যাবে না। করলে তো এখানেই...”, বলে হো-হো করে হেসে উঠল সে। মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখরও তার হাসিতে যোগ দিল।

অভী আর নিধি বাইরে বসে সব শুনছিল। নিধি বলল, “সমরোত্তমরা বোধহয় অনুমান করছেন, ঐশিকরা বিরাট কঠিন কোনো মায়ার প্রয়োগ করে ওঁদের জব্দ করতে চাইবেন। তাই সম্ভবত ওই মায়ার বিপরীত মায়া অভ্যাস করছেন।”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “হতে পারে।”

স্বপ্ন-উপল থেকে শ্যামশ্রীর ঠান্ডা গলা ভেসে এল। “অধিনায়ক, একটি কথা।”

“হ্যাঁ, বলো।”

“যুদ্ধক্ষেত্রে যদি এই মায়ার প্রয়োগের দরকার হয়, তাহলে এমনটা হতেই পারে, আমরা হয়তো আলাদা-আলাদা জায়গায় সেই মুহূর্তে ব্যস্ত আছি। আপনি এমন একটা বা দুটো শব্দ ঠিক করে দিন, যা আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত হলে আমরা বুঝে যাব, এবার আমাদের এই মায়া প্রয়োগের সময় এসে গেছে।”

বজ্রধর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “হুম, ভালোই বলেছ কথাটা। যদি আমাকে চিৎকার করে বলতে শোনো ‘সমরগরিমার জন্য’, তাহলে বুঝবে সময় এসে গেছে।”

ভেতরে বাকি সমরোত্তমদের সমর্থনসূচক গুনগুন শব্দ ভেসে এল স্বপ্ন-উপল থেকে।

বজ্রধর বললেন, “আমি জানি, মৃত দেবতা আমাদের ডেকেছেন। আমাদের অনেকেরই কাজ এখানে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু...”

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ কক্ষের মধ্য থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ এল না। অভী আর নিধি অবাক হয়ে তাদের হাতের পাথরটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিধি বলল, “যাক্কাবা! স্বপ্ন-উপলের মায়া নষ্ট হয়ে গেল নাকি? এমন তো আগে কখনও দেখিনি!”

হঠাৎ সম্মেলন কক্ষের দরজা খুলে গেল, আর হাসিমুখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মেঘবর্ণ। সোজা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে; বলল, “নিধি, হাত বাড়াও।”

নিধি বোকার মতো হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাতে আর একটা স্বপ্ন-উপল ধরিয়ে দিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “এই নাও। তোমাদের এই জিনিসটা কক্ষের মধ্যে

ছিল। অধিনায়ক এটা খুঁজে পেয়ে তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এবার তোমরা কেটে পড়ো দেখি এখান থেকে।”

কান লাল করে বসে রইল ওরা দু’জন। বজ্রধর ধরে ফেলেছেন ওদের।

হাসতে-হাসতে মেঘবর্ণ এগিয়ে গেল কক্ষের দরজার দিকে। অভী আর নিধি গুনতে পেল, ঢুকতে ঢুকতে সে বলছে, “কী হল? আমি আসতেই সবাই চুপ করে গেলেন কেন?”

নীলাভ্রর উত্তরটাও শোনা গেল, “আরে মেঘ, সেরকম কিছু নয়। আয়, বসে পড় এখানে।”

দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। অভী আর নিধি বসে রইল হাঁ করে।

বেশ কিছুক্ষণ পর অভী বলল, “ব্যাপারটা খুব খারাপ হল, না?”

নিধি শুকনো মুখে বলল, “খারাপ তো হলই। অধিনায়ক কী ভাবছেন, ভাবতেই আমার কেমন যেন লাগছে!”

অভী বলল, “তাহলে এক কাজ করা যাক। আমরা বরং অপেক্ষা করি এখানে। একসময় তো এই সম্মেলন শেষ হবেই। তখন অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইব।”

নিধি রাজি হয়ে গেল। ওরা বসে রইল ওখানেই।

দরজা আর খোলেই না। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে রাত নামল, তা-ও দরজা বন্ধ রইল। বসে বসে অভীর হাই উঠতে লাগল; নিধি তো পাথরের দেয়ালে মাথা দিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিল। তারপর বেশ রাতের দিকে দরজা খুলে এক-এক করে সমরোত্তমরা বেরিয়ে এলেন।

মেঘবর্ণ ওদের দেখে হেসে বলল, “কী ব্যাপার? এখনও মিত্রভবনে ফিরে যাওনি তোমরা?”

অভী বলল, “অধিনায়কের সঙ্গে একটু কথা ছিল, তাই অপেক্ষা করছিলাম।”

“বেশ, বেশ,” বলে সে চলে গেল। অন্য সমরোত্তমরাও তাদের দেখে একটু মুচকি হেসে স্থানত্যাগ করলেন।

বজ্রধর তখনও কক্ষ ছেড়ে বেরোননি। ওরা গিয়ে দরজায় টোকা দিল। “অধিনায়ক, একবার আসব?”

বজ্রধর ভেতর থেকে বললেন, “এসো।”

ওরা দু’জন কক্ষের মধ্যে ঢুকে অধিনায়কের পদস্পর্শ করল। “আমাদের ক্ষমা করুন, অধিনায়ক।”

স্মিত হাসি হাসলেন বজ্রধর। “বোকা ছেলে-মেয়ে সব! ক্ষমা চাওয়ার কী আছে এর মধ্যে?”

অভী স্বস্তির শ্বাস ফেলল। দুপুরবেলা অনুশীলন মঞ্চে দেখা নির্মম বজ্রধরের সঙ্গে এই শান্ত সমাহিত মানুষটার যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটু নিশ্চিত্ত বোধ করল সে; অনুতপ্ত স্বরে বলল, “আমরা নিতান্ত কৌতূহলবশেই এই কাজ করে ফেলেছি, অধিনায়ক।”

হাত তুলে বজ্রধর বললেন, “সে আমি বুঝতেই পেরেছি। আয়তনকে তথা সমগ্র সমরগরিমাকে তোমরা ভালোবাসো, আমি জানি। তাই একে নিয়ে তোমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা অস্বাভাবিক নয়, তা-ও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে এমন কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত এখন আমাকে নিতে হচ্ছে, যার কথা এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীরা জানুক, এ আমি মোটেই চাই না। সমরগরিমার ভালোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি, তাতে আশা করি তোমাদের সন্দেহ নেই?”

ওরা একসঙ্গে বলল, “না, অধিনায়ক।”

“তাহলে আর তো কোনো সমস্যা নেই। সবার ভালোর জন্য যা করতে হয়, আমরা সমরোত্তমরা তাই করব, এই বিশ্বাস আমাদের ওপর তোমরা রেখো।”

নিধি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, “অধিনায়ক হিসাবে আমাকে তোমরা ভরসা কর তো?”

ওরা সবেগে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

“তাহলে এইটুকু বিশ্বাস রেখো, সব ধ্বংসকে এড়ানো যায় না, কিন্তু সব দিক বজায় করে আয়তনের যাতে মঙ্গল হয়, আমি তা-ই করব।”

“কীরকম ধ্বংসের কথা বলছেন আপনি, অধিনায়ক?” অভী প্রশ্ন করল।

বজ্রধর ম্লান হাসলেন। “যে-কোনো জিনিসের শুরু হলে তার শেষও থাকে, তা-ই না? সে মানুষের জীবনই হোক, আর এই আয়তনের মতো প্রতিষ্ঠানই হোক।”



।। অষ্টম অধ্যায় ।।

সরোবরতীরে

আয়তন থেকে মিত্রভবনে ফিরে এসে নিধির সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করল অভী। নিধির মতে, সমরোত্তমরা নিজেদের মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন, তাই আগে থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে চাইছেন। ওই মায়া— ওটা যা-ই হোক না কেন— ওর আসল কথা হল, চূড়ান্ত বিপদের মুখে সমরোত্তমদের জীবন রক্ষা করা।

অভী বলল, “আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সমরোত্তমরা চিরকাল নিজেদের জীবনের চেয়ে অন্যদের জীবন রক্ষা করতেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, ওই ‘সমরগরিমার জন্য’ ধ্বনির মধ্যেই ওই মায়াপ্রয়োগের বীজ লুকিয়ে রাখছেন ওঁরা; দরকার পড়লে সবাই একসঙ্গে প্রয়োগ করবেন, আর তাহলেই মরুময় বা ঐশিকদের মায়াকে পরাস্ত করা যাবে।”

এত জটিল মায়ার শিক্ষা ওদের দু’জনের কারও নেই। অতএব ও-ব্যাপারে আর মাথা না ঘামিয়ে রাতের আহার সেরে ওরা যে যার কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জানালা দিয়ে বিরাট চাঁদটাকে দেখা যাচ্ছে। ফুরফুরে হাওয়ায় সারাটা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। আজ একটা দিন গেল বটে!

আজকের ঘটনাগুলো— বিশেষ করে আলোকপর্ণের ঘটনাটা ভাবতে লাগল অভী। হঠাৎ পর্বতের কথা মনে হল তার। খেয়াল হল, আজকের ওই যুদ্ধের পর সারাদিন আর পর্বতের দেখা পাওয়া যায়নি। তার কুকুর বক্রপুচ্ছকে সে নিকোলে আয়তনে দেখেছে বটে, কিন্তু পর্বতের বদলে আজ তার সঙ্গে ছিলেন রক্ষাবৈদ্য।

হয়তো পর্বত জোর চোট পেয়েছে; তাই তার কুকুরকে নিয়ে রক্ষাবৈদ্যই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।

জানালার বাইরে দিয়ে একটা রাতচরা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে। কী নিঃসঙ্গ সে ডাক! অভীর হঠাৎ লীনার কথা মনে পড়ে গেল।

হৃদয়শর মোচন করেই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ছে লীনা— দৃশ্যটা সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মনটাকে জোর করে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল অভী।

কত ভালো-ভালো মুহূর্ত কাটিয়েছে সে লীনার সঙ্গে। সেই যে-বার চঞ্চলের সাহায্যে ছদ্মবেশ ধরে ছায়াভবনে শর্বরের অনুগামী রাক্ষসদের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল তারা, কিংবা সেই যখন মাল্যপর্বতের রাজপ্রাসাদের জলাধারের পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা আর লালচে আলো পড়েছিল লীনার মুখটায়। কী সুন্দর লাগছিল ওকে! আর সেই যে-বার মাল্যপর্বত যাওয়ার আগে ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলেছিল, “তুমি থাকতে আর অন্য কাউকে...!” কথাগুলো মনে হতেই প্রথমে একটু হাসি ফুটে উঠল অভীর ঠোঁটে, তারপর সে দেখল, আপনা থেকেই জল গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ দিয়ে। কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিল সে ওই মেয়েটাকে, সে নিজেও যেন সবসময় বুঝে উঠতে পারে না এখন।

ঘুম আসছে না। কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেমন যেন অস্থির-অস্থির লাগছে। কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করে উঠে পড়ল অভী; এসে দাঁড়াল খোলা জানালার পাশে।

বাইরে চাঁদটা আরও উঠে এসেছে ওপরদিকে; আর কিছুক্ষণ পরে অভীর জানালা থেকে সরে যাবে সে।

সেই রাতচরা পাখিটা আবার যাচ্ছে ডাকতে-ডাকতে। তার অদ্ভুত অন্ধকার অবয়বটা সরে যাচ্ছে চাঁদের ওপর দিয়ে। অভীর হঠাৎ অপরাজিতার কথা মনে হল।

কেমন আছে তার মহানীলগৃধ্র বন্ধুটি? একবার দেখতে ইচ্ছা করছে তাকে। অভী তার নীল শঙ্খটি বার করে তাতে ফুঁ দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শোনা গেল অপরাজিতার বিশাল ডানার ঝাপটের শব্দ। জানালার বাইরে খোলা প্রান্তরে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে নেমে এল তার মহানীলগৃধ্র।

অভী জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল। বলল, “শরীর ভালো আছে, অপরাজিতা?”

আদর পেয়ে খুশি হয়ে অভীর হাতে মাথা ঘষতে লাগল বিরাতকায় পাখিটা। তার গলা জড়িয়ে ধরে রইল অভী; মনটা যেন এতক্ষণে একটু শান্ত লাগছে তার।

চাঁদের দিকে আর একবার তাকাতেই তার মনে পড়ল সেই প্রথমবার আয়তনে এসে অপরাজিতার পিঠে চেপে ভ্রমণের কথা। সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। “আবার একবার স্বপ্ন-সরোবর গেলে কেমন হয়?”

গতবার ওখানে গিয়েই অতীত ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পেয়েছিল অভী। ওই অদ্ভুত জায়গায় এই মায়ানীলগৃধ্রের মতো কিছু উচ্চমায়াসম্পন্ন জীব ছাড়া কেউ যেতে পারে না। অভীর মনে হল, ওখানে গেলে এখন যে গোলমালে পরিস্থিতি, তার কিছুটা আভাস পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

মনস্থির করে সে বলল, “অপরাজিতা, স্বপ্ন-সরোবর নিয়ে যাবে আমাকে?”

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল পাখিটা। জানালা দিয়ে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এসে সে চেপে বসল অপরাজিতার পিঠে, আর মুহূর্তের মধ্যে বিরাট ডানা ঝাপটে শূন্যে উঠে গেল মহানীলগৃধ্র।

উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ওরা— আরও, আরও উঁচু। রাতের হাওয়া হু-হু করে এসে লাগছে তার চোখেমুখে; কানের মধ্যে যেন ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে। এত তীব্র সে হাওয়া যে তাকে চোখ কুঁচকে রাখতে হচ্ছে। অপরাজিতার নরম পালকের মধ্য থেকে বুনো ফলের গন্ধ পাচ্ছে অভী।

নিচে রাতের সমরগরিমা আয়তন ছোটো হয়ে আসছে। পীতপত্রবনের গাছগুলোর মাথায় এসে পড়েছে সাদা জ্যোৎস্না— দেখে মনে হচ্ছে, কে যেন সাদা রঙে ধুইয়ে দিয়েছে ওদের মাথা। মৃত দেবতার নদীর বহতা জলে চিকমিক করছে বিরাট চাঁদের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। আকাশভরা তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে তার মাথার ওপরে। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অভী জানে, একটু পরেই সব হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিচের দিকে তাকাল অভী। রাতের সমরগরিমা হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। মাটি থেকে বহু, বহু উচ্চতায় এখন সে উড়ছে অপরাজিতার পিঠে চেপে। আচ্ছা, এখন সমরোত্তমরা...

ভাবতে ভাবতেই তার চোখের সামনে আঁধার নেমে এল। নিকষ কালো কালির মতো অন্ধকার— সেই অন্ধকারে নিজের হাত পা-ও দেখা যায় না। চাঁদ উধাও হয়ে গেছে; দেখা যাচ্ছে না একটি তারাকেও। অপরাজিতা উড়ছে, না শুধু ভেসে রয়েছে, অভী আর কিছু বুঝতে পারছে না। সেই তীব্র হাওয়ার স্রোত বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভয়াবহ অন্ধকারে অভীর মনে হতে লাগল, তার যেন দম আটকে আসছে।

তারপর সে অনুভব করতে পারল, অপরাজিতা নামছে। কোথায় নামছে, নিচে কী আছে কিছু দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু তার বাহনের নিম্নগতিটা অভী নিজের শরীর দিয়ে বুঝতে পারছিল।

আরও কিছুটা নামার পর থেমে গেল অপরাজিতা, একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। অভী বুঝতে পারল, অপরাজিতা মাটি পেয়েছে— এটা তাকে নামতে বলার ইঙ্গিত।

সাবধানে নেমে এল সে বিরাট পাখিটার পিঠ থেকে। এই অন্ধকারে চোখটা একটু অভ্যস্ত হওয়ার পর সে এখন বুঝতে পারছে, জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়— আকাশজুড়ে একটা খুব হালকা লালচে আভা ছড়িয়ে আছে। আকাশে চাঁদ, সূর্য, তারা কিছু নেই, কিন্তু তা-ও চারপাশটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না ওই লাল আভায়। অভী অনুভব করতে পারল, সে দিগন্তবিস্তৃত এক জলরাশির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপুল জলে তরঙ্গ উঠছে না, তাই কোনো শব্দও নেই। আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া অস্পষ্ট লাল আলোর মধ্যে এই অপরিমেয় জল যে কোথায় শেষ হয়ে দিগন্তরেখা ছুঁয়েছে, তা বলা একান্তই অসম্ভব। চতুর্দিক এত নিস্তব্ধ যে অভী নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল।

একটু-একটু ভয় করছে তার। এই বিরাট, বিপুল স্বপ্ন-সরোবরের সামনে সে একা। লাল আকাশের ছায়া পড়েছে স্থির জলে; তার ফলে জলটাকেও যেন আকাশের মতোই ম্লান লাল রঙের অন্তহীন এক ক্ষেত্র মনে হচ্ছে। এই অসীম গান্ধীর্যের সামনে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অভী।

সরোবরের তীরে তার পায়ের সামনে পড়ে আছে অসংখ্য স্বপ্ন-উপল। অভী নীচু হয়ে তাদের একটাকে তুলে নিল।

প্রত্যশামতোই তার হাত থেকে নুড়িটা ভেসে উঠল শূন্যে। সরোবরের আকাশ যেরকম মৃদু লাল রঙে ভরে আছে, সেইরকম একটা আভা বেরোতে লাগল স্বপ্ন-উপলের শরীর থেকে। ভাসমান নুড়িটা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর রং বদলাতে লাগল দ্রুত— লাল, গোলাপি, হলুদ, নীল, সবুজ। তার সেই আলো প্রতিফলিত হতে লাগল আকাশের গায়ে। অভী জানে, এইবার অদ্ভুত কিছু দৃশ্য দেখাবে তাকে স্বপ্ন-সরোবর।

প্রথম যে ঘটনার ছবি ফুটে উঠল আকাশে, অভী সেটা আগেই দেখেছে। সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে সে দেখল, আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে দুটো মনুষ্য-আকৃতিকে। সে আর উর্মি— তারা দাঁড়িয়ে আছে মাল্যপর্বতে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে। মন্দিরের বেশিরভাগটাই অন্ধকার, শুধু উর্মির হাত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তপদ্মরাগের সাদা আলোয় তৈরি হয়েছে একটা আলোকবৃত্ত; সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন, আর ওদের সামনে বসে আছেন বৃদ্ধা দ্রষ্টাদেবী।

সেই চলচ্ছবিতে অভী দেখতে পেল, মন্দিরের মধ্যে দেবীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে, আর তিনি তার হাতদুটোকে ধরেছেন নিজের দু'হাতে। তাঁর কপালে ঘোর ভ্রুকুটি; তিনি তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত স্বরে বলে চলেছেন, “কিছু বুঝতে পারছিস না তুই, না? নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছিস? আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ, রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস— কেউ শিবের চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি। তুই পেরেছিস। কেন? আজ পর্যন্ত কেউ নরকে গিয়েও একটুও আহত না হয়ে ফিরে আসতে পারেনি। তুই পেরেছিস। কেন? যে মুহূর্তে তুই নরকগহ্বরে পড়ছিলি, তখনই তোর পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একটিও আঁচড় গায়ে না নিয়ে তুই ফিরে এলি। কেন? হিমকুশলতার জন্য? দূর দূর! ভাব, অভী, ভাব। কেন ফিরে এলি তুই?”

তার কোনোক্রমে বলা “কেন”-র উত্তরে দেবী আবার বলছেন, “কারণ তুই একদিন সব ধ্বংস করে দিবি, তাই। নিয়তি তোকে বাঁচিয়ে রাখছে, কারণ একদিন তোকে দিয়ে সে সব ধ্বংস করাবে, তাই। তুই নিজেই সেই ধ্বংস; তুই নিজেই সে সর্বনাশ— তুই জানিস না? তুই বুঝিস না?”

এতদিন পরে এই পুরোনো ঘটনাটা দেখতে দেখতে অভীর কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে-মনে সে চাইছিল, এবার এই দৃশ্য মুছে যাক আকাশ থেকে। কিন্তু স্বপ্ন-সরোবরের আকাশে এখনও ভেসে আছে অতীতের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছবি; দ্রষ্টাদেবীর ঠোঁট কাঁপছে সেই ছবির মধ্যে; তিনি বলে চলেছেন, “আমি তোমার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। ভয়াবহ মৃত্যু। আমি দেখছি, তুই পাশুপতকে জাগিয়ে তুলছিস— শিব যে অস্ত্রে জগৎ সংহার করেন, যে ভয়ংকর শক্তিকে কখনও জাগিয়ে তুলতে নেই, তাকেই প্রাণ দিচ্ছিস তুই। তাকে থামানোর ক্ষমতা গোটা বিশ্বে কারও নেই। ও অস্ত্র প্রলয়ের অস্ত্র— ও জাগলে সব সৃষ্টির বিনাশ।”

থরথরিয়ে কেঁপে উঠে তিনি অভীর হাত ছেড়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সরোবরের আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল দৃশ্যটা।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে অভী জানে, এই স্বপ্ন-সরোবর যেসব দৃশ্য দেখায়, সেগুলো নিতান্ত এলোমেলো নয়; তাদের মধ্যে গভীর কোনো অর্থ থাকেই। দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা আজ তাকে দেখানোর একটাই মানে হতে পারে— সরোবর তাকে মনে করিয়ে দিল, তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। কিন্তু কীভাবে আসবে তার মৃত্যু?

অভী চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আরও কিছু তাকে দেখানো বাকি আছে এই সরোবরের; অতীত দেখিয়েছে, এবার ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা তো দেখাবেই।

তার অনুমান ঠিক প্রমাণিত হল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। আগের দৃশ্যটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশটা সেই হালকা লাল আভায় ভরে গিয়েছিল। এখন আবার যেন ‘দপ্’ করে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল তার গায়ে। অভী বুঝতে পারল, নতুন কোনো ঘটনার দৃশ্য আসতে চলেছে।

যে ঘটনা এবার সে ঘটতে দেখল আকাশজুড়ে, সেরকম কিছুর জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে দেখল, সে দাঁড়িয়ে আছে মৃত দেবতার নদীর তীরে, আর তাকে ঘিরে আকাশ থেকে নেমে আসছে-হাজার হাজার হিংস্র উড্ডীনখর। তার চোখের মণি সাদা হয়ে গেছে; দৃষ্টিশক্তি যে কমে আসছে, নিজের চোখের ওই অবস্থা দেখেই বুঝতে পারল অভী। একটা উড্ডীনখর প্রবল গতিতে নেমে এসে তার দীর্ঘ, ধারালো ঠোঁট দিয়ে আঘাত করল তার হাতে; যন্ত্রণায় কাতরভাবে মুখ বিকৃত করল সে।

দমবন্ধ করে সরোবরের আকাশের গায়ে সেই অসম যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে লাগল অভী। রবিকাকা প্রাণপণে ফুলঝুরি ঘোরাচ্ছে, কিন্তু সে-ও পেরে উঠছে না ওদের সঙ্গে। দশটা মরলে তাদের জায়গা নিচ্ছে আরও পনেরোটা উড্ডীনখর।

পাখিগুলো ঘিরে ফেলছে অভীকে; সে অসহায়ের মতো পড়ে আছে মাটিতে। সকলে মিলে তাদের ওপর নানা অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ করছে বটে, কিন্তু তাতে এই অফুরান বাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতিই হচ্ছে না। সে যেন বুঝতে পারছে, আকাশ থেকে নেমে আসা এই ভয়ানক প্রাণীগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।

ঐশিকরা সম্ভবত এই হিংস্র বাদুড়গুলোকে প্রশিক্ষিত করেছেন এমনভাবে যেন কোনোভাবেই প্রলয়যোদ্ধাকে এরা না ছাড়ে। অভী বুঝতে পারছে, এখান থেকে আজ আর বেঁচে ফেরা হবে না তার।

ঠিক এই সময়েই তার চারদিকে লাফ দিয়ে ছুটে এসে পড়লেন পাঁচ সমরোত্তম। সমরোত্তমরা ঘিরে ফেললেন তাকে। রক্তাক্ত নিধি কিছুটা দূরে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে; নীপাকেও দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। অজস্র উড্ডীনখর মেরে ফেলেছে বহু শিক্ষার্থীকে। তাদের একজনের পেটে ঢুকে আছে একটা একটা উড্ডীনখরের ছুরির মতো লম্বা, ধারালো ঠোঁট— সে ছটফট করছে, ওই অবস্থাতেও তরবারি দিয়ে আঘাত করতে চাইছে দানবিক বাদুড়টার গলায়। বজ্রধর যমদণ্ড শূন্যে তুলে কী যেন বিড়বিড় করছেন। নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী ঘিরে রেখেছেন তাকে। রবিকাকা ফুলঝুরি ঘোরাচ্ছে। অভীর একবার মনে হল, উদ্যতাস্ত্র মেঘবর্ণের দিকে তাকিয়ে নীলাভ্রর চোখে জল।

তারপর এক মুহূর্তের জন্য সব আলোয় আলো হয়ে গেল; তারপরেই অন্ধকার নেমে এল স্বপ্ন-সরোবরের তীরে।

আতঙ্কে অভী কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। এ-ই কি তবে প্রলয়? এইভাবেই কি ধ্বংস হয়ে যাবে তার আয়তন, তার সমরগরিমা, তার বন্ধুরা সবাই? এই সর্বসংহারী ভবিষ্যৎ-ই কি তবে অপেক্ষা করছে তাদের সকলের জন্য?

আর কিছু যদি দেখা যায়, সেই আশায় অপেক্ষা করতে লাগল সে।

দেখা গেল। আবার আলোকিত হয়ে উঠল লালচে আকাশ। অভী দেখল, সে স্থির হয়ে পড়ে আছে মাটিতে; তার চারপাশে অনেকগুলো উড্ডীনখরের মৃতদেহ। আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে, তবে বহু মানুষের চাপা কোলাহল কানে আসছে। দুটো পা এগিয়ে আসছে তার সামনে। কিন্তু ওই পা-দুটো আর ওই হাঁটার ভঙ্গিটা তার ভীষণ চেনা লাগছে। কিন্তু মানুষটাকে যে কে, সে বুঝতে পারছে না, কারণ পা-দুটো ছাড়া আগন্তুকের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

আরও কাছে সেগুলো এগিয়ে আসতে অভী বুঝতে পারল তাদের মধ্যকার অস্বাভাবিকত্বটা। মানুষের পা সেগুলো আদৌ নয়; অত বিশাল কোনো মানুষের পা হতেই পারে না। পা-দুটো যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে অন্তর্লীন অগ্নিপ্রভায়; সেগুলোর মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে, আর সেই আগুনের রেখা ফুটে উঠছে কালো পা-দুটোর গায়ে উজ্জ্বল কমলা শিরা-উপশিরার মতো।

দেখতে দেখতে অভী ভাবল, ‘এ কি সেই দানবটা? সে-ই কি তবে নেমে এসেছে প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে তার শেষ বোঝাপড়া করতে?’

আবার আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো দৃশ্য তাকে দেখাল না স্বপ্ন-সরোবর। অভী ফিসফিস করে বলল, “লীনা... লীনা কোথায়?”

সরোবরের আকাশে আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো। সেই আলোর মধ্যে এবার লীনার বাড়ির ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। লতাকা কিমাকে দেখা যাচ্ছে। বসে বসে দু’হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন তিনি। তাঁর হাতে সেই দংশন-ক্ষতচিহ্ন; রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার থেকে।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেঘবর্ণ। সে বলছে, “লতা, আমাকেও সবকিছু খুলে বলতে পারবে না তুমি?”

লতা কাঁদছেন। “এ-কথা আমি কাউকে কোনোদিন বলতে পারব না। তুমি যদি তার জন্য আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়েও যাও, তাও আমি এ-সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। দোহাই তোমার, তুমি আমার কাছে কখনও জানতে চেয়ো না।”

মেঘবর্ণকে একই সঙ্গে অপমানিত এবং অসহায় লাগছে। অভীর সে দৃশ্য দেখে অস্বস্তি লাগতে শুরু করল।

আকাশের আলোটা নিভল না, কিন্তু অভী দেখল, এর মধ্যেই পটভূমি এবং পাত্রপাত্রী বদলে যাচ্ছে আবার। এবার আকাশে ফুটে উঠছে আকাশলোকের দৃশ্য। সৌজন্য দাঁড়িয়ে আছে; তার সামনে সেই মরা নেকড়েটা পড়ে আছে। অভীকে বাঁচাতে গিয়ে এটার ওপরেই গতবার হৃদয়শর নিক্ষেপ করেছিল লীনা। মরুময়-সহ সব ঐশিক এসে দাঁড়িয়েছেন জন্তুটার সামনে। একটু ঝুঁকে পড়ে তিরটা তুলে নিল সৌজন্য; হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

সৌজন্য বলে উঠল, “নাহ্, এই মেয়ে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।” বলে ঐশিকদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল সে। তারপরেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

দ্রষ্টাদেবীর বলা পাশুপতের কথাটা তার আবার মনে পড়ল। সে বলল, “কিন্তু পাশুপত কই?”

অভী ভেবেছিল, আকাশে বোধহয় আবার কোনো নতুন দৃশ্য ফুটে উঠবে, কিন্তু আকাশ অন্ধকার হয়ে রইল। তার পরিবর্তে স্বপ্ন-সরোবরের জলে একবার আলোড়ন উঠল; বাতাস দিচ্ছে না একটুও, তবু কয়েকটা ঢেউ এসে পড়ল তার পায়ের একদম কাছে। অভীর হঠাৎ মনে হল, সরোবর যেন তাকে কাছে ডাকছে; মনস্থির করে সে এগিয়ে গেল জলের দিকে।

হালকা একটা লালচে বেগুনি আভা আসছে জলের মধ্যে থেকে। তীরে দাঁড়িয়ে অভীর মনে হল একবার জলের দিকে তাকাতে কে যেন প্রবল আকর্ষণে ডাকছে তাকে, আরও কাছে যেতে বলছে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়তেই নিজের মুখের ছায়া দেখতে পেল সে জলের গায়ে। আর তারপরেই মনে হল, তার প্রতিবিম্বকে কেন্দ্র করে প্রবল আলোর একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ যেন ফেটে পড়ছে।

দৃশ্যটা এতটাই অপার্থিব ও অদ্ভুত যে অভীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দ্রুত সরোবরের জলের কাছ থেকে পিছিয়ে এল সে। তার মন বলছে, তার এখানে থাকা নিরাপদ নয়। এই দৃশ্যের মানে কী, সে বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মনে পড়ে গেল, স্বপ্ন-সরোবরে বেশিক্ষণ থাকলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, এমন কথা একবার সে শুনেছিল মায়ের কাছে।

পোশাকের মধ্য থেকে নীল শজ্জাটি বার করে তাতে ফুঁ দিয়ে অপরাজিতাকে ডেকে নিল অভী।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার পাশে এসে দাঁড়াল মহানীলগৃধ্র। তার পিঠে উঠে অভী বলল, “এবার ফিরে চলো, অপরাজিতা।”

সঙ্গে-সঙ্গেই শূন্যে উঠে পড়ল বিরাট পাখিটা। আবার সেই অন্ধকার, বায়ুহীন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর যাত্রা; তারপর অভী দেখতে পেল মাথার ওপর ঝকঝকে চাঁদ আর তারার দল ফিরে এসেছে, মুখে লাগছে হু-হু হাওয়া। এতক্ষণে একটু স্বস্তির শ্বাস নিতে পারল সে।

অপরাজিতা তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল মিত্রভবনের পাশে; তখনও গভীর রাত্রি। সমরগরিমার মাঠে জনপ্রাণী নেই। অপরাজিতার পিঠ থেকে নেমে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাল অভী। একবার তার গালে মাথা ঘষে বিরাট মহানীলগৃধ্র উড়ে গেল অন্ধকার আকাশের দিকে।

তার কক্ষের বাইরের জানালা খোলাই ছিল; সেই জানালা দিয়ে আবার চুপিচুপি নিজের শয়্যায় এসে বসল অভী। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল; একবার উঠে গিয়ে বেশ কিছুটা জল খেয়ে আবার সে বসে পড়ল।

কী ভয়ানক অভিজ্ঞতা হল!

অভী বুঝতে পারছে, তার দিন শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তার চেয়েও তার বেশি চিন্তা হচ্ছে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে। উড্ডীনখররা সদলবলে আক্রমণ করেছে মানে অদূর ভবিষ্যতে ঐশিকরা পূর্ণশক্তিতে সমরগরিমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছেন। সেই যুদ্ধ থেকে তার বহু প্রিয়জনই যে বেঁচে ফিরবে না, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সারাটা রাত তার আর ঘুম এল না। রক্ত-কাদায় মাখামাখি নিধির অবশ হয়ে পড়ে থাকা আর অন্য এক শিক্ষার্থীর পেটে ঢুকে যাওয়া উড্ডীনখরটার তীক্ষ্ণধার, দীর্ঘ চঞ্চু— এই দুটো দৃশ্য বারবার ফিরে আসতে লাগল তার চোখের সামনে। যতই সে ছটফট করতে লাগল, ততই তার দু’হাত ঐশিকদের প্রতি ঘৃণায় ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগল।

চোখের দৃষ্টি আবার ঝাপসা হতে শুরু করল তার। একবার তার মনে হল, নিধিকে ডাকে; এইরকম হঠাৎ-আসা অন্ধত্বের মুহূর্তগুলোতে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয় অভীর। কিন্তু নিধিকে ডাকতে গিয়েও সামলে নিল সে। সারাদিন পরিশ্রমের পর বেচারি একটু ঘুমোচ্ছে— ঘুমিয়ে নিক। চুপ করে দৃষ্টিহীন অভী শুয়ে রইল বিছানায়। তার দুই বাহু বেয়ে জমে উঠতে লাগল বরফের আস্তরণ।

শুয়ে শুয়ে মনটাকে ঐশিকদের চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে অন্যদিকে চালানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। মনে করতে লাগল রবিকাকার সঙ্গে কাটানো তার ছোটোবেলার কথা। একটার পর একটা দৃশ্য এলোমেলোভাবে যাতায়াত করতে লাগল তার চোখের সামনে— বৈকালির জঙ্গলে সে আর রবিকাকা ঘুরছে; ভোরবেলা তাকে ঘুম থেকে তুলে গুড় আর ভেজানো ছোলা খাইয়ে তাদের ছোট বাড়িটার সামনে ব্যায়াম कराচ্ছে রবিকাকা; লীনা আর নিধির সঙ্গে অনুশীলন মঞ্চে বসে গল্প করছে সে; পর্বতের কুকুর বক্রপুচ্ছ রুটি খাচ্ছে তার হাত থেকে; বাবাকে নিয়ে প্রথমবার নরক থেকে ফেরার পর মৃত দেবতার নদীর তীরে পাশাপাশি শুয়ে আছে তারা দু'জন; অপরাজিতার পিঠে চেপে মাল্যপর্বতের মেঘনির্মাণশালার সামনে গিয়ে নামছে সে; মায়ের সঙ্গে পীতপত্রবনে রাতের বেলা বজ্রধরের সমাধির সামনে বসে আছে সে আর বন্যজন্তুগুলো এক-এক করে আসছে ওদের কাছে। ভাবতে-ভাবতেই অভী উপলব্ধি করল, জীবনটায় ভালো স্মৃতির অভাব নেই তার; সত্যিই এমন কিছু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সে পেয়েছে, তারপর যদি মরে যেতেও হয়, আর কোনো আপশোশ থাকবে না তার।

বাইরে ভোর হচ্ছে। অভী হঠাৎ বুঝতে পারল, তার হাতের বরফ তার অজান্তেই গলে গেছে; তার চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেছে; শরীরের তীব্র শৈত্য কখন সরে গিয়ে নিজের মধ্যে বেশ একটা আরামদায়ক উষ্ণ অনুভূতি হচ্ছে। তার ঘৃণাবোধটা এই ভালোবাসার মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন উধাও হয়ে গেছে।

একবার তার মনে হল, এইভাবেই হয়তো ঘৃণাকে ভালোবাসায় বদলে দেওয়ার কথা উর্মি বলেছিলেন তাকে। এ-ই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মায়া।

কে জানে! মায়াবিদ্যা প্রয়োগে কোনোদিনই অভী খুব একটা দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও অধিনায়ক বজ্রধর সবসময় বলে এসেছেন, তার মধ্যে নাকি বড়ো একজন মায়াধর হয়ে ওঠার অনেক গুণ আছে।

সারারাত ঘুম হয়নি, কিন্তু এই খুব ভালো-লাগার অনুভূতিটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে তার। এখন আর একটুও ক্লান্ত লাগছে না। খুশিমনে শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এল অভী।

তার মাথায় আছে, নিধিকে বলতে হবে কথাগুলো। ভবিষ্যতে যে বিপদ আসতে চলেছে, তার পূর্বাভাস যখন পাওয়া গেছে, তখন সতর্ক থাকাই ভালো। শুধু নিধিকে নয়, সমরোত্তমদেরও জানাতে হবে।

কাকে বলা যায়? অভী প্রথমেই অধিনায়ক বজ্রধরকে বাদ দিল। সে আয়তন থেকে লুকিয়ে স্বপ্ন-সরোবরের মতো বিপজ্জনক জায়গায় গিয়েছিল গুনলে অধিনায়ক হয়তো রাগ করতে পারেন। অনেক ভেবেচিন্তে সে দেখল, রবিকাকাকে বলাই ভালো হবে— সব ঘটনা বলা যাবে। মেঘবর্ণকেও বলা যেত; সাধারণত সব কথাই বলা যায় তাকে, কিন্তু তাহলে লতাকাকিমার প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে যেতে হত। ওই ব্যাপারটা নিয়ে মেঘবর্ণের সঙ্গে কথা বলতে তার সংকোচ

হচ্ছে। আর বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজের মৃত্যুর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে তার আদৌ ইচ্ছা নেই। রবিকাকার কাছে তবু মন খুলে কথা বলা যাবে।

আপাতত সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা দু'জন আয়তনের দিকে পা বাড়াল। সেখানে সমরোত্তম স্বর্ণশেখরের খোঁজ করতে রক্ষোবৈদ্য বলে দিলেন, “ওঁকে আর সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে আমি পাঠিয়েছি পর্বতের কাছে। আলোকপর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের আঘাতে পর্বতের খুলিতে তিনটে সরু ফাটল ধরেছে। সে অবশ্য ও-সবের পরোয়া না করে আগের মতো ঘুরে বেড়াতে চাইছিল; আমি কড়া শাসন করে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছি। ওষুধপত্র নিয়ম করে খাওয়ার ব্যাপারে ওর প্রবল অনীহা, কিন্তু ওষুধ না খেলে ওর রোগ বাড়বে বই কমবে না। পর্বত এই আয়তনে সমরোত্তমদের ছাড়া কারও কথা শোনে না; বিশেষ করে সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে ও খুব শ্রদ্ধা করে, হয়তো একটু ভয়ও পায়। তাই ওঁদের দু'জনকে পাঠিয়েছি আমি কয়েকটা ওষুধ দিয়ে। বাকি সমরোত্তমরা সম্মেলন কক্ষে বসে কথা বলছেন। আমি ওখানেই যাচ্ছিলাম; তোমরা চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পারো।”

অভী ভাবল, সে-ও মন্দ নয়; যদি ওখানে থাকতে থাকতে রবিকাকা ফিরে চলে আসে, ভালোই হবে। নিধির দিকে তাকাতে সে-ও মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল। ওরা দু'জনে চলল আয়তনের অলিন্দপথ দিয়ে সম্মেলন কক্ষের দিকে।

যেতে যেতে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “ওখানে এমন একজন আছেন, যাঁকে দেখলে তোমরা হয়তো একটু চমকে যাবে।”

নিধি বলল, “কে?”

রক্ষোবৈদ্য মুচকি হেসে তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, “চলো না দেখবে।”

কক্ষের বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অধিনায়ক, আমরা ভেতরে আসব?”

বজ্রধরে গলা পাওয়া গেল, “আসুন।”

ওদের দু'জনকে নিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন। ওদের দেখে একটু অবাক হয়েই সমরোত্তমরা তাকালেন। কিন্তু তাঁদের চেয়েও বেশি অবাক হল ওরা ভেতরের ব্যক্তিটিকে দেখে।

নিয়ামক বিনীতেশ! শান্তভাবে বসে কথা বলছেন তিনি সমরোত্তমদের সঙ্গে।

অভীদের দেখে মেঘবর্ণ একটু বিস্মিতভাবে বলল, “আচ্ছা, তোমরা এসেছ।”

নিধি কিন্তু-কিন্তু করে অধিনায়ক বজ্রধরের দিকে তাকিয়ে বলল, “ইয়ে, অধিনায়ক, আপনি যদি বলেন, আমরা চলে যাব।”

বজ্রধর হাত নেড়ে বললেন, “তার দরকার নেই। কোনো গোপনীয় আলোচনা হচ্ছে না এখানে। তোমরা চাইলে থাকতেই পারো।”

অগত্যা অভী আর নিধি গিয়ে সমরোত্তম নীলাভ্রর পেছনের আসনে বসে পড়ল। নিয়ামককে এখানে দেখে দু'জনেই হাঁ হয়ে গেছে। ওদের মুখের অবস্থা দেখে নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ দু'জনেই মুচকি হাসল।

অধিনায়ক বজ্রধর নিয়ামকের দিকে ফিরে বললেন, “তাহলে আপনার রক্ষীপ্রধান চক্রবাক এখন ঘন-ঘন সুদক্ষিণসারিতে যাতায়াত করছে, এ-ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না?”

অভী বুঝতে পারল, মেঘবর্ণ চক্রবাক আর ফলদোকানি অর্ধরাক্ষস সুচিত্রর ব্যাপারটা অধিনায়ককে ইতোমধ্যেই জানিয়েছে। নিয়ামক হাত উলটে বললেন, “চক্রবাক একজন স্বাধীন মানুষ। সে আমার অনুগত কর্মচারী ঠিকই, কিন্তু সে কোথায় কখন যাচ্ছে, আমাকে সবসময় জানাবেই বা কেন?”

বজ্রধর বললেন, “আসলে অর্ধরাক্ষসদের ওপর আপনি বা চক্রবাক— কেউই খুব একটা প্রসন্ন নন বলেই জানি। তাই একটু অদ্ভুত লাগছে এই ব্যাপারটা।”

নিয়ামক বললেন, “আমি এ-ব্যাপারে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারব না। চক্রবাক নিশ্চয়ই সুদক্ষিণসারিতে গিয়ে কোনো অন্যায় করেনি? তাহলে এত কথা আসছে কেন?”

নীলাভ্র বলল, “না, এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলার নেই আমাদের। কিন্তু একটা কথা, নিয়ামক মহোদয়। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে সম্মুখসমরে নামার জন্য ঐশিকরা এক অগ্নিদানবকে তৈরি করছেন?”

নিয়ামক মাথা নেড়ে বললেন, “শুনেছি।”

নীলাভ্র বলল, “সেই অগ্নিদানবকে সদ্য মানবমন্দিরে দেখা গেছে, আপনি জানেন?”

এবার একটু চমকে গেলেন নিয়ামক। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “এটাও শুনেছি। চক্রবাকের কাছে।”

নীলাভ্র এইবার বিস্ফোরণটা ঘটাল। “আমরা তো সংবাদ পেলাম, কাল রাতে আপনার কার্যালয়ের পেছনের দরজার সামনে দানবটাকে দেখা গেছে।”

নিয়ামক স্পষ্টতই ঘামতে লাগলেন। “আমি... আমি কী ব-রে জানব সে-সব?”

মেঘবর্ণ কড়াগলায় বলল, “আপনার কার্যালয়ের সামনে দানবটা চলে এল, আর আপনি জানেন না?”

“এ-সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা। কে দেখেছে ওটাকে?”

নীলাভ্র বলল, “প্রত্যক্ষদর্শী আছে। ছায়াভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্ধরাক্ষস সঞ্জীব কাল ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বচক্ষে দেখেছে দানবটাকে। আপনার কার্যালয়ের ওখানে কী করছিল ওই দানব, নিয়ামক মহোদয়?”

“সব বাজে কথা!” নিয়ামক চোঁচিয়ে উঠলেন। “সঞ্জীব একটা অর্ধরাক্ষস। ও এর আগে শর্বরকে সমর্থন করেছিল। ওর কথার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই।”

বজ্রধর হাত তুলে নীলাভ্র আর মেঘবর্ণকে থামতে ইঙ্গিত করলেন। বোঝাই যাচ্ছে, নিয়ামক সম্ভবত এ-ব্যাপারে কিছু জানেন, কিন্তু তিনি স্বীকার করবেন না।

ঠিক এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। বজ্রধর বললেন, “বোধহয় শ্যামশ্রী আর স্বর্ণশেখর ফিরল।”

অভী উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই যে ভেতরে এসে ঢুকল, তাকে দেখে সম্মেলন কক্ষের সবাই বাক্যহারা হয়ে গেল।

সৌজন্য!

কক্ষের মধ্যে এসে খুব বিনয়ের সঙ্গে মাথা বাঁকিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে উঠল, “আমাকে দেখে সকলে খুব অবাক হয়েছেন দেখছি। কেমন আছেন সবাই?”

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অভী হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। লোকটার সাহস এবং স্পর্ধা দেখে সে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সৌজন্য আবার বলল, “অনেকদিন পর পুরোনো ঘাঁটিতে ফিরে ভালোই লাগছে। নিয়ামক মহোদয়কে সুস্থ শরীরে দেখলাম বহুকাল পরে। ভালো আছেন তো?”

নিয়ামক অবরুদ্ধ স্বরে গোঁ-গোঁ করে কী একটা বললেন, বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি যে সৌজন্যের ওপর খুব একটা প্রসন্ন নন, তা বুঝতে অসুবিধা হল না। সৌজন্য তাঁকে দীর্ঘকাল ধরে অল্পমাত্রায় বিষপ্রয়োগ করছিল, তা তিনি ভোলেননি।

অধিনায়ক বজ্রধর শান্ত কণ্ঠে বললেন, “এসে পড়েছ যখন, আসন গ্রহণ করো, সৌজন্য। কিছু বক্তব্য নিশ্চয়ই নিয়ে এসেছ তুমি। বলো, আমরা শুনতে আগ্রহী।”

সৌজন্য বসে পড়ল অধিনায়কের মুখোমুখি। “ধন্যবাদ, মাননীয় অধিনায়ক বজ্রধর। আগেই বলে রাখি, আমি নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছি। আশা করি, এখানে আসার অপরাধে আমাকে বন্দি করে মাল্যপর্বতের রাজার হাতে তুলে দেবেন না আপনারা।”

বজ্রধর বললেন, “মাল্যপর্বতের সঙ্গে আমাদের এই মুহূর্তে মিত্রতার পরিস্থিতি বজায় আছে। সমরগরিমাতেও তোমার অপরাধ কম নয়, সৌজন্য। সেইসব অপরাধের জন্য তোমার কোনো শাস্তি এখনও হয়নি। কিন্তু এইটুকু ভরসা আমি তোমাকে দিচ্ছি, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। এতখানি বিপদ জেনেও তুমি যখন এসেছ, তার মানে তোমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই বলার আছে। তোমার সব বক্তব্য শুনে তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব।”

সৌজন্য বলল, “অতি উত্তম। আমি সরাসরিই বলি, আপনাদের কাছে আসার পেছনে আমার একটা স্বার্থ আছে।”

মেঘবর্ণ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, “ওটি তোমার কোন কাজে থাকে না?”

সৌজন্যও একটু হেসে বলল, “সবার সব কাজের পেছনেই কিছু না কিছু স্বার্থ থাকে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আমি কেবল সে-কথা সগর্বে স্বীকার করি, আর অন্যরা করে না— বাকিদের সঙ্গে আমার পার্থক্য এইটুকুই। সে যা-ই হোক, আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি— একটা সাহায্যের অনুরোধ।”

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল অভী; সে বুঝতে পারছিল, এই লোকটাকে দেখে অসম্ভব রাগ হচ্ছে তার। আবার তার হাত ঠান্ডা হয়ে যেতে শুরু করল। এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, “তুমিই দায়ী উর্মির মৃত্যুর জন্য— অস্বীকার করতে পারো এ-কথা?”

সৌজন্য বলল, “অস্বীকার করছি না তো। কিন্তু তার ওপর কোনো ব্যক্তিগত রাগ আমার ছিল না। সিংহাসন দখল করার জন্য উর্মির বাবা আমাকে বিষ

খাইয়েছিলেন, এটা তো জানো? উর্মির সঙ্গে আমি যা করেছি, তাকে তার বাবার আচরণের প্রত্যাঘাত বলে ভেবে নিলে ক্ষতি কি? তার বাবা আমাকে আঘাত করেছেন, আমি আমার মতো করে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছি। রাজনীতিতে এ-সব জিনিস তো হয়েই থাকে। কিন্তু অভী, তুমি আমার শত্রু নও।”

“তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে।”

নির্লজ্জের মতো হাসল সৌজন্য। “হে-হে... সে আমি কাকেই বা চাইনি? কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি বেঁচে থাকলেই আমার লাভ, তাই তুমি আমাকে ‘শত্রু’ ভাবলেও আমি কিন্তু তোমাকে তা ভাবছি না। সেই কারণেই আলোকপর্ণ কী করতে চলেছে, তার আভাস দিয়ে রেখেছিলাম, যাতে সমরগরিমার সমরোত্তমরা রক্ষা পান। দিই নি? তুমিই বলো।”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল; সৌজন্য যে সত্যিই তাদের সাবধান করে দিয়েছিল আলোকপর্ণের ব্যাপারে, এটা তো ঠিক। বজ্রধর হাত তুলে অভীকে শান্ত থাকতে ইশারা করলেন।

তবু অভী যেন কিছুতেই তার রাগ সামলাতে পারছিল না; তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হতে শুরু করেছিল। অবস্থা বুঝে নীলাভ্র উঠে গেল; ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে তার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া হাতদুটোকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হিমকুশলতাকে রুদ্ধ করার মায়া প্রয়োগ করল সে। ধীরে-ধীরে অভীর হাতের উষ্ণতা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল; চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল।

সৌজন্য পুরো দৃশ্যটা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে দেখছিল। অভী শান্ত হতে সে বলল, “আমার প্রস্তাবটা এবার বলি। আপনারা আমাকে একবার গোপনে পৌঁছে দিতে পারবেন রক্ষোপুরীতে?”

প্রস্তাব শুনে সবাই আর একপ্রস্থ হতবাক হলেন। বজ্রধর বললেন, “তুমি ওখানকার শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধী এবং পলাতক। এখন ওখানে গেলে তোমার প্রাণের দাম আর কিছু থাকবে?”

সৌজন্য বলল, “সেইজন্যই আমাদের লুকিয়ে যেতে হবে রক্ষোপুরীতে।”

মেঘবর্ণ বলল, “আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। ‘আমাদের’ মানে? তুমি কি ধরেই নিয়েছ আমরা প্রতিবেশী রাজ্যের আইন ভেঙে সেখানে গোপনে ঢুকতে তোমাকে সাহায্য করব?”

সৌজন্য মুচকি হেসে বলল, “এতে আপনাদেরই লাভ। আমি যদি খুব দ্রুত ওখানে পৌঁছতে না পারি, তাহলে মাল্যপর্বতের সঙ্গে আপনাদের যে সুসম্পর্ক ইদানীং তৈরি হয়েছেন, সেটি অচিরেই পরলোকগত হবে।”

বজ্রধর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “ব্যাখ্যা করে বলো।”

সৌজন্য বলল, “আপনারা জানেন না, কিন্তু আমার কাছে পাকা খবর আছে— ওখানে মরুময়, বিমোহক রাক্ষসদের প্ররোচনা দিয়ে রাজা পুনর্বসুকে অবিলম্বে সিংহাসনচ্যুত করার এবং হত্যা করার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। রাজা যেহেতু প্রশাসনিক বেশ কিছু ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করেছেন, তাই এইভাবে বদলা নিতে চাইছেন মরুময়।”

নীলাভ বলল, “কিন্তু তোমার এতে স্বার্থ কী, সৌজন্য? স্বার্থ ছাড়া কোনো কাজ তুমি কর, এমন দুর্নাম তোমার নেই বলেই তো জানি।”

সৌজন্য বলল, “স্বার্থ আমার আছে বইকি। রাজা পুনর্বসু আমার প্রতিপক্ষ; তবু বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার যা বামেলা, সে আমি পরে বুঝে নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে মরুময় রাজাকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসতে চাইছেন। মাল্যপর্বতের মেঘ যেহেতু ওঁর নিয়ন্ত্রণে, তাই পত্রতিলক বা বিমোহকদের কেউ ইচ্ছা থাকলেও আপত্তি করতে পারবে না। সেই কারণেই আমি চাই রাজাকে সাবধান করে দিতে।”

তার কথাগুলো অভীর বিশ্বাস হচ্ছিল না। সৌজন্য নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছে; এ-সবের পেছনে ওর নির্ঘাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তার মনে পড়ল, কিছুদিন আগে মাল্যপর্বতের মেঘনির্মাণশালায় যখন শেষমুখের সঙ্গে তার একটা সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল, তখন মরুময় তাকে বলেছিলেন, নিজে সিংহাসনে বসার চেয়ে সিংহাসনে বসা লোকটাকে চালনা করতেই তিনি বেশি আগ্রহী। সেই মরুময় আজ হঠাৎ করে রাজা পুনর্বসুকে অপসারিত করে সিংহাসনে বসতে চাইছেন, এটা যেন সে মেনে নিতে পারছিল না।

সমরোত্তমরাও যে খুব একটা বিশ্বাস করেছেন সৌজন্যকে, তা মনে হল না অভীর। বজ্রধর বললেন, “রাজাকে তো জটায়ু পাঠিয়েই সাবধান করা যায়।”

সৌজন্য একটু হেসে বলল, “মরুময় অত বোকা নন। মাল্যপর্বতে রাজার কাছে যত চিঠিপত্র আসে, সব আগে মরুময়ের হাতে পড়ে। তারপর তিনি সেগুলোকে রাজার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। জটায়ু পাঠিয়ে রাজাকে সাবধান করতে গেলে মরুময় আগাম খবর পেয়ে যাবেন, নিশ্চিত জেনে রাখুন। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে নিয়ে যান, তাহলে আমি রাজার মুখোমুখি বসে তাঁকে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে সাবধান করে দিতে পারব। আমি যেহেতু আকাশলোক থেকে আসছি, তাই মরুময়-সহ ঐশিকদের সব পরিকল্পনা আমার জানা।”

অধিনায়ক বজ্রধর তাঁর দুই সমরোত্তমের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন তাদের মুখের ভাব। নীলাভ আর মেঘবর্ণের মুখগুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে, সৌজন্যের একটা কথাও বিশ্বাস করেনি তারা। নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে দেরি হল না বজ্রধরের। “সৌজন্য, আমি দুঃখিত। তোমাকে এ-বিষয়ে কোনো সাহায্য আমরা করতে পারছি না।”

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সৌজন্য— যেন এর জন্য সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। “যা আপনি ভালো বোঝেন, অধিনায়ক বজ্রধর। আমি তবে বিদায় নিচ্ছি। যাওয়ার আগে, অভী, তোমার সঙ্গে একান্তে দু’-একটা কথা বলা যাবে?”

অভী অধিনায়কের দিকে তাকাল। তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। “যাও, অভী। কক্ষের বাইরে অলিন্দে গিয়ে কথা বলে এসো ওর সঙ্গে। সৌজন্য, তোমাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ তুমি আমাদের বন্দি নও। তবে ভবিষ্যতে এইরকম আকস্মিক ভ্রমণে এলে আমরা তখন হয়তো রাজা পুনর্বসুকে সংবাদ দেব, সে-কথা আগে থেকেই তোমাকে জানিয়ে রাখছি।”

ছদ্মবিনয়ের সঙ্গে আভূমিনত হয়ে সম্মানজ্ঞাপন করল সৌজন্য।

অভী ভেবে পাচ্ছিল না তার সঙ্গে এই বদমাশটার আর কী কথা থাকতে পারে। তবু সে অধিনায়কের আদেশমতো বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। সৌজন্য আবার সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল।

অভী কিছু একটা বলার জন্য হাঁ করেছিল, কিন্তু তাকে সে সুযোগ দিল না সৌজন্য। দরজাটা বন্ধ করেই অভীর দিকে ফিরে সে বলে উঠল, “অভী, আমার কাছে লীনার খবর আছে।”

এবার অভীর হাঁ-টা বন্ধ হতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

তার মনে পড়ে গেল স্বপ্ন-সরোবর কাল তাকে দেখিয়েছে, সৌজন্য ঐশিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে আকাশলোকে; তার হাতে লীনার নিক্ষেপ করা হৃদয়শরটা। তিরটা হাতে নিয়ে সে বলেছিল, “এই মেয়ে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।”

স্বপ্ন-সরোবর তো ভুল দেখায় না কখনও। তাহলে কি সত্যিই সৌজন্যের কাছে লীনার সংবাদ আছে?

অভী বলল, “কী খবর?”— বলতে গিয়ে নিজের গলা কেঁপে যাওয়াটা নিজেই বুঝতে পারল সে।

সৌজন্য চক্ষু বিস্ফারিত করে বলল, “আছে, আছে; দারুণ খবর আছে। কিন্তু সে-খবর পাবে, যদি আমাকে গোপনে মাল্যপর্বতের রাজপুরীতে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে পারো। আমি গোড়া থেকেই জানতাম, সমরোত্তমরা আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন না। ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসাটাকে নিতান্ত অছিলা বলতে পারো। আমি তো জানি, আমাকে যদি কেউ ওখানে সত্যিসত্যি নিয়ে যেতে পারে, সে ব্যক্তি তুমি। আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আকাশলোক থেকে সমরগরিমায় এসেছিলাম আজ।”

বেশ কিছুক্ষণ ভাবল অভী। সৌজন্য কোনোরকম ফাঁদ পাতছে না তো? লীনার নামটা ইচ্ছা করে ব্যবহার করে তাকে দিয়ে কোনো বিপজ্জনক কাজ করিয়ে নিতে চাইছে না তো ব্যাটা? সমরোত্তমরা সবাই ‘না’ বলেছেন। এই অবস্থায় তাঁদের কথা অমান্য করে সৌজন্যের সঙ্গে মাল্যপর্বত যাওয়াটা কি আদৌ ঠিক হবে?

কিন্তু লীনা...!

অবশেষে কৌতূহলেরই জয় হল। লীনার সম্বন্ধে যদি সত্যিই কোনো সংবাদ পাওয়া যায়! সৌজন্য তো অপার শক্তিশালী মায়াধর ঐশিকদের সঙ্গে থাকে; যদি লীনাকে ফিরিয়ে আনার কোনো কৌশল ওঁদের কাছ থেকে সত্যিই সৌজন্য জেনে থাকে!

ভেবেচিন্তে অভী বলল, “কিন্তু যেতে যদি হয়ও, আমরা যাব কীভাবে? অধিনায়ক-সহ সব সমরোত্তম আমাদের নিষেধ করেছেন; তাই জটায়ু ব্যবহার করা যাবে না। পায়ে হেঁটে তো যাওয়া অসম্ভব। ওখানে প্রহরীরাও তোমাকে দুর্গদ্বার পেরিয়ে ঢুকতে দেবেই না; দেখলেই ওদের হাতে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। তাহলে?”

“উপায় আছে।” সৌজন্য হাসল রহস্যময়ভাবে। “তুমি ছাড়া সে-উপায় বাস্তবায়িত করা অবশ্য আমার একার পক্ষে কঠিন।”

“কী বলতে চাইছ, খুলে বলো, সৌজন্য। আমরা সবার নজর এড়িয়ে রক্ষোপুরীতে যাব কীভাবে?”

সৌজন্য বলল, “বেশি কিছু না, আমাদের শুধু একটা নরকগহ্বর আহ্বান করতে হবে।”



।। নবম অধ্যায় ।।

গহ্বরযাত্রা

সৌজন্য যে কেন তাকে বাইরে আলাদা করে ডেকে কথা বলতে চেয়েছিল, সে-বিষয়ে সত্যিটা अभी কাউকে বলতে পারেনি— বাবাকে ছাড়া।

সে বাকিদের বলেছে, সৌজন্য তার সঙ্গে তার আগের আচরণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করার জন্য তাকে ডেকেছিল। আসল কারণটা সে বাবাকেও হয়তো বলত না, কিন্তু বলতে হয়েছে একটাই কারণে— তার বাবাও একজন হিমকুশল।

বাবাকে সব জানানোর আগে সৌজন্যের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে তার। প্রথমটা अभी বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, নরকগহ্বরের মতো ভয়ানক জায়গা, যেখানে একবার পড়লে নিতান্ত অলৌকিক ঘটনা ছাড়া বেঁচে ফিরে আসা অসম্ভব বললেই চলে, সেইরকম জায়গায় স্বেচ্ছায় ঢুকে মাল্যপর্বত যেতে চাইছে সৌজন্য।

তার কথা শুনে সৌজন্য বলল, “আদৌ অসম্ভব কথা বলছি না আমি। খেয়াল করে দেখেছ কি, নরকগহ্বরে এক জায়গা দিয়ে ঢুকে অন্য কোনো জায়গায় বেরিয়ে আসা যায়?”

অভী ভেবে দেখল, কথাটা ভুল নয়। তার নিজেরই দু'বার ওই ধরনের গহ্বরে ঢোকার অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমবার, শর্বরযুদ্ধের সময় সে নরকে গিয়েছিল সমরগরিমা আয়তনের মাঠ থেকে, আর বেরিয়েছিল মৃত দেবতার নদীর তীরে; দ্বিতীয়বার, সে সৌজন্যেরই আহ্বান করা গহ্বরে পড়েছিল মালাপর্বতে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে, আর বেরিয়েছিল সমরগরিমায় পীতপত্রবনে। তাহলে ওর পরিকল্পনা যতটা অসম্ভবই শোনাৎ, তার মধ্যে সারবস্তু আছে।

সৌজন্য বলল, “তোমাকে আগেও একবার বলেছিলাম বোধহয় যে নরকগহ্বর নিয়ে একসময় তোমাদের গ্রন্থাগারেই প্রচুর গবেষণা করেছিলাম আমি। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই নরকগহ্বর দিয়ে অনেকটা দূরত্ব খুব অল্প সময়ে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু ওই মারাত্মক নরকাগ্নির তাপের মধ্যে দিয়ে এই পথসংক্ষেপ করতে গেলে তোমাকে দরকার, কারণ তুমি খুব শক্তিশালী হিমকুশল। বলেছিলাম না, আমার নিজের স্বার্থ আছে তোমাদের রক্ষা করার?”

অভী বলল, “নরকগহ্বরের মধ্যে আমি নিজের শরীরকে হয়তো শীতল করে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব?”

সৌজন্য বলল, “সমরোত্তম নীলাভ তাঁর নিজের হাত থেকে তাপ দিয়ে তোমার হাতের শীতলতা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন একটু আগে, আমি দেখলাম। হিমকুশলতাকেও ওইভাবে প্রয়োগ করা যায়। দু'জন হিমকুশল দু'দিক থেকে শৈত্যপ্রয়োগ করলে অন্য একজন অহিমকুশলকেও তাঁরা প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন।”

অভী হাঁ করে বলল, “দু'জন... মানে...!”

সৌজন্য দুষ্ট হাসি হেসে বলল, “বললাম না, তোমাকে আমার খুব দরকার? পারলে তুমিই পারবে তোমার বাবাকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। নরকের ওই অমানুষিক তাপের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করতে হলে আমি দু'জন হিমকুশলের সুরক্ষা নিয়ে যেতে চাই। তাই সমরোত্তম নীলাভকেও এই যাত্রাপথে আমার দরকার।”

অভী বলে উঠল, “অসম্ভব! বাবা কিছুতেই রাজি হবে না।”

সৌজন্য বলল, “হবেন। অভী, তোমার সমস্যা কী জানো? তুমি মনুষ্যচরিত্র বড়ো কম বোঝো। একটা মানুষ কী কাজ করছে, সেগুলো যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করো, তাহলে সেই মানুষটা কী করতে পারে আর কী পারে না, তার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তোমার বাবার কাজগুলো তাঁর চরিত্রের সাপেক্ষে কখনও ভেবে দেখেছ?”

“কী বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি না।”

“তুমি বেশ বোকা ছেলে, আমি জানি। ভেবে দেখো, প্রথম শর্বরযুদ্ধের সময় যখন অন্য কেউ ভাবতে পারেনি, তখন সমরোত্তম নীলাভ আত্মবলিদান দিয়ে স্বেচ্ছায় নরকে চলে গিয়েছিলেন। আমি যখন এখানে সহকারী নিয়ামকরূপে কাজ করছিলাম, তখন ওঁকে কাছ থেকে খুব ভালো করে দেখেছি। ওঁর সবচেয়ে

বড়ো দুর্বলতা, উনি অন্যদের— বিশেষ করে দুর্বলের কষ্ট উপেক্ষা করতে পারেন না; তাই বারবার উনি অর্ধরাক্ষসদের সাহায্য করতে ছুটে যেতেন। আর একটা ব্যাপার আমি খেয়াল করেছি; সেটা হল তোমার প্রতি ওঁর নিখাদ ভালোবাসা। সমরোত্তম নীলাভ বা শ্যামশ্রীর মতো বাবা-মা-রা যদি জানতে পারেন তাঁদের সন্তান বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাঁরা তাকে সাহায্য করবেন। ভুল বলছি?”

অভী চুপ করে রইল। ধূর্ত সৌজন্য সত্যিই তার বাবার চরিত্রটাকে খুব ভালো করে বুঝেছে।

সৌজন্য আবার বলল, “সেই কারণেই তোমাকে রাজি করানোটা আমার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। আমি জানি, তুমি রাজি হলে নিজের উদ্যোগেই তুমি তোমার বাবাকে রাজি করাবে।”

অভী বলল, “আমি বলে দেখব, এইটুকু বলতে পারি। কিন্তু বাবা রাজি হবে কি না, সে-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।”

সৌজন্য নিশ্চিত সুরে বলল, “হবেন, হবেন। তিনি রাজি না হলে লীনার খবর পাবে কী করে তুমি?”

অভী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। সে বুঝতে পারছে, সৌজন্য তাকে খুব অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতিতে ফেলেছে। সবাইকে লুকিয়ে নরকগহ্বরের মতো ভয়ানক জায়গা দিয়ে মাল্যপর্বত অভিযান করার কথা শুনলেই বাবা ঘোর আপত্তি করবে, অথচ লীনার সম্বন্ধে সৌজন্যের কাছে কী সংবাদ আছে, সেটা না জানলেও নয়। কপাল ঠুকে অভী অপেক্ষা করতে লাগল বাবাকে একটু একা পাওয়ার জন্য।

এখন নিধিকেও কিছু জানানো যাবে না; সৌজন্য নিষেধ করেছে। অভী ভাবল, পরে নিধি যখন শুনবে লীনার জন্য সে এই কাজ করেছে, তখন নিশ্চয়ই সে-ও রাগ করে থাকতে পারবে না। তবু কথাগুলো নিধিকে বলার জন্য তার মনটা উশখুশ করতে লাগল।

নীলাভকে ফাঁকা পাওয়া গেল দুপুরের দিকে। গ্রন্থাগারে সে একাই বসে বসে বই পড়ছিল, এমন সময় অভী তার পাশে গিয়ে বসল। “বাবা, একটা কথা ছিল।”

বই বন্ধ করে নীলাভ তাকাল তার দিকে। “কী কথা রে?”

অভী একটু কিস্ত-কিস্ত করে বলল, “ইয়ে, লীনা...”

নীলাভ অবাক হয়ে বলল, “লীনা! কী ব্যাপার বল তো?”

“একজন আমাকে বলেছে, তার কাছে লীনার ব্যাপারে কিছু খবর আছে।”

“কী খবর?”

“কী খবর, এখনও জানি না। কিন্তু তার একটা কাজ করে দিলে সে খবরটা আমাকে দেবে বলেছে।”

নীলাভ সোজা হয়ে বসে বলল, “এই ‘একজন’-টি কে, শুনি?”

“সৌজন্য।”— নামটা বলেই মাথা নীচু করল অভী।

নীলাদ্র অবাক হয়ে বলল, “অভী, তুই এত বোকা হয়ে যাচ্ছিস কেন? সৌজন্য একটা বিশ্বাসঘাতক সাপ, তুই জানিস না? ও তোকে বলেছে ওর কাছে লীনার খবর আছে? আর তুই সেটা বিশ্বাস করেছিস? ওরে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওই লোকটা পারে না, হেন কাজ নেই। ও জানে, লীনা তোর খুব দুর্বল একটা জায়গা; তাই সেই জায়গায় ঘা দিয়ে ও নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাইছে। লীনার সংবাদের বিনিময়ে কী চেয়েছে ও? ওকে মাল্যপর্বতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে?”

অভী মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

নীলাদ্র বলল, “ওখানে ঢুকতে গেলেই তো রাজা পুনর্বসু ওকে ফাঁসিতে চড়াবেন। তুই যদি ওর সঙ্গে থাকিসও, তাহলেও কি রাজা ওকে ছেড়ে দেবেন?”

অভী আমতা-আমতা করে বলল, “সেইজন্যই তোমাকেও সঙ্গে থাকতে বলছে ও।”

নীলাদ্র ঙ্গ কুঁচকে বলল, “আমি? আমি সঙ্গে থেকে কী করব?”

অভী মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, “ও বলছে, একটা নরকগহ্বর আহ্বান করে তার মধ্য দিয়ে সবার নজর এড়িয়ে মাল্যপর্বতের প্রাসাদে ঢোকা যেতে পারে। আর সেই গহ্বরের প্রচণ্ড তাপ থেকে ওকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা দু’জন হিমকুশল ওর সঙ্গে থাকব।”

নীলাদ্র হ্যাঁ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, “কতটা মরিয়া হলে একটা লোক এমন উন্মাদের মতো চিন্তা করতে পারে, ভেবে দেখ একবার। আর নিজের প্রাণের এতখানি ঝুঁকি নিয়ে ও যাবে শুধু রাজাকে মরুময়ের ব্যাপারে সাবধান করতে? হতেই পারে না। জেনে রাখ অভী, সৌজন্যের মতো লোকেরা সবার আগে নিজের স্বার্থের কথা ভাবে। রাজার উপকারের জন্য এতখানি উতলা হওয়ার পাত্র ও নয়, যদি না এর পেছনে ওর গোপন কোনো উদ্দেশ্য থাকে।”

অভী বলল, “আমারও এ-কথা মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু বাবা, লীনার কোনো খবর সত্যিই যদি ওর কাছে থাকে! সত্যিই যদি তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় এখনও থাকে...!”

নীলাদ্র কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, “স্বয়ং অধিনায়ক বজ্রধর ওর এই প্রস্তাবে ‘না’ বলেছেন। এখন আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই, তাহলে ব্যাপারটা তাঁর আদেশ অমান্য করা হয়ে যাবে না?”

অভী চুপ করে রইল। এই চিন্তাটা তাকেও যথেষ্ট পীড়া দিচ্ছে।

তার গুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নীলাদ্র বলল, “চিন্তা করিস না, বাবা। আমি যাব তোর সঙ্গে।”

অভী একই সঙ্গে অবাক এবং খুশি হয়ে উঠল। “সত্যি?”

“হুঁ। তোকে তো আর ওই বদমাশটার সঙ্গে একলা ছেড়ে দিতে পারি না। তবে তোর মা-কে বা অন্য কাউকে কিছু বলিস না এখন। আমরা ফিরে এসে

তারপর ওদের সব জানাব। লীনাকে ফিরিয়ে আনার সত্যিই যদি কোনো উপায় হয়, তাহলে আমি তো খুশি হবই, একই সঙ্গে মেঘেরও লতার সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেটার একটা সমাধান হবে।”

অভী মাথা নাড়ল। লীনার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই যে লতাকাকিমার সঙ্গে মেঘবর্ণের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, সে জানে।

নীলাভ আবার বলল, “সঙ্গে অস্ত্র নিবি অবশ্যই। চন্দ্রহাস নেওয়া যাবে না। ওই দৈবাস্ত্রকে যদি সংগ্রহশালায় দেখা না যায়, সবাই বুঝে যাবে তুই ওটা নিয়ে কোথাও গেছিস। বড়ো কোনো অস্ত্রও সঙ্গে নিবি না। রাক্ষসদের প্রাসাদে যাচ্ছি আমরা, সঙ্গে আছে সৌজন্য— এই অবস্থায় প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বৃহৎ অস্ত্র না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে নিরস্ত্র অবস্থায় ওখানে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই। এমন অস্ত্র সঙ্গে নিবি, যেটা লুকিয়ে রাখতে পারবি।”

গতবার মাল্যপর্বতে গিয়ে প্রজ্ঞার হাতে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রগুলোর কথা ভাবতেই তার মনে পড়ে গেল, উর্মি যে হিরার তৈরি ছুরি দিয়ে নিজের বুকে বিদ্ধ করে রক্তপদ্মরাগ বার করে এনেছিলেন, সেই অসম্ভব ধারালো ছুরিটি এখনও তার কাছেই আছে। তার মনে পড়ল, সে একবার প্রজ্ঞার কাছেই শুনেছিল, ওই ছুরি দিয়ে আঘাত করলে পাথরও দু’টুকরো হয়ে যায়, আর বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেলে ওর মধ্যে সর্বভেদক মায়াশক্তি জন্মায়। মনে মনে খুশি হল অভী— এমন একটা অস্ত্র কাছে থাকলে কঠিন প্রতিপক্ষেরও মহড়া নেওয়া যাবে।

সে বলল, “হ্যাঁ বাবা, আমি সশস্ত্র হয়েই যাব।”

নীলাভ বলল, “বেশ, তাহলে সৌজন্যকে বলে দে, আজ বিকেলেই আমরা যাত্রা করব। ও যেন পীতপত্রবনে গিয়ে অপেক্ষা করে। নরকগহ্বর আত্মহান করতে হবে তো; সেই মায়ার প্রয়োগ সবার চোখের সামনে না হওয়াই ভালো।”

অভী ঘাড় নাড়ল। একবার তাকে মিত্রভবনে যেতে হবে উর্মির ছুরিটা আনার জন্য। সে মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছে, নিধিকে সব কথা জানিয়েই যাবে সে। কিন্তু মুখে নয়; একটা চিঠি লিখে মুখবন্ধ খামে ভরে সে দিয়ে আসবে মিত্রমাসির কাছে। নীলাভ বলে দিল, “সৌজন্যকে খবর দিয়ে তুই পীতপত্রবন যেখানে শুরু হচ্ছে, সেইখানে অপেক্ষা কর গিয়ে। আমি যাচ্ছি।”

বাবার কথায় সায় দিয়ে সৌজন্যকে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে মিত্রভবনের দিকে ছুটল অভী। নিজের কক্ষে এসে তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখে ফেলল সে। সৌজন্যের সঙ্গে তার কথোপকথনের সারাংশটুকু লিখে সে জানিয়ে দিল, তারা তিনজন নরকগহ্বরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে মাল্যপর্বতের উদ্দেশে। যদি তারা দু’দিনের মধ্যে না ফেরে, তাহলে নিধি যেন অধিনায়ক বজ্রধরকে পুরো বিষয়টা জানায়।

চিঠি লিখে খামে ভরে সেটা মিত্রমাসির হাতে দিয়ে হিরার ছুরিটা নিয়ে আবার জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল অভী। সৌজন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে; তাকে দেখে হাসল সে। অভী গম্ভীর মুখে তার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা গাছের তলায় বসল।

নীলাভ্র এসে পড়ল অলঙ্করণের মধ্যেই। তাকে দেখে সৌজন্য একগাল হেসে নমস্কার জানাল। “আপনার তুলনা নেই, সমরোত্তম নীলাভ্র। আমি যদি কখনও রাজা হতে পারি, আপনার এই ঋণ আমি ভুলব না।”

নীলাভ্র বলল, “ঢের হয়েছে। এবার নরকগহ্বরটি আহ্বান করো দেখি। তোমার শরীরেই সবচেয়ে বেশি রাক্ষসরক্ত আছে— এ-কাজ তুমিই সবচেয়ে ভালো পারবে।”

“যা বলেছেন।” বলে সৌজন্য কিছুটা এগিয়ে গেল বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার দিকে। অভী স্থিরচোখে দেখতে লাগল তার মায়াপ্রয়োগ।

ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সৌজন্য নরকগহ্বর আহ্বান করার মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। অভী দেখল, তাদের সামনে জঙ্গলের মাটির ওপর বেশ কিছুটা জায়গা তপ্ত লোহার মতো লাল বর্ণ ধারণ করছে। দু’হাত তুলে বিড়বিড় করে মন্ত্রটা বলতে লাগল সে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুবিশাল অগ্নিময় গহ্বরের মুখ খুলে গেল ওদের সামনে। গর্তের মধ্য থেকে উঠে আসা তীব্র তাপ চোখেমুখে লাগল অভীর।

সৌজন্য তৃপ্তমুখে পিছিয়ে এল। “এই নিন, সমরোত্তম নীলাভ্র। আমাদের যাত্রাপথ তৈরি; এই গহ্বরের উলটোদিকের মুখটা খুলেছে মাল্যপর্বতের রাজপ্রাসাদে। এবার আপনার আর আপনার পুত্রের কুশলতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের বাঁচা-মরা।”

অভী দেখল, এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের মায়া প্রয়োগ করতে গিয়েই সৌজন্য ঘেমে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, “মায়াটা খুব কঠিন?”

সৌজন্য বলল, “অভ্যাস করতে পারলে সব মায়াকেই আয়ত্ত্ব করা যায়। কিন্তু এ এমন মায়া, একে তো বারবার অভ্যাস করার উপায় নেই, তাই না? তবে হ্যাঁ, মায়াটা কঠিন নিঃসন্দেহে— অন্তত আমার মতো নশ্বর দেহধারীর ক্ষেত্রে তো বটেই।”

কথাটা বলে এমন অদ্ভুতভাবে হাসল সে, যাতে অভীর মনে হল, কী একটা বিষয় যেন সে বলতে গিয়েও বলল না।

নীলাভ্রও ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল। সে বলল, “আরও কিছু বলবে মনে হচ্ছে, সৌজন্য?”

সৌজন্য বলল, “আমি ভাবছিলাম, ঐশিকদের তৈরি অগ্নিদানবটার কথা। তাকে মনে আছে তো, অভী?”

অভী বলল, “আছে। তার কথা কেন?”

“সে যখন সম্পূর্ণ ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে এইরকম নরকগহ্বর জেগে উঠবে— ঐশিকরা বলেছিলেন আমাকে। এইটুকু একটা গহ্বর আহ্বান করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, আর সে যখন আসবে, তখন তার অগ্নিমায়ায় নরকের শত-শত দ্বার খুলে যাবে মাটির ওপর। ভেবে দেখো অভী, তখন সেই অমিতক্ষমতাধর দানবকে কীভাবে সামলাবে।”

অভী চুপ করে গেল। নীলাভ্র এগিয়ে এসে বলল, “সে যখন হবে, তখন দেখা যাবে। আপাতত চলে এসো, তোমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আমাদের চটপট ফিরতে হবে। আর হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে লীনার ব্যাপারে কোনো দামি খবর যদি দিতে না পারো, তাহলে আর রাজা পুনর্বসু নয়, আমি নিজেই তোমাকে হত্যা করব।”

সৌজন্য মুচকি হাসল। “শুধু খবর কেন, লীনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে আপত্তি আছে? অভী, কী বলো?”

অভী এত অবাক হয়ে গেল যে সে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। নীলাভ্র বলল, “কথা বলিয়ে দেবে মানে? মরা মানুষের সঙ্গে আবার কথা বলা যায় নাকি?”

“যায়, যায়। উপায় আছে।”

অভী বলল, “কেমন উপায়? সুতসোমের সঙ্গে প্রজ্ঞার কথা বলিয়ে দেওয়ার যেমন উপায় করেছিলে, তেমন ভণ্ডামি করতে চাইছ নাকি আবার আমাদের সঙ্গে?”

সৌজন্য জিহ্বা দংশন করে বলল, “আরে না না। এক চাল দু’বার চলে নাকি? প্রজ্ঞার মতো স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মহিলা আমি আগে দেখিনি, এটাও অবশ্য ঠিক; আমাকেও তিনি অবাক করে দিয়েছেন। তবে এখন যদি মিথ্যে বলে থাকি, তাহলে সমরোত্তম নীলাভ্র তো আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েই রাখলেন। মিথ্যে আমি বলছি না; মাল্যপর্বতে এমন একটি গোপন জায়গা সত্যিই আছে, যেখানে গেলে মৃতের সঙ্গে দেখা করতে পারবে।”

“কোথায়?”

“দ্রষ্টাদেবীর মন্দির।”

“সে জায়গা তো ধ্বংস হয়ে গেছে শুনেছি,” নীলাভ্র বলল।

“ঠিকই শুনেছেন। ওখানে হেঁটে যাওয়ার কোনো উপায় আর নেই। কিন্তু মন্দিরটার মূল কাঠামো এখনও আছে। আগে জীবন্ত আঁধারের বাসভূমি ছিল বলে কোনো জটায়ু ওখানে যেতে পারত না, কিন্তু এখন আকাশপথে ওখানে যাওয়া যায়। ওখানেই... আচ্ছা, সে-সব কথা মাল্যপর্বতে পৌঁছেই বলব নাহয়। চলুন, বেশি দেরি করলে কিন্তু এই নরকগহ্বরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।”

অভী আর নীলাভ্র দু’দিক থেকে সৌজন্যের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। ওরা এসে দাঁড়াল অগ্নিময় গহ্বরের মুখের সামনে। ভেতর থেকে উঠে আসা প্রচণ্ড তাপে বাইরের দৃশ্য যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। গহ্বরের অভ্যন্তর থেকে মাঝেমধ্যেই লাফিয়ে উঠছে লাল অগ্নিশিখার শীর্ষভাগ। নীলাভ্র বলল, “সৌজন্য, এবার আমরা নিজেদের শরীর ঠান্ডা করে গহ্বরের মধ্যে নেমে যাব। তুমি আমাদের শরীরের সঙ্গে নিজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে না; করলেই এই ভয়ংকর আগুন তোমাকে মুহূর্তের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। অভী, তৈরি?”

অভী বলল, “তৈরি।”

নীলাভ্র বলল, “বেশিক্ষণ এই আগুনগহ্বরে আমাদেরও থাকা চলবে না, বুঝতে পারলি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর উলটোদিকের মুখে বেরিয়ে পড়তে হবে।”

অভী নিজের ভেতরের হিমকুশলতার শৈত্যক্ষমতার ওপর মনঃসংযোগ করামাত্রই বুঝতে পারল, প্রথমে তার হাত আর তারপর তার সারা শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। নরকবিষ পান করার পর থেকেই তার হিমশক্তি অনেকগুণ বেড়ে গেছে, এটা সে নিজেও খেয়াল করেছে। তার সারা শরীর ঢেকে গেল সাদা বরফের পাতলা আস্তরণে; তার হাতে ধরা সৌজন্যের হাতেও ছড়িয়ে পড়ল বরফের সূক্ষ্ম চাদর। ওদিক থেকে নীলাভ ধরে রয়েছে সৌজন্যের আর একটা হাত; তার হাত থেকেও হিম আবরণ এসে ঢেকে ফেলল সৌজন্যকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নরকগহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল তিনটে বরফঢাকা সাদা মূর্তি।

নীলাভ বলল, “অভী, লাফ দে।”

অভীর বুকটা একটু দুরুদুরু করছিল। সৌজন্যের দিকে তাকাল সে; তার মুখ পাথরের মতো শক্ত— তাকে দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। নীলাভর আদেশমাত্রই তিনজনে একসঙ্গে লাফ দিয়ে পড়ল লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে।

নিচের দিকে পড়তে লাগল ওরা দ্রুতবেগে। নরকের দেয়ালগুলো প্রচণ্ড উত্তাপে গনগনে লাল হয়ে আছে। শরীরঢাকা হিমের আবরণ ভেদ করেও সেই ঝলসানো তাপ এসে লাগছে ওদের শরীরে। নাকে আসছে তীব্র পোড়া গন্ধ। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে অদ্ভুত রকমের হালকা লাগছে অভীর— যেন তারা ভেসে আছে এই অগ্নিময় পরিবেশের মধ্যে। এই ভারহীনতা সে আগেও অনুভব করেছে নরকের মধ্যে এসে। সে অনুমান করল, তাদের হিমকুশলতাই তাদের শূন্যে ভাসিয়ে রাখছে; নরকের আগুনকে তাদের দেহ স্পর্শ করতে দিচ্ছে না।

অভীর হঠাৎ মনে হল, ‘মৃত দেবতা কি এখানেই আছেন? তিনি কি আমাদের দেখছেন?’

যদি দেবতার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সেই আশায় উৎকর্ণ হয়ে রইল সে। কিন্তু নরকের সুবিশাল অগ্নিবর্ণ দেয়ালগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর উপস্থিতির কোনো আভাস পাওয়া গেল না। অভী নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই তরল আগুনের নদী কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে প্রবল গতিতে; গলন্ত আগুনের ফেনা ছিটকে উঠছে তার স্রোত থেকে। দেখেই যেন গা-শিরশির করে উঠল তার।

নীলাভ তাকে ইশারা করল, বামদিকের সুড়ঙ্গপথে ভেসে যেতে। সৌজন্য তার মায়াবলে ওই সুড়ঙ্গটাই তৈরি করেছে মাল্যপর্বতে যাওয়ার জন্য।

নরকের মধ্যে এদিক-ওদিক যাতায়াতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ সে আগেও করেছে। তিনজনেই তারা ভেসে চলল সুড়ঙ্গের দিকে।

সুড়ঙ্গের মুখটাও জ্বলজ্বল করছে আগুনের তাপে। তিনজন পাশাপাশি গেলে তার অসম্ভব তপ্ত দেয়ালে ঘষা লেগে যাওয়ার ঘোরতর সম্ভাবনা। ওদের ইশারা করে নীলাভ এগিয়ে গেল; তার একটা হাত বাড়ানো রইল পেছনের দিকে। সেই হাত ধরে রইল সৌজন্য। অভী রইল সবার পেছনে; সে নিজের এক হাত বাড়িয়ে সৌজন্যকে ধরে রইল, যাতে সৌজন্যের হিমকুশলতার সংযোগবর্ম অক্ষত থাকে।

যেন একটা বিরাট বড়ো চোঙের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। নরকের প্রচণ্ড তাপে লাল হয়ে থাকা দেয়ালগুলো সরে যাচ্ছে ওদের দুপাশ দিয়ে। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল ওরা তিনজন।

যেতে যেতে এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল অভী, হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন কথা বলে উঠল সুরেলা, গম্ভীর কণ্ঠে, “নিয়তির চেয়ে বড়ো আর কে আছে?”

প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠল সে। এক পলক দেখেই সে বুঝে নিল, কণ্ঠস্বরটা জেগে উঠেছে তার মাথার মধ্যে; বাবা আর সৌজন্য শুনতেই পায়নি কথাগুলো।

কার কণ্ঠ, তা-ও সে বুঝতে পারল সঙ্গে-সঙ্গেই। মৃত দেবতা!

“আমার কথা ভাবছিলে, অভী?”

অভীর মাথার মধ্যে যেন ঢেউ উঠছে শব্দগুলোর; কিন্তু অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না তাদের এই কথোপকথন। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে একবার হয়েছিল শর্বরের অচলগুহায় অভিযানের আগে।

অভী মনে মনে বলল, “হ্যাঁ, দেবতা। আমি কি এই অভিযানে এসে ভুল করলাম?”

দেবতার কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল তার মাথার মধ্যে। “মহাকালের বিশালতার সামনে ঠিক-ভুল বলে কিছু হয় কি? যে প্রলয় অনিবার্য, তুমি তাকে সামান্য কিছুটা ত্বরান্বিত করলে, এইটুকুই সত্য।”

অভী চমকে উঠল। সৌজন্যকে সাহায্য করে সে প্রলয়কে আরও কাছে ডেকে আনল নাকি?

সে বলল, “দেবতা, প্রলয় এলে কি কেউ বাঁচবে না?”

দেবতা উত্তর দিলেন, “যাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, তারা তো যাবেই। প্রলয় সেই সংহারক মৃত্যুর উৎসবে আমন্ত্রণমাত্র।”

সৌজন্যের হাত ধরে ভেসে যাচ্ছে সে, কিন্তু সৌজন্য এত কথার কিছু শুনতে পাচ্ছে না। আসন্ন গণমৃত্যুর ভয়াবহতা কল্পনা করেই অভীর বুক কেঁপে উঠল। সে বলল, “কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে প্রলয় ঘটবে, সে অস্ত্র কোথায়?”

“যথাস্থানে আছে। যখন তাকে আবিষ্কার করবে, তুমি অবাক হয়ে যাবে।”

একটু হেসে দেবতা নীরব হয়ে গেলেন। অভী বুঝতে পারল, তার মাথার মধ্যে দেবতার কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। নিজের অজান্তেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সৌজন্য তার হাত ধরে টানল। “কী হল? থেমে গেলে কেন? চলো, চলো!”

আবার চলতে শুরু করল সে ওদের সঙ্গে। কিন্তু মনের মধ্যে দেবতার ওই কথাটা বারবার ফিরে আসতে লাগল— “যাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, তারা তো যাবেই।”

কিছুক্ষণ পরে নীলাভ বলে উঠল, “গহ্বরের মুখ দেখা যাচ্ছে।”

অভী সচকিতভাবে সামনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এই আগুনের গর্তটা শেষ হচ্ছে তাদের থেকে আরও প্রায় আশি হাত দূরে। অগ্নিতাপে লাল হয়ে থাকা গোল সূড়ঙ্গমুখের শেষে বাইরে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। অভী দেখল, সৌজন্যের

ঠোঁটের কোণে লেগে আছে উত্তেজনাপূর্ণ একটা হাসি, যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার মনের সাধ পূরণ হতে চলেছে।

ওদের ভেসে চলার গতি বেড়ে গেল। তিনটে বরফঢাকা মূর্তি দ্রুতবেগে চলল আগুনরঙা নরকগহ্বরের সুড়ঙ্গপথে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাইরে ওরা ছিটকে এসে পড়ল গহ্বরমুখ দিয়ে, গড়িয়ে গেল শক্ত পাথুরে মাটির ওপর।

সৌজন্য ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল; সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহ থেকে সাদা বরফের আস্তরণ মিলিয়ে গেল। সে বলে উঠল, “এবার বেশ গরম লাগছে কিন্তু।”

অভী আর নীলাভও উঠে দাঁড়িয়েছিল। যে জায়গাটায় তারা এসে পড়েছে, সেটা অভীর খুব পরিচিত লাগছিল। তারা দাঁড়িয়ে আছে একটা ধূসর পাথরের তৈরি কক্ষের মধ্যে; কক্ষের একপ্রান্তে জমে আছে রাশি-রাশি বিরাটাকৃতির ভাঙা পাথর। এইখানেই, এই পাথরের ওপরেই...

চমকে উঠল অভী। মূল রাজপ্রাসাদের পেছনের এই কক্ষেই তার হাতের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল সুতসোমের। তাই এত চেনা-চেনা লাগছে জায়গাটা!

কিন্তু এ-ব্যাপারে সৌজন্যের সামনে আর কিছু না বলে সে বলল, “এবার লীনার সংবাদ চাই, সৌজন্য।”

সৌজন্য বলল, “বলছি। কিন্তু তার আগে রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে নিলে হত না?”

নীলাভ কড়াসুরে বলল, “না। আগে লীনার খবর, তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।”

সৌজন্য মাথা নেড়ে বলল, “তা-ই হোক। শোনো অভী, দ্রষ্টাদেবীর মন্দির একসময় প্রচণ্ড শক্তিশালী মায়ার আধার ছিল, তুমি জানো। এখন জীবন্ত অন্ধকার ওখানে আর নেই বটে, কিন্তু দেবীর মৃত্যুর পরেও তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত মায়ার অবশেষ ওখানে এখনও রয়ে গেছে। এ-ব্যাপারটা মাল্যপর্বতে এখনও কেউ জানে না; আমি ঐশিকদের কাছে এই খবর পেয়েছি। ওই জায়গায় গেলে এখনও মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। শুধু যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছ, তার ব্যবহার করা কোনো বস্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।”

অভী একটু দমে গেল। “লীনাকে বাঁচিয়ে তোলার কোনো উপায় নেই ওখানে?”

সৌজন্য মুচকি হেসে বলল, “তাকে বাঁচিয়ে দেব, এমন কথা তো আমি একবারও বলিনি; যোগাযোগ করিয়ে দেব বলেছিলাম। লীনার ব্যবহার করা কোনো জিনিস নিয়ে ওখানে চলে যাও, তাহলেই তার আত্মা ওই স্থানের মায়ার প্রভাবে তোমার অস্তিত্ব বুঝতে পেরে ওখানে চলে আসবে; মর্জি হলে কথাবার্তাও বলবে।”

নীলাভ বিরক্তমুখে বলল, “লীনার ব্যবহার করা কোনো জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, সেটা আগে বলতে পারোনি? অভী, তোর কাছে এখন সেরকম কিছু আছে?”

অভী মাথা নাড়ল। “নেই।”

সৌজন্য জাদুকরের মতো তার পোশাকের মধ্য থেকে বার করে আনল বস্তুটা। “এই নাও তোমাদের সমস্যার সমাধান।”

তার হাত থেকে ওটা নিতে গিয়ে অভীর হাত কেঁপে গেল। একটা রুমাল—
লীনা এটা ব্যবহার করত একসময়, তার মনে আছে।

সৌজন্য বলল, “গতবার লীনা যখন রক্ষোপুরীতে এসেছিল, তখন এটা
ফেলে গিয়েছিল এখানে। প্রফুল্ল তুলে রেখেছিল জিনিসটা। এতদিন পরে কাজে
লেগে গেল, কী আশ্চর্য, তা-ই না?”

অভী বুঝতে পারছে, আশ্চর্যের কিছুই নেই এতে; সৌজন্য সব পরিকল্পনা
করেই রেখেছিল।

নীলাভ বলল, “এই কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে ওই মন্দিরে গেলে এর টানে
লীনার প্রেতাত্মা আসবে, তুমি নিশ্চিত?”

সৌজন্য চোখ সরু করে বলল, “আজ্ঞে না, সমরোত্তম নীলাভ। জীবিতেরা
কোনোদিনই মৃতদের জগতের কোনো ব্যাপার নিশ্চিত জানতে পারে না। তবে
ওই মন্দিরে ইতঃপূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে; তাই আশা করা যায়, লীনার ক্ষেত্রেও
তার ব্যতিক্রম হবে না। এবার চলুন, আমাকে রাজা পুনর্বসুর মুখোমুখি দেখা
করার একটা ব্যবস্থা করে দিন।”

নীলাভ অভীর দিকে তাকাল। অভী মাথা নাড়ল। সৌজন্য তার কথা রেখেছে;
এবার তার কথা রাখতে ওদের আপত্তি নেই।

প্রস্তরকঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বীরেশ নামে
সেই প্রহরীর। অভীদের, বিশেষত সৌজন্যকে দেখে তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে
উঠল। নীলাভ তাকে বলল, “আমরা মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তুমি
আমাদের নিয়ে যাবে?”

অত্যন্ত অবাক হলেও বীরেশ রক্ষোপুরীর কেতাদুরস্ত প্রহরী। সে নমস্কার
করে বলল, “অবশ্যই, মাননীয় সমরোত্তম। আসুন আমার সঙ্গে।”

সৌজন্যকে নিয়ে যখন ওরা রাজার সভাকক্ষে ঢুকল, তখন ভেতরে
কেবলমাত্র রাজা আর প্রজ্ঞা বসেছিলেন। ওদের তিনজনকে দেখে তাঁরা দু’জনই
ভয়ংকরভাবে চমকে উঠলেন।

প্রজ্ঞা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ওরা প্রবেশ করামাত্র। রাজা ভয়ানক ভ্রুকুটি করে
বললেন, “এ-সব কী ব্যাপার, সমরোত্তম নীলাভ?”

নীলাভ তাঁর সামনে এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।
“সৌজন্যকে নিয়ে এসেছি আমরা।”

প্রজ্ঞা বললেন, “সৌজন্য কি আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?”

নীলাভ বলল, “না। সে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে বিশেষ একটি
প্রয়োজনে। আমাদের সে অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে আসার জন্য। আমার এবং
প্রলয়যোদ্ধার মনে হয়েছে, তার বক্তব্য আপনাদের শোনা উচিত। তাই তাকে সঙ্গে
নিয়ে এসেছি আমরা।”

রাজা বললেন, “তুমি দেশদ্রোহী, সৌজন্য। তুমি যদি এঁদের সঙ্গে না আসতে,
এই মুহূর্তেই তোমাকে বন্দি করে শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিতাম আমি।”

সৌজন্য মিষ্টি করে হাসল। “জানি তো। সেজন্যই এঁদের এনেছি সঙ্গে।
এঁরাই আমার সুরক্ষাকবচ।”

প্রজ্ঞা বললেন, “তুমি মাল্যপর্বতের রাজদণ্ডপ্রাপ্ত এবং পলাতক অপরাধী।
এর পরেও তুমি এ দেশে পা দিতে সাহস করলে কী করে, আমি ভেবে
পাচ্ছি না।”

সৌজন্য ঈষৎ নত হয়ে ছদ্মবিনয় প্রকাশ করল। “আমার সৌভাগ্য, আমার
কাজকর্মের মানে সবাই ভেবে পায় না।”

রাজা বললেন, “জেনে রাখো, এখানে প্রবেশ করেছ মানে আর তুমি জীবন্ত
ফিরবে না এই রক্ষোপুরী থেকে।”

সৌজন্য বলল, “মহারাজ, আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার আগে আমার
বক্তব্যটুকু আপনি শুনুন, এইটুকু আমার অনুরোধ। মরুময়ের বিষয়ে একটি
ব্যাপার আপনাকে জানাতে চাই।”

রাজা প্রজ্ঞার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, “তোমার বক্তব্য শুনতে
আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বলো কী বলবে। সমরোত্তম নীলাদ্র, প্রলয়যোদ্ধা,
আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।”

অভী পাশ থেকে বাবাকে খোঁচা মারল। তার মনের কথা বুঝতে পেরে নীলাদ্র
বলল, “মহারাজ, আপনার যদি অসম্মতি না থাকে, তাহলে প্রলয়যোদ্ধাকে এই
কক্ষের বাইরে যেতে অনুমতি দিন। তার কিছু কাজ আছে প্রাসাদের বাইরে।”

রাজা বললেন, “আমার সম্মতি আছে। প্রলয়যোদ্ধা অভী, তুমি কক্ষের বাইরে
যেতে পারো। আমার প্রহরীরা কেউ তোমার পথরোধ করবে না।”

অভী মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল; যাওয়ার
আগে নীলাদ্র তাকে নীচুগলায় বলে দিল, “আমি এখানেই থাকছি; তুই তোর
কাজে চলে যা। আমাকে এখানকার ঘটনার ওপর নজর রাখতে হবে; কেমন যেন
গন্ডগোলের আভাস পাচ্ছি। সৌজন্যের ওপর ভরসা করে আমাদের দু’জনেরই
চলে যাওয়াটা উচিত হবে না।”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক আছে। আমি ওখান থেকে ফিরে এসে
তোমাকে ডেকে নেব।”

রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথ
ধরল সে। দূর থেকে মাল্যপর্বতের পশ্চিমের চূড়াগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
এর আগে সর্বদা গোধূলিতে এসেছে সে এখানে। দেবী যতদিন বেঁচে ছিলেন,
ততদিন দিনের ওই বিশেষ সময়টি ছাড়া এই মন্দিরে পা দেওয়া নিষেধ ছিল।
এখন তিনিও নেই, জীবন্ত আঁধারও নেই; তাই দিনের বেলা আর ওখানে যাওয়ার
বাধানিষেধ নেই।

অবশ্য দেবী না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া মায়ার প্রভাবে এখনও জায়গাটা
ভরে আছে; তাই জীবন আর মৃত্যুর দুই আলাদা জগৎ কীভাবে যেন সংযুক্ত
হয়ে যায় ওখানে। পার্বত্য পথটা দিয়ে রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অভী মনে

পড়ছিল উর্মির কথা। এর আগে যতবার এই মন্দিরটায় গেছে সে, ততবার উর্মি থেকেছেন তার সঙ্গে। শেষবার অবশ্য আর ফিরে আসা হয়নি তাঁর।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল তার।

পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ ছিল মন্দিরে যাওয়ার জন্য। গতবার সৌজন্য এখান থেকে পালানোর সময় পথটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। নিচে গভীর খাদ। এপারের পাহাড়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদিকের পাহাড়ের সামনে কিছুটা সমতলভূমি, আর ধূসর পর্বতগাত্রের ওপর দেখা যাচ্ছে পাথুরে বাড়ির চৌকো দরজাটা। অভী সেই খাদের সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারল, পায়ে হেঁটে এই বিরাট খাদের বিস্তার অতিক্রম করা অসম্ভব।

আকাশপথে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এতদিন জীবন্ত আঁধারের তীব্র মায়ায় কোনো জটায়ু এই পথ অতিক্রম করতে পারত না; যারা এখানে আসত, তাদেরও দম বন্ধ হয়ে আসত ওই ভয়ানক অন্ধকারটার প্রবল চাপে। এখন অবশ্য সে ভয় আর নেই। অভী তার নীল শঙ্খ বাজিয়ে অপরাজিতাকে আহ্বান করল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার বিরাট পাখার ঝটপটানি শোনা গেল অভীর মাথার ওপর। তার মুখের ওপর ঘনিয়ে এল পাখিটার সুবিশাল ছায়া। অপরাজিতা নেমে এল তার সামনে।

অভী তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “আমাকে পাহাড়ের ওদিকের ওই ভাঙা বাড়ির দরজার মুখটার সামনে নিয়ে যেতে পারবে?”

মাথা নেড়ে অপরাজিতা তাকে তার পিঠে উঠতে ইঙ্গিত করল। অভী উঠে বসতেই ডানা মেলল সে। সুগভীর খাদের ওপর দিয়ে উড়ে চলল সে ধূসর পাহাড়ের পাশ দিয়ে। পায়ে হেঁটে বহুক্ষণ ধরে যে পথটা এর আগে পেরিয়ে আসত অভী, সেই পথ কয়েক মুহূর্তে আকাশপথে অতিক্রম করে দ্রষ্টাদেবীর পরিত্যক্ত মন্দিরের সামনে এনে তাকে নামিয়ে দিল অপরাজিতা।

চৌকো পাথুরে দরজাটার সামনে নেমে এসে তাকে ধন্যবাদ দিল অভী; বলল, “আবার একটু পরে ফিরতে হবে। তখন আর একবার কষ্ট দেব তোমাকে।”

শুনে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে হেসে উঠল অপরাজিতা। অভী বুঝতে পারল, তার মতো হালকা-পাতলা একটা মানুষকে বহিতে কষ্ট হবে শুনে বিরাট পাখিটার হাসি পেয়ে গেছে।

নিজেও একটু হেসে তার ঘাড়, মাথায় আলতো চাপড় মেরে তাকে বিদায় জানাল অভী। দুপুরের উজ্জ্বল নীল আকাশে ডানা মেলে অপরাজিতা অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের পাহাড়ের বিরাট চূড়াগুলোর পেছনে।

পোশাকের মধ্য থেকে লীনার ব্যবহৃত রুমালটিকে বার করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রষ্টাদেবীর পরিত্যক্ত মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অভী।

এখানে সে আগেও এসেছে, তবে প্রায় পুরো জায়গাটাই তখন অন্ধকারে ঢাকা থাকত বলে ভেতরটা ভালো করে কখনোই দেখতে পায়নি। এখন দিনের আলোয় দেখা গেল, ভাঙা পাথরের চাঁই বুলে আছে মন্দিরের ছাদ থেকে; দেখলে

ভয় হয়— এখনই বুঝে খসে পড়বে। দু'-তিন জায়গায় পাথর ভেদ করে মাথা তুলেছে বট, অশ্বখের চারা। ঘরটার ধূসর দেয়ালগুলো অমসৃণ; পাথুরে মেঝের ওপর জমে আছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। চতুর্দিক একদম নিঃস্বচ্ছ; একটা পাখিও ডাকছে না কোথাও। এখানেই কি দ্রষ্টাদেবীর রেখে যাওয়া মায়ার আকর্ষণে মৃত মানুষেরা ফিরে আসে জীবিতদের টানে? মূল জনবসতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই পাহাড়ের এককোণে এই ছায়াচ্ছন্ন ভগ্ন মন্দিরগৃহে দাঁড়িয়ে দিনের বেলাতেও অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে অভীর গা-ছমছম করে উঠল।

পা-গুলো হঠাৎ যেন দুর্বল লাগছে তার। অভী সেই ধূলিধূসর মেঝের ওপর বসে পড়ল। হাতে তার ধরা আছে লীনার রুমাল; অনুচ্ছ্বরে সে বলল, “লীনা, আমি এসেছি। তুমি কি আসতে পারবে?”

মন্দিরের মধ্যে কারও এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না।

অভী আবার ডাকল, “লীনা, তুমি কি আছ? তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?”

মন্দিরগৃহ আগের মতোই নিশ্চুপ হয়ে রইল। এত তীব্র সে নীরবতা যে অভী নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কেউ এল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে উঠে পড়ল সে। সৌজন্য সম্ভবত নিজের কার্যোদ্ধার করার জন্য আর একটা মিথ্যেকথা বলেছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছিল অভী, ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা কাণ্ড শুরু হল। কোথাও বিন্দুমাত্র হাওয়া নেই, তবু পাথুরে মেঝের ওপর জমা ধুলো হঠাৎ পাক খেতে শুরু করল। গ্রীষ্মের বিকেলে হঠাৎ আসা ঝড়ে মাঠের খড়কুটো যেভাবে ঘূর্ণি-হাওয়ায় ওপরদিকে পাক দিয়ে ওঠে, সেইভাবে ধুলোগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে স্তম্ভের আকার নিতে লাগল অভীর চোখের সামনে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই ধুলোর মধ্যে যার অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তাকে আবার কোনোদিন দেখতে পাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

উর্মি!

হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল অভী। উর্মি একটু হাসলেন। “অনেকদিন পর দেখা হল, অভী।”

অভী বোকার মতো বলে ফেলল, “আপনি... আপনি কী করে এলেন?”

উর্মি বললেন, “তুমিই ডেকেছ, তাই এসেছি। সৌজন্য তো তোমাকে বলেছিল, মৃতব্যক্তির ব্যবহার করা কোনো জিনিস নিয়ে এখানে এলে সেই ব্যক্তি মৃতদের জগতের সীমানা অতিক্রম করে জীবিতদের জগতে কিছুক্ষণের জন্য আসতে পারে।”

“কিন্তু আপনার কোন্ জিনিস...?” বলতে বলতে অভীর খেয়াল হল উর্মির ব্যবহার করা কোন বস্তুটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

সেই হিরার ছুরিটা!

উর্মি একটু হাসলেন। “আমার খুব প্রিয় অস্ত্র ছিল ওটা। অবশ্য আমি ওটাকে শিল্পবস্তু হিসাবেই দেখতাম, অস্ত্র হিসাবে নয়। এখনও ওর হাতলের কাছে আমার একফোঁটা শুকনো রক্ত লেগে আছে, তুমি বোধহয় খেয়াল করেনি।”

অভী একটু অপ্রস্তুতের মতো বলল, “আমি আসলে লীনাকে ডাকার জন্য এসেছিলাম এখানে।”

“জানি। কিন্তু লীনা মৃতদের দেশে নেই। অন্তত আমি জানি না সে কোথায় আছে। তার আত্মাটা সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে নষ্টই হয়ে গেছে। তার কোনো সন্ধান হয়তো কোনোদিনই আর মিলবে না।”

অভী বলল, “আমি যে স্বপ্নে দেখেছি তাকে?”

উর্মি বললেন, “সে তো স্বপ্নই। সত্যি তো নয়। সব স্বপ্ন সত্যি হবে, এমন কোনো কথা আছে কি? যারা হৃদয়শর বিমোচন করে, তাদের যে শেষ পর্যন্ত কী হয়, কেউ জানে না।”

অভী চুপ করে রইল। উর্মি তাকিয়ে দেখছিলেন চারপাশটা। অভী বুঝতে পারল, তাঁর যেখানে মৃত্যু হয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখছেন তিনি।

সেই ভয়ংকর স্মৃতিগুলো যেন অগ্নিশিখার মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল তার চোখের সামনে। আর তার সঙ্গে ফিরে এল খুব অদ্ভুত এবং খুব ব্যক্তিগত আর একটা স্মৃতি। এইখানেই তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে রাজকন্যা উর্মি তার হাতে...

চোখে জল চলে এল তার। ধরা গলায় সে বলল, “রাজকন্যা, আমি... আমি দুঃখিত। আপনাকে আমি বাঁচাতে পারিনি, আমি দুঃখিত।”

উর্মি ঝকঝকে একটা হাসি হাসলেন। অভীর মনে হল, মৃত্যুও যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের আনন্দময় ঔজ্জ্বল্যকে স্নান করে দিতে পারেনি। “বোকা ছেলে! তুমি দুঃখ পাচ্ছ কেন? সেদিন আমি যা করেছিলাম, তা আমার একান্ত নিজের সিদ্ধান্ত ছিল। আমার কাল পূর্ণ হয়েছিল, তাই নিয়তি আমাকে তুলে নিয়েছেন। মৃত্যু আসলে জীবনের খুব স্বাভাবিক একটা পরিণতি, অভী। একে মেনে নিতে পারলেই আর কোনো দুঃখ থাকে না।”

অভী উত্তর দিতে পারল না। রাজকন্যা আবার বললেন, “তুমি আমাকে বাঁচাতে পারোনি— এমনটা ভাবছই বা কেন? আমি নিজেই সেদিন মরতে চেয়েছিলাম, এটাই কি বড়ো কথা নয়?”

অভী তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। এই অসাধারণ মেয়েটির জীবন তার জন্যই শেষ হয়ে গিয়েছিল, এ-যন্ত্রণা সে চাইলেও ভুলতে পারে না।

একটু থেমে থেমে সে সসংকোচে বলল, “এখনও কি আপনি...?”

উর্মির ছায়া উত্তর দিল, “তুমি বোধহয় জানতে চাইছ, এখনও আমি তোমাকে ভালোবাসি কি না। অভী, ভালোবাসা কি নষ্ট হওয়ার জিনিস? যার প্রতি আমরা অন্তর থেকে মুগ্ধ হই, সে মুগ্ধতা কি মৃত্যুও কেড়ে নিতে পারে? কিন্তু এর বেশি আমি বলব না; আর বললেও তুমি বুঝবে না।”

হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত স্পর্শ করতে চাইল অভী, কিন্তু রাজকন্যার হাতের মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল অভীর আঙুলগুলো। স্নান হেসে তিনি বললেন, “আর আমাকে ছুঁতে পারবে না তুমি। আমি এখন স্পর্শের অতীত, অভী; কিন্তু অনুভবের অতীত নই। আমার জন্য তোমার মনে একটু হলেও জায়গা আছে দেখে আমার

ভালো লাগল, কিন্তু এবার তুমি ফিরে যাও। তোমার সঙ্গে থাকার জন্য নিয়তি আমাকে নির্বাচন করেননি। এবার আমাকে যেতে হবে। বিদায়।”

“একটু দাঁড়ান, রাজকন্যা।”

অভী চাইছিল, উর্মি আর একটু থাকুন। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, “যেতে দাও, অভী। ছায়া-অভীর মাথার চারপাশে থাকে না।”

“আর অল্পক্ষণ দাঁড়ান। কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।”

“জীবিতদের জগতে বেশিক্ষণ থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কী জানতে চাও বলো।”

“এই মন্দিরেই দ্রষ্টাদেবী কতগুলো কথা বলেছিলেন প্রলয় নিয়ে। মনে আছে আপনার?”

“আছে। ভয়ানক কোনো জগৎ-সংহারক অস্ত্র দিয়ে তুমি সবকিছু ধ্বংস করে দেবে, এইরকম বেশ কিছু কথা বলেছিলেন তিনি।”

“হ্যাঁ। কিন্তু এর মানে কী, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?”

উর্মি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “আমি তোমার আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করতে পারছি। তুমি নিজেও জানো তোমার মৃত্যু সন্নিহিত, তাই কথাটা তোমাকে বলছি, নয়তো বলতাম না। তোমার চারপাশে তীব্র একটা শক্তির উপস্থিতি আমি অনুভব করছি। সবসময় তোমাকে যেন ঘিরে রাখছে ওই শক্তি; মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলেই যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। ও যে ঠিক কী, আমি জানি না; কিন্তু ওর মধ্যে যে অকল্পনীয় ধ্বংসক্ষমতা রয়েছে, সেটা অনুভব করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না।”

উর্মির কথা শোনামাত্র অভীর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল স্বপ্ন-সরোবরের দৃশ্য— সেই লালচে বেগুনি আভাময় জলে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব, আর জলের ওপর সেই ছায়া-অভীর মাথার চারপাশে ফেটে পড়েছে অত্যাশ্চর্য আলোর শব্দহীন বিস্ফোরণ। চমকে উঠল সে।

উর্মি আবার বললেন, “আর আমাকে আটকিয়ো না এখানে। আমি তোমার আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করতে পারছি। যখন তোমার মৃত্যু হবে, আবার তোমার সামনে আসব আমি। বিদায়, অভী। ভালো থেকো।”

তার উদ্দেশে হাত নাড়লেন তিনি। চোখে জল নিয়ে প্রিয় বান্ধবীর মিলিয়ে যেতে থাকা ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল অভীও।

তারপর হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠল উর্মির শরীরটা, যেন চলে যেতে-যেতেও ফিরে এলেন তিনি। দ্রুতস্বরে তিনি বললেন, “অভী, এখনি বাইরে যাও। তোমার বাবা আসছেন এদিকে। এই খাদ পেরিয়ে তিনি আসতে পারবেন না। তোমার মহানীলগৃধ্রকে ডাকো; বাবাকে নিয়ে পালাও এখান থেকে। ঘোরতর বিপদে পড়ে গেছ তোমরা।”

কথাগুলো বলেই তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। ভীষণ চমকে উঠে অভী ছুটে বেরিয়ে এল মন্দিরের বাইরে।

সত্যিই নীলাভ্র এসে দাঁড়িয়েছে খাদের ওপারের পাহাড়ের প্রান্তে। ওখান থেকেই সে এতক্ষণ “অভী, অভী!” বলে চিৎকার করছিল; মন্দিরের মধ্যে থাকায় অভী শুনতে পায়নি।

নীলাভ্রর কথা পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে এল। “অভী, জলদি আয়। এক্ষুণি যেতে হবে এখান থেকে। শাঁখ বাজা।”

কী হয়েছে, অভী এখনও কিছুই জানে না, কিন্তু বাবা এইভাবে মরিয়া হয়ে ডাকছে মানে নিশ্চয়ই বড়োরকমের কোনো বিপদ হয়েছে। দেরি না করে পোশাকের মধ্য থেকে নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটি বার করে তাতে ফুঁ দিল সে।

অপরাজিতা নেমে এল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। তার পিঠে চেপে আকাশপথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাদটা পেরিয়ে যেতে যেতেই অভীর চোখে পড়ল অদ্ভুত দৃশ্যটা।

আর একজন ছুটে আসছেন নীলাভ্রর পেছনে। উঁচু থেকে ভালো করে দেখতেই সে চিনতে পারল তাঁকে। প্রজ্ঞা। কিন্তু তাঁর কোলে ওই রক্তাক্ত মৃতদেহটা কার?

অপরাজিতা আর একটু নিচের দিকে নামতেই অভী ভালো করে দেখতে পেল দেহটাকে। ভয়ে, বিস্ময়ে গলার মধ্যে একটা হেঁচকির মতো শব্দ করল সে।

রাজা পুনর্বসু! তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি; সারা গা ভেসে যাচ্ছে রক্তে; তাঁর রাজকীয় সাদা পোশাক ভিজে লাল হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

অভী হুড়মুড় করে নেমে এল অপরাজিতার পিঠ থেকে। প্রজ্ঞা ততক্ষণে চলে এসেছেন ওদের কাছে; তাঁর দু’হাতে ধরা আছে রাজার সংজ্ঞাহীন দেহ। অভী বলল, “এ-সব কী?”

নীলাভ্র বলল, “তুই চলে যাওয়ার পরে সৌজন্য বলল, সে রাজার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চায়, তাই কেউ যেন সামনে না থাকে। তখন রাজার অনুরোধে আমি আর প্রজ্ঞা চলে গিয়েছিলাম পাশের কক্ষে। হঠাৎ রাজার আর্তনাদ শুনে সভাগৃহে ছুটে এসে দেখি সৌজন্য ছুরি মেরেছে রাজাকে।”

“অ্যাঁ?”

“সৌজন্য যে নরকগহ্বরের মধ্যেও অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে এখানে আসতে পারে, এ-কথা আমাদের কারও মাথাতেই আসেনি। এদিকে আমাদের সঙ্গে ও রাজসভায় প্রবেশ করেছে, তাই প্রথামাফিক ওর দেহ অনুসন্ধানও করেনি সভার রক্ষীরা। অবশ্য করলেও কতটা লাভ হত, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।”

“কেন?”

“বলছি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও রাজাকে ছুরি মেরেছে। রাজার দেহরক্ষীরা ছিল বিমোহক রাক্ষস। মরুময়ের সাহায্যে তাদের ও আগেই বশ করে রেখেছিল। সব পরিকল্পনা করেই ও এসেছিল আজ এখানে। বিমোহক রাক্ষসদের অনেকেই এখন সৌজন্যকে চায় রাজা হিসাবে। আমরাই শেষে ওকে এখানের সিংহাসনে বসার সুযোগ করে দিলাম।”

অভী কয়েক মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল। সৌজন্য যে এত বড়ো পরিকল্পনা করে এসেছে এবং লীনার খবরটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছে, এ তার মাথাতেও আসেনি। সে বলল, “তারপর কী হল?”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমরা সভাকক্ষে ফিরে আসতেই চিৎকার করে সৌজন্য সব প্রাসাদরক্ষীকে ডেকে বলে দিল, ‘সমরোত্তম নীলাভ রাজাকে ছুরি মেরেছেন’। প্রহরীরাও বিশ্বাস করেছে সে-কথা; হয়তো তাদের মধ্যে বিমোহকদের ও আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল। সোজা কথায় সমরোত্তম নীলাভকে ও ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আমার ঘোরতর সন্দেহ, এর পেছনে মরুময়ের বুদ্ধিও আছে— সিংহাসনের পেছনে থেকে এই ধরনের খেলা তিনি বরাবর খেলে এসেছেন। রাজা পুনর্বসু এখনও জীবিত, কিন্তু আর তিনি কথা বলার অবস্থায় নেই। এদিকে সমরোত্তম নীলাভ, হাজার হোক, শত্রুদেশের লোক— তায় তিনি অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ঢুকেছেন রাজপুরীতে। তার ওপর সৌজন্য বিমোহক জাতির হওয়ায় অনেক বিমোহক অভিজাত রাক্ষস ওকে সমর্থন করছেন। বিমোহকরা অনেকদিন ধরেই চেয়ে আসছে, পত্রতিলক রাজবংশকে হটিয়ে তাদের জাতের কেউ সিংহাসনে বসুক। এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন?”

নীলাভ বলল, “দুষ্ট লোকের সমর্থকের অভাব কোনো দেশে কোনোদিনই হয়না, এক্ষেত্রেও হয়নি। আমার সাত্বনা, আমার সঙ্গে প্রজ্ঞা ভাগ্যিস ছিলেন; তিনি অন্তত জানেন আসল ঘটনাটা কী। মরণাপন্ন, অচেতন রাজাকে নিয়ে আমরা সৌজন্যের মুখের সামনে দিয়ে পালিয়ে এসেছি; প্রহরীরা আটকাতে এসেছিল, কিন্তু সেনানায়িকা প্রজ্ঞা সঙ্গে থাকায় তারা প্রাথমিকভাবে আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যায়নি, নয়তো আমাদের হাতে আজ অনেকগুলো প্রাণহানি হয়ে যেত।”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমি বলছি, আপনারা পালান এখান থেকে। এখানে থাকলে রাজাকে বাঁচানো যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব ওঁকে নিয়ে যান রক্ষোবৈদ্যের কাছে; যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন।”

অভী বুঝতে পারছে, সৌজন্যের কথায় বোকার মতো বিশ্বাস করে আবার তারা ঠকেছে। এই পুরো অনর্থের জন্য নিজেকেই দোষী মনে হতে লাগল তার। সে লীনার খবর পাওয়ার জন্য বাবাকে জোর না করলে এত কাণ্ড কিছুই হত না।

নীলাভ বলল, “সেনানায়িকা, আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে।”

প্রজ্ঞা মাথা নাড়লেন। “না, সমরোত্তম নীলাভ। একটি জটায়ু সর্বোচ্চ তিনজনের ভার বহন করতে পারে। আপনারা যান, আমি এখানেই থাকব।”

অভী শঙ্কিতকণ্ঠে বলল, “আপনাকে সৌজন্য মেরে ফেলবে।”

প্রজ্ঞা ম্লান হেসে বললেন, “সেই ঝুঁকি আমাকে নিতে হবে, কিন্তু আমি ও-সবে ভয় পাই না, অভী। মাল্যপর্বতের সেনাবাহিনী এখনও আমাকে সেনানায়িকা মানে। আলোকপর্ণের মতো অসমসাহসী যোদ্ধাযক এখনও আমাকে সমর্থন করে। আমার এলাকায় এত সহজে সৌজন্য আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমার গুণু আক্ষেপ হচ্ছে, রাজাকে আমি অনেকবার বলেছিলাম, মরুময়কে ত্যাগ

করুন; ওঁকে বারবার বলেছিলাম, সৌজন্যের আজীবন কারাদণ্ড তুলে নেবেন না। আমার কথা শুনলে আজ ওঁর এই অবস্থা হত না।”

আর দেরি না করে অচেতন রাজা পুনর্বসুর শরীরটাকে নিয়ে ওরা চেপে বসল অপরাজিতার পিঠে। প্রজ্ঞা ফিরে চললেন রক্ষোপুরীর উদ্দেশে। অপরাজিতা ডানা মেলল আকাশে।

নীলাভ শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে প্রশ্ন করল, “লীনার কোনো খবর পেলি?”
অভী সংক্ষেপে বলল, “না।”

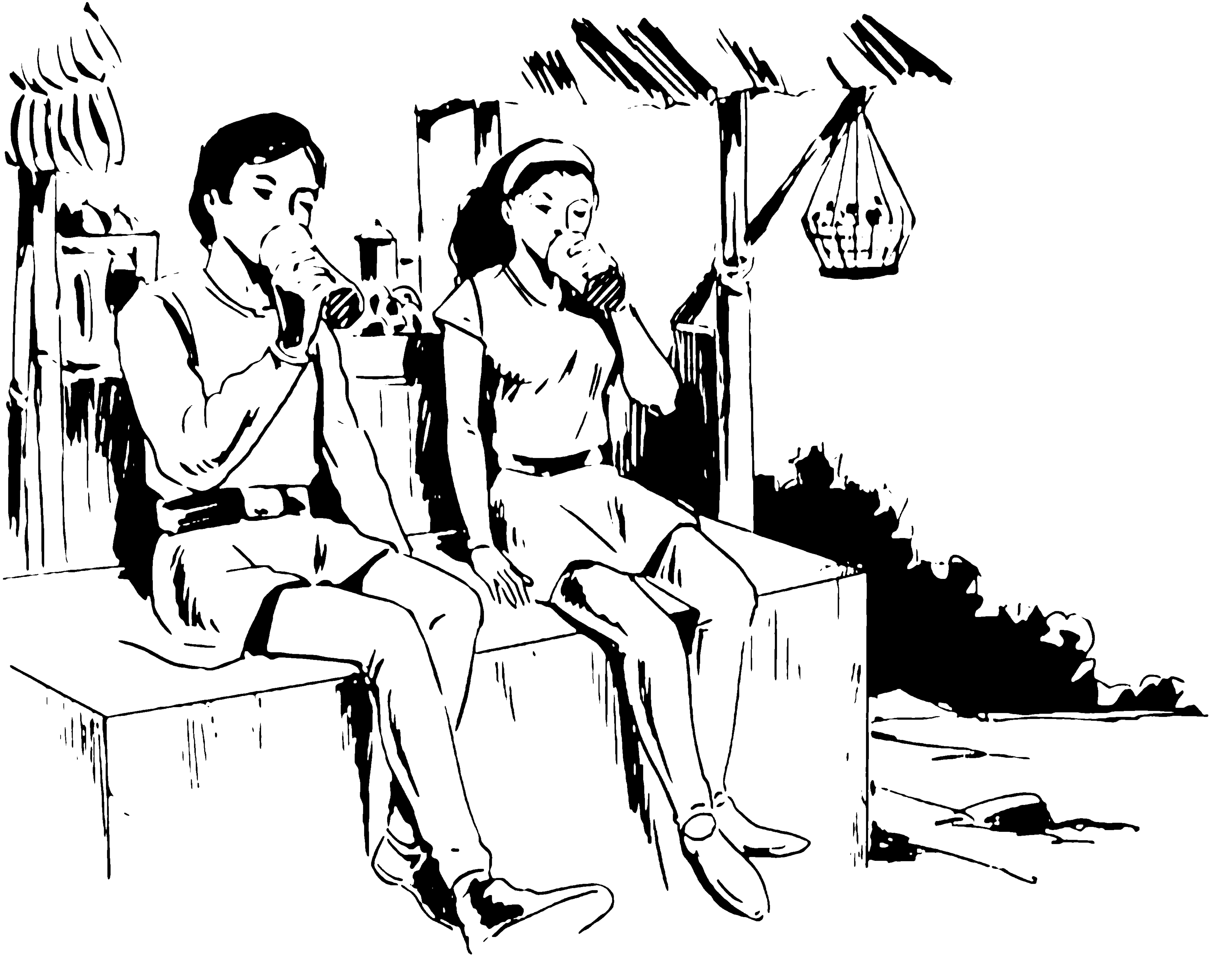
এই প্রসঙ্গে কথা বলতে তার আর ইচ্ছা করছে না।

নীলাভ বসেছে সামনে, তার পেছনে অজ্ঞান রাজার রক্তাক্ত দেহকে সাবধানে ধরে বসে আছে অভী। রাজার বুকে এখনও বিদ্ধ হয়ে আছে ছুরি; নীলাভ আর অভী দু’জনেই জানে, ওই অস্ত্র বুক থেকে টেনে খুলতে গেলেই এত রক্তপাত হবে যে, রাজার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রক্ষোবৈদ্যকে ছাড়া এই কাজ করার ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না।

অভীর সারা গায়ে হাতে লেগে রয়েছে রাক্ষসরাজের চাপ-চাপ রক্ত। তার আশঙ্কা হতে লাগল, আয়তনে রক্ষোবৈদ্যের সেবাকক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে যেতে পথেই না মৃত্যু হয় রাজার।

অনেক উঁচু দিয়ে সমরগরিমার দিকে উড়ে যেতে যেতে অভী একবার দেখতে পেল, প্রজ্ঞার নিঃসঙ্গ আকৃতিটা দ্রুতবেগে হেঁটে যাচ্ছে রাক্ষস রাজপ্রাসাদের দিকে। দুপুর ঢলে পড়ছে বিকেলের দিকে। কঠোর রৌদ্রে তাঁর ছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠেছে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি পথের গায়ে।

তারপর আর কিছু দেখতে পেল না সে; অপরাজিতা আরও উঁচুতে উঠে গেল। সাদা-সাদা মেঘ এসে ঢেকে দিল তার দৃষ্টিকে।



।। দশম অধ্যায় ।।

ষড়যন্ত্র

অভী মাথা নীচু করে বলল, “অধিনায়ক, শাস্তি যদি কিছু দিতে হয়, আমাকে দিন। সৌজন্যের কাছে লীনার সংবাদ আছে শুনে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। বাবা আমার অনুরোধ ফেলতে পারেনি বলেই আমার সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু এই ভুলের পুরো দায়িত্ব আমারই।”

নীলাভ্র এসেই পুরো ঘটনাটা অধিনায়ক বজ্রধরকে জানিয়েছে। তিনি গম্ভীরমুখে সব শুনেছেন, কিন্তু এখনও কোনো মন্তব্য করেননি। রক্ষোবৈদ্য রাজা পুনর্বসুর পরিচর্যা করছেন তাঁর সেবাকক্ষে। রাজা গুরুতর আহত; বাঁচবেন কি না ঠিক নেই। সৌজন্যের ছুরি তাঁর হৃৎপিণ্ডের একদম গা ঘেঁষে বিদ্ধ হয়েছে; আর একটু বামদিকে আঘাতটা এলে আর তাঁকে বাঁচানোর উপায় থাকত না।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বজ্রধর বললেন, “এখন শাস্তির কথা থাক। কিন্তু তোমাদের এই একটা ভুল পদক্ষেপে মাল্যপর্বতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সমীকরণটা একেবারে বদলে গেল, এটা বুঝতে পারছ? আমার আর রাজা পুনর্বসুর মধ্যে একটা গোপন অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। এ-ছাড়াও, পুনর্বসু মোটামুটি

আমাদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় করে চলতেন। কিন্তু সৌজন্য আদৌ তা করবে কি না আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সিংহাসনে বসার মুহূর্তেই সে নীলাদ্রকে ফাঁসাতে চেয়েছিল। কাজেই তার কাছ থেকে খুব ভালো কিছু আশা না করাই ভালো।”

মেঘবর্ণ বলল, “ওখানকার বিমোহকদের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া এ-জিনিস অসম্ভব ছিল। কিন্তু নীল, তুই এতটা বোকামি করলি কী করে? অভী নাহয় বাচ্চাছেলে, তার পক্ষে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সৌজন্য যে একটা সাপ, তুই তো জানতিস। ওই লোকটার কথায় তুই বিশ্বাস করলি কী করে?”

নীলাদ্র চুপ করে রইল। অভী অপরাধবোধে ভুগছিল। সৌজন্যের ফাঁদে বোকার মতো পা দিয়ে সে যে শুধু আয়তনের বিপদ ডেকে এনেছে তা-ই নয়, তার জন্য বাবাকেও দোষের ভাগী হতে হচ্ছে।

রক্ষোবৈদ্য এসে প্রবেশ করলেন সম্মেলন কক্ষে। নীলাদ্র উদ্বিগ্নভাবে বলল, “রাজা কেমন আছেন, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়? বাঁচবেন তো উনি?”

রক্ষোবৈদ্য হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করলেন। “নিয়ে আসতে আর একটু দেরি হয়ে গেলে বাঁচানো অসম্ভব ছিল। প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে তো। কিন্তু এখন ওঁর অবস্থা আশাজনক। রক্তপদ্মরাগমণি ওঁকে ধারণ করিয়ে এসেছি। ওই মণি কাছে থাকলে প্রাণ কিছুতেই শরীর ছেড়ে বেরোয় না। আশা করছি, এ-যাত্রা বেঁচে যাবেন রাজা।”

অভী খেয়াল করল, রক্ষোবৈদ্যের শেষ কথাগুলো শোনামাত্র অদ্ভুতভাবে একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন অধিনায়ক বজ্রধর। ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল তার।

কিন্তু সে যা-ই হোক, রাজা ভালো আছেন শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল অভী। তার মূর্খামির জন্য রাজার প্রাণ চলে গেলে নিজেকে সে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারত না। একবার বাবার দিকে চোখ তুলে দেখে নিল সে। নীলাদ্রও যে এই সংবাদে একটু নিশ্চিত হয়েছিল, তাকে দেখেই বোঝা গেল।

অধিনায়ক বজ্রধরের সম্মতি নিয়ে সে কক্ষের বাইরে চলে এল। নিধির সঙ্গে এখনই একবার দেখা করতে হবে।

তাকে পাওয়া গেল অনুশীলন মঞ্চে। তখন বিকেল হয়ে এসেছে। স্বর্ণশেখরের সঙ্গে সেখানে ত্রিশূল চালনা অভ্যাস করছিল সে। অভীকে আসতে দেখে সে একগাল হাসল।

স্বর্ণশেখর বলল, “অভী, আয় এদিকে। মুখ শুকনো কেন?”

অভী এগিয়ে গেল। নিধি তার ত্রিশূল নামিয়ে বলল, “কী ব্যাপার? ওখানে কী হল? তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমার তো চিন্তায় মাথাখারাপ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। খবরটা হজম করতেও পারছি না, আবার কাউকে বলতেও পারছি না— সে কী যন্ত্রণা! যাক, যে কাজে গিয়েছিলে, সেই কাজ হল? লীনার কোনো খবর পেলে?”

স্বর্ণশেখর চমকে উঠে বলল, “লীনার খবর? তার মানে?”

অভী বলল, “রবিকাকা, তোমাকেও কিছু বলতে পারিনি। শুধু বাবা জানত। আমরা দু’জন সৌজন্যকে নিয়ে মাল্যপর্বতে গিয়েছিলাম। তারপর ওখানে একটা বড়ো গন্ডগোল হয়ে গেছে।”

স্বর্ণশেখর ভ্রু কুঁচকে বলল, “কী হয়েছে, খুলে বল দেখি।”

আর দেরি না করে তাদের মাল্যপর্বতযাত্রা সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলল অভী। সৌজন্য কীভাবে তাকে লীনার খবর দেবে বলে ফাঁদে ফেলেছে, কীভাবে তার অনুরোধে নীলাভ্র তাদের নিয়ে নরকগহ্বরের মধ্য দিয়ে মাল্যপর্বত অভিযান করেছে, তারপর সুযোগ বুঝে কীভাবে সে রাজাকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তার দায় নীলাভ্রর ওপর চাপিয়েছে এবং কীভাবে প্রজ্ঞার সাহায্যে তারা মৃতপ্রায় রাজাকে নিয়ে আয়তনে পালিয়ে আসতে পেরেছে— সবটাই বলে গেল সে একটুও না থেমে। নিধি আর স্বর্ণশেখর হাঁ করে পুরোটা শুনে গেল। অভী থামার পর স্বর্ণশেখর বলল, “আয়তনের দিকে অনেকক্ষণ যাওয়া হয়নি বলে এ-সব খবর এখনও আমার কানে আসেইনি। যা-ই হোক, রাজা এখন কেমন আছেন?”

অভী বলল, “একটু ভালো আছেন, শুনে এলাম এইমাত্র।”

নিধি গম্ভীরগলায় বলল, “সৌজন্যের কথায় বিশ্বাস করে এতসব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললে? তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না কোনোদিন, অভী?”

অভী মাথা নীচু করে বলল, “আসলে ও লীনার খবর দেবে বলতে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি।”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, সেই ব্যাপারে কী হল? লীনার কী খবর পেলে?”

অভী বলল, “লীনার খবর পাইনি। তবে উর্মি...”

বাকি দু’জন বিস্ফারিত চোখে একসঙ্গে বলে উঠল, “উর্মি? তাকে দেখলে?”

অভী শুকনো গলায় বলল, “হ্যাঁ। দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে ওপার থেকে উর্মি এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বলে গেলেন, লীনার আত্মা নাকি মৃতদের জগতেও নেই। আমি জানি না, কথাটার মানে কী। লীনা যদি মরে গিয়েই থাকে, তাহলে সে ওখানে নেই কেন? হৃদয়শর নিক্ষেপ করলে ঠিক কী হয়, রবিকাকা?”

স্বর্ণশেখর ম্লানমুখে বলল, “আমি জানি না রে। কেউই বোধহয় এর উত্তর জানে না।”

নিধি প্রশ্ন করল, “উর্মি আর কিছু বললেন?”

অভী বলল, “হ্যাঁ। আমার মৃত্যু যে খুব কাছে চলে এসেছে, সেই কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন।”

এর উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে স্বর্ণশেখর আর নিধি দু’জনেই চুপ করে রইল। যুদ্ধ, মৃত্যু এইসব নিয়েই আয়তনের সকলের কাজকর্ম, তবু এই অনাগত মৃত্যুর প্রসঙ্গ এখনও তাদের কিছুটা বিব্রত করে।

তারপর একটু সামলে নিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য নিধি বলল, “আজ একটা ব্যাপার হবে, তুমি বোধহয় জানো না।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “কী?”

নিধি মুখ টিপে একটু হেসে বলল, “আজ আয়তনে এক নতুন শিক্ষার্থী আসছে।”

“কে?”

“আন্দাজ করো তো।”

অভী কিছুক্ষণ ভেবেও বলতে পারল না। তখন নিধি বলে দিল, “নীপা।”

একগাল হেসে অভী বলল, “তা-ই নাকি? দারুণ খবর তো! কে যাচ্ছেন ওকে আনতে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী। আমাকে নীলাদ্র আগেই এই সংবাদ দিয়ে রেখেছিল। একটু পরেই তার সুদক্ষিণসারি যাওয়ার কথা। তবে নিধি, তোমার বাবা দিঙনাগ জানেন তাঁর ছোটোমেয়ের এই সুসংবাদ?”

নিধি হাসতে গিয়েও থেমে গেল। “বাবা জানে, এবং সে আদৌ খুশি নয়। একে সে ‘সুসংবাদ’ বলে মনেও করছে না। তার মনে-মনে ধারণা, আয়তন নাকি আমাদের স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শেখায়। তার বড়োমেয়েটাকে আয়তনই নাকি পর করে দিয়েছে। এখন ছোটোটিও যদি দিদির পথে যায়, তাহলে তার খুব একটা আনন্দিত হওয়ার কথা নয়।”

অভী বলল, “সে যা-ই হোক, সমরোত্তমদের কেউ ওকে আনতে গেলে তাঁর মুখের ওপর তোমার বাবা ‘না’ বলার সাহস পাবেন বলে মনে হয় না। আচ্ছা, নীপা এলে কোথায় থাকবে? তোমার কক্ষে তোমার সঙ্গেই তো ও থাকতে পারে।”

নিধি অদ্ভুতভাবে তাকাল তার দিকে। “না, অভী, আমার কক্ষে ওকে রাখতে চাই না আমি। মিত্রমাসি ছাড়াও অনেক ভবন-অধ্যক্ষ আছেন সমরগরিমা আয়তনে। কেউ না কেউ ওকে ঠিক থাকার জায়গা দিয়ে দেবেন। তুমি হয়তো জানো না, এই নিয়ে অধিনায়ক বজ্রধর আর সমরোত্তম শ্যামশ্রীর সঙ্গে আমার আগে কথা হয়েছে। ওঁরাও আমাকে একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, আমার কক্ষে লীনা ছাড়া আর কেউ থাকুক, এ আমি চাই না। লীনা যে আমার কত প্রিয় বন্ধু ছিল, সে-কথা তোমরা কেউ ভাবতে পারবে না; কত দিন কত রাত আমরা দুই বন্ধু গল্প করে কাটিয়েছি, সে-সব খবর কেউ জানেও না। এখনও মাঝে-মাঝে রাতের বেলা ঘুম ভেঙে গেলে পাশের শূন্য বিছানাটার দিকে তাকালে মনে হয়, ও বোধহয় একটু পরেই ফিরে আসবে। ওই জায়গাটি অন্য কেউ নিলে আমার ভালো লাগবে না। নীপা আমার বোন ঠিকই, কিন্তু লীনা যেখানে থাকত, সেই জায়গা তাকেও দিতে আমার আপত্তি আছে। অধিনায়ক বজ্রধর আমাকে কথা দিয়েছেন, আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করেই তিনি নীপার জন্য অন্য কোনো ভবনের ব্যবস্থা করে দেবেন।”

অভী দেখল, নিধি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একবার চোখ মুছে নিল। ওদের দুই বান্ধবীর মধ্যে যে কতখানি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল, তা সে নিজের চোখেই দেখেছে। সে এই আয়তনে আসার আগে থেকেই লীনা আর নিধি মানিকজোড় ছিল।

স্বর্ণশেখর নিধির মাথায় হাত রেখে একটু সান্ত্বনা দিল। তারপর সম্ভবত কথা ঘোরানোর জন্যই সে বলে উঠল, “আচ্ছা, তোমরা সঞ্জীবকে চেনো তো?”

অভী একটু অবাক হয়ে বলল, “অর্ধরাক্ষস সঞ্জীব তো? যে জঙ্গলের মধ্যে ছায়াভবন সরাইখানার দায়িত্ব সামলায়?”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, তাকে আমরা ভালো করেই চিনি। কেন? কী করেছে সে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “লীনার প্রসঙ্গ উঠতে তার কথা মনে পড়ল। লোকটা দিনকয়েক আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ‘আমার সঙ্গে’ বললে অবশ্য কথাটা পুরোপুরি ঠিক বলা হবে না; সে এসেছিল মেঘবর্ণের সঙ্গে দেখা করতে। ঘটনাচক্রে আমি তখন ওর সঙ্গেই কথা বলছিলাম। তাই তার কথাগুলি আমি সবই শুনেছি। লোকটা অদ্ভুত একটা তথ্য দিয়ে গেছে আমাদের।”

নিধি বলল, “কীরকম?”

স্বর্ণশেখর বলল, “তোমরা হয়তো জানো, সুদক্ষিণসারিতে নিয়ামকের রক্ষীপ্রধান চক্রবাককে মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। লোকটা সেখানে ঠিক কী উদ্দেশ্যে যায়, এখনও আমরা জানতে পারিনি। তাই মেঘবর্ণ ওই চক্রবাক আর নিয়ামকের পেছনে কয়েকজন গুপ্তচর লাগিয়েছিল— তাদের মধ্যে একজন হল এই সঞ্জীব। এর কাজ ছিল নিয়ামকের কার্যালয়ে কারা যাওয়া-আসা করছে, সে-সম্পর্কে সব খবর আমাদের কানে পৌঁছে দেওয়া। লোকটা সেদিন এসে বলল, সে দেখেছে মানবমন্দিরের লতা খুব চুপিচুপি চোরের মতো নিয়ামকের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।”

অভী আর নিধি হাঁ করে বলল, “লতা মানে আমাদের লতাকাকিমা? লীনার মা?”

“হুঁ। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সঞ্জীব চলে যাওয়ার পরে মেঘবর্ণ আমাকে বলল, ‘আমি আগেও ওকে নিয়ামকের কাছে যেতে দেখেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জটিল করতে চাইছি না।’”

অভী অবাক হয়ে বলল, “নিয়ামকের কাছে লতাকাকিমার কী দরকার পড়ল?”

স্বর্ণশেখর বলল, “শুধু তা-ই নয়, সেই সময় নিয়ামকের কার্যালয়ে আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। লতা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সে-ও ওখান থেকে চলে যায়। কে, আন্দাজ করতে পারো?”

“কে?”

“সৌজন্য।”

ওদের হাঁ বন্ধ হতে এবার আরও বেশি সময় লাগল। তারপর নিধি বলল, “সৌজন্য কী করছিল ওখানে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “গতবার যখন ও এসেছিল অভীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রক্ষোপুরী নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখনই ও লুকিয়ে নিয়ামকের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। আর সেই সময় লতাও ওই একই জায়গায় উপস্থিত ছিল। নিতান্ত কাকতালীয় হওয়া সম্ভব কি ব্যাপারটা?”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “কখনও নয়। সৌজন্য যেখানে উপস্থিত আছে, সেখানে কাকতালীয় বলে কিছু হতেই পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর পেছনেও ওর কোনো দুষ্টবুদ্ধি আছে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আচ্ছা, এখন এই আলোচনা থাক। ওই যে শ্যামশ্রী আসছে। তোমরা যাবে নাকি ওর সঙ্গে সুদক্ষিণসারি?”

অভী বলল, “মা যদি আপত্তি না করে, তাহলে আমি তো যাবই।”

নিধি বলল, “তুমিই যাও; আমি যাব না ভাবছি। একজন সমরোত্তমের সঙ্গে তার অভীদাদা তাকে আনতে এসেছে দেখলে বোনটা খুশিই হবে। বাবা এমনিতেই আমার সঙ্গে কথা বলে না, আর আমিও এই মুহূর্তে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছি না। অনর্থক তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ কী?”

অভী অনুরোধের সুরে বলল, “নিধি, তুমি চলো। নীপার কতদিনের ইচ্ছা আয়তনে শিক্ষার্থী হিসাবে সুযোগ পাওয়ার, তোমার সঙ্গে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করার। নিয়তির ইচ্ছায় এতদিনে তার হাতে স্পষ্ট নিয়তিলাঞ্ছন দেখা দিয়েছে; এখন তুমি যদি তার আয়তনে আসার সময় উপস্থিত থাকো, তাহলে তারও ভালো লাগবে।”

নিধি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আচ্ছা, যাব।”

শ্যামশ্রী আসতে ওরা তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, “তোমরা আসতে পারো আমার সঙ্গে। বৃদ্ধ দিঙ্নাগ কেমন ব্যবহার করবেন, অনুমান করতে পারছি না। তখন, নিধি, তুমি থাকলে তুমি হয়তো তোমার বাবাকে বোঝাতে পারবে।”

নিধি শুকনো একটা হাসি হেসে বলল, “আমার বাবা আমার কোনো কথা শুনবে, সে সম্ভাবনা কম। তবে নীপার মুখ চেয়েই আমি যাব আপনার সঙ্গে।”

স্বর্ণশেখর গেল না ওদের সঙ্গে। সমরোত্তম শ্যামশ্রীর সঙ্গে নিধি আর অভী যাত্রা করল সুদক্ষিণসারির উদ্দেশে। অভীর মনে পড়ছিল, একদিন সে-ও এইরকমভাবেই আয়তনে এসেছিল সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে, তবে সেদিন তার সঙ্গে আর কেউ ছিল না।

সমরগরিমা আয়তনের মাঠের পাশে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে আসছে; একটা বুলবুলি শিস দিচ্ছে আমগাছের মগডালে বসে। দিন শেষ হয়ে আসছে।

যেতে-যেতে শ্যামশ্রী বললেন, “অভী, তোকে একটা কথা বলছি। কথাটা হয়তো একটু তেতো শোনাবে, কিন্তু তোর মঙ্গলের জন্যই এটা তোকে বলা দরকার। তুই মনে-মনে এটা জেনে রাখ, লীনা আর আসবে না। শুনতে তোর খারাপ লাগছে জানি, কিন্তু তবু বলছি। লীনার সংবাদ পাওয়ার আশায় ভবিষ্যতে আর কোনো প্রলোভনে পা দিস না, এইটুকু তোর মা এবং তোর শিক্ষক হিসাবে আমি তোকে অনুরোধ করে রাখছি।”

অভী মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। বোকার মতো তার মাল্যপর্বতে চলে গিয়ে ঝামেলা বাধানোয় মা যে সন্তুষ্ট নয়, সে বুঝতে পারছিল। নিধি কী একটা

বলতে গিয়েও থেমে গেল— সমরোত্তম শ্যামশ্রীর সামনে এই নিয়ে মুখ খুলতে সাহস পেল না।

সুদক্ষিণসারিতে পৌঁছে নিধির বাড়ির দিকে রাস্তাটা যেখানে বেঁকে যাচ্ছে, সেখানে মৃগেন্দ্রর দেখা পেল ওরা। মৃগেন্দ্র কথা বলছিল তার বাবা রথীন্দ্র আর আর একজন বয়স্ক অর্ধরাক্ষস সুহাসের সঙ্গে। অভীর মনে পড়ে গেল, এই দু'জন অর্ধরাক্ষস-সহ আরও অনেককে এর আগে নিয়ামক পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন অর্ধরাক্ষসদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হওয়ার অপরাধে।

সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে দেখে তিনজনেই নমস্কার জানালেন। রথীন্দ্র এগিয়ে এসে বললেন, “সুদক্ষিণসারিতে স্বাগতম, মাননীয় সমরোত্তম।”

শ্যামশ্রী প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, “দিঙ্‌নাগের বাড়িতে যাচ্ছি নীপাকে আয়তনের শিক্ষার্থী হিসাবে আমন্ত্রণ জানাতে।”

রথীন্দ্র আর সুহাস একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। দিঙ্‌নাগ যে সমরগরিমা আয়তনের কার্যকলাপ খুব একটা পছন্দ করেন না, এ-কথা সর্বজনবিদিত। শ্যামশ্রী একটু হেসে বললেন, “চিন্তা নেই, আমার গায়ের চামড়া যথেষ্ট মোটা। আয়তনের এবং শিক্ষার্থীদের মঙ্গলের জন্য আমরা সমরোত্তমরা করতে পারি না, হেন কাজ নেই।”

অর্ধরাক্ষস দু'জন হাসলেন। মৃগেন্দ্র বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আমি যাব আপনাদের সঙ্গে?”

“আসতে পারো। আয়তনের অর্ধরাক্ষস শিক্ষার্থী একজন সঙ্গে থাকলে তো ভালোই হয়। দিঙ্‌নাগকে অন্তত এটুকু বোঝানো সহজ হবে যে আমরা অর্ধরাক্ষসদের শত্রু নই, যদিও তিনি কতটা বুঝতে চাইবেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।”

বাবার কাছে বিদায় নিয়ে মৃগেন্দ্র তাঁদের সঙ্গে ধরল। হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল, “গতবার নিধি যখন শেষমুখের বিষাক্ত তিরে মরতে বসেছিল, তখন এই লোকটাই নিজের মরণাপন্ন মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। সে-বার যে আমাদের কী রাগ হয়েছিল, কী বলব আপনাকে!”

নিধির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে দেখে অভী আস্তে করে মৃগেন্দ্রর হাতে একটা চিমটি কাটল। সে বুদ্ধিমান ছেলে; মুখ ফিরিয়ে নিধির দিকে একবার দেখেই আর কোনো কথা না বলে চুপ করে গেল।

শ্যামশ্রী এত কিছু দেখেননি। তিনি বললেন, “নীপাকে আয়তনে আনার কথা বললে আজ আবার তিনি কী মূর্তি ধরবেন, বলা মুশকিল।”

মৃগেন্দ্র বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আপনাকে যদি উনি অপমান করেন, আমরা শিক্ষার্থীরা কিন্তু কেউ তা সহ্য করব না। নিধি, তুমি...?”

নিধি গম্ভীর মুখে বলল, “উনি আমার বাবা হতে পারেন, কিন্তু আমার শিক্ষকদের অপমান করার অধিকার ওঁকে কেউ দেয়নি। তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, মৃগেন্দ্র, এতজন শিক্ষার্থীর সামনে একজন সমরোত্তমকে বাবা অপমানজনক কিছুটি বলবে না। অত সাহস তার নেই।”

নিধির বাড়ির সামনে পৌঁছে শ্যামশ্রী বললেন, “আমরা ভেতরে ঢুকব না। নিধি, তুমি গিয়ে তোমার বোনকে ডেকে আনো।”

অভীর দিকে তাকিয়ে নিধি বলল, “আমি যাচ্ছি। তুমি আসবে?”

একটু কিস্ত-কিস্ত করে শেষ পর্যন্ত অভী এগিয়ে গেল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিধির মা। ওরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তাঁকে। খুশি হয়ে তিনি চোঁচিয়ে ডাকলেন, “অ্যাই নীপা, দেখে যা কারা এসেছে!”

নীপা বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে। অভীকে দেখেই ছুটে এসে হাত ধরে টানল সে। “অভীদাদা, বাইরে কেন? ভেতরে এসো। দিদি, আয় না রে।”

নিধি বলল, “আজ তোকে নিতে এসেছেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। তৈরি হয়ে নে তুই। বাবা কোথায়?”

শঙ্কিত মুখে নিধির মা বললেন, “সে আছে ভেতরে। ডাকব?”

দরজার বাইরে থেকে সমরোত্তম শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, ডাকুন।”

নিধির মা এগিয়ে এসে বললেন, “মাননীয়া সমরোত্তম, দয়া করে ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করুন।”

শ্যামশ্রী দরজা পেরিয়ে সামনের ঘরে এসে বসলেন। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই এসে ঢুকলেন নিধির বাবা দিঙনাগ। অভীর মনে হল, তিনি সম্ভবত দরজার ওপারেই ছিলেন— এদিকের কথাবার্তা এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলেন।

বাবাকে আসতে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল নিধি। সেদিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন তার মা। দিঙনাগ তাঁর বড়ো মেয়ের দিকে একবার তাকালেনও না।

শ্যামশ্রী হাতজোড় করে বৃদ্ধ দিঙনাগকে নমস্কার জানালেন। গম্ভীরভাবে প্রতিনমস্কার করে দিঙনাগ বললেন, “সমরগরিমার সমরোত্তমদের মধ্যে একমাত্র আপনার শরীরেই রাক্ষসরক্ত আছে। আপনি আমার নমস্কার পাওয়ার যোগ্য।”

শ্যামশ্রী হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, “রাক্ষসরক্ত আছে এমন ব্যক্তি ছাড়া আপনি যদি কাউকে নমস্কার করতে না পারেন, তাহলে আপনার নমস্কার গ্রহণ করতে আমি অস্বীকার করছি।”

দিঙনাগ এই প্রত্যুত্তর আশা করেননি। একটু অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, “আপনি বোধহয় অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু আমি আপনাকে সম্মান দিতেই চেয়েছিলাম।”

একটু দুঃখের হাসি হেসে শ্যামশ্রী বললেন, “ওইখানেই তো গন্ডগোল, মাননীয় দিঙনাগ। অন্যদের অসম্মান না করেও যে একজনকে সম্মান করা যায়, এটা একজন বয়স্ক অর্ধরাক্ষসকে বলে দিতে হচ্ছে, এখানেই আমার দুঃখ।”

কী বলবেন, ভেবে না পেয়ে দিঙনাগ চুপ করে রইলেন। শ্যামশ্রী বললেন, “গতবার আমার স্বামী সমরোত্তম নীলাদ্র দু’বার আপনার প্রাণরক্ষা করেছিলেন— একবার বর্ষার আঘাত থেকে, আর একবার জ্বলন্ত ছায়াভবন থেকে। তার জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশটুকুও আপনি করেননি। এতে আমাদের দুঃখ আছে, ক্ষোভ নেই। ভদ্রতাবোধ সকলের সমান নয়, আমরা জানি।”

অভী বুঝতে পারছিল, মা ভেতরে-ভেতরে বেশ রেগে আছে। আড়চোখে নিধির দিকে তাকিয়ে সে দেখল, নিধি মাথা নাড়ছে— মানে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কথাগুলো তার পছন্দ হয়েছে।

তিনি আবার বললেন, “বেশিক্ষণ আপনার ঘরে বসে আপনাকে বিব্রত করব না। আপনার ছোটোমেয়ে নীপার হাতে নিয়তিলাঞ্ছন দেখা দিয়েছে, আপনি জানেন নিশ্চয়ই। আজ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়তনে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।”

দিঙ্নাগ গোমড়ামুখে বললেন, “নীপা আয়তনে যাবে, এতে আমার মত নেই।”

শ্যামশ্রী বললেন, “নিয়তির ডাকের চিহ্ন ওই নীল দাগটা— ও দাগ যার হাতে ফুটে ওঠে, তাকে আয়তনে আসতেই হয়, নতুবা তার ফল মঙ্গলজনক হয় না, এ-কথা আপনি জানেন না, আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না দয়া করে।”

“জানি। তবু আমি চাই না, আমার ছোটোমেয়ে নিজে একজন অর্ধরাক্ষস হয়ে আয়তনে গিয়ে অর্ধরাক্ষসদের হত্যা করার শিক্ষা পাক। আমি চাই না, সে তার দিদির মতো নিজের জাতের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক তৈরি হোক।”

নিধি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। মৃগেন্দ্র গেল তার পিছুপিছু।

শ্যামশ্রী সম্ভবত কড়া কোনো উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পাশের ঘর থেকে নীপার হাত ধরে তার মা বেরিয়ে এলেন। মেয়ের হাত শ্যামশ্রীর হাতে অর্পণ করে তিনি বললেন, “আমি নীপার মা হয়ে বলছি, আপনি ওকে নিয়ে যান, সমরোত্তম শ্যামশ্রী। এই লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে। নিয়ামকের বিরোধিতা করতে করতে এ গোটা সমরগরিমাকেই নিজের শত্রু ভাবতে শুরু করেছে।”

দিঙ্নাগ রাগতভাবে বলে উঠলেন, “আমি নিষেধ করছি, নীপা! তুই যাবি না।”

নীপার মা বললেন, “ও যাবে। কী চাও তুমি? বড়োমেয়েটাকে তো পর করেই দিয়েছ, এখন কি চাও তোমার ছোটোমেয়েটাও মরে যাক? আমরা বুড়োবুড়ি চিরকালের মতো একা হয়ে যাই?”

চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ দিঙ্নাগ। নীপা প্রথমে মা-কে তারপর বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দিঙ্নাগ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

অভী দেখল, নিধির চোখ লাল। তাদের আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ মুছে নিল।

নিধির মা প্রথমে নীপাকে, তারপর অভীকে চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন, তারপর এগিয়ে এসে নিধিকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদলেন। শ্যামশ্রী বললেন, “আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার দুই মেয়েই ভালো থাকবে আয়তনে।”

নিধির মা বললেন, “আমি জানি। ঘরের এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মেয়েদুটো যত দূরে থাকে, ততই ওদের পক্ষে মঙ্গল। ওই একটা লোকের জন্য সংসারটায় শান্তি পেলাম না কোনোদিন, জানেন!”

সমরোত্তম শ্যামশ্রী তাঁর হাত ধরে তাঁকে একটু সাহায্য দিলেন। তারপর ওঁরা আয়তনে ফেরার পথ ধরলেন। নীপা খুশিমুখে বলল, “অভীদাদা, আজ থেকে আমিও তোমাদের মতো আয়তনের একজন হয়ে গেলাম।”

অভী স্নেহের সঙ্গে একটু হেসে বলল, “আমরাও নিশ্চিত হলাম, যুদ্ধ লাগলে আমাদের পক্ষে দারুণ একজন যোদ্ধা পাব।”

শ্যামশ্রীও হাসলেন। “ভুল বলিসনি, অভী। নীপার মধ্যে দুর্দান্ত যোদ্ধা হয়ে ওঠার সব গুণই আছে।”

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সুদক্ষিণসারির পথ দিয়ে আয়তনের দিকে যেতে যেতে নিধি হঠাৎ চাপাগলায় বলল, “অভী, ওই দেখো।”

তার নির্দেশমতো মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই অভী দেখতে পেল লোকটাকে। সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল সে।

চক্রবাক!

লোকটার হাবভাব মোটেই সুবিধার ঠেকল না তার কাছে। আর একজন অর্ধরাক্ষসের সঙ্গে খুব নীচু স্বরে কীসব কথা বলছে সে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আয়তনের সেনাবাহিনীর পোশাক পরা আরও দু’জন লোক।

নিধি ফিসফিসিয়ে বলল, “চক্রবাকের সঙ্গে যে কথা বলছে, তাকে চিনতে পারছ? সুচিত্র! সেই ফলদোকানি।”

অভী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চক্রবাকরা তিনজনই সশস্ত্র; কোমরে তাদের ঝুলছে তরবারি, এক সৈন্যের হাতে বর্শা।

অভী চুপিচুপি বলল, “এর সঙ্গে চক্রবাককে আগেও কথা বলতে দেখেছে নীপা। ব্যাপারটা কী?”

নিধি একটু জোরে বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আপনারা যান, আমরা একটু পরে আয়তনে যাচ্ছি।”

শ্যামশ্রী ওদের ওখানে রেখে ফিরে গেলেন নীপা আর মৃগেন্দ্রকে নিয়ে।

নিধি বলল, “অভী, চলো এক কাজ করা যাক। সুচিত্রকাকার দোকানে বসে একটু ফলের রস খাওয়া যাক। যদি কোনো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে, তাহলে পরে সমরোত্তমদের আমরা সে-কথা জানাতে পারব।”

এতে আপত্তির কিছু নেই। অভী রাজি হয়ে গেল।

ওরা দু’জন এগিয়ে গেল সুচিত্রের দোকানের দিকে। চক্রবাক ততক্ষণে ওখান থেকে সরে গেছে তার দুই অনুচরকে নিয়ে।

ওদের আসতে দেখে সুচিত্র একটু অস্বস্তিভরে হাসল। “কী নিধি, কী খবর?”

নিধি বলল, “খবর কিছু নেই। কমলার রস পাওয়া যাবে?”

“যাবে। বোসো, দিচ্ছি।”

দোকানের সামনে পাথর দিয়ে বসার জায়গা করা আছে। সেখানে বসে পড়ল অভী আর নিধি। সুচিত্র দুটি শ্বেতপাথরের পাত্রে কমলার রস এনে রাখল ওদের সামনে।

নিজের পাত্রটি মুখের সামনে ধরে শ্বাস নিল অভী। ভারি সুন্দর গন্ধটা। রসটায় এক চুমুক দিতেই মুখ দিয়ে একটা “আহ্” তার বেরিয়ে এল আপনা থেকেই।

খুশি হয়ে মাথা নাড়ল সুচিত্র। “প্রলয়যোদ্ধা অভী, পছন্দ হয়েছে?”

অভী বলল, “হয়েছে। দারুণ বানান আপনি এই পানীয়, আমি সমরোত্তম মেঘবর্ণের কাছে আগেও শুনেছি।”

মেঘবর্ণের নাম শুনে সুচিত্রের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। একবার সন্তুষ্টভাবে চারপাশ দেখে নিল সে। অভীর মনে হল, সে যেন দেখতে চাইছে চক্রবাকের দলবল আশেপাশে আছে কি না।

নিধির সঙ্গে অভীর একবার চোখাচোখি হল অভীর; তারপর সে বলল, “আপনি কি আমাদের কিছু বলতে চাইছেন, সুচিত্রকাকা?”

সুচিত্র কী একটা বলতে গিয়ে হাঁ করেও চুপ করে গেল। “না, মানে, ইয়ে...”

নিধি ভরসা দেওয়ার সুরে বলল, “যদি কোনো ঝামেলায় পড়ে থাকেন, আমাদের বলতে পারেন আপনি। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার সমস্যার সমাধান করার আশ্রয় চেষ্টা আমরা করব।”

সুচিত্র এসে বসল ওদের সামনে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, “নিধি, তোমাদের আয়তনের নিয়ামক মনে করেন, আমরা অর্ধরাক্ষসরা সবাই নাকি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তা নই। আমি চাই না, আমার জাতের কারও কোনো ক্ষতি হোক। কিন্তু আজকের ব্যাপারে মুখ খুললে চক্রবাক আমার বউকে আর আমার ছোটোছেলেটাকে মেরে ফেলবে।”

চমকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাল অভী আর নিধি। অভী বলল, “আপনি খুলে বলুন, সুচিত্রকাকা। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি, অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে আপনার সমস্যার কথা পৌঁছে দিলে আপনাদের কারও গায়ে আঁচড়টিও কাটার সাধ্য হবে না নিয়ামকের।”

সুচিত্র বলল, “নিয়ামকের হুকুমে বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের সুদক্ষিণসারির চারজন বয়স্ক নেতাস্থানীয় লোকের ওপর নজরদারি করতে হচ্ছে আমাকে। নিধি, তার মধ্যে তোমার বাবাও আছেন।”

“কিন্তু কেন?”

“নিয়ামক এর আগে এই চারজন অর্ধরাক্ষস নেতাকে মারতে চেয়েছিলেন। গতবার ছায়াভবনের জতুগৃহের ঘটনা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই? তাঁর ধারণা, এই চারজন নেতার কারণেই অর্ধরাক্ষসরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। তাই আজ...” — বলে আবার চুপ করে গেল সে।

নিধি বলল, “আপনার পরিবারের কারও কিছু হবে না, আমি ভরসা দিচ্ছি আপনাকে। আজ ওরা কী করতে চলেছে, দয়া করে আমাদের বলুন, সুচিত্রকাকা।”

“চক্রবাক হুমকি দিয়ে গেছে, যদি এ-ব্যাপারে সমরোত্তমদের কাউকে ঘৃণাক্ষরেও কিছু জানাই, আমার পরিবারকে আমার চোখের সামনে খুন করবে

সে। সমরোত্তম মেঘবর্ণ আমাকে ‘বন্ধু’ বলেন, কিন্তু তবু তাঁকেও আমি কিছু বলার সাহস পাইনি।”

অভী আর নিধি তাকিয়ে রইল তার দিকে। সুচিত্র একটু থেমে বলল, “নিধি, আজ তোমার বোন নীপা একটু আগে শিক্ষার্থী হিসাবে চলে গেল আয়তনে, তা-ই না?”

“হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে এ-সবের কী সম্পর্ক?”

“নীপাকে ওরা ভয় পায়; কারণ তার সঙ্গে প্রলয়যোদ্ধা এবং সমরোত্তম শ্যামশ্রীর খুব ভালো সম্পর্ক। নীপা যে আমার দোকানের ওপর নজর রাখছিল, এটাও চক্রবাক সন্দেহ করেছিল। তাকে যে সমরোত্তম শ্যামশ্রী এখান থেকে আয়তনে নিয়ে চলে যাবেন, এ-কথা বেশ কিছুদিন ধরে সবাই জানত। ওরা অপেক্ষা করছিল আজকের দিনটার। চক্রবাক আর নিয়ামক পরিকল্পনা করে রেখেছে, যেদিনই নীপা সুদক্ষিণসারি ছেড়ে আয়তনে চলে যাবে, সেদিনই রথীন্দ্র, সুহাস, নির্মল আর দিগ্‌নাগ— এই চারজন অর্ধরাক্ষসের ওপর আক্রমণ হবে। কাজটা করা হবে খুব গোপনে। এদের এক-এক করে কোনো একটা কাজের অছিলায় ডেকে নেওয়া হবে বাড়ি থেকে, আর তারপর আড়ালে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খুন করে পুঁতে দেওয়া হবে। চক্রবাক এই একটু আগে আমাকে বলে গেল, এদের একজনও কাল ভোরের সূর্য দেখবে না।”

অভী আর নিধি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। সৌজন্যকে ওরা বরাবর ‘দুষ্ট’ বলে জেনে এসেছে, কিন্তু নিয়ামক বিনীতেশ যে তাঁর ছেলেমানুষি অহংকার আর অভিমানের তলায় এতখানি ক্রুরতা এবং হিংস্রতা লালন করে চলেছেন, ওরা ঠিকমতো বুঝে উঠতেই পারেনি।

সুচিত্র আবার বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর হঠাৎ ফিরে আসবেন, এ-কথা ওরা ভাবতে পারেনি; নয়তো অনেকদিন আগেই অর্ধরাক্ষসদের ওপর অনেক বেশি চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু হয়ে যেত। তোমাদের এই কথাগুলো বলতে পেরে ভালো লাগছে। নয়তো আমার জাতির এতজন অর্ধরাক্ষসের মৃত্যুর পরোক্ষ দায় আমিও এড়াতে পারতাম না। তোমরা তো এক-একজন বিরাট যোদ্ধা। যদি পারো, এখুনি ওদের আটকাও। নিধি, তোমার বাবা আর রথীন্দ্র— এই দু’জনের ওপর ওদের বেশি রাগ। আগে এদের ওপরেই হামলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।”

অভী সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “নিধি, চলো।”

নিধিও উঠে দাঁড়িয়েছিল; সে বলল, “যাচ্ছি। কিন্তু অভী, তোমার-আমার দু’জনের কারও কাছেই কোনো অস্ত্র নেই।”

অভী ঠিক এই কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। সঙ্গে চন্দ্রহাস দূরে থাক, একটা সাধারণ তরবারিও নেই। নিধি সবসময় তার ত্রিশূলটা নিয়ে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু কপাল এমন যে আজই সে অস্ত্রটা মিত্রভবনে রেখে চলে এসেছে।

নিধি বলল, “সুচিত্রকাকা, আপনার কাছে কোনো অস্ত্র আছে?”

“পাগল! নিয়ামকের বাহিনী এর আগে এসে বাজারে আমাদের প্রত্যেকের দোকান তল্লাশি করে গেছে। যে অর্ধরাক্ষসদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে,

তাদের বেদম প্রহার দিয়ে সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে এই ফল কাটার ছোটো ছুরিটি ছাড়া আর কিছু নেই।”

সেটাই তার হাত থেকে নিয়ে নিধি বলল, “আচ্ছা, এই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব আমরা। চলো, অভী।”

অভী নিধির সঙ্গে সুচিত্রের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু সে খুব ভালো করেই জানে, সশস্ত্র তিনজন সেনাবাহিনীর যোদ্ধার সামনে ওই একটা ছুরি দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। যদি হিমকুশলতা প্রয়োগ করা যায়, তাহলে অবশ্য...

নিধি তার মনের কথা বুঝতে পেরে গেছে। একটু হেসে সে বলল, “চক্রবাকদের গায়ে জোর যতই থাকুক, বুদ্ধির দৌড় ওদের খুব বেশি দূর নয়। তাই ভরসা রাখো।”

অভী বলল, “আগে কার কাছে যাবে?”

নিধি বলল, “এখন আর সমরোত্তমদের ডাকার সময় নেই। যা করার, আমাদেরই করতে হবে। রথীনকাকার বাড়িটা সামনে; চলো, তাকে আগে সাবধান করে তারপর আমার বাবার কাছে যাব।”

রথীন্দ্রের বাড়ি যেতে ওদের বেশি সময় লাগল না। দরজায় ডাকতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। ওদের দেখে অবাক হয়ে তিনি বলে উঠলেন, “নিধি! অভী! এইসময় তোমরা এখানে? ব্যাপার কী?”

নিধি বলল, “রথীনকাকা, সময় বেশি নেই। নিয়ামক আপনাদের চারজন নেতাকে মারতে লোক পাঠিয়েছেন। আপনি হয় এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে পালান, অথবা চুপচাপ দরজা এঁটে বসে থাকুন— কেউ হাজার ডাকলেও দরজা খুলবেন না।”

রথীন্দ্রের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। “আমাদের চারজন মানে আমি, সুহাস, দিঙনাগ আর নির্মল— এদের কথা বলছ তো?”

“হ্যাঁ।”

“নিয়ামকের আমাদের ওপর পুরোনো রাগ আছে, আমরা জানি। কিন্তু যা-ই হোক, তার জন্য আমি পালিয়ে যাব না। নিধি, এই লড়াই আমাদের লড়তে হচ্ছে শাসকের বিরুদ্ধে। তোমাদের যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার সমরগরিমা থাকে, তাহলে সে সমরগরিমা আমাদেরও আছে। ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়াকে আমিও ঘৃণা করি। নিয়ামকের সেনারা এখন কোথায় গেছে?”

অভী বলল, “সেটা ঠিক জানা নেই আমাদেরও। তবে আমরা এখন নিধির বাড়ি যাব।”

একটুও ইতস্তত না করে রথীন্দ্র বললেন, “চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।”

নিধি বলল, “আপনাকে দেখলেই ওরা মেরে ফেলবে।”

একটু হেসে তিনি বললেন, “আমি মরার ভয় পেলে আমার সহযোদ্ধাদের দেখবে কে? নাও, নাও, আর দেরি কোরো না; চলো, যাওয়া যাক।”

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন তিনি। তারপর তিনজন ছুটলেন নিধির বাড়ির দিকে।

দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা, বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে গেছে চক্রবাক-সহ তিনজন সেনা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে পুরোপুরি। সেই আলো-আঁধারিতে ওদের যেন তিনটে অশুভ প্রেতমূর্তির মতো লাগছে। নিধির বাড়ির দরজায় খুব ভদ্রভাবে ডাকছে ওরা, “মাননীয় দিঙনাগ, বাড়ি আছেন?”

অভীরা কিছুটা দূরে গাছের ছায়ায় মিশে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ফিসফিস করে বলল, “এবার আমরা কী করব? ওদের ওপর বাঁপিয়ে পড়ব?” তার মাথায় মাধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যার কথাটা— তাদের সঙ্গে সেরকম কোনো অস্ত্রই নেই।

রথীন্দ্র নীচুগলায় বললেন, “থামো, আগে দেখি ওরা কী করে।”

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ দিঙনাগ। “কী চাই?”

চক্রবাক বলল, “নমস্কার। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।”

দিঙনাগ জুঁকুঁচকে তাকালেন তার দিকে। “আপনি নিয়ামক বিনীতেশের রক্ষীপ্রধান না? আমার সঙ্গে তো আপনার কোনো কথা থাকার কথা নয়।”

“কথা আছে। অর্ধরাক্ষসদের বিষয়েই কথা আছে। কিন্তু সবার সামনে বলতে চাই না। নিয়ামক আপনাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী যে পদক্ষেপ নিতে চলেছেন, সেই বিষয়ে কিছু গোপন কথা আপনাকে জানাতে চাই। আপনি যদি অল্প সময়ের জন্য জঙ্গলের দিকটায় একটু আসেন, তাহলে ভালো হয়।”

দিঙনাগ ইতস্তত করছেন। রথীন্দ্র ফিসফিসিয়ে বললেন, “অর্ধরাক্ষস নেতাদের এই প্রলোভন দেখানো হলে কেউ সামলাতে পারবে না। আমিও পারতাম না। এবার তোমরা তাড়াতাড়ি কিছু করো। ওই জঙ্গলে একবার ওকে নিয়ে যেতে পারলে আর ও জ্যান্ত ফিরবে না।”

নিধি বলল, “অভী, তুমি যাও। রথীনকাকা, আপনি ওর সঙ্গে যান। আমি যাচ্ছি আপনাদের পেছনে।”

অভী তাকিয়ে দেখল, নিধি তাকে যেতে ইশারা করছে। তার মানে, ও নিশ্চয়ই কিছু একটা বুদ্ধি বার করেছে। তার ওপর ভরসা করে অভী গাছের তলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল লোকগুলোর দিকে। রথীন্দ্র তাকে অনুসরণ করলেন।

নিধির বাড়ির দরজার সামনে এসে অভী জোরগলায় বলে উঠল, “থামো তোমরা! কেউ কোথাও যাবে না এখান থেকে।”

চক্রবাকের দলটা চমকে গেল। তাকে এখানে দেখতে পাবে, ওরা আশা করেনি। নিধির বাবা অপ্রসন্নসুরে বললেন, “অভী, এ আমাদের অর্ধরাক্ষসদের ব্যাপার। এর মধ্যে তোমার নাক গলানোর কোনো কারণ দেখছি না আমি।”

রথীন্দ্র এগিয়ে এলেন। “দিঙনাগ, গোঁয়াতুঁমি কোরো না। অর্ধরাক্ষসদের ভালোমন্দের ব্যাপারে আমি অন্তত কিছু বলার অধিকার রাখি, এ-কথা আশা করি তুমিও মানো। অভী যা বলছে, শোনো। তাতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল।”

চক্রবাক তাঁর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল। “আরে, মাননীয় রথীন্দ্র যে! আপনার কাছেও যেতাম আমরা। অর্ধরাক্ষসদের ব্যাপারে নিয়ামকের কিছু বক্তব্য

আছে— সেগুলি উপযুক্ত গোপনীয়তা সহকারে আপনাদের জানাতে চাই। একবার আপনারা দু'জন আসবেন আমাদের সঙ্গে পীতপত্রবনের দিকে?”

অভী বলে উঠল, “না, কেউ কোথাও যাবে না। আপনাদের যা বক্তব্য, এখানেই বলুন সবার সামনে।”

চক্রবাক তার কোমরের তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখল। “না বললে কী করবে, অভী? সঙ্গে তো তোমার কোনো অস্ত্রই নেই দেখছি।”

তার চোখের ইঙ্গিতে বাকি দু'জন সেনার একজন অভীর চিবুকের তলায় তরবারি ঠেকাল, আর একজন ভীতিপ্রদভাবে তার তরবারি তুলে ধরল রথীন্দ্র আর দিঙনাগের দিকে। “আপনারা চলুন বনের দিকে। আপনাদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নির্মল আর সুহাসের জন্য ফিরে আসব আমরা।”

দিঙনাগ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন ওদের উদ্দেশ্য। আতঙ্কিত চোখে তিনি একবার অভী আর একবার রথীন্দ্রের দিকে তাকালেন। রথীন্দ্র বললেন, “এবার বুঝতে পারছ তোমাকে কী বলছিলাম?”

অভী ভাবছিল, নিধি এত দেরি করছে কেন? কী করছে সে ওই অন্ধকার গাছতলায়?

আর ঠিক তখনই যেন তার প্রশ্নের উত্তর দিতেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল একটা সাদা আলোর বন্ধিম রেখা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওদের সামনে আবির্ভূত হল নিধি, আর তার হাতে এই অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলজ্বল করছে...

চন্দ্রহাস!

সেই বাঁকা দৈব তরবারির আভা পড়েছে তার চোখে। প্রচণ্ড ভয় আর অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছে চক্রবাকের দলটা। নিধি হাসল গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। “কী চক্রবাক? আমাদের সঙ্গে অস্ত্র নেই বলে খুব আনন্দ হচ্ছিল, না? প্রলয়যোদ্ধার হাতে যদি এই অস্ত্র দিই, আর সে যদি চন্দ্রহাস চালাতে শুরু করে, কতক্ষণ পারবে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে?”

অভী বলতে যাচ্ছিল, ‘তুমি... তুমি কী করে চন্দ্রহাসকে...? আমাকে দাও ওটা!’ কিন্তু নিধি তার দিকে তাকিয়ে সবার অলক্ষ্যে একটা চোখের ইশারা করে দিতেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে সে চুপ করে গেল।

ভ্রমমায়া!

এ আদৌ চন্দ্রহাস নয়! নিধি সম্ভবত সুচিত্রর সেই ছুরিটাকে ভ্রমমায়া প্রয়োগ করে চন্দ্রহাসের রূপ দিয়েছে! অভীর হাতে পড়লেই তার এই মায়াবিভ্রম লোপ পাবে। তাই নিজেই সে ওই নকল দৈবাস্ত্র তুলে ধরে ভয় দেখাচ্ছে ওদের। কিন্তু মায়াটার প্রয়োগ অসম্ভব নিখুঁতভাবে করেছে নিধি— কিছু বোঝার উপায় নেই।

কাঁ বুন্ধি মেয়েটার!

চক্রবাকের অনুচরদের অস্ত্র আপনা থেকেই নেমে গেল নিচের দিকে; তারা ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছে চন্দ্রহাসের দিকে। নিধি ঝুন্ধভাবে বলল, “আমার বাবাকে মারতে এসেছিলে তোমরা? আজ আর রক্ষা নেই তোমাদের!”

নকল চন্দ্রহাস উদ্যত করে তেড়ে গেল সে ওদের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে লোক তিনটে পালাল। তারা ভালো করেই জানে, নিরস্ত্র অর্ধরাক্ষসদের ভুলিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা এক জিনিস, আর চন্দ্রহাসের মতো অপরাজেয় দৈবাস্ত্রের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

অভী বলল, “ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ওরা? আয়তনের দিকে তো যাচ্ছে না?”

রথীন্দ্র বললেন, “ওই গলিপথটা দিয়ে অল্পসময়ের মধ্যে মানবমন্দির যাওয়া যায়। ওরা বোধহয় ভাবছে, আয়তনে গেলে পাছে সমরোত্তমদের মুখোমুখি পড়ে যেতে হয়, তাই সেদিকে এই মুহূর্তে না যাওয়াই ভালো।”

নিধি বলল, “চলো অভী, ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি। রথীনকাকা, আপনি চেষ্টা করে লোক জড়ো করুন। ওদের একটা বিচার হওয়া দরকার অধিনায়কের সামনে।”

রথীন্দ্র পাশের বাড়িগুলোর দিকে ছুটে গেলেন। দিঙনাগ দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থির হয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে নিধি বলল, “তোমার বিশ্বাসঘাতক মেয়ে আর তার বন্ধুর কল্যাণে তোমার অমূল্য অর্ধরাক্ষস প্রাণটা বেঁচে গেল আজ। যাও, ঘরে ঢুকে যাও আবার। আমরা এই খবর প্রচার করে আর তোমার অসম্মান ঘটাতে চাই না।”

দিঙনাগ কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন; তারপর চুপচাপ চলে গেলেন বাড়ির মধ্যে। অভী আর নিধি ছুটল চক্রবাকের পলায়মান দলটার পেছনে— নিধির হাতে ভ্রমমায়ানির্মিত উদ্যত চন্দ্রহাস।

রথীন্দ্র পেছন থেকে চিৎকার করে সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসদের ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছে ওরা। অভী একবার মাথা ফিরিয়ে দেখল, তাঁর ডাকে অন্তত জনা দশেক লোক জমা হয়ে গেছে এরই মধ্যে; ওদের পেছনে ছুটে আসছে লোকগুলো।

ওদের সামনে প্রাণপণে পালাচ্ছে চক্রবাকের দলবল। তারা জানে, সাধারণত সন্ধ্যার পর সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসরা মানবমন্দিরের দিকে যায় না, আর মানবমন্দিরের মানুষরাও অনেকেই এদিকে আসে না। তাই এই গলিরাস্তাটা ফাঁকা থাকারই কথা।

আলোও বেশ কম এখানে। অন্ধকারের মধ্যে পদে পদে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা। বেশি ব্যবহার হয় না বলে মাটির রাস্তার ওপর প্রচুর ধুলো-ময়লা জমে আছে, জায়গায় জায়গায় জমে আছে খড়কুটো। সে-সব টপকে দৌড়ে পালাচ্ছে চক্রবাক আর তার দুই অনুচর। পেছনে ছুটে আসছে অভী আর নিধি, আর তাদের বেশ কিছুটা পেছনে ‘মার-মার’ রবে তেড়ে আসছে অর্ধরাক্ষসদের দল— তাদের অনেকের হাতেই বাঁশের লাঠি। চক্রবাকরা জানে, আজ ধরা পড়লে ভয়াবহ গণপ্রহার জুটবে কপালে। আয়তনে একবার পৌঁছে যেতে পারলে অন্তত নিয়ামকের সুরক্ষা পাবে ওরা, আর সমরোত্তমরাও প্রাথমিকভাবে জনগণের মারে প্রাণনাশ হওয়ার বিপদ থেকে ওদের রক্ষা করতে পারবেন।

ছুটতে-ছুটতে অভী দেখল, গলিটা যেখানে শেষ হচ্ছে, তার থেকে একশো হাতের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে লীনাদের বাড়িটা। জানালা দিয়ে ভেতরে আলো দেখা

যাচ্ছে, তার মানে লতাকাকিমা জেগেই আছেন। ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ঝোপের মধ্যে সারি-সারি জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। চক্রবাকের দলটা দৌড় দিল দু'পাশের বাড়িগুলো পেরিয়ে ওই ঝোপটার দিকে। সেদিকে কুড়ি-বাইশটা বড়ো-বড়ো গাছ খুব কাছাকাছি গজিয়েছে। তাদের পাদদেশে লতাগুল্ম জমে ঝোপটা বেশ ঘন হয়ে আছে। অভী জানে, ওই ঝোপ পেরিয়ে গেলে আর একটা রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে আয়তনের মাঠে ঢুকে পড়া যায়। চক্রবাকরা সেই উদ্দেশ্যেই ছুটছে ওই দিকে।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনাটা।

গাছগুলোর মাঝে একটা বিরাট কালো কীসের যেন স্তূপ ছিল, ছুটতে-ছুটতে হোঁচট খেয়ে চক্রবাকের এক অনুচর হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সেই বিরাট বস্তুটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল বিপুল অগ্নিশিখায়। তার স্পর্শে বিকট চিৎকার করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল লোকটা।

অভী, নিধি আর তাদের পেছনের অর্ধরাক্ষসদের পুরো দলটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এই বীভৎস দৃশ্য দেখে। কালো অন্ধকারের পিণ্ডটা উঠে দাঁড়াল তাদের দিকে মুখ করে। ভয়ানক চমকে গিয়ে অভী বলে উঠল, “এ তো ঐশিকদের সেই অগ্নিদানব!”

চক্রবাক এবং তার আর এক সঙ্গী দানবটার খুব কাছে এসে পড়েছিল। কোনোক্রমে হাঁচড়-পাঁচড় করে তারা বেরিয়ে পালিয়ে এল ঝোপ থেকে; মুখ-চোখ তাদের লাল হয়ে গেছে। চক্রবাক চিৎকার করে বলে উঠল, “পালাও সবাই! পালাও এখান থেকে!”

অভী আর নিধির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, “আমাদের আয়তনে নিয়ে চলো। কিন্তু এখান থেকে পালাও। ওটার সামনে পড়ে গেলে কেউ বাঁচবে না।”

অগ্নিদানবটা উঠে দাঁড়িয়েছে; পাতার গায়ে যেমন শিরা-উপশিরা থাকে, তেমনই তার সুবিশাল দেহের মধ্যে অজস্র জটিল শিরাবিন্যাসের মতো তরল আগুন খেলে যাচ্ছে; শুধু তার বুকের মধ্যে একটা চৌকো পাথরের আকৃতি দেখা যাচ্ছে, যেখানে কোনো আগুন নেই। গাছগুলো ছাড়িয়ে আরও অনেক উঁচুতে উঠে গেছে তার মাথা; দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধকার আকাশের গায়ে যেন বিরাট এক অগ্নিময় মিনার মাথা তুলেছে। সেই অকল্পনীয় উচ্চতা থেকে সে তাকিয়ে রইল তার থেকে কিছু দূরে জমা হওয়া ভিড়টার দিকে। তার ভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু তার সেই গম্ভীর উপস্থিতির মধ্যেই এমন একটা ভয়প্রদ ব্যাপার আছে যে কেউ আর সাহস করে সামনে এগোতে পারল না।

আতঙ্কিত অর্ধরাক্ষসরা পিছিয়ে যাচ্ছে এক-পা এক-পা করে। কিন্তু দানবটা আর এদিকে এল না। পায়ে-পায়ে সে চলে গেল পীতপত্রবনের রাস্তায়। অভী আর নিধি একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। দু'জনের মনে একই প্রশ্ন, “ঐশিকদের ওই ভয়ংকর অগ্নিদানব রাতের অন্ধকারে মানবমন্দিরে কী করতে এসেছিল?”

রথীন্দ্র এগিয়ে এসে বললেন, “ওটা যা-ই হোক, চলে গেছে। এবার চক্রবাক আর তার সঙ্গীকে বন্দি করে নিয়ে চলো সবাই অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে।”

দু'জন অর্ধরাক্ষস দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধল চক্রবাকদের, তারপর তাদের নিয়ে চলল আয়তনে। অভী আর নিধিও চলল দলটার সঙ্গে। তারা পুরো ঘটনাটার সাক্ষী।

দুই বন্দিকে এনে ফেলা হল অধিনায়কের সামনে। তিনি তখন সবেমাত্র নীপার জন্য ভবনের ব্যবস্থা করে তাকে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর তত্ত্বাবধানে রেখে সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলেন। এমন সময় অভীরা সবাই মিলে এসে হাজির হল।

শ্যামশ্রী, নীপাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও ভিড়টাকে আসতে দেখে থেমে গেলেন।

রথীন্দ্র পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বললেন অধিনায়ককে। আসার পথে অভী আর নিধি তাঁকে বলে রেখেছিল, এই ব্যাপারটার খবর যে ওরা সুচিত্রর কাছ থেকে পেয়েছে, সেটা যেন রথীন্দ্র গোপন রাখেন, নয়তো পরে সে বেচারা বিপদে পড়তে পারে। রথীন্দ্র সেইভাবেই সবকিছু জানিয়ে দিলেন দুই সমরোত্তমকে। ঘটনা শুনতে-শুনতে বজ্রধরের কপালে ঘোর জ্রকুটি দেখা দিল।

সবশেষে রথীন্দ্র বললেন, “আজ নিধি আর অভী না থাকলে কাল সকালে দেখতেন, সুদক্ষিণসারি থেকে চারজন অর্ধরাক্ষস হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমাদের লাশগুলোও যে কবে খুঁজে পাওয়া যেত, তার কোনো ঠিক নেই।”

বজ্রধর এসে দাঁড়ালেন চক্রবাকের সামনে। “তোমার এই আচরণের কারণ কী, রক্ষীপ্রধান চক্রবাক?”

চক্রবাক বুঝতে পেরেছিল, সে বড়োরকমের বিপদে পড়েছে, এখানে তার ঔদ্ধত্য দেখানো চলবে না। সে বলল, “মাননীয় অধিনায়ক, আমি যা করেছি, সব নিয়ামক বিনীতেশের আদেশে করেছি। নতুবা অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে আমার তো কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।”

নিধি পাশ থেকে অভীর কানে-কানে বলল, “ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকুক, অর্ধরাক্ষসদের ওপর অত্যাচার করতে ইনি কোনোদিনই কম যাননি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “নিয়ামকের আদেশ পালন করতে করতে নিজের বিবেকবোধটুকুও বিসর্জন দিয়ে ফেলেছ, চক্রবাক? তোমার মতো লোক আমাদের সমরগরিমার সেনাবাহিনীতে আছে ভেবেই আমি ঘৃণাবোধ করছি!”

অর্ধরাক্ষসদের অনেকেই সম্মেলন কক্ষের ভেতরে ঢোকেনি, দরজার বাইরে থেকেই উঁকি মারছিল। তাদের মধ্য থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে দাবি শোনা গেল, “অধিনায়ক বজ্রধর, ওকে একবার আমাদের হাতে তুলে দিন। তারপর আমরা ব্যাপারটা বুঝে নিচ্ছি।”

আর একজনের ত্রুদ্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “ওই নিয়ামকই যত নষ্টের গোড়া। ও-ই করিয়েছে এ-সব। ওর কঠিন শাস্তি চাই।”

বজ্রধর জ্র কুঁচকে রথীন্দ্রের দিকে তাকালেন। তিনি ভিড়টার দিকে ফিরে বললেন, “তোমরা শান্ত থাকো। অধিনায়ক বজ্রধরকে বিষয়টার বিচার করতে দাও।”

বজ্রধর কক্ষের ভেতরের এবং বাইরের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “একটা ব্যাপার আপনাদের বুঝতে হবে। উনি সমরগরিমার নিয়ামক। আইন অনুযায়ী আমি ওঁর বিচার করতে পারি না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যাতে উনি এই ধরনের ঘটনা না ঘটান, তার দিকে আমরা দৃষ্টি রাখব। শ্যামশ্রী, তুমি কী বলো?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করছি, অধিনায়ক। নিয়ামক বিনীতেশের কার্যকলাপের ওপর আমাদের অবিলম্বে রাশ টানতে হবে।”

রথীন্দ্র বললেন, “অধিনায়ক, নিয়ামককে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব আপনারা যথাসাধ্য পালন করবেন, এ-আশা আমার আছে। কিন্তু আজকের এই অপরাধ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে যে ব্যক্তি, তার ন্যায্য শাস্তি আপনি কী দেন, দেখার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি।”

বজ্রধর এগিয়ে গেলেন চক্রবাকের দিকে। “শাস্তি ও পাবে। চক্রবাক, সমরগরিমার সমরোত্তমদের না জানিয়ে তুমি সেনা নিয়ে গিয়েছিলে আমাদের নাগরিকদের ক্ষতিসাধন করতে। এই অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে তোমাকে এবং তোমার অনুচরকে বহিষ্কার করছি আমি।”

চক্রবাকের মাথায় শকুনের পালক লাগানো যে শিরস্ত্রাণ লাগানো ছিল, তা তিনি টেনে খুলে নিলেন। অপমানে মাথা নীচু করে দাঁতে দাঁত চেপে রইল সে।

নীপা একবার তার দিদির দিকে তাকাল; নীচুগলায় বলল, “এই লোকটার জন্যই মরতে হয়েছিল তরুণকে, আমি ভুলিনি সে-কথা। যতদিন ও বেঁচে থাকবে, আমি তা ভুলবও না।”

বজ্রধরের আদেশে কয়েকজন সেনা এসে বহিষ্কৃত চক্রবাক ও তার অনুচরকে বন্দি করে নিয়ে গেল। তারপর রথীন্দ্র-সহ সব অর্ধরাক্ষস সমরোত্তমদের নমস্কার করে বিদায় নেওয়ার পর তিনি ফিরলেন অভীদেবের দিকে।

শ্যামশ্রী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে। তিনি বললেন, “নিয়ামক যা করেছেন, তা অতি ঘৃণ্য, কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু আমি চিন্তিত অন্য ব্যাপারটা নিয়ে।”

বজ্রধর বললেন, “ঠিক এই কথাটা বলব বলেই আমি এতক্ষণ সবার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। নিয়ামককে আমরা সামলে নিতে পারব, কিন্তু ঐশিকদের ওই দানব এখানে কী করতে এসেছিল?”

অভী আর নিধির কাছ থেকে দানব-সংক্রান্ত ঘটনাগুলো আবার শুনলেন বজ্রধর ও শ্যামশ্রী। তাদের বর্ণনা শেষ হলে বজ্রধর বলে উঠলেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। দানবটা যদি এখানে এসেই থাকে, তাহলে মানবমন্দিরে ওই ঝোপের মধ্যে কী করছিল সে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমার মনে হয়, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল দানবটা। নয়তো সে অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করে ফেলতে পারত। যে ক’জন

ওই সময় ওখানে ছিল, তাদের সবাইকে চাইলেই ও মুহূর্তের মধ্যে ধসংস করে ফেলতে পারত। কিন্তু ও কাউকে আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করতে যায়নি। ওই সৈন্যটি ভুল করে ওর গায়ে স্পর্শ করে ফেলায় নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।”

অভী বলল, “সৌজন্য বলেছিল, দানবটার শরীরে এখনও আক্রমণ করার মতো জোর হয়নি। সে অবশ্য বেশ কিছুদিন হয়ে গেল।”

নিধি বলল, “আমারও মনে আছে কথাটা। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে ও বারবার এখানে আসছে কী করতে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আরও খেয়াল করে দেখো, ওকে কিন্তু একবারও সুদক্ষিণসারিতে দেখা যায়নি। বারবার মানবমন্দিরেই দেখা যাচ্ছে দানবটাকে। কেন? ওখানে কি কেউ ওকে সাহায্য করছে?”

বজ্রধর বললেন, “এটা ভালো বলেছ, শ্যামশ্রী। তাছাড়া তোমার দেওয়া সুরক্ষামায়া ঘিরে রেখেছে গোটা সমরগরিমাকে। দানবটা নিশ্চয়ই বেশ শক্তিশালী মায়াপ্রাণী। আয়তনের নিজের লোক ছাড়া কারও পক্ষে, বিশেষ করে কোনো মায়াপ্রাণীর পক্ষে ওই মায়া ভেদ করে বারবার ভেতরে আসা সম্ভবই নয়। তাহলে কি ওকে সাহায্য করছে আমাদের সমরগরিমারই কোনো ব্যক্তি?”

শ্যামশ্রী গম্ভীরমুখে বললেন, “এখন সবাই জানে, ঐশিকরা ওই অগ্নিদানবকে তৈরি করছেন প্রলয়যোদ্ধাকে হত্যা করার জন্য। তাহলে ভাবতে হবে, সমরগরিমায় এমন কে আছে, যে চায় অভী মরে যাক? অভীর এই গোপন শত্রুটি কে, সেইটি এখন আমাদের যেভাবেই হোক আবিষ্কার করতে হবে।”

মায়ের কথার অর্থ অনুধাবন করে অভী স্তম্ভিত হয়ে রইল। এত প্রবলভাবে তার মৃত্যু চায়, মানবমন্দিরে এমন কে-ই বা থাকতে পারে?



।। একাদশ অধ্যায় ।।

অরণ্য-সংকট

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অভী একাই তরবারি চালনা অভ্যাস করছিল অনুশীলন মঞ্চের ওপর, এমন সময় সে দেখল, আয়তনের মাঠের ওপর দিয়ে আসছেন অধিনায়ক বজ্রধর; তাঁর পাশেই হাঁটতে-হাঁটতে আসছে নীলাভ্র। দু'জনে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

ওঁরা আসছেন পীতপত্রবনের দিক থেকে। নীলাভ্রের মুখের ভাব বেশ চিন্তিত। বজ্রধরের কপালে জ্রুকুটি। অভী এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে।

আলোচনায় মগ্ন থাকায় তাঁরা ওকে খেয়াল করেননি; অনুশীলন মঞ্চ পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অভী শুনতে পেল অধিনায়ক বজ্রধর বলছেন, “এই ব্যাপারে আমি মেঘবর্ণকে একটুও বিশ্বাস করি না। ওকে বললে ও কিছুতেই রাজি হবে না, তাই ওকে এ বিষয়টা জানানো চলবে না একেবারেই...”

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল অভী। মেঘবর্ণকে সে অধিনায়ক বজ্রধরের অত্যন্ত কাছের লোক বলেই জানত। অধিনায়ক তাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না, এমন ব্যাপার কী থাকতে পারে, তার মাথায় এল না।

অধিনায়কের কপালের ওপর জু'দুটো বেঁকে আছে ধনুকের মতো। এই ভোরে বনে গিয়েছিলেন মানে তিনি পীতপত্রবনের গাছগুলোকে নিয়ে চিন্তিত, অভী বুঝতে পারল।

তাদের সামনে এসে দু'জনকেই নমস্কার জানিয়ে সে বলল, “অধিনায়ক, কোনো দুঃসংবাদ আছে কি? আপনাকে খুবই গম্ভীর লাগছে।”

বজ্রধর বললেন, “অভী, দুঃসংবাদ তো আছেই। পীতপত্রবন শুকিয়ে যাচ্ছে; পাতা ঝরে গিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে শয়ে-শয়ে লতাগুল্ম। দেখে এলাম, বহু গাছের নিচের দিকটা কেমন যেন পোড়া-পোড়া হয়ে গেছে, যেন কেউ বিষ দিয়েছে ওদের গোড়ায়। ওই বনের গাছগুলো যদি মরে যায়, সমরগরিমায় বৃষ্টি হবে না আর কোনোদিন। জলের জন্য আমাদের তখন মরুময়ের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।”

নীলাভ্র বলল, “আমি অধিনায়ককে এই কথাই বলছিলাম। মরুময় এর আগেও এই বন ধ্বংস করতে চেয়েছেন। আমার ঘোর সন্দেহ, এবারের এই ঘটনার পেছনেও তাঁরই হাত আছে।”

অভী বলল, “যদি গাছে বিষপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, আমি সে বিষ আকর্ষণ করে নিতে পারব।”

বজ্রধর একটু হেসে বললেন, “জানি। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তোমাকে বিষ-আকর্ষণ মায়া আমি প্রয়োগ করতে দেব না, কারণ ওই বিষ তোমার শরীরেই জমা হয়ে তোমাকে কষ্ট দেবে।”

নীলাভ্র বলল, “তা ছাড়া, আমার মনে হল, গাছগুলোতে বিষ নয়, অন্য কিছু প্রয়োগ করা হয়েছে। বিষ দিলে ওরকম ঝলসে পুড়ে যাওয়ার মতো কালো দাগ হয় না। এখন প্রশ্ন, এই কাজ করছে কে? সমরগরিমার ভেতরের লোক ছাড়া ওই বনে গিয়ে এই কাণ্ড কেউ করতে পারে কি? রাক্ষসরা পারে, আমরা জানি। এর আগেও শর্বরের সময়ে পীতপত্রবনে ছায়াভবনে ওদের আনাগোনা ছিল। কিন্তু এখন শর্বরের সমর্থকরাও নেই; আর বাকি যারা আছে, তারা নিজেদের দেশের রাজনীতি নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় তাদের আছে বলে আমার মনে হয় না।”

বজ্রধর বললেন, “নীলাভ্র, তুমি কী বলতে চাইছ, আমি বুঝেছি। তোমার ধারণা, আমাদের ভেতরের কেউ এই ব্যাপারে জড়িত।”

নীলাভ্র বলল, “তা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব কি? বনটা নদীর এপারে। আমাদের এদিকে লোকজনের পক্ষে বনে যাওয়া যতটা সহজ, রাক্ষসদের কারও পক্ষে বারবার জটায়ুবাহিনীর সাহায্য নিয়ে মৃত দেবতার নদী পেরিয়ে এপাশে আসার কাজটা অত সহজ নয় নিশ্চয়ই। এই বিষ বা যা-ই হোক না কেন, সেটা রোজ একটু একটু করে ছড়ানো হচ্ছে বনের মাটিতে। বাইরে থেকে কোনো রাক্ষসের পক্ষে এসে প্রতিদিন সেই কাজ করে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলে আমার মনে হয়।”

অভী ভেবে দেখল, বাবার কথায় যুক্তি আছে। মাল্যপর্বত থেকে কোনো রাক্ষস বনে নিয়মিত যাতায়াত করলে কারও না কারও চোখে ঠিকই পড়ে যেত। এই কাজ ভেতরের কোনো লোকেরই হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ।

হঠাৎ তার মাথায় এল, ওঁরা কি মেঘবর্ণকে সন্দেহ করছেন? নয়তো বজ্রধর হঠাৎ মেঘবর্ণকে বিশ্বাস না করার কথা বললেন কেন?

হতেই পারে না। মেঘবর্ণের মতো আয়তনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মানুষ সে আজ পর্যন্ত দেখেনি। সেই লোককে সন্দেহ করছেন অধিনায়ক আর তার বাবা, যে কিনা মেঘবর্ণের প্রাণের বন্ধু— এ কক্ষনও হতে পারে না!

মনের অস্বস্তিটা চেপে রাখল সে। বাবাকে এ-ব্যাপারে পরে জিজ্ঞাসা করবে কি? করলেও বাবা কি আদৌ উত্তর দেবে? বিষয়টা স্পর্শকাতর এবং খুবই গোপনীয়, সন্দেহ নেই। অধিনায়ক যদি তাকে মুখ খুলতে নিষেধ করে থাকেন, তাহলে বাবা মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখবেই।

তার চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল একটা ‘ঝটপট’ শব্দে। একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল তাদের তিনজনেরই চোখে মুখে। মাথার চুল ফরফরিয়ে উঠল তার। মুখ তুলে সে দেখল, একটা জটায়ু নেমে আসছে আকাশ থেকে।

বজ্রধর ভ্রু কুঁচকে বললেন, “এ তো মাল্যপর্বতের জটায়ু দেখছি। সঙ্গে চিঠিও ধরা আছে।”

জটায়ুটা এসে বজ্রধরের সামনে একটা সিলমোহর করা খাম ফেলে দিয়ে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আবার উড়ে চলে গেল।

নীলাভ্র ঝুঁকে পড়ে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, “মাল্যপর্বতের রাজার সিলমোহর করা চিঠি, অধিনায়ক। মনে হচ্ছে, মহারাজ সৌজন্যের বার্তা এসেছে আপনার জন্য।”

‘মহারাজ’ শব্দটা যে একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে উচ্চারণ করল নীলাভ্র, অভী বুঝতে পারল। সে দেখতে পাচ্ছিল, বাবার হাতে ধরা চিঠির খামের ওপর লেখা আছে— ‘সমরগরিমার মাননীয় অধিনায়ক সমীপেষু’।

অভী দেখল, দূর থেকে মা আর মেঘবর্ণ আসছে। ওদের দেখে হাত নাড়ল মেঘবর্ণ।

বজ্রধর বললেন, “আরও দু’জন সমরোত্তম আসছেন, ভালোই হল। সবার সামনেই সৌজন্যের চিঠি খুলব।”

মেঘবর্ণ কাছে এসে বলল, “এক্ষুনি দেখলাম, মাল্যপর্বতের জটায়ু উড়ে যাচ্ছে এইদিক থেকে। ব্যাপার কী, নীল?”

নীলাভ্র চিঠিটা বাড়িয়ে দেখাল তাদের। শ্যামশ্রী গম্ভীর মুখে বললেন, “এই সকাল-সকাল সৌজন্যবাবাজি আবার কী নতুন খেলা শুরু করল?”

বজ্রধর বললেন, “সেটাই এবার আবিষ্কার করব আমরা। তোমরা এসে পড়েছ, তাতে ভালোই হয়েছে। স্বর্ণশেখর কোথায়?”

মেঘবর্ণ বলল, “রক্ষোবৈদ্যকে সঙ্গে নিয়ে সে গেছে পর্বতের কাছে। পর্বত সেই লড়াইয়ের পর থেকেই ঝিমিয়ে আছে, তাকে একটু মানসিকভাবে চাপা করার দরকার আছে। ওখান থেকে ফিরে ওরা যাবে আঙন-দানবের আক্রমণে যে

সৈনিক মারা গেছে, তার বাড়িতে। তার বিধবার জন্য মাসান্তিক ভাতা চালু করা হচ্ছে আয়তনের পক্ষ থেকে, তা নিয়েই কথা বলবে ওরা।”

বজ্রধর বললেন, “বেশ। এবার খামটা খুলে দেখো, নীলাভ্র।”

নীলাভ্র এক হাতে সিলমোহর ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা স্বপ্ন-উপল আর একটা চিঠি। বজ্রধর বললেন, “স্বপ্ন-উপল। তার মানে, এর মধ্যে কোনো দৃশ্য বা শব্দ ধরে পাঠিয়েছে সৌজন্য। এটাই আগে দেখা যাক।”

নীলাভ্র স্বপ্ন-উপলকে হাতে নিয়ে প্রকাশমায়া প্রয়োগ করতেই ওদের সামনে আকাশের গায়ে একটা চৌকো আকারের আলোময় দৃশ্য আত্মপ্রকাশ করল। জায়গাটা মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার সামনে। বিরাট ফটকের পেছনে দেখা যাচ্ছে স্তম্ভের মতো আকাশচুম্বী মেঘগুলোকে। একটা খুঁটিতে বাঁধা আছে একটা লোক, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাক্ষস-সেনারা। লোকটার মুখ ফুলে আছে; বোঝা যাচ্ছে, তার মুখের মধ্যে কাপড় গোঁজা আছে, যাতে সে শব্দ করতে না পারে। আর আছেন কয়েকজন অভিজাত রাক্ষস, সৌজন্য নিজে এবং সেনানায়িকা প্রজ্ঞা।

বাঁধা লোকটাকে দেখেই অভী চমকে উঠল, “আরে, এ তো সেই... কী যেন নাম...!”

বজ্রধর বললেন, “সুমন্ত। গতবার প্রজ্ঞার সঙ্গে তুমি আর আমি মাল্যপর্বতে গিয়েছিলাম এর কাছে— প্রজ্ঞার মৃত ছেলে সুতসোমের ভূত ডেকে আনবে বলে দাবি করেছিল এই লোকটা।”

অভীর মনে পড়ে গেল, সে-বার লোকটা কীরকম কাতর আবেদন করছিল তাকে যন্ত্রণাহীনভাবে মেরে ফেলতে। ও জানত, সৌজন্য ওকে ধরতে পারলে ভয়াবহ মৃত্যু দেবে।

আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা দৃশ্যটায় আর একজনের আবির্ভাব ঘটল। ব্যক্তিটিকে দেখে অভী চমকে উঠল।

মরুময়!

নিজে একজন ঐশিক হয়েও মাল্যপর্বতের পুরো রাক্ষস-রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই একজন লোক। সৌজন্য হাসিমুখে বলল, “মহামন্ত্রী মরুময়, এই বধ্যভূমিতে আপনাকে স্বাগতম।”

মরুময় হাত তুললেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। অভী খেয়াল করে দেখল, এখনও আগের মতোই খুঁড়িয়ে হাঁটছেন তিনি।

নীরসেনার ত্রিশূলের বহু পুরোনো আঘাতের ফল!

মরুময় বললেন, “মাননীয় রাক্ষসরাজ সৌজন্যের কাজে লাগতে পেরে আমি খুশি। আপনি তিনটি উড্ডীনখরকে আহ্বান করতে চান, তা-ই তো, মহারাজ?”

সৌজন্য বলল, “হ্যাঁ, মহামন্ত্রী। এই লোকটি আমাদের রাজ্যে গোপনে প্রতারণামূলক ব্যবসা করত। আমাদের মাননীয়া সেনানায়িকাকেও সে একসময় ঠকাতে চেয়েছিল, সে-কথা ও নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে। আমাদের রাজ্যে বাস করেও যারা অসৎ উপায়ে উপার্জন করতে চায়, তাদের কাছে ওর এই শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকবে।”

প্রজ্ঞা বললেন, “ওকে ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে যে প্রতারণা ও করেছে, তার জন্য ওর প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই।”

সৌজন্য বলল, “কিছু ব্যাপারে রাজাকে নির্মম হতে হয়। আমার রাজ্যে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই, এটা মাল্যপর্বতবাসী যত তাড়াতাড়ি বোঝে, ততই মঙ্গল।”

বজ্রধর দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বললেন, “ইচ্ছা করেই লোকটার মুখে কাপড়জাতীয় কিছু একটা গুঁজে রেখেছে সৌজন্য, যাতে ও সবার সামনে ফাঁস করে দিতে না পারে যে সৌজন্যই ওকে দিয়ে ওইসব কাজ করিয়েছিল।”

বন্দি সুমন্তের সামনে দাঁড়িয়ে মরুময় হাত তুললেন আকাশের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন নীলাকাশ ভেদ করে নেমে এল বিরাট ডানাওয়ালা কালো মূর্তি তিনটে। তাদের ধারালো নখ আর চোখের অসম্ভব হিংস্র দৃষ্টি দেখে অভী শিউরে উঠল।

এই বস্তুই সেদিন আক্রমণ করেছিল তাকে। অপরাজিতা তখন না থাকলে...!

বন্দি সুমন্ত মুখ তুলে বিস্ফারিত চোখে দেখছে, তার ওপর নেমে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের দল। ভয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে তার মুখ দিয়ে, যদিও মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় তার আর্ত চিৎকার পরিস্ফুট হতে পারছে না। উড্ডীনখরগুলো নেমে এল তার মাথার ওপর; একটা মহাকায় বাদুড়ের দীর্ঘ, ধারালো চঞ্চু গোঁথে গেল তার কাঁধে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। উপস্থিত রাক্ষস-জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

অভী আর দেখতে পারছিল না এই নৃশংসতা। তবু বীভৎসতার বোধহয় অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে; একবার চোখ সরিয়ে নিয়েও আবার তাকাল সে স্বপ্ন-উপল থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্যটার দিকে। তার চোখে পড়ল, সৌজন্য নিরুত্তাপ মুখে তাকিয়ে দেখছে পাখিগুলোর লোকটাকে শিকার করার ঘটনা, কিন্তু তার পাশে দাঁড়ানো মরুময়ের চোখেমুখে কী বিচিত্র পাশবিক উল্লাস— মুখটা যেন পৈশাচিক আনন্দে জ্বলজ্বল করছে তাঁর।

অভীর মনে পড়ে গেল, মরুময় একজন ঐশিক; অন্যদের যন্ত্রণা তাঁকে আনন্দ দেয়, পুষ্টি দেয়। সে দেখল, মরুময়কে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছেন লোকটার মৃত্যুযাতনা।

ততক্ষণে ঠুকরে-ঠুকরে সুমন্তের শরীরটাকে একটা গোলাপি মাংসপিণ্ডে পরিণত করে দিয়েছে দানবিক বাদুড়গুলো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বধ্যভূমি। এতক্ষণ ছটফট করছিল লোকটা; এবার তার দেহ স্থির হয়ে গেল। এই যন্ত্রণা শেষ হওয়ায় অভী মনে মনে স্বস্তি পেল একটু।

দানবগুলো তখনও ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে মৃতের মাংস। মরুময়ের ইঙ্গিতে তারা দেহটাকে ছেড়ে উড়ে গেল আকাশে। সৌজন্য তাঁর দিকে ফিরে বলল, “এই মৃত্যু আমি উৎসর্গ করলাম আকাশলোকের অধিপতি ঐশিকদের উদ্দেশে। আগামী এক বৃহৎ কর্মের উপযুক্ত মনে করে আমাকে তাঁরা নির্বাচন করেছেন, তাই এই মৃত্যু আমার তরফ থেকে তাঁদের উপহার। আশা করি, এই প্রতারণার মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁদের তৃপ্তি আনয়ন করবে।”

দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। মেঘবর্ণ মন্তব্য করল, “সৌজন্যের কাছ থেকে এমন আচরণই প্রত্যাশিত। হিংস্রতাপ্রিয় বিমোহক রাক্ষসদের মাঝে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ওকে কিছুদিন ছাড়া-ছাড়াই এই ধরনের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাতে হবে, তবে ওরা ওকে মানবে। সুমন্ত বেচারার নিতান্তই বলির পাঁঠা হয়ে গেল।”

নীলাভ বলল, “আমার মনে হচ্ছে, সৌজন্য এইভাবে প্রজ্ঞাকেও একটা বার্তা দিয়ে রাখতে চাইল যে আচরণে একটু বেচাল দেখলে তাঁরও একই অবস্থা হবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কথাটা ভুল কিছু বলোনি। কিন্তু প্রশ্ন হল— ঐশিকরা কী এমন বৃহৎ কর্মের জন্য সৌজন্যকে নির্বাচন করেছেন, সে-বিষয়ে কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারলে?”

সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কেউই কিছু অনুমান করে উঠতে পারেনি এখনও।

বজ্রধর বললেন, “খামের মধ্যে একটা চিঠিও আছে। নীলাভ, তুমিই পড়ে শোনাও সবাইকে।”

নীলাভ স্বপ্ন-উপলটাকে খামে ভরে হাতের চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

সমরগরিমার মাননীয় অধিনায়ক বজ্রধর,
মাল্যপর্বতের প্রেত-বিশেষজ্ঞ সুমন্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচর
মারফত আমি খবর পেয়েছিলাম, সে আপনার এবং প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেছে আমার অগোচরে। সেই প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের
মৃত্যুর দৃশ্য আপনার আনন্দের জন্য এই পত্রের সঙ্গেই প্রেরণ করলাম।
এবার আশা করি আমার পরবর্তী অনুরোধ রক্ষা করতে আপনি একটু
বেশি আগ্রহী হবেন।

প্রথমেই আপনাকে অবগত করতে চাই যে, আমি আমার প্রতিবেশী
রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা বজায় করে চলতে চাই। আমার বিমোহক মন্ত্রীরা
এ-ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেন ঠিকই, কিন্তু রাজা হিসাবে
আমি চাই, অধিনায়ক বজ্রধর, আপনি একবার আসুন আমাদের রাজ্যে।
প্রলয়যোদ্ধাকেও আনুন। আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু গুরুতর আলোচনা
আছে। আপনি না আসতেই পারেন; কিন্তু আমার মহামন্ত্রী মরুময়
বলছিলেন, আপনাদের সমরগরিমার গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে কেন, সে-
বিষয়ে উনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানেন। গাছের এই রোগের একটা
প্রতিষেধকও ওঁর কাছে আছে। সে-বিষয়ে যদি আমাদের সহযোগিতা
চান, আমরা সদাপ্রস্তুত।

আমি জানি, আপনি আসবেন। তাই আমার অনুরোধ, আসার সময়
উর্মির রক্তপদ্মরাগ-সহ রক্ষোবৈদ্যকে নিয়ে আসবেন দয়া করে। অন্য
কোনো সমরোত্তম যদি আসতে চান, তাঁকেও স্বাগত জানাচ্ছি।

মাল্যপর্বতের রক্ষোপুরী আপনাদের আগমন-প্রতীক্ষায় রইল।

নীলাভ চিঠি পড়া শেষ করতেই শ্যামশ্রী বলে উঠলেন, “এটা ফাঁদ নয় তো?”

মেঘবর্ণ নিজের হাতে ঘুষি মেরে বলল, “অবশ্যই ফাঁদ! সৌজন্য গতবার নীলকে ফাঁদে ফেলে রাজা পুনর্বসুর হত্যার দায়ে ফাঁসিয়েছিল। আর ওকে আমি বিশ্বাস করি না। এবারও হতভাগা নির্ঘাত কোনো বদবুদ্ধি আঁটছে।”

শ্যামশ্রী বজ্রধরের দিকে তাকালেন। “অধিনায়ক, আপনি কী বলেন?”

বজ্রধর বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। আমি জানি, সৌজন্যের উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে না। কিন্তু আমার মাথায় এখন শুধু ঘুরছে, গাছগুলোকে যদি বাঁচানো না যায়, সমরগরিমা অনতিবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে; আমার এবং তোমাদের সকলের এতদিনের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। যেতে আমাকে হবেই।”

নীলাভ বলল, “একদিন এই মরুময়ই সমরগরিমার পুরো অরণ্য ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। আজ তিনি আপনাকে সেই অরণ্য রক্ষা করার উপায় বলে দেবেন, এই কথা আপনি বিশ্বাস করেন?”

বজ্রধর বললেন, “বিশ্বাস করছি না তো। কিন্তু ভেবে দেখো, সৌজন্য আর কী ধরনের বিপদে ফেলতে পারে আমাদের? আমাদের সরাসরি আক্রমণ বা বন্দি করার কথা সে ভাবছে না নিশ্চয়ই। যুদ্ধ করে আমাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা তার নেই, সৌজন্য নিজেও জানে। এদিকে আবার লিখেছে, রক্তপদ্মরাগ-সহ রক্ষোবৈদ্যকে নিয়ে যেতে। তার মানে, চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সাহায্য নিশ্চয়ই ওর প্রয়োজন। তাই ভাবছি, একবার গিয়েই দেখা যাক।”

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক, আপনাকে এবার তাহলে একা ছাড়ব না। আমি যাব আপনার সঙ্গে।”

বজ্রধর হাসলেন। “মহাবীর মেঘবর্ণ, তোমার ধারণা যুদ্ধ হলে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব না?”

সবাই হেসে উঠল। মেঘবর্ণ অবশ্য অপ্রস্তুত হওয়ার পাত্র নয়। সে বলল, “সম্মুখযুদ্ধে আপনাকে পরাস্ত করতে পারে, তেমন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত জন্মায়নি, অধিনায়ক। কিন্তু যুদ্ধ যদি বেধেই যায়, তখন যেন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে মরার সৌভাগ্য হয়, এইটুকু প্রার্থনা করি।”

কথাটা শুনে বাকি সমরোত্তমরা অদ্ভুতভাবে একবার তাকিয়ে নিলেন পরস্পরের দিকে। তারপর বজ্রধর মেঘবর্ণের কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললেন, “পাশাপাশি যুদ্ধ করে মরার প্রসঙ্গ যখন উঠল, তখন বলি। মেঘবর্ণ, একদিন তুমি হয়তো আমার নেওয়া কোনো কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য আমার ওপর রাগ করবে, কিন্তু সে-রকম দিন যদি সত্যিই আসে, মনে রেখো, ওই সিদ্ধান্তই আমার আদেশ। আশা করব, সারাজীবন যেমনটি করে এসেছ, আমার সেই সিদ্ধান্তকেও তুমি সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মান করবে।”

মেঘবর্ণ মাথা নীচু করে বলল, “অধিনায়ক, আপনি যখন যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি কোনোদিন ক্ষণিকের জন্যও তাতে সন্দেহ করিনি, ভবিষ্যতেও করবও না।

আপনি যদি আমাকে প্রাণ দিতেও বলেন, আমি তাতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করব না, আপনি জানেন।”

বজ্রধর হাসলেন। “সমস্যা তো সেখানেই। যাক গে, অভী, তুমি যদি চাও, নিধিকে সঙ্গে নিতে পারো; সঙ্গে চন্দ্রহাস অবশ্যই নেবে। শ্যামশ্রী, তুমি একবার গিয়ে রক্ষাবৈদ্য মহোদয়কে এই নিমন্ত্রণের সংবাদ দাও। নীলাভ্র, তুমি আমার সঙ্গে এসো। মেঘবর্ণ, তুমি দ্রুত তৈরি হয়ে নাও, আমরা এক দণ্ড পরেই যাত্রা করব।”

এই বলে মৃদু হেসে তিনি বাকি দুই সমরোত্তমকে নিয়ে চলে গেলেন। মেঘবর্ণ দাঁড়িয়ে রইল একটু অবাক হয়ে।

অভী জিজ্ঞাসা করল, “অধিনায়কের ওই কথাগুলোর মানে কী, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি জানি না, অভী। কিন্তু অধিনায়কের ওই মুচকি হাসির অর্থ আমি জানি— উনি কিছু একটা গোপন রাখতে চাইছেন।”

অভী প্রশ্ন করল, “তোমার কাছ থেকে?”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “হুঁ। শুধু তা-ই নয়, আরও একটা ব্যাপার গত কয়েকদিনে আমার নজরে পড়েছে। বাকি সমরোত্তমরা সবাই মাঝে-মাঝে কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু আমাকে আসতে দেখলেই চুপ করে যায়। তোমার মা, নীল, রবি— সবাই এই কাণ্ডটা করে। কিন্তু কেন, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।”

অভীর মনে হল, আজ কিছুক্ষণ আগে শোনা অধিনায়ক বজ্রধরের কথাটা তার মেঘবর্ণকে বলা উচিত। কিন্তু সে-কথা শুনেই মেঘবর্ণ অটুত হাস্য করে উঠল।

“অধিনায়ক বলেছেন, কোনো একটা ব্যাপারে আমাকে তিনি বিশ্বাস করেন না? হতেই পারে না! ও তুমি ভুল শুনেছ, অভী। তিনি জানেন, আয়তনের যে-কোনো কাজে আমি সর্বদা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। আর যা-ই হোক, আমার প্রতি ভরসার জায়গায় তাঁর কোনো খাদ নেই।”

অভী চুপ করে রইল। মেঘবর্ণ যখন কথাটা বিশ্বাস করতে চাইছে না, তখন আর তাকে এই নিয়ে কিছু বলতে তার ইচ্ছা করল না। কিন্তু তার নিজের মনের মধ্যে অস্বস্তির একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল।

মেঘবর্ণ বলল, “সময় বেশি নেই। যাও, চটপট নিধিকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে বলো। যাওয়ার আগে চন্দ্রহাস নিতে হবে, মনে রেখো; অধিনায়কের আদেশ।”

মাথা নেড়ে মিত্রভবনের দিকে ছুটল অভী।

সৌজন্যের এই হঠাৎ আমন্ত্রণের কারণ কী, ওরা দু'জন অনেক ভেবেও বার করতে পারল না। নিধি বলল, “আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। সৌজন্য কিন্তু উড্ডীনখর আহ্বান করার ক্ষমতা রাখে।”

অভী বলল, “না, সৌজন্য পারে না; মরুময় পারেন।”

নিধি বলল, “দুটো কি একই ব্যাপার নয়?”

অভী বলল, “আমার তা মনে হয় না। মরুময় একজন ঐশিক— নিজের স্বার্থে তিনি সৌজন্যকে ব্যবহার করবেন, আর সৌজন্যও নিজের স্বার্থে মরুময়কে হাতে

রাখতে চাইবে, এই পর্যন্ত ওদের সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে যে-কোনো একজনের স্বার্থে যা লাগলে সে অন্যমূর্তি ধরবে, মিলিয়ে নিয়ে তুমি।”

নিধি তার মাথায় টোকা মেরে বলল, “যেদিন প্রথম এসেছিলে আয়তনে, কী কাবলাই না ছিলে! এখন দেখছি অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছ।”

অভী হাসল। “স্বেচ্ছায় হইনি; এই পরিবেশটা করে দিয়েছে।”

মিত্রমাসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। অভী একবার সংগ্রহশালায় গিয়ে চন্দ্রহাসকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখা করল সমরোত্তমদের সঙ্গে।

মেঘবর্ণের গৃধ্র আত্মাদি আর বজ্রধরের গৃধ্র সুসভ্যকে শাঁখ বাজিয়ে ডাকতেই তারা নেমে এল আয়তনের মাঠে। মেঘবর্ণের সঙ্গে আত্মাদির পিঠে উঠল অভী আর নিধি। সুসভ্যের পিঠে উঠে গেলেন অধিনায়ক বজ্রধর, তাঁর পেছনে উঠলেন রক্ষোবৈদ্য। তারপর দুই সমরোত্তমের ইশারা পেতেই সুবিশাল দুই গৃধ্র উঠে গেল আকাশে।

আকাশপথে যেতে যেতে প্রবল হাওয়ার শব্দের মধ্যেও মেঘবর্ণ মুখ ফিরিয়ে বলল, “পর্বতের সঙ্গে দেখা করে এলাম আসার আগে। সে বলল, তার স্ত্রী উত্তরাকে রক্ষোপুরীর পাট চুকিয়ে সমরগরিমায় চলে আসার অনুরোধ করতে।”

অভী বলল, “আমি বউদিকে এর আগে একবার এই কথা বলেছিলাম। সে বলেছিল, তার কিছু কাজ বাকি আছে মাল্যপর্বতে; সেগুলো মিটিয়ে তারপর সে ফিরবে পর্বতের কাছে।”

শুনে মেঘবর্ণ বলল, “তা-ই নাকি? তাহলে মনে হচ্ছে, উত্তরার এই অসমাপ্ত কাজগুলোর খবর পর্বতও জানে না।”

নিধি বলল, “তা অসম্ভব নয়। পর্বতদা তো বহুদিন মাল্যপর্বতের বাইরে। ওদিকে উত্তরাবউদি বেশ কিছুদিন কাজ করেছে রাজকন্যা উর্মির কাছে। চিরকালের মতো দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে সবকিছু গুছিয়ে নিতে তার সময় লাগা স্বাভাবিক।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাল্যপর্বতের রক্ষোপুরীর দুর্গপ্রাকারের সামনে এসে নামলেন ওঁরা। দুই গৃধ্র তাদের আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল।

প্রজ্ঞা স্বয়ং দাঁড়িয়ে ছিলেন দুর্গদ্বারে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর আদেশে প্রহরীরা সুবিশাল দরজা খুলে দিল সম্পূর্ণভাবে। প্রজ্ঞা বললেন, “মহারাজ সৌজন্যের ইচ্ছানুসারে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।”

অভী খেয়াল করল, তার বাবার মতোই প্রজ্ঞার ‘মহারাজ’ শব্দটার উচ্চারণে একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে। প্রজ্ঞার সঙ্গে তারা প্রবেশ করল ভেতরে।

মনে-মনে একটু অবাক হচ্ছিল সে। সৌজন্য জানে, গতবার মৃতপ্রায় রাজা পুনর্বসু, প্রজ্ঞার সাহায্য ছাড়া পালাতে পারতেন না। তা-ও সে প্রজ্ঞাকে তাঁর সেনানায়িকা পদে বহাল রেখেছে কেন?

নিধিকে সে নীচুগলায় প্রশ্নটা করেই ফেলল। নিধিও ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল, “সম্ভবত প্রজ্ঞার বদলে উপযুক্ত রাক্ষস-সেনানায়ক ও এখনও খুঁজে পায়নি।

রাক্ষসরা প্রায় সবাই বিরাট যুদ্ধবাজ ঠিকই, কিন্তু তা-ও, ওঁর মতো যুদ্ধবিশারদ নেতা মালাপর্বতে আর একজনও নেই বলেই শুনেছি।”

সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই বিরাট মাঠ দিয়ে যেতে যেতে অভীর মনে পড়ল, প্রথমবার এখানে এসে এই মাঠ পেরনোর সময় সুতসোমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের। কিন্তু এখন প্রজ্ঞার সামনে ইচ্ছা করেই সে-কথার উল্লেখ করল না সে।

রাজপ্রাসাদের মূল প্রবেশকক্ষের সামনে দু’জন অস্ত্রধারী রাক্ষসসেনা পাহারা দিচ্ছে। প্রজ্ঞাকে দেখে তারা মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাল।

রাজার সভাকক্ষে বিরাট সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে বেদির ওপর রাখা আছে রাজসিংহাসন; সেই আসনে সগর্বে সমাসীন সৌজন্য। তার বামপাশে বসে আছেন মহামন্ত্রী মরুময়, আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু’জন অস্ত্রধারী দেহরক্ষী। দৃশ্যটা দেখেই অদ্ভুত একটা কথা মনে পড়ে গেল অভীর।

এই কিছুদিন আগে সে যখন এই কক্ষে এসেছিল, তখন ওই সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা পুনর্বসু, আর বন্দি সৌজন্য দাঁড়িয়ে ছিল সামান্য একজন অপরাধী হিসাবে। আজ নিয়তির ইচ্ছায় সৌজন্য সিংহাসনে, আর রাজ্যচ্যুত পুনর্বসু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

নিধি পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, “রাজা হলে কী হয়, ব্যাটার মুখে সেই ধূর্ত হাসিটা একই রকম রয়েছে, দেখছ? আদৌ ওকে মানাচ্ছে না ওই সিংহাসনের ওপর।”

অভী মাথা নাড়ল। নিধি কথাটা ভুল বলেনি। সৌজন্যকে রাজাসনে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন।

অধিনায়ক বজ্রধর অবশ্য রাজার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হলেন না। অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন, “মহারাজ, আপনার ইচ্ছানুসারে আমরা সমরগরিমা আয়তন থেকে এসেছি আপনার কাছে। আশা করব, আমাদের সমস্যার সমাধান আপনার কাছে আমরা পাব।”

সৌজন্যও উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে বাকি রাখল না। “মাননীয় সমরোত্তম অধিনায়ক, আপনি আমার রাজ্যে পদার্পণ করেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। মাননীয় অতিথিবৃন্দ, আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।”

তার দেখিয়ে দেওয়া গদীয়ুক্ত কাষ্ঠাসনে বসে পড়লেন সবাই। অভী ভাবছিল, এত মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা লোকটা সদ্য তারই এক প্রজাকে উড্ডীনখর দিয়ে হত্যা করিয়েছে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য।

সৌজন্য বলল, “মাননীয় রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, রক্তপদ্মরাগ মণিটি সঙ্গে এনেছেন তো?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এনেছি। আপনি হয়তো জানেন, তা-ও বলছি, সাধারণ রোগব্যাদিতে রক্তপদ্মরাগ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না; সহজলভ্য ওষুধেই বেশিরভাগ রোগ সেরে যায়।”

সৌজন্য একটু হাসল। “যে রোগের কথা বলছি, তা অন্য কিছুতে সারা মুশকিল।”

“কী রোগ?”

“বহু পুরোনো অসুস্থত। আপনি সেই ঘটনার সাক্ষী, অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর একটু চমকে উঠলেন; তারপর শুকনো একটা হাসি হেসে বললেন, “বুঝতে পেরেছি। মহামন্ত্রী মরুময়ের পায়ের সেই আঘাত, তাই না?”

মরুময় বললেন, “আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, অধিনায়ক বজ্রধর। আপনারা সম্ভবত পথশ্রমে ক্লান্ত; আপাতত আপনারা আহাৰাদি ও বিশ্রাম সেরে নিন। রক্ষোবৈদ্য, আপনার মণিটি নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। দুপুরের পরে আপনার ডাক পড়বে এই সভায়।”

কোনো কথা না বলে রক্ষোবৈদ্য উঠে দাঁড়ালেন। অভী আর নিধি দু'জনেই খেয়াল করে দেখল, তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

সৌজন্যের আদেশে দু'জন অর্ধরাক্ষস কর্মচারী এসে ওদের নিয়ে গেল অতিথিশালার দিকে। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট বিরাট একটি কক্ষে প্রবেশ করার পর মেঘবর্ণ বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, মনে হচ্ছে আপনি কোনো একটা ব্যাপারে একটু অপ্রসন্ন?”

রক্ষোবৈদ্য পালঙ্কের ওপর বসে বললেন, “পুরোনো একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আমি যখন মাল্যপর্বতে থাকতাম, তখন একবার আমার কাছে খুব খারাপ একটা রোগ নিয়ে এক রাক্ষস চিকিৎসা করাতে এসেছিল। অত্যন্ত দুষ্ট রাক্ষস ছিল সে; একসময় আমার অনেক ক্ষতি করতেও চেয়েছিল। আমি ইচ্ছা করে তাকে বলেছিলাম, আমার কাছে ওই রোগের ওষুধ নেই। চিকিৎসার অভাবে লোকটা অনিবার্যভাবেই মরেছিল, এবং দেশের তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।”

মেঘবর্ণ খুশি হয়ে বলল, “বেশ করেছেন আপনি। এর জন্য আপনার মেজাজ খারাপ হল কেন?”

“কেন জানো? আমার সারা জীবনে ওই একবারই আমার চিকিৎসক সত্তাটা হেরে গিয়েছিল। সেজন্য আমি নিজেকে আজও ক্ষমা করতে পারিনি। আজ মরুময়ের চিকিৎসা করার কথা যখন শুনলাম, তখন মনে হচ্ছিল, এই অসম্ভব দুষ্ট লোকটার ব্যথা নিরাময় না করলেই ভালো হত। কিন্তু আমি তো বৈদ্য; আমার রোগী ব্যক্তি হিসাবে ভালো কী মন্দ, তা দেখার অধিকার আমার নেই। আর তা ছাড়া, পরিস্থিতি এখন যদিকে গেছে, আমার ইচ্ছা না থাকলেও ওই খল ঐশিকের ওপর রক্তপদ্মরাগের আরোগ্যমায়া আমাকে প্রয়োগ করতেই হবে।”

দ্বারের সামনে ছায়া পড়ল। রক্ষোবৈদ্য থেমে গেলেন।

“ভেতরে আসব, মাননীয় অধিনায়ক?”

অধিনায়ক বজ্রধর মুখ তুলে তাকে দেখে হাসলেন। “অবশ্যই, উত্তরা।”

পর্বতের স্ত্রী উত্তরা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সমরোত্তমদের সবাইকে এবং রক্ষোবৈদ্যকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বজ্রধর বললেন, “কেমন আছ?”

উত্তরার মুখ একটু শুকনো, কিন্তু চোখদুটিতে উৎসাহের অভাব নেই। সে বলল, “আপনাদের আশীর্বাদে ভালো আছি, অধিনায়ক।”

মেঘবর্ণ বলল, “উত্তরা, পর্বত তোমাকে যত দ্রুত সম্ভব সমরগরিমা চলে যেতে বলছিল।”

উত্তরা যুক্তহস্তে বলল, “যাব, মাননীয় সমরোত্তম। অল্প কিছু কাজ আমার বাকি রয়ে গেছে এখানে। সেগুলো সেরে নিতে আমার আর কয়েকটা দিন লাগবে। তারপর চিরতরে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব আমি। অনুগ্রহ করে পর্বতকে বলবেন, তার উপহার আমার পছন্দ হয়েছে।”

উপহার? অভী অবাক হয়ে ভাবল, ‘পর্বতদা আবার কী উপহার পাঠাল বউদিকে?’

উত্তরা বলল, “মাননীয় রক্ষোবৈদ্য, একটি ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “বলো, কী ব্যাপার?”

“রাজকন্যা উর্মি মৃত্যুর আগে সেবাকক্ষে তাঁর ঔষধের সংগ্রহকে ঠিক সাজিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। আমি কিছুটা কাজ শিখেছিলাম তাঁর কাছে, কিন্তু ভালোভাবে সবকিছু শিখে উঠতে পারার আগেই তো তিনি চলে গেলেন। আপনি যদি একটু দেখিয়ে দেন, তাহলে ঔষধের পাত্রগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করে সাজিয়ে রাখতে পারি।”

রক্ষোবৈদ্য উঠে দাঁড়ালেন। “অধিনায়ক, আমি উর্মির সেবাকক্ষে গেলে আপনার আপত্তি নেই তো?”

বজ্রধর বললেন, “কীসের আপত্তি? যান আপনি।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কী অভী? যাবে নাকি আমার সঙ্গে?”

অভী বলল, “যাব।”

অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে উত্তরার সঙ্গে ওঁরা দু’জন বেরিয়ে এলেন অতিথিশালার দিকে। সেবাকক্ষে যেতে যেতে অভীর পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ছিল। এই কক্ষেই দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটত উর্মির।

সেবাকক্ষে পৌঁছে উত্তরা আর রক্ষোবৈদ্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ঔষধের শ্রেণিবিভাগ করে আলাদা-আলাদা তাকে তাদের গুছিয়ে রাখতে; অভী একটি মর্মরবেদির ওপর বসে তাঁদের কাজ দেখতে লাগল।

তার হঠাৎ চোখে পড়ল, কয়েকটা ঔষধের পাত্র একদিকে সরিয়ে রাখতে রাখতে রক্ষোবৈদ্য একবার বাম হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিলেন।

সে জানে, রক্ষোবৈদ্য তাঁর এই দূর সম্পর্কের নাতনিটিকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তার মনে পড়ে গেল রক্ষোবৈদ্যের আক্ষেপ, “আমি এই মেয়েটির ছোটোবেলা কাছ থেকে দেখতে পাইনি, আর তার বড়োবেলা দেখার কোনো সম্ভাবনাও আর আমার রইল না।”

উত্তরাও লক্ষ করেছিল তাঁর চোখের জল। সে আন্তে-আন্তে বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, রাজকন্যা উর্মি আপনাকে খুব ভক্তি করতেন। প্রায়শই বলতেন উনি আপনার কথা।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “বয়স হচ্ছে তো। এখন এই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলোর কথা বড্ড মনে পড়ে আর মনখারাপ হয়ে যায়, বুঝলে?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁকে সামলে নিতে সময় দিল উত্তরা; তারপর বলল, “আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগবে। আপনি ছাড়া আর কেউ এ-কাজ পারবে বলে মনে হয় না।”

“বলে ফেলো।”

“রাজকন্যা উর্মিকে একসময় তাঁরই এক কর্মচারী বিষপ্রয়োগ করেছিল। অল্পমাত্রায় সে বিষটা দিয়েছিল বলে সে-যাত্রায় তিনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। রাজকন্যা বিষটাকে চিহ্নিত করে একটা পাত্রে সরিয়ে রেখেছিলেন। সমস্যা হল, বিষের পাত্রটা মিশে গেছে অন্যান্য ওষুধের পাত্রের সঙ্গে। এখন সেটাকে আলাদা না করলে যদি কেউ অজান্তে খেয়ে ফেলে বিপদ ঘটায়...”

রক্ষোবৈদ্য ওষুধগুলো দেখে নেড়েচেড়ে বিষের পাত্রটা আলাদা করে দিয়ে বললেন, “এক কাজ করো। এটাকে অন্য ওষুধের সঙ্গে রেখে কাজ নেই। কোনো বাস্তবের মধ্যে পুরে চাবি দিয়ে দাও আপাতত।”

উত্তরা মাথা নাড়ল। এমন সময় মেঘবর্ণ সেবাকক্ষের সামনে এসে ডাকল, “আপনাদের কাজ হল এখানে?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এই তো, প্রায় শেষ।”

“তাহলে চলুন, আহারের ডাক এসেছে। আহারকার্যের পরে রাজসভায় গিয়ে মরুময়ের ‘পদসেবা’ করতে হবে।”— বলে হেসে উঠল সে।

অভী তো হাসলই, উত্তরাও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ‘ফিক্’ করে একটু হেসে নিল। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “পদসেবাই বটে। সেই মহান উদ্দেশ্যেই তো এত দূর থেকে এসেছি আমরা।”

যেতে যেতে মেঘবর্ণ বলল, “উত্তরা, যদি কিছু মনে না করো, একটা প্রশ্ন করব?”

একটু অবাক হয়ে উত্তরা বলল, “হ্যাঁ, বলুন না।”

মেঘবর্ণ একটু কিস্ত-কিস্ত করে বলল, “এখানে আসার আগেই পর্বতের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আমি। তোমার জন্য কোনো উপহার তো ও পাঠায়নি।”

হঠাৎ উত্তরার মুখের কোমল ভাবটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল; তার পরিবর্তে তার ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা নিষ্ঠুর হাসি। “পাঠিয়েছে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। সদ্য হাতভাঙা, একচোখ কানা একটা রাক্ষস ও আমার জন্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে সমরগরিমা থেকে। এই জন্যই ওকে এত ভালোবাসি আমি।”

অভী স্তব্ধ হয়ে রইল। আলোকপর্ণের কথা বলছে উত্তরা!

মেঘবর্ণও কোনো উত্তর দিতে পারল না। উত্তরা আবার বলল, “আলোকপর্ণকে দেখেছেন ফিরে আসার পর? কারও সামনে ও আর বেরোতে পারে না লজ্জায়। এত বীরত্বের আশ্ফালন করত সবসময়, এখন অন্ধ, খঞ্জ হয়ে সেনাবাহিনীর সামনে আসবে কোন মুখে? এই লোকটার জন্যই আমার পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমি ভুলিনি সে-কথা। আমার স্বামীও আমার সেই যন্ত্রণা ভোলেনি দেখে আমার আনন্দ হবে না?”

চোখগুলো তীব্র প্রতিহিংসা-কামনায় জ্বলজ্বল করছে উত্তরার। অভী আর সেদিকে তাকাতে পারল না, মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওদের আহারগৃহের সামনে ছেড়ে দিয়ে সেবাকক্ষে ফিরে গেল উত্তরা। রক্ষোবৈদ্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ঘৃণা বড়ো ভয়ানক বিষ, বুঝলে মেঘবর্ণ? তার জ্বালা কোনো-কোনো মানুষ সারাজীবন বয়ে বেড়ায়।”

মেঘবর্ণ বলল, “পর্বত আর উত্তরার সঙ্গে আলোকপর্ণ যা করেছিল, তাতে আমি অন্তত এতে অবাক হলাম না।”

আর এসব নিয়ে কথা হল না। দ্রুত আহারাди সম্পন্ন করার পর তিনজন রাক্ষস-প্রহরী এসে ওদের নিয়ে চলল মূল রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষের দিকে। যেতে-যেতে নিধি ফিসফিসিয়ে অভীর কানে-কানে বলল, “ওই প্রচণ্ড বদ লোকটার ক্ষত নিরাময় করবেন রক্ষোবৈদ্য, ভাবতেই গা জ্বলে যাচ্ছে আমার।”

অভী মাথা নেড়ে সাই দিল।

রাজা সৌজন্য ও মরুময় বসেছিলেন সভাগৃহে। অভী দেখল, প্রজ্ঞা নেই। সম্ভবত সৌজন্যই তাঁকে চলে যেতে আদেশ দিয়েছে।

ওরা প্রবেশ করার পর সৌজন্য প্রহরীদের আদেশ দিল, “তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। এখন কক্ষের ভেতরে কেউ থাকবে না। আমি আহ্বান করলে তবে আসবে।”

প্রহরীরা মাথা নীচু করে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মরুময় খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নেমে এলেন রাজসিংহাসনের বেদির সোপান বেয়ে। সৌজন্য বলল, “রক্ষোবৈদ্য, এবার আপনার হাতযশ। মাননীয় মরুময়ের পায়ের আঘাতটির নিরাময়ের জন্য আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।”

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “এর পরিবর্তে আপনাদের কাছ থেকে আমরা সমরগরিমার গাছগুলোর রোগ নিবারণের পরামর্শ পাব, তা-ই তো?”

সৌজন্য চতুর হাসল। “হ্যাঁ, গাছগুলোর কী হয়েছে, তা আমরা আপনাকে জানাতে পারব, আশা করছি।”

বজ্রধরের চোখের ইঙ্গিতে রক্ষোবৈদ্য এগিয়ে গেলেন মরুময়ের দিকে। তাঁর হাতে ধরা আছে উর্মির রক্তপদ্মরাগ মণি।

মরুময় তাঁর উরু অনাবৃত করতেই দেখা গেল দগদগে ঘা-টা। কত বছর আগেকার আঘাত— তবু এখনও যেন টাটকা মনে হয়। রক্ত পড়ছে না বটে, কিন্তু ক্ষতস্থানটা পুরোপুরি শুকোয়নি আজও। নিধি নীচুগলায় অভীকে বলল, “নীরসেনারা সর্বদা মৃত দেবতার নদীর জলে ডুবে থাকে তো। ওদের অস্ত্রগুলো তাই সর্বদা ওই জলের মারাত্মক বিষ বহন করে।”

রক্ষোবৈদ্য রক্তপদ্মরাগ মণিটা চেপে ধরলেন মরুময়ের পায়ের ক্ষতস্থানে। ক্ষণিকের জন্য সাদা রঙের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরোগ্যমণি, আর সঙ্গে-সঙ্গে মরুময় একটা আরামের “আহ্” শব্দ করে উঠলেন। তারপর রক্ষোবৈদ্য হাত সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল, ক্ষতস্থানটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে; ঘা-টা মিলিয়ে গেছে, শুধু চামড়া ওপর একটা বিশী কালচে দাগ রয়ে গেছে।

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “নীরসেনার ত্রিশূলের ক্ষত বড়ো মারাত্মক জিনিস। এই ক্ষত রক্তপদ্মরাগ ছাড়া অন্য কিছুতেই সারা অসম্ভব ছিল।”

সৌজন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘটনাটা দেখছিল। সে বলল, “ওই দাগটা রয়ে গেল যে?”

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “ও দাগ দূর করা রক্তপদ্মরাগেরও অসাধ্য; কারণ ওই দাগ তো কোনো রোগ নয়— ও হল অতীত অপরাধের শাস্তির চিহ্ন। আপনার পায়ে স্বয়ং একজন নীরসেনার ত্রিশূলের আঘাত ছিল, মরুময়। রক্তপদ্মরাগ ছাড়া আপনার এই ক্ষত আপনার জীবদ্দশায় সারানো অসম্ভব ছিল। কিন্তু আঘাতের যত্ননা নিরাময় করা গেলেও ওই দাগ কোনোদিনই উঠবে না।”

মরুময় বললেন, “নাহ্, দাগ-টাগ নিয়ে আমি বড়ো একটা চিন্তিত নই, অধিনায়ক বজ্রধর জানেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।”

কয়েক পা হেঁটে দেখলেন তিনি, আর খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে না।

সৌজন্য মরুময়কে বলল, “আমার দিকের কথা আমি রেখেছি। এবার আপনাদের দিকের কথা রাখার দায়িত্ব আপনাদের।”

মরুময় বললেন, “সৌজন্য, ঐশিকরা তাঁদের কথা রাখবেন, তুমি এ-বিষয়ে আমার ওপর ভরসা করতে পারো।”

বজ্রধর বললেন, “এবার আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। মহারাজ সৌজন্য, আপনার প্রেরিত স্বপ্ন-উপলে দেখেছি আপনি বলছেন, ঐশিকরা কোনো বৃহৎ কর্মের জন্য আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। সে-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যাবে কি?”

সৌজন্য হাসল। “সেই কথা বলব বলেই আপনাদের সবাইকে ডেকেছি। আমি আকাশলোকে থাকাকালীন ঐশিকরা আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁদের কিছু কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে তাঁরা আমাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আপনারা তো জানেন, ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোভনীয় আর কিছু হতেই পারে না।”

মেঘবর্ণ মন্তব্য করল, “হ্যাঁ, কেউ-কেউ তা-ই মনে করে বটে।”

কথাটার হলটুকু অগ্রাহ্য করে সৌজন্য বলে চলল, “ঐশিকশ্রেষ্ঠ মারা যাওয়ার পর আকাশলোকে ঐশিকদের একটি আসন খালি হয়ে আছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। তাঁরা কথা দিয়েছেন, আমাকে তাঁরা একজন ঐশিকে রূপান্তরিত করবেন।”

অভী চমকে উঠল। এই প্রলোভন তো একসময় ঐশিকরা তাকেও দিয়েছিলেন। সে ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল ঠিকই, কিন্তু সৌজন্যের মতো ক্ষমতালোভী লোক এ-হেন লোভনীয় প্রস্তাব পেলে লুফে নেবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

মেঘবর্ণ আর বজ্রধর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। সৌজন্য ঐশিক হয়ে যাওয়া মানে সে অমিত মায়াক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে। তার মতো দুষ্ট লোকের হাতে এই বিপুল ক্ষমতা চলে আসা সমরগরিমার পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না।

মরুময় ক্রুর হাসলেন। “সৌজন্য, আমাদের সমরোত্তমদের চিন্তামিত্র মুগ দেখে আন্দাজ করতে পারছ নিশ্চয়ই, ওঁরা কী ভাবছেন?”

সৌজন্য উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি আবার বলে উঠলেন, “ঐশিক হওয়া মানে তো শুধু মালাপর্বত নয়, সমরগরিমার ওপরেও প্রভুত্ব করার মতো ক্ষমতা পাওয়া। তাই ওঁরা এত চিন্তিত। ঠিক বলছি, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “না, ঠিক বলছেন না আপনি, মরুময়। সমরগরিমা একটি স্বাধীন রাজ্য; তার নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। তার ওপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা কারও নেই— কোনো ঐশিকেরও নেই।”

সৌজন্য হাত তুলে বলল, “ক্ষমতা আমার যতই থাকুক, এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সঙ্গে কলহ চাই না, আগেও বলেছি। আপনাদের সমরগরিমার পীতপত্রবনের গাছগুলোর কী রোগ হয়েছে, তাই নিয়ে কিছু তথ্য আপনাদের দেব বলেছিলাম। সেইটুকু দিয়ে আপনাদের ঋণমুক্ত হতে চাই আপাতত।”

মেঘবর্ণ বলল, “একটা প্রতিষেধকও আছে আপনাদের কাছে, বলেছিলেন।”

দুষ্ট হাসি হাসল সৌজন্য। “হে-হে! ওই প্রতিষেধকের কথাটুকু মিথ্যে বলেছিলাম। জানতাম, ওটা না বললে আপনারা এখানে আসবেন না।”

অভী হাঁ করে চেয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে, সৌজন্য সেই আগের মতোই আছে— দুষ্ট, প্রতারক এবং অত্যন্ত নির্লজ্জ।

বজ্রধর অবশ্য চটপট নিজেকে সামলে নিলেন। “বেশ, বুঝলাম। গাছগুলোর আসলে কী হয়েছে, সেই তথ্য পেলেও আমাদের উপকার হবে।”

সৌজন্য মরুময়ের দিকে তাকাল। তিনি বললেন, “আপনাদের বনের গাছগুলোকে বিষ দেওয়া হয়েছে, এমনটা ভাবছেন নিশ্চয়ই?”

বজ্রধর বললেন, “না, আমাদের তা মনে হচ্ছে না। বিষপ্রয়োগের লক্ষণ ওদের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। বরং কেমন একটা পুড়ে যাওয়ার মতো দাগ দেখা যাচ্ছে।”

অভী বলল, “বিষপ্রয়োগ করা হলে আমি সেই বিষ আকর্ষণ করে নিতে পারতাম।”

মরুময় হাসলেন। “জানি। সেই ক্ষমতা তোমার আছে, আমরা খবর পেয়েছি।”

সৌজন্য বলল, “মজাটা ওইখানেই। অভীর বিষহরণ ক্ষমতার কারণেই গাছে বিষ দেওয়ার পথে যাওয়া হয়নি। আসল ঘটনাটা হল, ঐশিকদের অগ্নিদানব ওই বনে ঘোরাফেরা করছে রাতের বেলা। সে নিজে এখনও পুরোপুরি সবল হয়ে ওঠেনি, তাই সমরগরিমার একজন তাকে নিয়ে যাচ্ছে গাছগুলোর কাছে, এবং দানবটা রাতের বেলা গাছের গোড়ার মাটিটাকে শুকিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের নির্যাস তরল আগুন প্রয়োগ করে। ওই আগুনের এত তেজ— ওটা মাটির নিচের জলস্তরকেও বেশ কিছুটা শুকিয়ে দিতে পারে।”

কথাটা শুনেই দুই সমরোত্তম, অভী এবং নিধি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। নীলাভ্রর অনুমান বর্ণে-বর্ণে মিলে গেছে। সমরগরিমার ভেতরের লোকই তাহলে কেউ আছে, যে দানবটাকে সাহায্য করছে।

মরুময় বললেন, “আপনাদের পীতপত্রবনের গাছগুলোর মধ্যে বৃষ্টি-আকর্ষণ মায়া আছে। ওদের কারণেই সমরগরিমায় বৃষ্টি হয়। ঠিক বলছি তো, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। মরুময় বললেন, “পুরো বনের মাটি যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু গাছগুলো আর বাঁচবে না।”

সৌজন্য বলল, “তাহলে আর সমরগরিমায় বৃষ্টিও হবে না।”

বজ্রধর বললেন, “একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। রাজা সৌজন্য, আপনি বারবার বলছেন, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আপনার ইচ্ছা নেই। অথচ আমাদের সঙ্গে কীভাবে শত্রুতা করছেন, সেটাও আমাদের আমন্ত্রণ করে এনে সবিস্তারে শোনাচ্ছেন। আপনি আসলে ঠিক কী চান, বলুন তো?”

অভী বুঝতে পারছিল, অধিনায়ক রেগে গেছেন। সৌজন্যের অবশ্য এ-সবে কিছু আসে যায় না। সে দিব্যি হাসিমুখে বলল, “এই পরিকল্পনা আজ আপনাদের জানাব বলেই ডেকে এনেছিলাম এখানে। আপনাদের সাধ্য থাকলে যদি এই দানবকে আটকাতে পারেন, আপনাদেরই লাভ। আমি দেওয়া-নেওয়ায় বিশ্বাসী; আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছি, তাই আপনাদের একটা তির্যক উপকার করার চেষ্টা করলাম, ব্যস। সেই উপকারের অংশ হিসাবেই সমরগরিমার এই আসন্ন খরা কীভাবে রোধ করা যায়, তার উপায় আপনাদের বলে দিতে চাই।”

“উপায়টা কী?”

“উপায়টি যে সহজ, তা আদৌ নয়। ওই তরল আগুন দিয়ে শুকনো করে দেওয়া মাটির এখন প্রচুর পরিমাণে জল দরকার; তবেই গাছগুলো বাঁচবে। যদি কৃত্রিমভাবে প্রচুর পরিমাণে মেঘ নিয়ে গিয়ে বৃষ্টিপাত করানো যেত, তাহলে কিছু উপায় হতে পারত। কিন্তু মেঘ তো সব আমাদের দখলে। কাজেই সে-ব্যাপারে কিন্তু আপনারা কোনো সাহায্য পাবেন না। হে-হে!”

নিধি আর অভী সঙ্গে-সঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল। অভী জানে, নিধিও একই কথা ভাবছে। প্রচুর মেঘ জমা করা আছে কেবলমাত্র ওই একটি জায়গাতেই।

মরুময়ের মেঘনির্মাণশালা! আর সেখান থেকে মেঘ পাওয়ার উপায়ও ওই একটিই!

ডাকাতি!



॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

মেঘবাহন

একটা চিঠি হাতে নিয়ে রক্ষোপুরীর অতিথিশালায় বসে ছিলেন অধিনায়ক বজ্রধর। বাকিরা তাঁকে ঘিরে বসে ছিল।

পড়া শেষ করে চিঠিটা মেঘবর্ণের হাতে তুলে দিলেন তিনি। “একবার এটা পড়ে সবাইকে শুনিye দাও। আমাদের ওখানে স্বর্ণশেখর, নীলাভ আর শ্যামশ্রীকে এ-দিকের পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম আমি; শ্যামশ্রী তার উত্তর পাঠিয়েছে।”

চিঠিটা হাতে নিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের এখানের কাজ তো আপাতত শেষ। এখনই দেশে ফিরলে হত না?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আমাকে উত্তরা অনুরোধ করেছে আর একটা দিন থেকে যেতে। উর্মির সেবাক্ষের দায়িত্ব নিয়েছে মেয়েটা— কাজও করছে আন্তরিকভাবে। ও এখান থেকে চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু যাওয়ার আগে চিকিৎসাকেন্দ্রটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারবে বলেই আমার ভরসা হচ্ছে। পরে ও না থাকলেও সাধারণ গরিব রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষসদের অসুবিধা হবে না এখান

থেকে সেবা পেতে। আমি সৌজন্যকেও বলে যাব, রাজা হিসাবে যেন সে সাধারণ প্রজাদের জন্য এই কক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই আমি অধিনায়ককে অনুরোধ করেছি আর একদিন এখানে থেকে যেতে।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি একটা কথা ভেবে অবাক হই। আপনি বা উত্তরা— আপনাদের দু’জনের সঙ্গেই আপনার দেশের লোক যা ব্যবহার করেছে, তার ক্ষমা হয় না। তবু আপনারা এদের জন্য এত ভাবেন?”

রক্ষোবৈদ্য একটু হাসলেন। “দেশের টান, মাটির টান বড়ো কঠিন টান, সমরোত্তম মেঘবর্ণ! ওই টান ছিঁড়ে যাকে চলে যেতে হয়, শুধু সে-ই বোঝে এর কষ্ট।”

বজ্রধর বললেন, “একদিন অপেক্ষা করে গেলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে না, কিন্তু নিজে কাল উর্মির সেবাকক্ষটি ঘুরে এসে আমার মনে হয়েছিল, অত কাজ একদিনেও শেষ হওয়ার নয়। তাই ওখানে যে সমরোত্তমরা আছে, তাদের এদিকের সংবাদটা আগাম জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে চিঠিটা লিখেছিলাম। ঐশিকদের আগুন-দানব আয়তনে কার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পীতপত্রবনে ঘুরে ঘুরে গাছের মাটিতে তরল আগুন সিঞ্জন করছে, সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে বলেছিলাম ওদের। মেঘবর্ণ, তুমি সবাইকে শ্যামশ্রীর উত্তরটা একবার পড়ে শুনিয়ে দাও।”

মেঘবর্ণ পড়তে শুরু করল।

মাননীয় অধিনায়ক বজ্রধর,

সৌজন্যের ঐশিকত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা শুনে আমরা তিনজন সমরোত্তমই প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত অবাক হয়েছি, তবে গভীরভাবে ভেবে দেখলে মনে হয়, তার মতো ক্ষমতাপিপাসু ব্যক্তির কাছে এই পদক্ষেপ খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। ঐশিকরাও নিজেদের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওকে ব্যবহার করছেন, এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তবে চিঠিতে আর বেশি কিছু লিখছি না; এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করাই শ্রেয় বলে মনে হয়।

আমরা ইতোমধ্যেই পীতপত্রবনে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দানবটার ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছি, যদিও খুব সাবধানে এ-ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। ওই দানবের যে বিপুল ধ্বংসক্ষমতার পরিচয় আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি, তাতে আমাদের সেনাদের কারও যাতে অনাবশ্যক প্রাণহানি না ঘটে, সে-কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।

আপনাকে জানাই, রাক্ষসদের ভূতপূর্ব রাজা পুনর্বসু অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাদের কাছে সব শুনেছেন এবং আমাদের সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সৌজন্যকে বিতাড়িত করার জন্য যা করা প্রয়োজন, সব তিনি করতে রাজি আছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন,

যদিও একজন ক্ষমতাচ্যুত, রাজাহীন রাজার সাহায্য আমাদের কীভাবে কাজে আসতে পারে, আমার মাথায় আসেনি।

শেষে আর একটি অনুরোধ আপনার কাছে আছে, মাননীয় অধিনায়ক। আমাদের তিন সমরোত্তমেরই ধারণা, মরুময় এবং সৌজন্য ওই কৃত্রিমভাবে প্রচুর মেঘ নিয়ে গিয়ে পীতপত্রবনে বৃষ্টিপাত করানোর কথাটা আপনাদের বলেছে, যাতে আপনারা লুকিয়ে মরুময়ের মেঘনির্মাণশালায় অভিযান করতে যান এবং প্রতারণা ও তক্ষরতার অপরাধে ও আপনাদের শাস্তি দিতে পারে। প্রলোভন দেখানোর জন্যই কথাটা ওরা বলেছে, আমি নিশ্চিত। সেই কারণেই আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার পুত্রটিকে একটু সামলে রাখবেন। হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যের পাতা ফাঁদে পা দেওয়ার জন্মগত প্রতিভা আছে তার, আপনিও হয়তো তা জানেন। নিধিকেও নিষেধ করবেন ওর সঙ্গে দিতে। এই মুহূর্তে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে এই ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়াই সমরগরিমার পক্ষে মঙ্গলের হবে, আমার ধারণা।

প্রণামান্তে,
সমরোত্তম শ্যামশ্রী

চিঠি শেষ করে মেঘবর্ণ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। অভী দেখল, কক্ষের সবাই মুখ টিপে হাসছে। তার কান লাল হয়ে গেল।

রক্ষোবৈদ্য সন্নেহে বললেন, “মা তোমাকে ঠিক চিনেছে, অভী। সত্যিই ভাবছিলে নাকি এমন কিছু করার কথা?”

নিধির দিকে তাকিয়ে অভী নিজেকে সামলে নিল। “না, না। এ-সব চিন্তা আমার মাথায় আসেইনি।”

বজ্রধর বললেন, “অভী, তোমার ব্যাপারে তোমার মা যা বলার বলে দিয়েছেন, আমি আর নতুন করে কোনো নির্দেশ তোমাকে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা পুনর্বসু আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন, এটা একটা ভালো খবর। রাক্ষসদের ভেতরের সব খবর জানে, এমন একটা লোক আমাদের পক্ষে থাকলে ভবিষ্যতে আমাদেরই সুবিধা হবে।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কিন্তু সৌজন্যকে ঐশিকরা নিজেদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার দেবেন, এটা আমার বেশ অদ্ভুত লাগছে, অধিনায়ক। এতখানি ক্ষমতা ওর মতো লোককে দেওয়া যে বিপজ্জনক, ঐশিকরা কি সে-কথা বোঝেন না?”

বজ্রধর বললেন, “সৌজন্যের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা কী জানেন?— তার ক্ষমতার লোভ। ও সম্ভবত বুঝতে পারছে না, ঐশিকরা ওকে ব্যবহার করছেন; কাজ মিটলেই ওকে ছুড়ে ফেলে দেবেন তাঁরা। আর এর পেছনে মরুময়ের দুষ্টবুদ্ধি অবশ্যই আছে।”

নিধি বলল, “অধিনায়ক, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?”

“করো।”

“সৌজন্য এবং মরুময় যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, এটা তো পরিষ্কার। যুদ্ধ না লাগলেও আপনি যমদণ্ড ব্যবহার করে ওদের সবাইকে মোরে ফেলাতে পারেন না?”

“পারি না, এবং পারলেও করতাম না। এইরকম অন্যায় কাজের জন্য যমদণ্ড ধারণ করতে চাইনি আমি কোনোদিন। এর শক্তিকে অন্যদের রক্ষা করার কাজে লাগানোর জন্য আমাকে দিয়েছিলেন মৃত দেবতা। আরও একটা ব্যাপার কী জানো? আমার কাছে যে যমদণ্ড আছে, তার শক্তি কমে আসছে। মৃত দেবতা আগেই আমাকে সাবধান করে রেখেছিলেন এ-সম্বন্ধে। আর একবার মাত্র ভয়ংকর কোনো কাজে এই দণ্ডের শক্তি ব্যবহার করা যাবে।”

“ভয়ংকর কাজ মানে?”

“মানে, প্রচণ্ড ক্ষমতামণ্ডলী কোনো প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার কাজে। তা-ও আমার একার শক্তিতে সম্ভবত কুলোবে না, অন্যদের সাহায্য নিতে হবে ওই বিরাট মায়াকে প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু এ-সব কথা থাক। এই মুহূর্তে আমাদের আর বিশেষ কোনো কাজ নেই। রক্ষোবৈদ্য, আপনি তো উত্তরা এলে তার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন সেবাক্ষের কাজে। আপাতত তোমরা সবাই যে যার মতো সময় কাটাও গিয়ে।”

অভীও এখান থেকে বেরোতে চাইছিল। নিধির সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে মেঘনির্মাণশালা অভিযানের ব্যাপারে। মায়ের এই নিষেধাজ্ঞার পরেও ওখানে যাওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কক্ষের বাইরের অঙ্গনে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন। নিধি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অভী তাকে থামাল। “না, এখানে নয়। রাক্ষস-প্রহরীরা সবসময় যাতায়াত করছে এই পথে। সেবাক্ষে চলো, ওখানেই যা বলার বলব।”

উর্মির সেবাক্ষ তখনও ফাঁকাই ছিল। সেখানে পৌঁছে অভী বলল, “শোনো, মা যা-ই বলে থাকুক, আমি কিন্তু যাচ্ছি ওখানে। অন্তত কিছুটা মেঘ আপাতত চুরি করে না আনলে গাছগুলোকে বাঁচানো যাবে না। তুমি যাবে?”

নিধি হাসল, “তুমি যাবে, আর আমি যাব না? হে হে হে!”

অভী বলল, “বেশ, আজকেই বিকেলে যখন সবাই ব্যস্ত থাকবে, তখন তুমি আর আমি চুপচাপ বেরিয়ে যাব এখান থেকে মেঘনির্মাণশালার দিকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, রাক্ষসদের দেশ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।”

“রাক্ষসদের দেশ দেখতে যাবে তোমরা?”

একদম নতুন গলায় কথাটা শুনে ওরা চমকে ফিরে তাকাল। এক বৃদ্ধা এসে ঢুকেছেন সেবাক্ষে; তাঁর মাথার চুল সব সাদা, শিরদাঁড়া বয়সের ভারে বেঁকে যাওয়ায় একটু ঝুঁকে পড়েছেন তিনি। তাঁর মুখটা অভীর ভীষণ চেনা-চেনা লাগল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না, কোথায় দেখেছে তাঁকে।

নিধি কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চিনে ফেলল তাঁকে। দু'হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার দিকে সে এগিয়ে গেল স্বচ্ছন্দগতিতে। “আরে, স্নিগ্ধামাসি না?”

এইবার অভীর মনে পড়ে গেল। উর্মি বেঁচে থাকতে তারা যখন রক্ষোপুরীতে এসেছিল, তখন অসুস্থ নাতি-নাতনিদের জন্য জল চুরি করতে গিয়ে প্রাসাদের প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছিলেন এই মহিলা। উর্মি খুব বুদ্ধি করে আইন বাঁচিয়ে অভীদের মাধ্যমে বৃদ্ধাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অভী শুনেছিল, পরে তিনি ঐ অসুস্থ নাতি-নাতনিদের চিকিৎসাও করেছিলেন।

বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটে উঠল। “বাব্বা! আমাকে মনে আছে তোমার?”

নিধি বলল, “অর্ধরাক্ষসরা তাদের নিজেদের লোককে মনে না রাখলে কে রাখবে? কেমন আছ তুমি? তোমার নাতি-নাতনিরা কেমন আছে? এখানে কী করছ তুমি?”

বৃদ্ধা বললেন, “নাতি-নাতনিগুলো ভালো আছে গো। তোমরা সে-বার আমাকে জল দিয়ে না বাঁচালে ওরা মরেই যেত। আর রাজকন্যা উর্মির দয়ায় ওরা সেরেও উঠেছিল। বড়ো ভালো মেয়ে ছিল গো আমাদের রাজকন্যা! নিয়তি যে ভালো লোকেদের কেন বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখে না, কে জানে!”

অভী এগিয়ে গেল। তার সন্দেহ হচ্ছিল, বৃদ্ধা সম্ভবত তাদের কথাবার্তা সব শুনে ফেলেছেন। সে বলল, “আপনি এখানে কী করছেন?”

তিনি বললেন, “রাজকন্যা বেঁচে থাকতে তাঁর সেবাকক্ষ চালানোর জন্য কয়েকজন সহকারী খুঁজছিলেন। রাজকন্যা মারা যাওয়ার পর উত্তরা এখন সামলাচ্ছে সেই দায়িত্ব। সে-ও আমার মতো অর্ধরাক্ষস; সে আমাকে ডেকে নিয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য। আজ আমাকে উত্তরাই ডেকেছিল এখানে আসার জন্য। আমরা তো আর রাজকন্যার মতো কঠিন অসুখের চিকিৎসা জানি না, তবু ছোটোখাটো রোগ নিয়ে কেউ এলে তাকে রাজকন্যার রেখে যাওয়া খাতার সঙ্গে রোগলক্ষণ মিলিয়ে আন্দাজে দু'-একটা ওষুধ দিই। আমি কিন্তু মূর্খ নই; লেখাপড়া জানি।” বলে তিনি মিষ্টি করে হাসলেন।

অভীও একটু হাসল। তিনি আবার বললেন, “তোমরা মেঘনির্মাণশালায় যাবে ভাবছিলে?”

এবার ওরা একটু সতর্ক হয়ে গেল। এই বৃদ্ধাকে এক অর্থে অপরিচিতই বলা যায়। ঐকে আদৌ বিশ্বাস করা উচিত হবে কি না, ওরা বুঝতে পারছিল না।

তিনি অবশ্য ওদের এই ইতস্তত ভাবটা খেয়ালই করলেন না। “তোমাদের কিন্তু বাইরে বেরোতেই দেবে না প্রাসাদের প্রহরীরা। আমি শুনেছি, নতুন রাজার আদেশ আছে, তোমাদের সব কার্যকলাপ যেন কড়া নজরে রাখা হয়।”

অভী আর নিধি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়ল। সৌজন্যের কাছ থেকে এটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়।

স্নিগ্ধা বললেন, “কিন্তু আমি তোমাদের চুপিচুপি প্রাসাদের মূল ফটক পেরিয়ে বাইরে বার করে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারি।”

নিধি বলল, “কীভাবে?”

শিগ্ধা বললেন, “দিনে দু’বার ফটকের প্রহরীদের দায়িত্ব বদল হয়। যে প্রধান প্রহরী আজ বিকেলে মূল ফটকের দায়িত্বে থাকবে, সে একজন অর্ধরাফ্রিস। আমাকে ‘ঠাকুমা’ বলে সে— খুব ভালোবাসে আমাকে। আমি বললে সে তোমাদের চুপচাপ ফটকের বাইরে বার করে দিতে পারবে।”

অভী বলল, “নিধি, কী বলো তুমি?”

নিধি বলল, “ভালোই তো হয় তাহলে। নির্বিঘ্নে ফটক পেরিয়ে যেতে পারলে কঠিন কাজের অর্ধেকটাই সারা হয়ে যাবে। কিন্তু এই কাণ্ড করতে গিয়ে আপনি আবার বিপদে পড়বেন না তো?”

বৃদ্ধা হঠাৎ নিধির চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন। “এইটুকু করব না তোমাদের জন্য? তোমরা আমার যা উপকার করেছিলে, আমি সারা জীবনে ভুলব না, মা। আমার কচি-কচি নাতি-নাতনিগুলো প্রাণে বেঁচেছিল শুধু তোমাদের জন্য। আমার দেশের লোক আমার ভালো চায়নি কখনও; কিন্তু তোমরা ভিনদেশিরা আমার জন্য যা করেছ, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। মঙ্গল হোক তোমাদের, মঙ্গল হোক তোমাদের দেশের সবার!”

নিধি বলল, “শিগ্ধামাসি, আমরা বিশেষ কিছু করিনি। রাজকন্যা উর্মি সেই সময় উপস্থিত না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না।”

বৃদ্ধা বললেন, “তোমরা কী করেছ, সে আমি জানি, আর নিয়তি জানেন। যাক, বিকেলে প্রহরী বদলালে আমি আসব তোমাদের নিয়ে যেতে। তৈরি থেকো, কেমন?”

ওরা মাথা নাড়ল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই উত্তরা এসে ঢুকল। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দেখে ওরা একটু অবাক হয়ে তাকাল।

ওদের দেখে উত্তরা একটু হাসল, তারপর বৃদ্ধার দিকে ফিরে বলল, “এই যে, মাসি! আপনিও এসে গেছেন দেখছি। রক্ষোবৈদ্য মহোদয়কে ডেকে এসেছি, উনিও আসছেন। উনি এলেই কাজ শুরু করব।”

অভী বলল, “বউদি, তোমার হাতে ওটা কী?”

উত্তরা বলল, “খুব ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছিল, তাই বিষ দিয়েছিলাম। রক্ষোবৈদ্যই তো বিষটা খুঁজে দিলেন, মনে নেই, অভী? সেটা এখনও কাজ করে কি না, একবার পরীক্ষা করে দেখে নিলাম। ওই বিষ মেশানো খাবার খেয়ে গোটাচারেক ইঁদুর মরেছে, সেগুলোকেই ফেলতে যাচ্ছিলাম। তোমাদের এখানে দেখে একবার দেখা করে গেলাম। গল্প করো তোমরা, আমি আসছি এখনি। মাসি, তুমি এসো তো একবার আমার সঙ্গে।”

শিগ্ধাকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল উত্তরা।

সেবাকক্ষটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ওরা। অভীর মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কক্ষের ভেতরটা আবার দেখতে-দেখতে। উর্মির স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই কক্ষের প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে।

উর্মির স্মৃতির কথা মনে পড়তেই আর একটা কথা স্মরণ হল অভীর। সে বলল, “নিধি, একটা জিনিস রাখবে তোমার কাছে?”

নিধি একটু অবাক হয়ে বলল, “কী জিনিস?”

নিজের পোশাকের মধ্য থেকে উর্মির সেই হিরার ছুরিটা বার করে সে নিধির হাতে তুলে দিল। “এইটি রাখো তুমি। রাক্ষস অস্ত্রশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন এই ছুরিটি— সর্বভেদক মায়াশক্তি আছে এর মধ্যে।”

“মানে, যে-কোনো বস্তুকে কাটা যায় এই ছুরি দিয়ে?” নিধি একটু অবাক হয়ে গেল। “এ-জিনিস তুমি আমাকে দিয়ে দিচ্ছ কেন?”

অভী ক্লান্তস্বরে বলল, “উর্মির কাছে একসময় ছিল এটা। অনেকগুলো দুঃখের গল্প জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। তুমিই রাখো একে; এই বেদনার স্মৃতি আর আমি বইতে পারি না।”

কথা না বাড়িয়ে নিধি ছুরিটা নিয়ে নিজের পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। তখনই দরজার সামনে থেকে মেঘবর্ণ ডাকল, “অভী! নিধি! কী করছ এখানে? কখন থেকে খুঁজছি তোমাদের!”

অভী চকিত হয়ে বলল, “কেন? কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?”

দুষ্ট হাসি হেসে কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেঘবর্ণ বলল, “হয়নি এখনও, কিন্তু হবে। আমার কাছে লুকিয়ে না অভী, তুমি ইতোমধ্যেই মেঘনির্মাণশালায় যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছ, না? শ্যামশ্রীর চিঠি পড়া হচ্ছিল যখন, তখন তোমার মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝে ফেলেছি।”

মেঘবর্ণের চোখ এড়াবার উপায় নেই। অগত্যা অভী তাকে সব খুলে বলল।

শুনে মেঘবর্ণ বলল, “আমি একটা প্রস্তাব দিতে চলেছি। কিন্তু নিধি, তোমার সেটা খুব একটা ভালো লাগবে না।”

নিধি ভ্রুকৃটি করে বলল, “শুনি।”

“আজ বিকেলে অভীর সঙ্গে আমি যাব মেঘনির্মাণশালায়। প্রাসাদ-চত্বর থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি সঙ্গে থাকবে ঠিকই, কিন্তু তারপর তোমাকে ফিরে যেতে হবে।”

নিধি বলল, “সে কী? কেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “তুমি অর্ধরাক্ষস বলে ওই বৃদ্ধা তোমাকে একটু বেশি পছন্দ করছেন, বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই? আবার বিকেলে দুর্গপ্রাকারের প্রধান রক্ষীও একজন অর্ধরাক্ষস থাকবে। কাজেই তোমার উপস্থিতি ওখানে জরুরি। কিন্তু তারপর মেঘনির্মাণশালায় তুমি না থাকলেই ভালো।”

নিধি যে একটু রেগে গেছে, তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সে বলল, “কারণটা কী?”

মেঘবর্ণ বলল, “কারণ, যে মুহূর্তে আমরা ওখান থেকে কিছুটা মেঘ অপহরণ করে ফেলব, সেই মুহূর্ত থেকেই আমরা সরাসরি রাক্ষস-আইনে অপরাধীর আওতায় পড়ে যাব। আমরা যারা কাজটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকব, তাদের ওখান থেকে তৎক্ষণাৎ পালাতে হবে। ওদিকে আমাদের পক্ষের যারা তখনও রক্ষোপুরীতে রয়ে যাবেন, তাঁরা হলেন অধিনায়ক বজ্রধর এবং রক্ষোবৈদ্য। আমাদের বাগে না পেয়ে এঁদের ওপর সৌজন্য আর মরুময় তখন প্রতিহিংসা

চরিতার্থ করার চেষ্টা করতে পারে। রক্ষোবৈদ্য কিন্তু যুদ্ধের কিছু বোঝেন না। তখন তোমার মতো দক্ষ একজন যোদ্ধা পাশে থাকলে অধিনায়ককে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?”

নিধি বলল, “অধিনায়ক বজ্রধরকে আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাবে সৌজন্য?”

“না দেখানোই উচিত। আজও গোটা মায়াজগতে বজ্রধরের নামে কম্পিত হয় না, এমন যোদ্ধা পাওয়া কঠিন। তবু তুমি থাকলে আর একটা সুবিধা হবে। অধিনায়ক জানেন, তুমি এবং অভী সবসময় একসঙ্গে সবজায়গায় যাও। তোমাকে চোখের সামনে দেখলে উনি সম্ভবত অভীর অনুপস্থিতিটা খেয়াল করবেন না।”

এই যুক্তির উত্তরে আর কোনো প্রতিযুক্তি নিধির মাথায় না আসায় সে নিতান্ত অনিচ্ছাভরে মেঘবর্ণের কথা মেনে নিতে বাধ্য হল। স্থির হল, আজ বিকেলে স্নিগ্ধা এলে ওরা তিনজনই যাবে তার সঙ্গে। তারপর ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবে অভী আর মেঘবর্ণ; নিধি ফিরে আসবে অতিথিশালায় অধিনায়ক বজ্রধর এবং রক্ষোবৈদ্যের কাছে।

বিকেল পর্যন্ত প্রবল উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় কাটাল ওরা। নিধি একবার বলল, “খুব সাবধানে থেকো। সৌজন্য বা মরুময় টের পেলে কিন্তু তোমাদের জ্যান্ত ফিরতে দেবে না ওখান থেকে।”

অভী চন্দ্রহাসের গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, “সঙ্গে মেঘবর্ণ থাকছে। তাকে এত সহজে হারাতে পারবে না রাক্ষসদের দলবল। তা ছাড়া, এই অস্ত্রটি হাতে থাকলে আমিও আশা করি তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারব।”

নিধি হাসল। “ওই অস্ত্র সঙ্গে থাকলে তোমাকেও সম্মুখযুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না, আমি জানি। কিন্তু সৌজন্য অতি ধূর্ত বদমাশ; সম্মুখযুদ্ধের মতো ন্যায়সংগত বিষয়ে তার খুব একটা আস্থা নেই বলেই আমার মনে হয়।”

বিকেলবেলা অধিনায়ক বজ্রধরের অগোচরে চুপিচুপি বেরিয়ে এল ওরা অতিথিশালা থেকে। স্নিগ্ধা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেবাকক্ষে। সেখানে গিয়ে ওরা দেখল, সমরোত্তম মেঘবর্ণ আগেই এসে হাজির। ওদের দেখে একগাল হেসে সে বলল, “তক্ষরগণ, প্রস্তুত হও। আজ আমরা ডাকাতি করতে চলেছি স্বয়ং রাজার রত্নভাণ্ডারে!”

নিধি সংশোধন করে দিয়ে বলল, “রত্নভাণ্ডারে নয়, মেঘভাণ্ডারে।”

“ওই একই হল। সারা রাজ্যের লোক যেখানে জলকণ্ঠে শুকিয়ে মরতে বসেছে, সেখানে বর্ষার মেঘের চেয়ে বড়ো রত্ন আর কী আছে?”

স্নিগ্ধা মেঘবর্ণকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, “আপনি অনেক বড়ো বীর, আমি শুনেছি। এখানকার রাক্ষসেরা সবাই আপনার নাম জানে।”

মেঘবর্ণ হাসল। “আশীর্বাদ করুন মাসিমা, যেন কার্যসিদ্ধি করে আসতে পারি।”

বৃদ্ধাও হাসলেন। “আমাদের অর্ধরাক্ষসদের কাছে তো আশীর্বাদ কেউ চায় না; আপনিই প্রথম চাইলেন। আপনাকে আশীর্বাদ আমি করার কেউ নই, কিন্তু আপনাদের মঙ্গল হোক, এ আমি সত্যিই মন থেকে চাইছি।”

মেঘবর্ণ বলল, “তা-ই অনেক। এবার চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।”

ওরা চারজন সেবাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট মাঠের ওপর দিয়ে চলল মূল দুর্গপ্রাকারের দিকে। কয়েকজন রাক্ষস প্রহরী দ্রুত তুলে ওদেরকে দেখল, কিন্তু সম্ভবত স্নিগ্ধা সঙ্গে থাকায় কেউ কিছু বলল না। অতীর মনে হল, সৌজন্য এদেরকেই আদেশ দিয়েছে ওদের ওপর নজর রাখার জন্য।

দুর্গপ্রাকারের সামনে পৌঁছতেই বিরাট ফটকের এপারে যে দু'জন রাক্ষসসেনা ছিল, তারা অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়াল। “কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? আপনাদের বাইরে যাওয়ার রাজকীয় অনুমতিপত্র আছে কি?”

অতীর ভেতরে ভেতরে একটু দৃষ্টিভ্রান্ত হচ্ছিল। স্নিগ্ধা অবশ্য ভয় না পেয়ে বললেন, “প্রধান প্রহরী কোথায়? তাকে একবার ডাকো দেখি বাছারা। বলো, স্নিগ্ধাঠাকুমা ডাকছে।”

প্রধান প্রহরীকে অবশ্য ডাকতে হল না; সে সম্ভবত কাছাকাছিই ছিল, এখন ওদের গলা পেয়ে বেরিয়ে এল।

ওদের চারজনকে একসঙ্গে দেখেই সে ব্যাপার বুঝে নিল। অন্য প্রহরীদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় ওদের কাছে ডাকল সে। অতীরা এগিয়ে গেল তার দিকে।

সে চাপাগলায় একটু রাগীভাবে বলল, “ঠাকুমা, তুমি দু'জন বলেছিলে। এ তো তিনজন দেখছি। এ-রকম করে আমাকে বিপদে ফেলো না বাপু। নতুন রাজা জানতে পারলে সুমন্তর মতো আমাকেও উড্ডীনখর দিয়ে খাওয়াবে।”

নিধি বলল, “শুধু এরা দু'জনই বাইরে যাবে। আমি কেবল সঙ্গে এসেছি। এখান থেকে আমি ফিরে যাব।”

লোকটা তবু গজগজ করতে লাগল। “ঠাকুমা, আমরা যে কত ঝামেলা মাথায় নিয়ে রাজার কাজ করি, তুমি কি বুঝবে? এখান থেকে নাহয় বেরিয়ে গেলে; এরপর ধারামান মেঘনির্মাণশালায় ঢুকবে কী করে? তোমরা তো ধরা পড়বেই, মাঝখান থেকে আমি ফেঁসে যাব। প্রাণে না মারলেও রাজা আমার মাইনে কাটবেন নিশ্চিত।”

বৃদ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওরে, যদি অর্ধরাক্ষস জাতের প্রতি তোর এখনও একটুও টান থাকে, তাহলে এদের ছেড়ে দে। ওই মরুময় আর সৌজন্য কোনোদিন আমাদের একটুও সম্মান দিয়েছে? মাইনের ওই ক'টামাত্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য জাতের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা করিস না। এই মেয়েটাও অর্ধরাক্ষসের মেয়ে; এই ছেলেটার মনে অর্ধরাক্ষসদের প্রতি কত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা! এদের ভালো করলে নিয়তি তোর ভালো করবেন।”

জাতের কথা উঠতে অবশেষে বরফ গলল। প্রধান প্রহরী বলল, “ঠিক আছে, ঠাকুমা। তোমার কথাতেই ছেড়ে দিচ্ছি এদের। আসুন আপনারা।”

নিধি বলল, “সাবধানে যাও তোমরা। আমি ফিরে যাচ্ছি এখান থেকেই।”

বিরাট ফটক পেরিয়ে রক্ষোপুরীর বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। অতী বলল, “এসো। মেঘনির্মাণশালাটা এইদিকে।”

বিকেল ফুরিয়ে আসছে ইতোমধ্যেই। সূর্য ডুবছে মালাপর্বতের পশ্চিমের চূড়াগুলোর পেছনে, অভী দেখতে পেল। তার লাল রং লেগে রয়েছে আকাশের সাদা-সাদা ভাসমান মেঘগুলোয়। দূরের পাহাড়ের শীর্ষভাগ এই রক্তিম আলোয় উনুনের আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছে। বাতাস বইছে না বললেই হয়। পাহাড়ি জায়গায় পাথর থেকে যেন প্রতিফলিত হয়ে আসছে উত্তাপ। কপালে হাত দিয়ে ঘাম মুছে নিল অভী।

বেশ কিছুটা হাঁটতে হবে। মেঘবর্ণ বলল, “অভী, আমাদের পরিকল্পনা কী? সোজা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, তাই তো?”

অভী ভাবছিল, গতবার সে এখানে চালাকি করে ঢুকেছিল প্রহরীদের অকালবর্ষণের লোভ দেখিয়ে। সেই প্রহরীরা কি এখনও আছে? যদি থাকে, তাহলে হয়তো তারা তাকে আর একবার বৃষ্টি এনে দেওয়ার বিনিময়ে মেঘনির্মাণশালায় ঢুকতে বাধা দেবে না।

সে বলল, “দেখি কী পরিস্থিতি হয়। একবার চেষ্টা করে দেখব ভালো কথায় কাজ হয় কি না। যদি না হয়, তাহলে সহিংস হওয়া ছাড়া উপায় কী?”

এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথে কিছুক্ষণ হাঁটার পর অনেক দূর থেকেই আকাশছোঁয়া কালচে ধূসর মেঘস্তম্ভগুলো দৃশ্যমান হল। অভী বলল, “অবশেষে ধারান্নানের দেখা পাওয়া গেল। এবার সাবধান হতে হবে।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, ওদের! আমরা এসে পড়েছি কিনা!” বলে --হি করে হাসল।

মেঘনির্মাণশালার প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। এরও একটা প্রকাণ্ড ফটক আছে। তার ঠিক পেছনেই আছে একটা বিরাট বিপদঘণ্টা, অভী জানে। সেটা একবার বাজিয়ে দিলেই রাশি-রাশি রাক্ষসসৈন্য দৌড়ে আসবে, মরুময় এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জনা আটেক প্রহরী; পোশাক দেখে মনে হচ্ছে, তাদের মধ্যে সামনের লোকটা খুব সম্ভবত এদের নেতা।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই প্রহরীরা সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল। তিনজন উঁচিয়ে ধরল বর্শা, দু'জন বার করল তরবারি, আর বাকিরা ধনুতে তির পরিয়ে নিশানা স্থির করে রাখল তাদের দিকে। প্রধান প্রহরী চিৎকার করে বলল, “ওখানেই থামো তোমরা! আর কাছে আসবে না।”

অভীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন প্রহরীকে চোখের ইশারায় তার সঙ্গে আসতে বলল প্রধান প্রহরী। ওরা তিনজন এগিয়ে এল এদের দিকে। “এখানে কী চাই তোমাদের? তোমরা সমরগরিমার লোক না?”

অভী মেঘবর্ণের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, “তুমি চুপ করে থাকো, আমি কথা বলছি।”

মেঘবর্ণ হেসে মাথা নাড়ল। অভী প্রহরীদের বলল, “হ্যাঁ, আমি প্রলয়যোদ্ধা অভী, ইনি সমরোত্তম মেঘবর্ণ। এর আগে যারা এখানের পাহারার দায়িত্বে ছিল, তারা কোথায়?”

তাদের পরিচয় শুনে লোকটার চোখে একটু সম্ভ্রম ফুটে উঠল বটে, কিন্তু পথ ছেড়ে দেওয়ার কোনো লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। সে বলল, “প্রলয়যোদ্ধা, তোমাকে গতবার এখানে ঢুকতে দিয়েছিল বলে সেই রক্ষীদের মহারাজ সৌজন্য কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করেছেন মহামন্ত্রী মরুময়ের আদেশে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা উড্ডীনখরদের খাদ্য হবে। তোমাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে চাই না, কিন্তু এখানে ঢোকার ইচ্ছা নিয়ে যদি এসে থাকো, তাহলে চলে যাওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হবে। রাজার আদেশ ছাড়া কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না।”

অভী তাকাল মেঘবর্ণের দিকে। সে বলল, “দেখো, প্রলয়যোদ্ধাকে যদি ঢুকতে দাও, সে কিন্তু তাহলে চন্দ্রহাস বার করবে না। ওই দৈবাস্ত্রের সামনে তোমাদের কোনো অস্ত্র কাজ করবে না, জানো তো?”

অভীর কোমরে ঝোলানো শিবের বক্ষিম তরবারির দিকে সভয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল তিনজন প্রহরী। তারপর প্রধান প্রহরী বলল, “তবু চন্দ্রহাসের আঘাতে মরা ভালো। সে অনেক কম যন্ত্রণার মৃত্যু। উড্ডীনখরের হাতে মরার চেয়ে প্রলয়যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা অনেক সম্মানের হবে।”

হঠাৎ ওদের পেছনের দিকে একজন প্রহরীকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে ওরা সকলেই সেই দিকে ফিরে তাকাল। একটা লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে তার বাহন এক বিরাট গৃধ।

প্রহরীদের প্রধান একটু উষ্ণস্বরে বলল, “আরও লোক নিয়ে এসেছ তোমরা? একবার ওই বিপদঘণ্টা যদি বাজাই, কী হবে জানো? তখন তোমরা পরিস্থিতি সামলাতে পারবে তো?”

অভী অবাক হয়ে বলল, “আমরা তো আর কাউকে সঙ্গে আনিনি! এ আবার কে এল?”

লোকটার পরনে কালো রঙের আলখাল্লা; তার ওপর মাথা থেকে একটা আবরণ নেমে ঢেকে দিয়েছে তার মুখের প্রায় পুরোটাই। চলার ভঙ্গিতে তার ফুটে উঠছে তীব্র আত্মবিশ্বাস। নির্ভয়ে লোকটা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

মেঘনির্মাণশালার রক্ষীরা তাদের অস্ত্র উদ্যত করল। আগন্তুক বলল, “আমি বলছি, সুশোভন, ওদের ঢুকতে দাও।”

প্রহরীপ্রধান চমকে উঠল। “আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? কে আপনি?”

তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার ঢাকাটা খুললেন। এবার বাকিদের সঙ্গে চমকে গেল অভী আর মেঘবর্ণও। “মহারাজ, আপনি?”

রাজা পুনর্বসু বললেন, “হ্যাঁ, এঁরা আমার বন্ধু। এঁদের ঢুকতে দাও। কিছুটা মেঘ এঁদের প্রয়োজন; তা এঁদের নিয়ে যেতে দাও। আমি জানি, আমি আর তোমাদের রাজা নই, কিন্তু তোমাদের ওপর এইটুকু ভরসা আমার আছে যে তোমরা এখনও আমাকে ফেরাবে না। আমি কি ভুল ভেবেছি, সুশোভন? এঁরা একসময় আমার জীবনরক্ষা করেছিলেন, তাই আমি সেই ঋণ শোধ করতে এসেছি। তোমরা কি আমাকে সৌজন্যের কাছে ধরিয়ে দেবে?”

প্রহরীপ্রধান সুশোভন বলল, “না, মহারাজ। আমি আপনার নুন খেয়েছি একসময়। আমি জাতে পত্রতিলক; বিমোহকদের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করব না প্রাণ থাকতে। প্রকাশ্যে এ-সব কথা আমরা কেউ কখনও বলি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি, সৌজন্য আপনাকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করেছে। আপনার আদেশে আমরা জীবন দিতে পারি আজও।”

“অতি উত্তম। তাহলে এঁদের ভেতরে ঢুকতে দাও। আমি এবার বিদায় নেব। সৌজন্যের অতিবিশ্বস্ত বিমোহক অনুগামীদের কেউ আমাকে এ-রাজ্যে দেখে ফেললে আমি বিপদে পড়ব।”

মেঘবর্ণ বলল, “মহারাজ, আপনার এই উপকার সমরগরিমা ভুলবে না কোনোদিন। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন আমরা এইসময় এখানে আসব?”

রাজা হাসলেন। “এইসময় আসবেন, জানতাম না। কিন্তু কোনো এক সময় আসবেন, অনুমান করেছিলাম। তখনই সমরগরিমার এক জটায়ুতে চেপে চলে এসেছিলাম এখানে। সমরোত্তম শ্যামশ্রীর আড়ালে সমরোত্তম নীলাদ্র ডেকে দিয়েছিলেন জটায়ু; বলেছিলেন, ‘আপনি দয়া করে যান। যতই নিষেধ করা হোক, আমার ছেলে ঠিক ওখানে পৌঁছেবেই।’ ওই মানুষটি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন; তাঁর অনুরোধ কি আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি?”

মেঘবর্ণ অভীর দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুরে বলল, “শুধু তোমার মা নয়, নীলও তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে, অভী।”

রাজা বললেন, “আপনারা ধারান্নান মেঘনির্মাণশালার মধ্যে প্রবেশ করার আগেই আমি চলে যেতে চাই। এই মেঘস্তম্ভগুলোর সুরক্ষা বিঘ্নিত হলে মরুময় সবার আগে মায়াসংকেত পান। তার আগে আমার সমরগরিমায় ফিরে যাওয়াই উচিত।”

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জটায়ুর পিঠে চেপে চলে গেলেন মাল্যপর্বতের ভূতপূর্ব রাজা পুনর্বসু।

প্রহরীরা আর বাধা দিল না ওদের ভেতরে ঢুকতে; কেবল প্রধান প্রহরী বলল, “আপনারা দয়া করে বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না। মহামন্ত্রী মরুময় জানতে পারলে আমরা অন্তত বলতে পারব, আপনারা আমাদের যুদ্ধে পরাস্ত এবং নিরস্ত্র করে ভেতরে ঢুকেছেন। কিন্তু আপনারা ধরা পড়ে গেলে আমাদের সকলের মৃত্যু নিশ্চিত।”

মাথা নেড়ে মেঘবর্ণকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনির্মাণশালার ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অভী। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে অল্প কিছুক্ষণ আগে। তাদের সামনে গগনস্পর্শী মেঘস্তম্ভগুলোর গায়ে খেলে যাচ্ছে সরু-সরু বিদ্যুতের রেখা। স্তম্ভগুলোর ধূসর মাথায় এখনও দেখা যাচ্ছে দিনশেষের লালচে আলোর আভাস। মেঘবর্ণ কিছুক্ষণ এই গম্ভীর দৃশ্যের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “সারা রাজ্যের প্রজাদের তৃষ্ণার জল আটকে রেখে যারা অর্থ আর ক্ষমতার লোভে এইরকম দানবীয় মেঘের বন্দিশালা বানায়, তাদের জন্য শুধু ঘৃণা ছাড়া

আর কিছু অনুভব করতে পারছি না আমি। নাও অভী, চটপট কাজ শুরু করো। এই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছে না একদম।”

অভী এগিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মেঘস্তুম্বের সামনে। গতবার খুব সামান্য পরিমাণ মেঘকেই কেটে বার করে দিয়েছিল সে; কিন্তু এবার তা করলে চলবে না। তা ছাড়া, যে মেঘ ওরা এই স্তুম্ব থেকে কেটে বার করবে, সেটাকে তো সমরগরিমায় নিয়ে যেতেও হবে। কীভাবে সম্ভব তা?

মেঘবর্ণ তাকিয়ে আছে তার দিকে। “অভী, তাড়াতাড়ি নাও।”

অভী এখনও ভাবছে কী করা যায়। এমন সময় দূর থেকে প্রচণ্ড একটা গর্জন আর চিৎকার-চ্যাঁচামেচির শব্দ ভেসে এল। বহু রাক্ষস ছুটে আসছে এদিকেই—খোলা ফটকের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল ওরা।

যে মাঠ দিয়ে ওরা একটু আগে হেঁটে এল এই ফটক পর্যন্ত, সেই মাঠ ছেয়ে গেছে রাক্ষস-সৈন্যে। অভী জানত, মেঘনির্মাণশালার মধ্যে যে বিরাট বিপদঘণ্টা আছে, সেটা বাজালে রক্ষোপুরীর সেনাদলের কাছে সংকেত যায়। কিন্তু ঘণ্টা তো কেউ বাজায়নি! তাহলে এই শত-শত সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্য ছুটে আসছে কেন এখানে?

প্রহরীপ্রধান সুশোভন চিৎকার করে বলল, “আপনাদের কাজ শেষ করতে পারলে করুন। নয়তো এখুনি পালান। মহামন্ত্রী মরুময় স্বয়ং মহারাজ পুনর্বসুকে এদিক থেকে জটায়ুর পিঠে চেপে উড়ে যেতে দেখে ফেলেছেন। তিনিই আসছেন সেনা নিয়ে। পালান আপনারা!”

উত্তেজনায় অভীর হাত কাঁপছে। মেঘবর্ণ তার তরবারি খুলে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল, যেন সে একাই এই বিরাট রাক্ষসবাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

পালানোর পথ নেই। জটায়ুবাহিনীর গৃধ-আহ্বানকারী দক্ষিণাবর্ত শাঁখ সে বা মেঘবর্ণ কেউই সঙ্গে আনেনি। এখন উপায়?

অভী দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছে। গতবার সে কী করেছিল যেন?

মা এর আগে তাকে যেমন শিখিয়েছিল, তেমন করে মনের শক্তি প্রয়োগ করল সে বিরাট একটা অংশের ওপর। কালো মেঘের খণ্ডটা স্তুম্বের গা কেটে বেরিয়ে আসতেই মানসিক শক্তিপ্রয়োগে সেটাকে ধরে রাখল অভী; সে জানে, একে মুক্ত করে দিলেই এ উড়ে গিয়ে মাল্যপর্বতেই বৃষ্টি ঝরিয়ে দেবে।

রাক্ষসরা তেড়ে আসছে ‘মার-মার’ শব্দে। তাদের সামনে মরুময়কেও দেখতে পাচ্ছে সে। পায়ের ব্যথা সেরে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর খুঁড়িয়ে হাঁটা একদম সেরে গেছে। দীর্ঘ এক তরবারি নিয়ে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাক্ষসবাহিনীর।

মেঘবর্ণ বলল, “লড়াই জমবে মনে হচ্ছে। কী বলো, অভী?”

স্তুম্বের গা থেকে বেরিয়ে আসা বাদলমেঘের বিরাট অংশটা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে ওদের মাথার ওপর; দেখে মনে হচ্ছে, বিরাট একটা কালো ছাতা যেন ঢেকে ফেলেছে ওদের ওপরের আকাশ। প্রাণপণে মেঘটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাখতেই অভীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

সে বলল, “মেঘবর্ণ, তুমি ওদের ঠেকাও। তারপর আমি বললেই বাঁপ দেবে এর ওপর।”

মেঘবর্ণ অবাক হয়ে বলল, “কীসের ওপর? এই মেঘে? তাতে কী হবে?”

“ভরসা করো। তুমি ওদের আটকে রাখো শুধু কয়েক মুহূর্ত।”

তরবারি নাচিয়ে হেসে উঠল মেঘবর্ণ। “তথাস্তু।”

শনশন করে তার হাতে ঘুরতে লাগল দীর্ঘ তরবারি। অভীদের মাথার ওপরের ছাতার মতো মেঘখণ্ডের মধ্যে চমকে উঠছে বিদ্যুতের রেখা। সেই বিদ্যুৎদীপ্তি ঝলসে উঠল তার উন্মুক্ত তরবারির গায়ে।

মেঘের গোল ছায়া ঘিরে রয়েছে ওদের। মরুময় চিৎকার করে বললেন, “আত্মসমর্পণ করুন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। নয়তো আপনাদের মৃত্যু অনিবার্য!”

মেঘবর্ণও চোঁচিয়ে পালটা উত্তর দিল, “কার হাতে? আপনার হাতে নাকি? আসুন তবে, আপনার তরবারির শিক্ষা কতদূর, পরীক্ষা হয়ে যাক। না কি তরবারির বদলে লুকিয়ে বিষপ্রয়োগ করাতেই আপনার যত বীরত্ব?”

গতবার সৌজন্য আর মরুময় মিলে তাকে আর শ্যামশ্রীকে বজ্রমাণিকের বিষ দিয়ে প্রায় উন্মাদ করে দিয়েছিলেন, সে-জ্বালা সে ভোলেনি এখনও।

মরুময় মুখে যতই আশ্ফালন করুন, এই মুহূর্তে একজন সমরোত্তমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামার মতো বোকা তিনি নন। তিনি আদেশ দিলেন, “সেনারা, মেরে ফেলো ওদের।”

রাক্ষসসেনারা ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সমরগরিমার সমরোত্তমদের অসাধারণ অস্ত্রবিদ্যার কথা তারা অনেকেই জানে। মেঘবর্ণের প্রতি সমীহবশেই তারা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মরুময়ের আদেশ পেতে তারা এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। মেঘবর্ণ নীচু গলায় জানতে চাইল, “অভী, আর কতক্ষণ?”

অভী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল না। বাম হাত দিয়ে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে মেঘটাকে ধরে রেখেছিল সে; এবার ছাতার মতো মেঘখণ্ডের কেন্দ্রের দিকে লক্ষ করে নিজের শরীরের হিমকুশলতা জাগিয়ে তুলল সে। পলকের মধ্যে তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেল, আর নিজের হাত থেকে সুতীব্র গতিতে বরফের স্রোত নিক্ষেপ করল সে মেঘটার মাঝখান বরাবর। সঙ্গে-সঙ্গে মেঘের মাঝের অংশটা বিরাট একটা বরফের চাদরের মতো আকার ধারণ করল।

অভী হিমস্রোত নিক্ষেপ চালিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তেই তাদের মাথার ওপর তৈরি হল এক বৃহদাকৃতি গোলাকার বরফনির্মিত আসন— সেটা ভেসে রইল শূন্যে। তার চারপাশে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল ঘন কালো ধোঁয়ার মতো মেঘ।

রাক্ষসরা ওদের পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছে; উদ্যত তরবারি আর গদা নিয়ে তারা পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে মেঘবর্ণের দিকে। অভী লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আসনটার ওপরে। উঠেই সে বুঝতে পারল, মেঘের মধ্যে ভাসমান বরফনির্মিত আসনটা প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও সম্ভবত তার হিমকুশলতার কারণেই এই ঠান্ডা তাকে কষ্ট দিচ্ছে না। সে অনুভব করতে পারছে, এই মেঘ তার কথা শুনছে— এর গতিপথ সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তার মানসিক শক্তির সাহায্যে।

সে চিৎকার করে বলে উঠল, “মেঘবর্ণ! চলে এসো।”

মেঘবর্ণ মুখ ফিরিয়ে শূন্যে ভাসমান বরফজমা মেঘের ওপর অভীকে দেখে অবাক যদি হয়েও থাকে, তার মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। প্রশংসার সুরে “এই তো চাই!” বলে লাফ দিয়ে সে উঠে পড়ল মেঘের মাঝে অভীর পাশের বরফ-আসনে। পরক্ষণেই মেঘ হু-হু করে উঠে গেল শূন্যে। রাক্ষসরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

অভী দেখতে পেল, সৌজন্যও ততক্ষণে এসে পড়েছে অকুস্থলে। মরুময় চিৎকার করে আদেশ দিলেন, “ধনুর্ধর সেনা! তির ছোড়ো। ওদেরকে আকাশ থেকে তিরবিদ্ধ করে নামাও।”

অভী ভয় পেয়ে গেল। এখনও তারা ওদের বাণনিষ্ক্ষেপ সীমানার মধ্যে আছে। মনের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে জমাট মেঘটাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আর তার শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। হিমকুশলতার প্রয়োগ সবসময় তাকে দুর্বল করে দেয়; তার ওপর এই এতখানি মেঘকে নিয়ন্ত্রণ করাও নিতান্ত সহজ কাজ নয়।

উঁচু থেকে ওরা দেখতে পাচ্ছিল, অন্তত পঞ্চাশজন রাক্ষস-সেনা তাদের ধনুতে বাণরোপণ করে নিশানা করেছে ওদের দিকে। অতজন যুদ্ধকুশল রাক্ষসরা কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না, এ হতেই পারে না। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভী অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল ওদের বাণমোচন মুহূর্তের অপেক্ষায়।

তখনই লাফ দিয়ে সৌজন্য এসে দাঁড়াল তার ধনুর্ধারী সেনাদের সামনে; চিৎকার করে সে আদেশ দিল, “থামো সবাই! অস্ত্র নত করো।”

মরুময় অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে, যেন তার কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেনারাও অবাক। সৌজন্য আবার আদেশ দিল, “তোমাদের মহারাজের আদেশে এই মুহূর্তে অস্ত্র নত করো সবাই।”

রাক্ষস-সেনারা সবাই ধনুক নামিয়ে নিল। অভীদের মেঘ ততক্ষণে ভেসে চলে গেল ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। দিনশেষের তারাগুলি তখন ফুটে উঠছে এক-এক করে। সন্ধ্যার নীলচে কালো আকাশের গায়ে ওদের মেঘ-বাহন উড়ে চলল সমরগরিমার দিকে।

মেঘবর্ণ এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল পুরোটা। সে এইবার হাতের তরবারি কোষবদ্ধ করে বলল, “ব্যাপারটা কী হল বলো তো? সৌজন্য এমন করে আমাদের বাগে পেয়েও ছেড়ে দিল কেন?”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “কী জানি! কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেছিলাম, এইবারেই সব শেষ!”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, সৌজন্য ওই ধনুর্ধরদের না থামালে আমাদের বিপদ ঘটান সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু কেন? মরুময়ের মতো একজন ক্ষমতাধর ঐশিকের নির্দেশ সৌজন্য অমান্য করল কীসের আশায়? আমাদের ডাকাতি সফল করে ওর কী লাভ? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে এর পেছনে?”

অভী চুপ করে রইল। নিজের স্বার্থ ছাড়া সৌজন্য কিছু করে না, এর প্রমাণ সে বহুবার পেয়েছে। তার মনের গোপন ইচ্ছাটি বোঝা সহজ নয়, তা-ও সে জানে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যেন মাত্রাছাড়া রকমের আশ্চর্য লাগছে তার।

উড়ে যেতে যেতে একটু থেমে সে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, নিধি আর রক্ষোবৈদ্য তো ওখানে রয়ে গেলেন। ওদের কোনো ক্ষতি করবে না তো ওরা?”

মেঘবর্ণের দু’চোখ হঠাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠল। “অসহায় অবস্থায় পেয়ে বন্দি করে ওরা যদি ওদের কোনো ক্ষতি করে, তাহলে রক্ষোপুরী ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা।”

তার অবাক চোখের দৃষ্টি দেখে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মেঘবর্ণ আবার বলল, “তবে সৌজন্য আমাদের যখন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল, তখন আশা করি ওদেরও কোনো ক্ষতি করবে না। উহ্, বরফটা বড্ড ঠান্ডা!”

অভী এতক্ষণে বুঝতে পারল, এই প্রচণ্ড শৈত্য মেঘবর্ণ খুব কষ্ট করেই সহ্য করছিল। সে তো আর হিমকুশল নয়।

তাড়াতাড়ি মেঘবর্ণের হাত ধরে রাখল সে। নিজের শরীরের হিমকুশলতার বর্ম দিয়ে বাইরের শৈত্যের হাত থেকে তাকে আবরণ দিয়ে রাখল অভী। অনেকটা সৌজন্যকে সেই বার সে আর বাবা মিলে যেমন করে প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে সুরক্ষা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেইভাবে। পার্থক্য শুধু এই, তখন তারা ওকে বাঁচিয়েছিল প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে, আর এবার মেঘবর্ণকে সে রক্ষা করছে প্রচণ্ড শৈত্যের হাত থেকে।

একমুহূর্তের জন্য অভী অনুভব করতে পারল, এইবারের হিমকুশলতার প্রয়োগটা তাকে আর দুর্বল করছে না, বরং অদ্ভুত একটা শক্তি দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে।

কেন? ঘৃণার পরিবর্তে অন্যের কষ্টে তার দয়া জাগছে বলে?

মেঘবর্ণ হঠাৎ বলে উঠল, “মৃত দেবতার নদী পেরোচ্ছি আমরা। ওই যে পীতপত্রবনের মাথা দেখা যাচ্ছে। চলো, এই জঙ্গলের ধারেই নামা যাক। এখান থেকে হেঁটে ফিরব আমরা। তুমিও এই মেঘকে ওখানেই মুক্তি দাও। তাহলে জঙ্গলটা একটু বৃষ্টি পাবে।”

অভীর ইচ্ছায় ছাতার মতো জমাট মেঘ নেমে আসতে লাগল নিচে। বেশ কিছুটা নামার পর জঙ্গলের মাটিতে লাফ দিয়ে প্রথমে নামল মেঘবর্ণ, তারপর নামল অভী।

তার হাতের ইঙ্গিতে আবার মেঘটা উঠে গেল বেশ কিছুটা উঁচুতে, আর তারপরেই অভী হিমকুশলতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল সেই মেঘপিণ্ডকে। তার ছাতার মতো শরীরের বরফ গলে যেতেই ভারমুক্ত মেঘ উঠে গেল বহু, বহু উঁচুতে, আর ছড়িয়ে পড়তে লাগল পীতপত্রবনের বিরাট আকাশ জুড়ে। একটু দুঃখ নিয়ে অভী দেখল, ছড়িয়ে পড়ার পর যতটা বড়ো হবে ভেবেছিল, মেঘটা ততটা বড়ো হল না।

ঝিরঝির করে হালকা বৃষ্টি নেমে এল সেই মেঘ থেকে, কিন্তু বৃষ্টির ধরন দেখেই ওরা অনুমান করে নিল, এই বৃষ্টি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে না। এর মধ্যেই মেঘটা পাতলা হতে শুরু করেছে।

এত বড়ো বনে এই অল্প পরিমাণ বৃষ্টিতে খুব বেশি লাভ হবে না, অভী বুঝতে পারছিল।

মেঘবর্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “তবু যতটুকু জল গাছগুলোর গোড়ায় যায়, ততটুকুই লাভ।”

অন্ধকার পীতপত্রবনের মধ্য দিয়ে আয়তনের দিকে ফিরতে লাগল ওরা। পায়ের তলায় সন্ধ্যার অরণ্যের মাটি ভিজে আছে এই ক্ষণিকের বর্ষণে। আঁধার ঘনিয়ে আসা বড়ো-বড়ো গাছগুলোর তলা থেকে সোঁদামাটির গন্ধ ছাড়ছে। বাতাসে একটা আরামদায়ক শীতলতা অনুভব করা যাচ্ছে। পায়ের তলায় ঝরে যাওয়া হলুদ পাতার গায়েও লেগে আছে ফোঁটা-ফোঁটা জল। এই ঠান্ডা, শান্ত পরিবেশটা বেশ ভালো লাগছিল অভীর।

মেঘবর্ণ আসছিল তার আগে-আগে। হঠাৎ অরণ্যপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে; তার হাত চলে গেল কোমরের তরবারির মুষ্টিতে।

অভী চমকে উঠল। নিশ্চিত কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে মেঘবর্ণ।

সে ফিসফিস করে বলে উঠল, “অভী, তোমার সামনে ডানদিকে ভালো করে খেয়াল করো। কী একটা যেন নড়ছে না ওখানে?”

তার কথামতো সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেই অভী বুঝতে পারল, ভুল বলেনি মেঘবর্ণ। বিরাট একটা ছায়া অন্ধকারের মধ্যে নড়াচড়া করছে ঘন গাছের সারির আড়ালে।

অভী ফিসফিসিয়ে বলল, “মেঘবর্ণ, কাছে যেয়ো না।”

মাথা নেড়ে মেঘবর্ণ বলল, “কাছে যাচ্ছি না, এখান থেকেই হাঁক দিচ্ছি।”

বলে সে জোরগলায় চৈঁচিয়ে উঠল, “কে রে? কে ওখানে?”

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। যে ছায়ামূর্তিটা এতক্ষণ একটা বিরাট গাছের তলায় ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা করছিল, সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর তৎক্ষণাৎ তার বিপুলাকৃতি কালো শরীরটার গায়ে সরু-সরু শিরার মতো তরল আগুনের স্রোত জেগে উঠল। মেঘবর্ণ চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল।

“ঐশিকদের অগ্নিদানব!”

দানবটার হাত থেকে তরল আগুনের ধারা নেমে আসছে; এতক্ষণ ওই আগুনই সে সিঞ্জন করছিল গাছটার গোড়ায়। অভীর হঠাৎ মনে হল, দানবটার চোখে যেন ঘোর লেগে আছে। তার চোখ অগ্নিময় বটে, কিন্তু যেন সম্মোহিতের মতো বুদ্ধিহীন দৃষ্টি তার দুচোখে— যেন সে যে কী করছে, সে নিজেই ঠিকমতো বুঝতে পারছে না।

আর একটা ব্যাপার খেয়াল করল অভী— দানবটা আকারে এই অল্পসময়ের মধ্যেই অনেকটা বেড়েছে। তার মানে, দিনে-দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে সে।

যা-ই হোক, এ-সব কাণ্ড আর চলতে দেওয়া যায় না। কোমর থেকে চন্দ্রহাসকে উন্মুক্ত করে এগিয়ে গেল অভী।

দানবটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে— যেন এই অস্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে খুব ভালো করেই জানে, কিন্তু একটুও ভয় নেই তার। পালানোর কোনো লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না।

মেঘবর্ণও এগিয়ে গেল অভীর পাশে; তার হাতেও উদ্যত তরবারি। দানবটা একবার দেখল তার দিকে। অভীর মনে হল, একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওই বিরাট চেহারার বস্তুটার ঠোঁটে।

চন্দ্রহাসকে সামনে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল অভী। দানবটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'হাত থেকে গড়িয়ে পড়ছে তরল লাভার মতো আগুনের ধারা; মাটিতে যেখানে সে আগুন স্পর্শ করছে, সেখানেই গর্ত হয়ে ধোঁয়া উঠতে শুরু করছে, কিন্তু সে অভীদের আক্রমণ করার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এটা কেমন অদ্ভুত লাগল অভীর কাছে।

সে বলে উঠল, “তুমি কী ধরনের জীব, আমি জানি না। কিন্তু জেনে রাখো, শিবের এই তরবারি যদি তোমার অঙ্গস্পর্শ করে, তাহলে তুমি যত ক্ষমতাধরই হও, বাঁচতে পারবে না।”

কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। একটা মোটা গাছের পেছন থেকে একটা ছায়া হঠাৎ দৌড়ে পালাল উত্তরদিকের গাছগুলোর অভিমুখে, আর আর একটা ছায়া কোথা থেকে ছুটে এল দানবটার দিকে। অরণ্যব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে দানবটার গায়ের আগুনের শিরা-উপশিরাগুলো থেকে একটা হালকা আভা বেরোচ্ছিল, সেই আলোই এতক্ষণ পড়ছিল ওদের চোখেমুখে। সেই আলোতেই অভী দেখল, সেই দ্বিতীয় ছায়া-আগন্তুক দানবটার হাত ধরে টানল— যেন ওটাকে সে তার সঙ্গে যেতে বলছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, দানবটাকে স্পর্শ করার পরেও এই ব্যক্তি পুড়ে গেল না সেই সৈনিকের মতো।

আগন্তুকের আবরণে ঢাকা মুখ ওরা দেখতে পেল না বটে, কিন্তু সে যে একজন মহিলা, তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

দানবটা এইবার মুখ হাঁ করে হাসল। অভী দেখতে পেল, তার বিরাট মুখের মধ্যেও গলগলিয়ে ফুটছে নরকগহ্বরের মতো আগুন, আর তার সুসজ্জিত দাঁতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। অভী এসে দাঁড়াল তার সামনে। হাতটা শূন্যে তুলল দানব— যেন এইবার তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করবে সে। মেঘবর্ণ চৈতাল, “অভী, সাবধান!”

অভীও তার চন্দ্রহাস উদ্যত করে রেখেছিল, কিন্তু দানবটা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মুঠো দিয়ে আঘাত করল জঙ্গলের মাটির ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে তার আর অভীর মাঝখানে খুলে গেল একটা নরকগহ্বর। লকলকিয়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল মাটির অগ্নিকুণ্ড থেকে— তার লাল আগুনের তাপ ‘ধক্’ করে এসে লাগল

অভীর চোখে মুখে। হতবাক হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল সে। আর ততক্ষণে সেই অজ্ঞাতপরিচয় মেয়েটির সঙ্গে একদৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল মহাকাশ দানব। জঙ্গল আবার আগের মতো নীরব হয়ে গেল।

অস্ত্র নামিয়ে অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “এ-সব কী হল, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “দুটি সঙ্গী নিয়ে গাছগুলোর সর্বনাশ করতে এসেছিল দানবটা। আমার ধারণা, এই দু’জনই সমরগরিমার বাসিন্দা। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় শুভকাজে বাধা পড়েছিল। তাই নরকগহ্বর আহ্বান করে আমাদের সাময়িকভাবে আটকে রেখে হতচ্ছাড়া পালাল।”

“কিন্তু চাইলে ওটা কি আমাদের মেরে ফেলতে পারত না?”

“জানি না। হয়তো এখনও পুরোপুরী শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি ওই দানব। তবে এখনই তার শক্তির যা নমুনা দেখলাম, তাতে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। একটা নরকগহ্বর আহ্বান করা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। বেশ জটিল মায়া ওটা। সেই ভয়ংকর নরকের দ্বার ও মাটিতে একটা আঘাতমাত্র করে খুলে দিল, এ জিনিস আমরা শর্বরের মতো ভয়ানক রাক্ষসকেও করতে দেখিনি।”

অভী বলল, “এই গহ্বরের মুখটা কতক্ষণ খোলা থাকবে?”

“বেশিক্ষণ নয়। ওইটুকুই আশার কথা, সাধারণত নরকগহ্বরের মুখ বেশি সময় ধরে মাটির ওপর উন্মুক্ত থাকতে পারে না। এটাও একটু পরে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এর সঙ্গে ওই রহস্যময়ী সাহায্যকারিণীটি কে ছিলেন, সেটাই এখন আমাকে ভাবাচ্ছে। আর প্রথমে যে লোকটা পালাল, সে-ই বা কে?”

আগুনটা পেরিয়ে ওরা সাবধানে আবার হাঁটা দিল আয়তনের উদ্দেশ্যে। অভী প্রশ্ন করল, “ওই দু’জনকে তুমিও চিনতে পারলে না?”

“না। এত অন্ধকারে কাউকে চেনা সম্ভবই নয়। প্রথম লোকটা তো গোড়াতেই দৌড় দিল, আর দ্বিতীয়জনের, মানে মহিলাটির, মুখ পুরোপুরি ঢাকা ছিল। তাই...”

বলতে বলতেই হঠাৎ চমকে উঠে মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ল মেঘবর্ণ। অভী দেখল, কী একটা ধাতব জিনিস নরকগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যেও চকচক করছে। মেঘবর্ণ বস্তুটা হাতে তুলে মুখের সামনে ধরল।

একটা নূপুর!

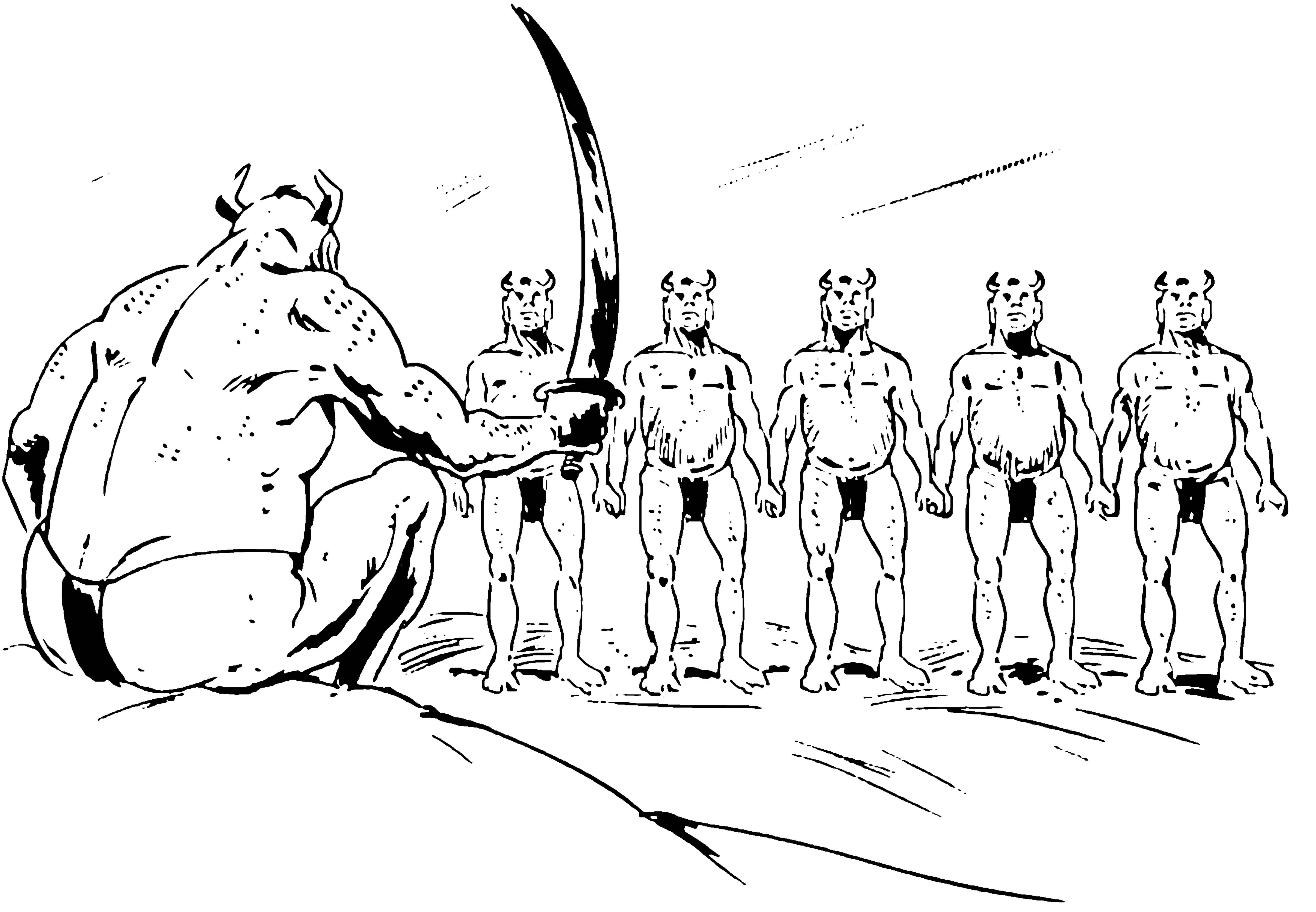
মেঘবর্ণের মুখটা হঠাৎ যেন মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছে অভী। সে বলল, “পালাতে গিয়ে ওই মহিলার পা থেকে নির্ঘাৎ খুলে পড়ে গেছে এটা। কিন্তু জিনিসটা কার, চিনব কী করে?”

“আমি চিনতে পেরেছি।” মেঘবর্ণের মুখ বিবর্ণ; তার গলা ভেঙে গেল কথা বলতে গিয়ে। তীব্র অবিশ্বাস চোখে নিয়ে সে তাকিয়ে আছে গয়নাটার দিকে। “এটা লতার। আমিই উপহার দিয়েছিলাম ওকে।”

এইবার অভীর আবছাভাবে মনে হল, এই নূপুর সে-ও আগে দেখেছে লীনার মায়ের পায়ে।

মেঘবর্ণকে দেখে মনে হচ্ছে, এতখানি আঘাত সে জীবনে কোনোদিন পায়নি।
ফিসফিস করে সে বলল, “লতা... বিশ্বাসঘাতকতা করছে সমরগরিমার সঙ্গে?”
অভী চুপ করে রইল; কোনো উত্তর তার মুখে এল না।

সত্যিই তো! লতাকাকিমা এই জঙ্গলে কী করছিলেন ঐশিকদের অগ্নিদানবের
সঙ্গে? কেনই বা তিনি পালালেন ওদের দেখে? আর তাঁর সঙ্গে ওই রহস্যময়
পুরুষটিই বা কে?



।। ত্রয়োদশ অধ্যায় ।।

প্রলয়ের পূর্বাভাস

অভীরা আয়তনে ফেরার অল্লক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন বজ্রধর, নিধি এবং রক্ষোবৈদ্য।

অভী আর মেঘবর্ণ আয়তনে অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য। স্বর্ণশেখর, নীলাভ্র আর শ্যামশ্রীকে তারা ইতোমধ্যেই সব জানিয়েছে। শুনে তাঁরা রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছেন।

একটা ব্যাপারে অবশ্য ওদের দু'জনের কেউ মুখ খোলেনি বাকিদের কাছে। এখানে আসার পথে মেঘবর্ণ অভীকে বলেছিল, “অভী, লতার ব্যাপারটা এই মুহূর্তে তুমি কাউকে বোলো না। কাল একবার মুখোমুখি ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। তারপর বিষয়টা আমি সবার গোচরে আনব। এইটুকু সাহায্য কি আমি তোমার কাছ থেকে পেতে পারি?”

অভী মাথা নেড়ে বলেছিল, “অবশ্যই। লীনা প্রাণ দিয়েছিল আমার কথা ভেবে, আয়তনের মঙ্গলের কথা ভেবে। যে ঐশিকরা তাঁর মেয়ের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তাদের জন্য লতাকা কিমা সমরগরিমার সর্বনাশ কেন করছেন, সেটা আমাকেও জানতে হবে বইকি।”

মেঘবর্ণ চুপ করে ছিল। তার প্রিয় মানুষটা সম্পর্কে এই কথাগুলো যে তার শুনতে ভালো লাগবে না, অভী জানত। তবু লতাকাকিমার কথা ভাবলেই অত্যন্ত রাগ হচ্ছিল তার।

কীভাবে পারলেন তিনি গোপনে ঐশিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে? নিজের মেয়ের আত্মবলিদানের কথা একবারও ভাবলেন না?

তার চেয়েও বড়ো কথা, এই কাজের পেছনে তাঁর স্বার্থ কী?

অভী জানতে চেয়েছিল, “মেঘবর্ণ, এই কথাগুলো শুধু নিধিকে জানালে তোমার আপত্তি আছে?”

মেঘবর্ণ একটু ভেবে বলেছিল, “না, নিধি লীনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। তাকে বলতে পারো। কিন্তু আর কাউকে নয়।”

অভী এখন সম্মেলন কক্ষে বসে বাবা, মা, রবিকাকা আর মেঘবর্ণের সঙ্গে আলোচনা করছিল সৌজন্যকে নিয়ে। কেন সৌজন্য তাদের হত্যা করার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিল, সেটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

তখনই সম্মেলন কক্ষের দ্বার ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন অধিনায়ক বজ্রধর। তাঁর পেছনে পেছনে এসে ঢুকলেন রক্ষোবৈদ্য আর নিধি। ওঁদের দেখে সবাই সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

প্রতিনমস্কার করে বজ্রধর বললেন, “সবাই আসন গ্রহণ করো। রক্ষোবৈদ্য, আপনিও থাকুন এই আলোচনায়।”

নিধি এসে অভীর পাশে বসল। অভী ফিসফিসিয়ে বলল, “আগে তোমাদের অভিজ্ঞতা শুনি। তারপর এ-দিকেরও কিছু কথা আছে, বলব।”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনারা ফিরে আসতে স্বস্তি পেলাম, অধিনায়ক। সৌজন্য আমাদের ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু আপনাদের ওপর কেমন আচরণ করবে, তাই নিয়ে একটু চিন্তায় ছিলাম।”

স্বর্ণশেখর বলল, “অধিনায়ক বজ্রধরকে আক্রমণ করা বা বন্দি করার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বোকা সৌজন্য নয়। কিন্তু আপনাদের ঠিক কী বলল ও?”

বজ্রধর বললেন, “সৌজন্যের সঙ্গে দেখা আমাদের হয়নি আর। কিন্তু তার আদেশেই আমাদের ওখান থেকে নির্বিঘ্নে ফিরে আসার ব্যবস্থা হয়েছে।”

নীলাভ্র বলল, “কীরকম?”

বজ্রধর বললেন, “বলছি। কিন্তু তার আগে, মেঘবর্ণ, তুমিও যে অভীর সঙ্গে মেঘনির্মাণশালায় চলে যাবে, এ আমি ভাবিনি। কাজটা কি ঠিক হয়েছিল?”

নীলাভ্রর দিকে ফিরে চোখ টিপে মেঘবর্ণ মৃদু হেসে বলল, “শুধু আমাকে বকছেন কেন? এই নীলটাও কি কম যায়? স্বয়ং রাজা পুনর্বসুকে জটায়ুতে চাপিয়ে মেঘনির্মাণশালায় পাঠিয়েছিল ও আমাকে আর অভীকে সাহায্য করার জন্য, তা-ও আবার বউকে লুকিয়ে। জিজ্ঞাসা করুন না ওকে।”

তার বলার ভঙ্গিতে শ্যামশ্রী চোখ বড়ো-বড়ো করে নীলাভ্রর দিকে তাকালেন, আর বজ্রধর হেসে ফেললেন। নীলাভ্র তর্জনের ভঙ্গিতে মেঘবর্ণের উদ্দেশে

একটা আঙুল তুলে শাসাল। বজ্রধর বললেন, “কিছু ব্যাপারে তোমাদের এখনও ছেলেমানুষি যায়নি দেখে ভালো লাগছে, আবার ভয়ও পাচ্ছি। আর একটু পরিণত আচরণ করো, মেঘবর্ণ। ভবিষ্যতে তোমার ওপর বেশ কিছু কঠিন দায়িত্ব আসতে চলেছে। তখন আমাদের সবার সাহায্য তুমি না-ও পেতে পারো।”

মেঘবর্ণ বলল, “ভবিষ্যতে যা হবে, দেখা যাবে। আপাতত আপনাদের ফিরে আসার ইতিহাসটা বলুন আমাদের।”

বজ্রধর বললেন, “তোমরা মরুময়ের ধারাস্থান মেঘনির্মাণশালায় চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমার খেয়াল হয়, অভী নেই, আর তুমিও নেই। দুই-এ দুই-এ চার করতে আমার অসুবিধা হয়নি। নিধিকে জিজ্ঞাসা করতে সে প্রথমটা ইতস্তত করছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর কতখানি বিপদের মধ্যে তোমরা পড়তে পারো, সেটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ও মুখ খুলল। আমি ততক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেনানায়িকা প্রজ্ঞা ছুটে এলেন অতিথিশালায়।”

শ্যামশ্রী বললেন, “প্রজ্ঞা আপনাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন? কেন?”

বজ্রধর বললেন, “সৌজন্যেরই হুকুমে। অভীরা যে মেঘনির্মাণশালায় ঢুকেছে এবং সেখানে রাজা পুনর্বসুকেও দেখা গেছে, এই সংবাদ দ্রুত পৌঁছে যায় মরুময় এবং সৌজন্যের কাছে। মরুময় সঙ্গে-সঙ্গে কিছু সেনা নিয়ে ছুটে যান ওখানে। সৌজন্য সেই সুযোগে প্রজ্ঞাকে ডেকে আদেশ দেয়, তখুনি আমাদের জটায়ুতে চাপিয়ে সমরগরিমায় ফেরত যাওয়ার জন্য। সে নাকি প্রজ্ঞাকে বলেছে, ‘পুনর্বসুর সঙ্গে আমি পরে বোঝাপড়া করে নেব। কিন্তু মেঘচুরি করে অভীরা পালিয়ে গেলে মরুময় ওখান থেকে ফিরে এসে রাগে এতটাই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে থাকবেন যে আমার কথাও অগ্রাহ্য করে এদের ওপর উড্ডীনখরের আক্রমণ করিয়ে দিতে পারেন।’ সেই কারণেই তাড়াতাড়ি আমরা ফিরতে পেরেছিলাম।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কিন্তু তা-ও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সৌজন্য কোনোকালেই আমাদের মঙ্গলাকাক্ষী নয়। আজ আপনারা সমরগরিমার তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি মরুময়ের উড্ডীনখরের হাতে মারা যেতেন, তাতে কি পরোক্ষে ওরই লাভ হত না?”

বজ্রধর হাসলেন। “খেলা অনেক গভীরে, শ্যামশ্রী। প্রজ্ঞাকে সৌজন্য বলেছে, সে সিংহাসনে বসার পর থেকেই মরুময় তাকে নিজের মতো করে চালাতে চাইছেন। সৌজন্যের কথায়, ‘কারও হাতের পুতুল হয়ে থাকার জন্য আমি সিংহাসনে বসিনি। সময় এলে মরুময়ের বিরুদ্ধেও আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’ কাজেই বুঝতেই পারছ, আমাদের সকলেরই প্রাণ আপাতত রক্ষা করার পেছনে ওর উদ্দেশ্য হল, মরুময়ের প্রভাব খর্ব করা— রাক্ষসদের বুঝিয়ে দেওয়া, আসলে রাজা কে!”

স্বর্ণশেখর বলল, “সে একদিক থেকে ভালো। ওদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যত থাকবে, আমাদের ততই মঙ্গল; সমরগরিমাকে জড়িয়ে অশান্তি বাধানোর সুযোগ ওরা তত কম পাবে। সৌজন্য আর মরুময়— দুটির কেউই তো সাধুপুরুষ নয়— একই পাঁকের এপিঠ-ওপিঠ।”

বজ্রধর বললেন, “তা তো বটেই। যা-ই হোক, মেঘবর্ণ, এবার তোমাদের অভিজ্ঞতা শুনি।”

মেঘবর্ণ তাদের সঙ্গে যা-যা ঘটেছিল, সব বলে গেল এক-এক করে। হিমকুশলতা দিয়ে অভীর মেঘ জমিয়ে তার ওপর চেপে সমরগরিমায় উড়ে আসার কথা শুনে স্বর্ণশেখর হাততালি দিয়ে উঠল। “বাহ্, অভী! দারুণ বুদ্ধি তো তোরা!”

শ্যামশ্রী ভ্রুকুটি করে শুনছিলেন। তিনি বললেন, “তুমি থামো, রবি! ছেলেটার এইরকম ভুল কাজ করার প্রবণতাকে আর উৎসাহ দিয়ো না।”

স্বর্ণশেখর বলল, “ভুল কাজ কেন হবে? বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু কাজটা ভুল নয়, শ্যামশ্রী। পীতপত্রবনের মরতে বসা গাছগুলোর জন্য আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে আছি, তুমি জানো। তাদের জন্য ও বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে এবং সফলভাবে ফিরে এসেছে, এতে তো আমাদের খুশি হওয়া উচিত।”

নীলাভ্র মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল। “একদম আমার মনের কথা।”

শ্যামশ্রী এবার হাসলেন। “অভী, অবস্থাটা দেখ। বাবা, কাকা— সবাই তোর হয়ে কেমন গলা ফাটাচ্ছে। আর মেঘবর্ণের কথা ছেড়েই দিলাম— সে তো সঙ্গে করেই তোকে নিয়ে গিয়েছিল একদম অকুস্থলে!”

অভীও মুচকি হাসল। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “একটা কথা কিন্তু তোমরা কেউ খেয়াল করলে না।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কী কথা?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আমার মনে হচ্ছে, এই হিমকুশলতার ওপর অভীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনেক বেড়েছে। দেখো, হিমকুশলতার মায়া এমনিতেই অত্যন্ত দুর্লভ; বেশি লোকের মধ্যে এ-জিনিস দেখাই যায় না। তাই এর প্রয়োগ সম্বন্ধে বেশি কিছু কেউই জানে না— এমনকি অভী নিজেও না। প্রশ্ন হল, অভী জানল কী করে যে বিরাট একখণ্ড মেঘের মাঝখানে এই মায়ার প্রয়োগে তাকে জমিয়ে দেওয়া যায় এবং তাতে চেপে আকাশে উড়ে চলে যাওয়া যায়?”

কক্ষের সকলেই অভীর দিকে তাকাল। অভীর অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। এইভাবে সে তো কখনও ভাবেইনি। সত্যিই তো, সে জানল কী করে?

একটু আমতা-আমতা করে সে বলল, “আমি... আমি ঠিক জানি না। তখন মনে হল ওটা করা সম্ভব, আর দেখলাম কাজটা হয়েও গেল। কিন্তু কীভাবে...?”

বজ্রধর বললেন, “অভী, তোমার মধ্যে প্রথম এই ক্ষমতাটার প্রয়োগ আমরা দেখেছিলাম তোমার অস্ত্রপরীক্ষার মধ্যে। সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, তোমার মধ্যে বিপুল মায়াশক্তির আধার আছে, যদিও তুমি নিজেই সে-বিষয়ে সচেতন নও। তাই তোমাকে তরবারির পাশাপাশি মায়াবিদ্যা চর্চার উপদেশও দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে আমার। আসলে যাঁরা খুব বড়ো মায়ার আধার হন, তাঁরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না, তাঁরা কী বিরাট সম্ভাবনা নিজের মধ্যে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রবৃত্তি তাঁদের দিয়ে সংকটকালে সঠিক মায়ার প্রয়োগ করিয়ে নেয়। বরাবর তোমার সঙ্গে এমনটাই তো হয়েছে, তা-ই নয় কি?”

অভী ভেবে দেখল, কথাটা একদম ঠিক। তার হিমকুশলতা, তার চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধ করা, তার মেঘনিয়ন্ত্রণ মায়া— এর কোনোটার সম্বন্ধেই সে আগে থেকে জানত না; কার্যক্ষেত্রে হঠাৎ করেই এগুলোকে আবিষ্কার করেছে সে।

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক, একটা অন্য ব্যাপারে আমার একটা বিষয় আপনাদের জানানোর আছে।”

অভী তার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল, মেঘবর্ণ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চলেছে। বজ্রধর বললেন, “বলো।”

মেঘবর্ণ এবার এই একটু আগে পীতপত্রবনে ঐশিকদের দানবের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা বলে গেল সবার সামনে। শেষে বলল, “দানবটার সঙ্গে দু’জন সাহায্যকারী ছিল, যারা ওকে গাছগুলোর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার ধারণা, তারা দু’জনই সমরগরিমার ভেতরের লোক।”

সবাই উত্তেজিতভাবে মেঘবর্ণের বর্ণনা শুনছিলেন। সে থামতে নীলাদ্র বলল, “কিন্তু মেঘ, তোরা সেই দু’জনের একজনকেও চিনতে পারলি না?”

মেঘবর্ণ বন্ধুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, “না, এত অন্ধকার যে আমরা কারও মুখ বুঝে উঠতে পারিনি।”

নীলাদ্র বলল, “দানবটাকে আমাদের ভেতরের কেউ সাহায্য করছে, এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু সেই ঘরশত্রুটি কে বা কারা? সমরগরিমা ধ্বংস হয়ে গেলে এখানের কার কী লাভ?”

বজ্রধর বললেন, “আজ এই আলোচনা থাক। আমি রাতটা একটু ভাবি। তবে পীতপত্রবনে অনুসন্ধান করতে আমাদের সমরোত্তমদের কেউ গেলেই ভালো হয়।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আমি যাব, অধিনায়ক। যেখানে দানবটাকে আজ দেখা গেছে, সেখানে কাল অভীর সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসব যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।”

“অতি উত্তম,” বজ্রধর হাত তুললেন। “আজকের মতো এখানেই সভা শেষ হোক। সকলেই ক্লান্ত তোমরা। আজ রাতের মতো বিশ্রাম করে নাও। কাল সকালে আমরা পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করব।”

সবাইকে নমস্কার জানিয়ে অভী আর নিধি হাঁটা দিয়েছিল মিত্রভবনের উদ্দেশে, এমন সময় মেঘবর্ণ পেছন থেকে ডাকল, “অভী, একটু দাঁড়াও।”

আয়তনের অলিন্দপথে চলতে-চলতে থেমে গেল ওরা। মেঘবর্ণ পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল অভীর সামনে; নীচু গলায় বলল, “কাল তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু।”

অভী বুঝতে পারল মেঘবর্ণ কোথায় যাওয়ার কথা বলছে। সে বলল, “মানবমন্দির?”

“হ্যাঁ।”

একটু অস্বস্তি বোধ করছিল অভী। সে বলল, “আমাকে বাদ দাও না, মেঘবর্ণ। এই ব্যাপারটা তোমরা দু’জন মিটিয়ে নিলেই তো ভালো হত। আমি ওখানে গেলেই আবার লীনার কথা উঠবে।”

নিধি এখনও ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে বলল, “কী ব্যাপার? লীনাকে নিয়ে কী হয়েছে, আমাকে তো কিছু বলোনি কেউ?”

মেঘবর্ণ বলল, “লীনাকে নিয়ে নয়, তার মা-কে নিয়ে; তুমি পারে ওর কাছে সব শুনে নিয়ো। অভী, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমি চলো আমার সঙ্গে। ওই ঘটনার সময় তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, আর লীনার মৃত্যুর সময়ও তুমি তার সঙ্গে ছিলে। তার মায়ের এই আচরণের কারণ জানার অধিকার তোমারও আছে।”

অভী শুকনো মুখে বলল, “অধিকার হয়তো আছে, কিন্তু সেই অধিকারবলে আমি এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে চাই না, মেঘবর্ণ। আমার পক্ষে মারাত্মক অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে সেটা।”

মেঘবর্ণ বলল, “তবু চলো, আমার জন্য। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি অন্তত জানব, এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কেউ একজন আছে— আমি একা নই। যাবে না?”

অভী আর ‘না’ বলতে পারল না। সে নীরবে ওপরে-নিচে মাথা নাড়ল। মেঘবর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, “বাঁচালে! কাল সকালে আমি আসব তোমাদের ওখানে; তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। নিধি, ওর কাছে সব শোনার পর তুমিও যদি তখন আমাদের সঙ্গে আসতে চাও, আসতে পারো।”

সে ফিরে চলে গেল। অভী আর নিধি চলল তাদের বাসভবনের দিকে। নিধি বলল, “কী ব্যাপার, এইবার ঝেড়ে কাশো দেখি বাপু।”

অভী বলল, “এখানে নয়। আগে মিত্রভবনে ঢুকি, তারপর বলছি।”

বেশ রাত হয়ে গেছে। সমরগরিমার মাঠের ওপর দিয়ে ওরা ফিরে এল মিত্রভবনে। মিত্রমাসি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর দুই অতিথি বান্ধবী ভবন-অধ্যক্ষার সঙ্গে গল্প করতে, তাই ওদের আসাটা খেয়াল করলেন না। সেই সুযোগে নিধির ঘরে এসে অভী আজ সন্ধ্যার পীতপত্রবনের অভিজ্ঞতা তাকে শুনিয়ে দিল। শুনে নিধি হাঁ হয়ে গেল। “লতাকাকিমা! তোমাদের নিশ্চিত ভুল হচ্ছে কোথাও!”

অভী বলল, “ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। মেঘবর্ণ তার দেওয়া উপহারের নূপুর চিনতে ভুল করবে, এ হতে পারে না। তা ছাড়া, এর আগের ঘটনা মনে করো। সুদক্ষিণসারি থেকে সেবার পালানোর সময় যে জায়গায় চক্রবাকরা এই দানবের সামনে পড়েছিল, মানবমন্দিরের সেই জায়গাটা লীনাদের বাড়ি থেকে খুব কাছে। আজকের ঘটনার পর আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, লতাকাকিমাই ওই দানবকে সাহায্য করছেন। যে বিশ্বাসঘাতককে আমরা খুঁজছি, সেই ব্যক্তি উনি ছাড়া আর কেউ নন।”

নিধি চুপ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ; তারপর বলল, “বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু কেন? এইসব করে তাঁর লাভ কী?”

“জানি না। সেটাই কাল আমি আর মেঘবর্ণ তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইব। যদি সদৃশুর পাই, ভালো; নয়তো অধিনায়ক বজ্রধর-সহ বাকি সমরোত্তমদের জানানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তারপর তাঁরা যা ভালো বোঝেন, তা-ই করবেন।”

রাতের আহাৰ সেৰে নিজের কক্ষে এসে শুয়ে পড়ল অৰ্ভী। সারাদিনের পৰিশ্রমে বেশ ক্লান্ত ছিল সে, তাই ঘুমটীও এসে গেল তাড়াতাড়ি।

ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্ন দেখল সে, অগ্নিদানবটী এসে দাঁড়িয়েছে তার খোলা জানালায়— আগুনঝরা চোখে দেখছে তার দিকে।

ভয়ানক চমকে যেতেই ঘুমটী ভেঙে গেল তার। মাথার পাশেই খোলা জানালা; হালকা বাতাস আসছে। বাইরে সমরগরিমা আয়তনের ফাঁকা মাঠ; জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

অৰ্ভী আবার শুয়ে পড়ল বটে, তবে ঘুম আসতে এবার বেশ কিছুটা দেৰি হল। তার বারবার যেন মনে হচ্ছিল, দানবটী বুঝি সত্যিই এসে পড়েছিল তার খোলা জানালার ঠিক ওপারে।

ভোরবেলা তার ঘুমটী আবার ভেঙে গেল। শয্যাভ্যাগ করে মিত্রভবনের বাইরে চলে এল অৰ্ভী; এসে দাঁড়াল কক্ষের তার জানালার বাইরের মাঠে। তার মন কিছুতেই ভুলতে পারছে না গতরাতের স্বপ্নটার কথা।

জানালার খোলা পাল্লাদুটোর নিচে বসে মেঝের ঘাসগুলোর দিকে ভালো করে দেখতেই চমকে উঠল সে।

তার জানালার ঠিক বাইরের মাঠের ওপর ঘাসগুলো কীভাবে যেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে!

মেঘবৰ্ণ তাকে নিতে এল সূৰ্যোদয়ের দুই দণ্ড পরে। নিধিকে তার কক্ষ থেকে ডেকে এনে মেঘবৰ্ণ বলল, “তুমি কি আসবে আমাদের সঙ্গে?”

তাদের সঙ্গে নিধি বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু পথে যেতে-যেতেই সে শুনিয়ে রাখল, “মেঘবৰ্ণ, যদি দেখি পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে, তাহলে কিন্তু আমি ওখান থেকে চলে আসব। আমার ধারণা, অৰ্ভীও তা-ই করবে।”

অৰ্ভী নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। মেঘবৰ্ণ বলল, “তা-ই হোক। যে মুহূর্তে তোমাদের মনে হবে ওখানে থাকা আর উচিত নয়, সেই মুহূর্তেই তোমরা চলে যেয়ো।”

মানবমন্দিরে পৌঁছে লতাকাৰিকিমার বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেঘবৰ্ণ, যেন সে দরজায় ডাকবে কি না মনস্থির করতে পারছে না।

তারপর সে দরজায় করাঘাত না করে একটু উঁচুগলায় ডাকল, “লতা, বাড়িতে আছ?”

কয়েক মুহূর্ত পরে লতাকাৰিকিমার গলা পাওয়া গেল, “কে?”

অৰ্ভী আর নিধি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। মেঘবৰ্ণের গলা তিনি চেনেন ভালো করেই, তবু...

মেঘবৰ্ণ বলল, “আমি। একবার বাইরে আসতে পারবে?”

এইবার দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন লতাদেবী। সঙ্গে-সঙ্গে অভীর নজরে পড়ল, তাঁর বাম হাতে বাঁধা রয়েছে সেই সাদা বন্ধনী, আর ভেতরের ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে গোল হয়ে ফুটে উঠেছে বন্ধনীর কাপড়ের ওপর।

সেদিকে তাকে তাকাতে দেখেই সম্ভবত লতা উপলব্ধি করলেন যে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা মানে অনেকের নজর পড়বে তাঁর এই ক্ষতচিহ্নের ওপর। তিনি বললেন, “ভেতরে এসো তোমরা।”

ওরা তিনজন কক্ষের ভেতরে এসে দাঁড়াল; লতা বিছানায় বসলেন। তিনি একবারও ওদের বসতে বললেন না; মনে হল, তিনি যেন চাইছেন, ওরা যত তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়, ততই মঙ্গল।

মেঘবর্ণ ভণিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল। “দেখো লতা, কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি কোথায় ছিলে, কার সঙ্গে ছিলে, এইসব প্রশ্ন তোমাকে করলে তুমি বানিয়ে-বানিয়ে অনেক কথা বলার চেষ্টা করবে, যেগুলো আমার বিশ্বাস হবে না এবং তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে দেখে আমার কষ্ট হবে। তাই সেই যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতার গোড়াতেই কুঠারাঘাত করা যাক। যা বলবে, দয়া করে সত্যি কথা বলো।”

লতা বিস্ফারিত চোখে চুপ করে রইলেন। মেঘবর্ণ বলল, “কাল জঙ্গলে কী করতে গিয়েছিলে সন্ধ্যাবেলা?”

লতা এইবার মুখ খুললেন। “আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম, তুমি জানলে কী করে? কী প্রমাণ আছে? তুমি আমার কাছে এ নিয়ে কৈফিয়ৎ চাইছই বা কেন?”

আর কোনো কথা না বলে মেঘবর্ণ তার হাতের মুঠো খুলে দিল। সেই নূপুরটা এসে পড়ল লতার কোলে।

আর ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই বুঝে লতা ডান হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

মেঘবর্ণ বলল, “তোমার সঙ্গে কেউ একজন ছিল। আর ছিল সেই অগ্নিদানব, যাকে আকাশলোকে ঐশিকরা তৈরি করেছেন মায়া দিয়ে আমাদের সমরগরিমার সর্বনাশ করার জন্য, অভীকে হত্যা করার জন্য। ওই দানবকে তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছ পীতপত্রবনে, ওটাকে তুমি লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছ মানবমন্দিরে। সত্যি করে বলো তো লতা, আসলে কী চাও তুমি?”

লতাকাকিমা কাঁদছেন। সেই কান্নার মাঝখানেই তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, “আমি বলতে পারব না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।”

তাঁর কান্না দেখে মেঘবর্ণের মুখের কঠোরতা প্রশমিত হয়ে এল। তাঁর নত হয়ে আসা মুখের চিবুক তুলে ধরল সে ওপরের দিকে। অভী আর নিধি দেখল, অব্যবহৃত জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর গাল বেয়ে।

মেঘবর্ণ বলল, “লতা, আমাকেও সবকিছু খুলে বলতে পারবে না তুমি?”

রুদ্ধস্বরে লতা বললেন, “এ-কথা আমি কাউকে কোনোদিন বলতে পারব না। তুমি যদি তার জন্য আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়েও যাও, তা-ও আমি

এ-সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। দোহাই তোমার, তুমি আমার কাছে কখনও জানতে চেয়ো না।”

অভী হঠাৎ চমকে উঠল। এই দৃশ্যই তো সে দেখেছিল স্বপ্ন-সরোবরের আকাশে। মেঘবর্ণ বলল, “ওই লোকটা কে ছিল তোমার সঙ্গে?”

“বলতে পারব না। বললে বিপদ হবে। আমার ওপর নজর রাখছে ওরা।”

“কারা?”

লতা চুপ করে রইলেন। অভীর মনে হল, উনি ঐশিকদের কথা বলছেন।

মেঘবর্ণকে ভীষণ অসহায় লাগছে, অপমানিত লাগছে। নিধি চুপিচুপি অভীর হাতে টান দিল। এখান থেকে সরে পড়ার ইশারা।

ওঁদের দু’জনকে কক্ষের মধ্যে রেখে অভী আর নিধি বেরিয়ে এল বাইরে। এসে একটা জোর নিশ্বাস ফেলল দু’জনেই। ঘরের ভেতরের পরিবেশটা বড়োই অস্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল ওদের পক্ষে।

লতাকাকিমার সঙ্গে ঐশিকদের এবং দানবটার কীভাবে সংযোগ হয়ে থাকতে পারে, সে-কথা অনেক ভেবেও ওদের মাথায় এল না।

দূর থেকে পর্বতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নীপাকে আসতে দেখল ওরা। পর্বতের মুখে হাসি দেখে অভীর ভালো লাগল। আলোকপর্ণের সঙ্গে সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পর থেকে পর্বত বেশ কিছুদিন কারও সামনে আসেনি, কথাবার্তাও বিশেষ বলেনি। আজ তাকে হাসিমুখে নীপার সঙ্গে গল্প করতে দেখে অভীর মনে হল, পর্বত তার আগের ফুরফুরে মেজাজ ফিরে পেয়েছে।

ওদের দেখে নীপা এগিয়ে এল। নিধির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, “দিদি, তোদের কাছেই যাব ভাবছিলাম। দুটো জিনিস দেখাব তোদের। প্রথমে এইটা দেখ। বাড়িতে মা তোর পুরোনো জিনিসপত্রের মধ্যে এটা খুঁজে পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। একবার দেখ এর মধ্যে কী আছে; অনেক পুরোনো কথা মনে পড়বে, ভালো লাগবে তোর।”

একটা ছোট স্বপ্ন-উপল সে তুলে ধরল ওদের মুখের সামনে।

নিধি খুশি হয়ে সেটা তার হাত থেকে নিয়ে বলল, “অভী, পর্বতদা, আন্দাজ করতে পারো, এই স্বপ্ন-উপলে কী আছে?”

পর্বত বলল, “ভালো কিছু আছে, বুঝতেই পারছি।”

নিধি বলল, “লীনা যখন প্রথম আয়তনে আসে, তখন আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হওয়ার পরের কিছুদিনের স্মৃতি ধরা ছিল এই পাথরটার মধ্যে। আমার বাড়িতে রাখা ছিল এটা, তারপর এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মা খুঁজে পেয়ে পাঠাল তোকে, নীপা।”

পর্বত বলল, “তাহলে দেখা যাক এর মধ্যে কী আছে।”

পর্বত স্বপ্ন-উপলটা হাতে নিয়ে তার ওপর মায়া প্রয়োগ করতেই ওদের সামনে আকাশের গায়ে খুলে গেল একটা দৃশ্য। এতকাল পরে লীনাকে দেখে অভী চমকে উঠল।

ছবির এই উচ্ছল মেয়েটাকে দেখলে কে বলবে, সে আজ আর নেই।

লীনা হাসছে, নিধির হাত ধরে সে সমরগরিমার মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে অনুশীলন মঞ্চের দিকে। তার খোলা চুল উড়ছে বিকেলের হাওয়ায়। কিন্তু অনুশীলন মঞ্চের দিকে গেল না তারা। মাঠের পাশে একটা বড়ো গাছের তলায় বসে পড়ল দুই বান্ধবী। লীনা তার হাতের ধনুক আর পিঠ থেকে তিরপূর্ণ তৃণ খুলে নামিয়ে রাখল মাটিতে।

অভীর মনে হল, এই স্মৃতিছবির লীনার বয়সটা যেন একটু কম লাগছে। তা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার আয়তনে আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই লীনা আর নিধি একসঙ্গে এখানে আছে।

লীনা বলছে, “জানো নিধি, অধিনায়ক বজ্রধর আজ সকালে আমাকে বলেছেন, আমার মতো নিপুণ তিরন্দাজ শিক্ষার্থী তিনি অনেকদিন দেখেননি।”

ছবির নিধি প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। অভীর পাশে দাঁড়ানো বাস্তবের নিধি বলল, “ও আয়তনে আসার দু’দিন পরের ঘটনা এটা। তারপর আমরা এখান থেকে গিয়েছিলাম সংগ্রহশালা দেখতে।”

ছবিতে আবার দেখা গেল, একটা কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে লীনার পিছু পিছু ঘুরছে। পর্বত বলে উঠল, “এ তো আমার বক্রপুচ্ছ। লীনা আয়তনে আসার পরেই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল ওর সঙ্গে।”

কুকুরটার সঙ্গে ছুটে-ছুটে খেলছে ছবির লীনা আর নিধি। দেখতে-দেখতে অভীর পাশে দাঁড়ানো বাস্তবের নিধি চোখ মুছে নিল একবার।

আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা দৃশ্যে লীনা তখন বলছে, “জানো নিধি, আমার মনে হয়, সমরোত্তম মেঘবর্ণ একটু বিশেষভাবে মায়ের দিকে তাকায়। দেখলে কেমন মায়া হয়। আমার মা-ও ব্যাপারটা বোঝে না, তা নয়। তবু মেঘবর্ণ নিজে থেকে না এগোলে কী করেই বা সে মুখ ফুটে বলে?”

কথাটা শুনেই ছবির নিধি হেসে উঠল। “জেনে রাখো, লীনা, ছেলেদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে ওরা এইসব ব্যাপার বুঝতেই পারে না।”

অভী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজ লতা আর মেঘবর্ণের এই অবিশ্বাস আর অশান্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো কেমন যেন নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে।

আর লীনা? এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটা আজ কোথায়? মহাকাল যেন তাকে এমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে আজ তার কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

স্বপ্ন-উপল থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্যটার দিকে আবার তাকাল সে। লীনাকে দেখা যাচ্ছে— অনুশীলন মঞ্চে সে এক হাঁটু গেড়ে বসে তির ছুড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। তার পাশে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে মেঘবর্ণ; একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন অধিনায়ক বজ্রধর। দেখতে দেখতেই মেঘবর্ণ মুখ ফিরিয়ে বলল, “অধিনায়ক, এই মেয়ে আমাদের ধনুর্ধর বাহিনীর অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠতে চলেছে। এই বয়সেই কী নিখুঁত লক্ষ্যভেদশক্তি! স্নায়ুর ওপর কী চমৎকার নিয়ন্ত্রণ!”

বজ্রধর বললেন, “ওকে অসিবিদ্যাটাও ভালো করে শিখিয়ে, মেঘবর্ণ। আমি ওর অস্ত্রপরীক্ষার দিনে দেখেই বুঝেছি, ধনুকের পাশাপাশি তরবারিও ওর হাতে ভালো চলবে। মেয়েটির সমরগরিমার অনুভূতিও প্রবল। যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে পালানোর কথা ও স্বপ্নেও ভাববে না।”

দেখতে-দেখতে অভীর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তার বারবার মনে পড়তে লাগল, লীনার দেহটা শোওয়ানো আছে এখনও রক্ষাবৈদ্যের সেবাকক্ষে, কিন্তু সেই দেহে আর কখনও প্রাণ ফিরবে না। সে যেন আবার নতুন করে বুঝতে পারছে, লীনাকে সে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিল।

স্বপ্ন-উপলের আলো নিভে গেল। দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। অভী পাশে তাকিয়ে দেখল, নিধি নিঃশব্দে কাঁদছে।

পর্বত এসে হাত রাখল নিধির কাঁধে; তারও চোখ ছলছলে হয়ে এসেছে। নিধি আবার চোখ মুছে একটু ব্যর্থ হাসবার চেষ্টা করল।

নীপা একটু অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, “তোমরা সবাই এত কষ্ট পাবে জানলে আমি এটা আনতাম না।”

অভী বলল, “না রে, বোন। ঠিকই করেছিস তুই। আমরা লীনার মরে যাওয়াটা নিয়ে এত ভাবি, কিন্তু মেয়েটা বেঁচে থাকতে আমাদের কতটা আনন্দে ভরিয়ে রাখত, সেই কথাটাই ভাবতে ভুলে যাই।”

নীপা মুখ শক্ত করে বলল, “অভীদাদা, আমি কিন্তু দাঁতের বদলে দাঁত— এই নীতিতে বিশ্বাসী। লীনাদির পরিণতির জন্য যারা দায়ী, তাদের কাউকে যদি আঘাত করার সামর্থ্য আমার থাকত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম, আমি কোনো ঋণ রাখায় বিশ্বাসী নই!”

অভী দেখল, নীপার চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। তার মাথায় হাত রেখে সে বলল, “শান্ত হ, নীপা। মাথা গরম করিস না। বরং অনেকদিন পর তোর কল্যাণে আমরা ওকে দেখতে পেলাম, এতেই মনটা ভালো হয়ে গেল।”

পর্বত বলল, “যে যাওয়ার, সে তো চলেই যায়। কিন্তু যারা রয়ে যায়, তাদের অবলম্বন হিসাবে কিছু স্মৃতি তো চাই। নয়তো আমরা চলে যাওয়া মানুষদের ছবি আঁকিয়ে রাখি কেন? মূর্তি বানিয়ে রাখি কেন? মনে রাখার জন্যই তো।”

নিধি আর অভী মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল। পর্বত বলল, “মেঘবর্ণকে নিয়ে তোমাদের কথা শুনে আজ মনে পড়ছে, মেঘবর্ণ একসময় আমাকে বলেছিল, ‘লীনাকে আমি নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসি।’ লীনা মারা যাওয়ায় মেঘবর্ণ যে কতখানি আঘাত পেয়েছিল, তোমরা হয়তো জানোই না।”

অভী চুপ করে রইল। লীনাকে যে মেঘবর্ণ ভীষণ ভালোবাসত, তার মৃত্যুতে সে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল, সেই সংবাদ ওরা কিছুটা হলেও জানে। রক্ষাবৈদ্যের কাছে মেঘবর্ণ একসময় গিয়েছিল নিজের হৃদয় কেটে লীনার দেহে বসানো যায় কি না, সে বিষয়ে অনুরোধ করতে। চূড়ান্ত ভালোবাসা ছাড়া এ-কাজ কেউ করে কি?

অভীর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তার প্রথমবার আকাশলোকে যাওয়ার দৃশ্যগুলো। ওখান থেকে ফেরার সময় মায়ানেকড়ের আক্রমণে অভী আর উর্মি যখন মরতে বসেছিল, তখন লীনা বাধ্য হয়েই তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিষ্ক্ষেপ করেছিল হৃদয়শর। লীনা জানত, ধনু থেকে ওই বাণ মোচন করার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মৃত্যু নিশ্চিত, তবু সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করেনি। তাকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু কেন? কেন তাকে দিতে হল এই আত্মবলিদান?

ঐশিকদের জন্য, আবার কেন?

ঐশিকরা তাদের আকাশলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমন্ত্রণ করে। অভীকে তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁদের মতো ঐশিকত্ব বরণ করার। সে যখন তাঁদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল, তখন লীনাকে মেরে ফেললেন তাঁরা, শুধু তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। ঐশিকদের হিংস্র আশ্ফালন মনে পড়ে গেল তার, “আমরা তোমার মৃত্যু চাই, অভী। কিন্তু এখনই নয়। তোমাকে আমরা ভাঙতে চাই, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাই। তুমি যাদের ভালোবাসো, তাদের সবাইকে এক এক করে আমরা কেড়ে নেব। তুমি মরবে— কিন্তু একদম একা হয়ে।”

এই স্মৃতিগুলো ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র একটা ঘৃণা ফোয়ারার মতো উঠে এল অভীর ভেতর থেকে। মুহূর্তের মধ্যে তার হাত ঠাণ্ডা হতে শুরু করল, চোখের দৃষ্টি কমতে কমতে সে অন্ধ হয়ে গেল, তার চোখের মণি বরফের মতো সাদা হয়ে গেল। ঐশিকদের প্রতি অসম্ভব ঘৃণায় তার দু’হাতের ওপর বরফের কাঁটার মতো আকৃতি গজিয়ে উঠল। নিধি চিৎকার করে উঠল, “অভী! কী হচ্ছে? সামলাও নিজেকে!”

পর্বত শঙ্কিতকণ্ঠে বলল, “একমাত্র হিমকুশল নীলাব্রই ওকে এখন থামাতে পারে। আমরা ওকে ছুঁতে গেলেই ও আমাদেরও জমিয়ে দেবে।”

নীপা পাশ থেকে ডাকল, “অভীদাদা! অভীদাদা! শান্ত হও।”

অভী ওদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না কিছুতেই। তার মনে হচ্ছিল, এই বিপুল পরিমাণ জমাট ঘৃণা সে এবার এক মহাবিস্ফোরণে ছড়িয়ে দেবে জগতের ওপর। যে ঘৃণা বরফের পাহাড় হয়ে জমে আছে তার বুকের মধ্যে, নিজেকে ফাটিয়ে সেই তীব্র বিষকে বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারলে যেন তার শান্তি হয়। কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে তার। সে শুনতে পেল, নিধি বলছে, “অভী, নিয়ন্ত্রণ করো নিজেকে। এই ঘৃণার হাতে যদি তুমি নিজেকে ছেড়ে দাও, তাহলে তো ঐশিকদেরই জিত হল।”

অভীও যেন সেটা উপলব্ধি করতে পারছিল; সে এমন হিংস্র, সর্বধ্বংসী শক্তিকে কিছুতেই বাইরে আসতে দেবে না, কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতেও পারছিল না সে। নীপা এগিয়ে গেল তার দিকে। “অভীদাদা!”

পর্বত সাবধান করার সুরে বলল, “নীপা, ওর কাছে যেয়ো না এখন। ওকে ছুঁলে তোমার শরীর বরফে জমে যাবে।”

নিধি কিন্তু বোনকে নিষেধ করল না। নীপা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অভীর দিকে, তারপর সে হাত বাড়িয়ে অভীর ডানহাত স্পর্শ করল; কোমল সুরে ডাকল, “দাদা!”

অভীর কানে সেই ডাক ভেসে এল তার মাথার মধ্যকার তীব্র বিশৃঙ্খলার আওয়াজ ছাপিয়ে। সে শুনতে পাচ্ছে, পর্বত ডাকছে, “নীপা, ছেড়ে দাও বলছি ওর হাত।”

হঠাৎ করেই যেন দৃষ্টি ফিরে এল তার চোখে; নিজের হাতে আর একটা উষ্ণ হাতের স্পর্শ সে এতক্ষণে অনুভব করতে পারল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সামনের দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল সে।

তার হাত ধরে রেখেছে ছোট নীপা। তার হাত থেকে বরফের ধারা বেয়ে উঠছে নীপার হাতে; নীপার কবজি পর্যন্ত ঢেকে গেছে বিষাক্ত নীলাভ বরফে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে বাচ্চা মেয়েটার, কিন্তু অভীর হাত ছাড়েনি সে। মুহূর্তের মধ্যে অভী বুঝতে পারল, তীব্র ঘৃণাকে নিজের মধ্যে বাড়তে দিয়ে কী ভুল সে করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে জোর টান দিয়ে নিজের হাত থেকে নীপার হাত ছাড়িয়ে দিল। এইবার কেঁদে উঠে মাটিতে বসে পড়ল নীপা।

অভীর সারা শরীরের বরফ মুহূর্তের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার শরীর ভরে উঠল স্বাভাবিক উত্তাপে। মাটিতে বসে থাকা নীপার দিকে তাকিয়ে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা করছিল অভীর।

এই ছোট মেয়েটাকে কী ভয়ানক কষ্ট দিয়ে ফেলল সে!

হাঁটু গেড়ে নীপার সামনে বসল সে। নীপার হাতে এখনও জমে আছে নীলচে বরফ। অভী তার হাতটা চেপে ধরল নিজের হাতের মধ্যে।

আগে নীলাভ তার হাতে বরফ গলিয়ে দেওয়ার তাপপ্রদান মায়া প্রয়োগ করেছে, কিন্তু অভী নিজে জানে না ওই মায়া কীভাবে প্রয়োগ করা যায়। নীপার বরফজমা হাতটা সে চেপে ধরল নিজের দু’হাত দিয়ে। অদ্ভুত একটা স্নেহে অভীর মনটা যেন গলে গেল।

সজ্ঞানে কোনো মায়ার প্রয়োগ সে করেনি, তবু তার হাত থেকে কোমল একটা তাপ ছড়িয়ে পড়ল নীপার হাতে। তার হাতের বিষণ্ণ বরফ গলে যেতে লাগল দ্রুত। এবার ভেজা চোখে নীপা একটু হাসল।

অপরাধবোধে অভীর চোখে জল এসে পড়েছিল। সে বলল, “তোকে এত কষ্ট দিয়েছি, আমি বুঝতে পারিনি রে, বোন!”

নিধি এসে অভীর কাঁধ ধরে টেনে তুলল। “হয়েছে, আর ক্ষমা-টমা চাইতে হবে না। আমরা অর্ধরাক্ষসরা নিজেদের মধ্যে অত ভদ্রতা-সভ্যতার ধার ধারি না, বুঝেছ? ওঠো, ওঠো।”

পর্বত বলল, “আর ভয় নেই। বরফটা গলে গেছে; এবার নীপা, তোমার হাতটা আমাকে দাও। একটু ঘষে দিলেই রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে।”

নিধি বলল, “জানো অভী, কিছুটা এই ধরনের দৃশ্যই আমি দেখেছিলাম নীরসেনা হয়ে জলের তলায় চলে যাওয়ার আগে— তুমি নিজের অন্তরের ঘৃণার

সমুদ্রে পড়ে আর উঠতে পারছ না কিছুতেই। এর ওপর নিয়ন্ত্রণ তোমাকে আনতেই হবে, নয়তো এই নিজের ভেতরের এই ঘৃণাই তোমাকে শেষ করে দেবে।”

নীপার হাত পর্বতের হাতে দিয়ে অভী বলল, “এই বিকট ঘৃণা নিজের মধ্যে নিয়েও আমি মরে যাই না কেন, বুঝো পাই না।”

পর্বত বলল, “চাইলেই কি আমরা কেউ মরতে পারি, অভী? নিয়তি আমাদের দিয়ে যা-যা কাজ कराবেন বলে স্থির করে রেখেছেন, সেইগুলি সমাপ্ত না হলে আমাদের কারও ছুটি নেই।”

নীপা বলল, “অভীদাদা, তুমি আর এই নিয়ে মাথাখারাপ কোরো না। আমার যেটুকু ব্যথা ছিল, ভালো হয়ে গেছে।”

নিধি বলল, “আরে, ওইদিকে দেখো, কে আসছেন!”

তার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে অভী দেখল, স্বর্ণশেখরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছেন রাজা পুনর্বসু। তাঁকে দেখেই অভী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

উনি না থাকলে কাল তারা কোনোমতেই শান্তিপূর্ণভাবে ঢুকতে পারত না মেঘনির্মাণশালার মধ্যে।

রাজা সামনে আসতে নমস্কার জানাল ওরা। তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, “প্রলয়যোদ্ধা, কার্যসিদ্ধি হয়েছে তো?”

অভী একটু হেসে বলল, “হয়েছে, মহারাজ। আপনি না থাকলে এত সহজে হত না।”

রাজা বললেন, “সৌজন্য অত্যন্ত দুষ্ট এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাক্ষস। ওর হাতে পড়লে তোমাদের ঘোর বিপদ হতে পারত। এখন থেকেই বলে রাখছি, যদি আবার মেঘনির্মাণশালায় যাওয়ার দরকার পড়ে, আমাকে বলে রেখো। আমিও যাব তাহলে তোমাদের সঙ্গে। আমি স্বয়ং যদি দলে থাকি, তাহলে ওখানে আমার অনুগত প্রহরীরা তোমাদের ঢুকতে বাধা দেবে না।”

অভী বলল, “অবশ্যই জানাব আপনাকে।”

রাজা বললেন, “অধিনায়ক এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন, সবাই নিরাপদে ফিরেছেন শুনলাম।”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, আমি ছিলাম অধিনায়কের সঙ্গে। সেনানায়িকা প্রজ্ঞা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এখানে ফিরে আসতে সাহায্য করেছেন।”

রাজা বললেন, “প্রজ্ঞার মতো এত বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী আজ পর্যন্ত আমি কাউকে দেখিনি। যদি কখনও আবার মাল্যপর্বতের সিংহাসনে ফিরতে পারি, প্রজ্ঞাকে আমি আমার সভায় উচ্চপদে আসীন করব।”

কথাটা বলেই তাঁর চোখ পড়ল পর্বতের দিকে— চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সে; এইসব কথাবার্তায় অংশ নেয়নি। রাজা বললেন, “পর্বত, যদি এই বিপদের মুহূর্তে তোমার কাছে একটা সাহায্য চাই, করবে কি? যদি সৌজন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়, তুমি আমার পাশে থাকবে? তুমি মাল্যপর্বতের অসামান্য যোদ্ধা একজন রাক্ষস বলেই কথাটা বললাম। দেশের এই বিপদের দিনে তুমি সাহায্য করবে না?”

পর্বত শুকনো গলায় বলল, “আমার বিপদের মুহূর্তে আপনি আমার পাশে ছিলেন কি, মহারাজ? আপনার রাজত্বকালেই আলোকপর্ণ আমার গর্ভবতী স্ত্রীকে অভিশাপ দিয়ে মহাসপিণীতে রূপান্তর করে দিয়েছিল। আপনি চাইলে তাকে নিবারণ করতে পারতেন না, এমন তো নয়। আপনার আদেশেই আমাকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। আপনার জন্যই আমার অজাত সন্তান মারা যায়। আপনার জন্যই উত্তরাকে ওই সাপের শরীরে এতকাল নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আজ আমার মতো বাধ্য হয়ে নিজের দেশ ছেড়ে আসার পর আপনার মনে হচ্ছে, আমার সাহায্য আপনার লাগবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনি ভুল করছেন, মহারাজ। মাল্যপর্বত আর আমার ‘দেশ’ নয়। দেশের লোকের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি, তারপর তার সঙ্গে সব বন্ধন আমার মন থেকেই আলাগা হয়ে গেছে।”

রাজা চুপ করে রইলেন; কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। পর্বত আর কোনো কথা না বলে স্থানত্যাগ করল।

পরিবেশটা বেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পেরেই রাজা বললেন, “একবার আয়তনের দিকে যাই। অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে কিছু কথা আছে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আসুন তবে।”

রাজা চলে যাওয়ার পর সে বলল, “এখন বিপদে পড়ে পুনর্বসু আমাদের সামনে ভালো সাজতে চাইছেন বটে, কিন্তু রাজা থাকাকালীন অন্যায়ও তিনি কম করেননি। সারা দেশের লোকের জল আটকে ব্যবসা করা ওঁর রাজত্বেই শুরু হয়েছিল। মরুময়ের এত বাড়বাড়ন্ত তো ওঁর প্রশয় পেয়েই।”

নিধি বলল, “পর্বতদা ঠিক করেছে। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজার এখন ওকে মনে পড়েছে। একদম উচিত উত্তর দিয়েছে ও।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আসলে রাজ্যহারা হয়ে পুনর্বসু এখন মরিয়া হয়ে গেছেন। একটু আগে আমার সঙ্গে আসতে আসতে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, সৌজন্যের সঙ্গে যুদ্ধে সমরগরিমার বাহিনী তথা সমরোত্তমরা তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করবেন কি না।”

অভী বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। “কী অসম্ভব দুরাশা! কী ভয়ানক কল্পনাশক্তি! তুমি কী বললে, রবিকাকা?”

স্বর্ণশেখর বলল, “আমি বললাম, এটা আপনাদের মাল্যপর্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সমরোত্তমরা এই ব্যাপারে নাক গলাবেন না। তা-ও যদি আপনার সংশয় থাকে, আপনি অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে কথা বলুন।”

নীপা বলল, “সেই কথা বলতেই বুঝি উনি আয়তনে গেলেন। কিন্তু ওদের ব্যাপারে আমরা মাথা ঘামাতে যাবই বা কেন?”

স্বর্ণশেখর বলল, “সেটাই আসল কথা। উনি নিজেও জানেন, অধিনায়ক কোনোমতেই রাজি হবেন না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে গেছেন। ক্ষমতার

মোহ বড়ো সাংঘাতিক জিনিস, বুঝলে? একবার ওই মোহ যাকে ধরে, তাকে ছাড়তেই চায় না।”

নিধি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীনার স্বপ্ন-উপলটা বোনের হাতে ফেরত দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গেল। “নীপা, তুই দুটো জিনিস দেখাবি বলেছিলি না? আর একটা কী?”

নীপা তার পোশাকের মধ্য থেকে সুন্দর, নীল রঙের একটা পাথর বার করে দেখাল। “এই যে, এইটা।”

পাথরটা চিনতে পারল অভী। ঐশিকশ্রেষ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁর মুকুট থেকে খুলে নিয়ে এই নীলকান্তমণিটা সে উপহার দিয়েছিল নীপাকে।

নিধি বলল, “এটা তো দেখেছি আগেও। নতুন কী দেখব?”

নীপা বলল, “একটা ব্যাপার খেয়াল করছি কিছুদিন ধরে। এই পাথরটা আগে কী দারুণ ঝিলমিল করত, অন্ধকারে আলোও বেরোত। কিন্তু এখন আর সে-সব কিছুই হয় না। তোকে দেখাতে আনলাম, যদি কিছু বুঝতে পারিস।”

নিধি হাত বাড়িয়ে পাথরটা নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই স্বর্ণশেখর একপ্রকার ছোঁ মেরে নীপার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিল। “কী বললে? আগে এটা থেকে অন্ধকারে আলো বেরোত, এখন আর বেরোচ্ছে না?”

তার বলার ভঙ্গিতে অবাক হয়ে অভী বলল, “তাতে ক্ষতি কী?”

স্বর্ণশেখর ততক্ষণে ওটাকে একবার চোখের সামনে তুলে, আর একবার সূর্যের দিকে তুলে ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। সে বলল, “নীপা, এটা ব্যবহার করে তুমি রূপান্তরমায়া প্রয়োগ করতে, বলেছিলে না?”

নীপা বলল, “হ্যাঁ, করতাম তো। কিন্তু ইদানীং আর করা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, মণিটার মধ্যে যে মায়াশক্তি ছিল, সেটা ফুরিয়ে গেছে।”

স্বর্ণশেখর মণিটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। “না, নীলকান্তমণির মায়াশক্তি কখনও ফুরোয় না।”

নিধি অবাক হয়ে বলল, “তাহলে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “এটা একটা নকল পাথর। দেখতে নীলকান্তমণির মতোই বটে, কিন্তু নিতান্তই ঝুটো।”

অভী চমকে উঠল। “তার মানে? আসলটা তবে গেল কোথায়? আর নীপার কাছে নকলটাই বা এল কী করে?”

নিধি বলল, “তার সঙ্গে আমার প্রশ্ন, এটা বদলাবদলি করে কার কী লাভ? কেউ কি ওই মণিটাকে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “পারে তো বটেই। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ ওটা ব্যবহার করে অত ভালো রূপান্তর করতে পারতেন। শুধু তা-ই নয়, ওটা দিয়ে কারও ওপর দূর থেকে অল্পবিস্তর সম্মোহন মায়া প্রয়োগ করাও সম্ভব বলে শুনেছি। বহু দূর থেকে দৈববাণীর মতো নির্দেশ প্রয়োগও করা যায়। শুধু তা-ই নয়, একবার গ্রন্থাগারে একটা মায়াবিদ্যা সংক্রান্ত পুথিতে পড়েছিলাম, কোনো ছোটোখাটো বস্তুকে ওই মণির মধ্যে মায়াবলে বন্দি করেও সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায়। এখন প্রশ্ন হল,

যে ব্যক্তি এই মণিচুরির অপকর্মটি করেছে, সে এর মধ্যে ঠিক কোন উদ্দেশ্যটি নিয়ে করেছে?"

অভী বলল, "এবং কে করেছে? সমরগরিমার কারও কাজ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কার কাছে থাকতে পারে জিনিসটা?"

স্বর্ণশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "আমার মাথায় একটা অসম্ভব নাম আসছে।"

"কে? কে?" বাকি তিনজন একসঙ্গে জানতে চাইল।

"নিয়ামক বিনীতেশ।"

কয়েক মুহূর্ত লাগল ওদের নামটা হজম করতে। তারপর নিধি বলে উঠল, "তাকী করে সম্ভব? নিয়ামক তো দীর্ঘদিন আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানাতেই আসেননি।"

অভী বলল, "নিয়ামক নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে মণি চুরি করবেন, এ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু লোক লাগিয়ে এই কর্ম তিনি করাতেই পারেন, যদি তিনি বোঝেন এর মধ্যে তাঁর কিছু লাভ আছে, অথবা যদি তাঁকে কেউ এই বুদ্ধি দিয়ে থাকে। কিন্তু রবিকাকা, তোমার এই সন্দেহ কেন হচ্ছে?"

স্বর্ণশেখর বলল, "বলছি। তোরা হয়তো জানিস না, ইচ্ছা না থাকলেও আয়তনের কিছু কিছু কাগজপত্রের কাজ করাতে আমাদের যেতে হয় নিয়ামকের কাছে। অনেক ক্ষমতা খর্ব হওয়ার পরেও উনি আইনত এখনও সমরগরিমার প্রশাসনিক প্রধান, তাই এইটুকু সম্মান এখনও উনি পেয়ে থাকেন। ঐশিকদের অগ্নিদানবের সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের এক সৈনিক মারা গিয়েছিল, আশা করি সবার মনে আছে? সেই লোকটির বিধবা স্ত্রীর জন্য কিছু মাসিক ভাতা আয়তন থেকে দেওয়ার জন্য দরকারি কাগজপত্রে নিয়ামকের সহি প্রয়োজন ছিল। শ্যামশ্রী আমাকে অনুরোধ করেছিল ব্যাপারটা দেখতে। যেদিন সৌজন্য চিঠি পাঠিয়ে অধিনায়ককে আমন্ত্রণ জানাল, সেদিন আমি কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম ওই লোকটির বাড়িতে, তোরা হয়তো জানিস। ঘটনা হল, তার আগের রাতেই বেশ কিছু কাগজে স্বাক্ষর করানোর জন্য নিয়ামকের কার্যালয়ে আমি হাজির হয়েছিলাম বিনা সংবাদে। অসিত বলে যে লোকটা সবসময় তাঁর কার্যালয়ের সামনের কক্ষে বসে থাকে, তার সঙ্গে আমি বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছি; নিয়ামকের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েও সে আমাকে আগেও ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। সেই রাতেও আমি অসিতের সঙ্গে কথা বলে হঠাৎ করেই তাঁর কার্যালয়ের ভেতরের কক্ষে ঢুকে পড়েছিলাম। ঢুকেই দেখি, নিয়ামকের বসার আসনের পাশেই যে বিরাট লৌহসিন্দুক আছে, তিনি তার মধ্যে কিছু একটা জিনিস ঢুকিয়ে রাখছেন। জিনিসটা বেশ ছোটো, কিন্তু তাঁর হাতে ধরা অবস্থাতেই ওর মধ্য থেকে উজ্জ্বল নীলচে আলো বেরিয়ে আসছিল। আমাকে দেখেই চমকে উঠে তিনি তৎক্ষণাৎ সিন্দুক বন্ধ করে দেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল, নির্ঘাৎ এ কোনো মায়াবস্তুর হবে। কিন্তু তখন যেহেতু নীপার নীলকান্তমণি চুরি যাওয়ার ঘটনাটা জানতাম না, তাই আর মাথা ঘামাইনি। এখন মনে হচ্ছে, একবার নিয়ামক মহোদয়ের কাছে থাকা বস্তুটা কী, একটু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।"

ঘটনাটা বলতে-বলতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল মাঠের শেষপ্রান্তের রাস্তার দিকে, নীপা প্রশ্ন করল, “এদিকে কোথায় যাবেন, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর? সুদক্ষিণসারি?”

স্বর্ণশেখর বলল, “না, বামদিকের পথটা ধরে পীতপত্রবনে যাব। কাল যেখানে দানবটাকে দেখা গিয়েছিল, অধিনায়ক আমাকে তার চারপাশটা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছেন। অভী, চল তো একবার আমার সঙ্গে।”

নিধি আর নীপা বলল, “আমরাও যাব?”

“অসুবিধা নেই। আসতে পারো।”

নিয়ামককে নিয়ে জল্পনা করতে করতে ওরা চলল পীতপত্রবনের পথে। বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অভীর মনে পড়ে যাচ্ছিল, মানুষের জগতে সে রবিকাকার সঙ্গে এইরকম ভাবেই ঘুরতে যেত বৈকালির বনে।

নিধি জানতে চাইল, “জায়গাটা আর কত দূরে, অভী?”

অভী বলল, “এখান থেকে অনেকটাই। জঙ্গল যেখানে শেষ হয়ে মৃত দেবতার নদীর চর শুরু হচ্ছে, তার একটু আগে।”

বেলা বাড়ছে, অরণ্যের গাছে-গাছে পাখি ডাকছে। অভী দেখল, গাছগুলোর বেশিরভাগের মধ্যেই সেই পরিচিত স্বাস্থ্যকর সবুজ ভাবটা যেন উধাও হয়ে গেছে। মরাটে, শুকনো পাতার ভার নিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অধিকাংশ মহাবৃক্ষ। পায়ের তলায় পড়ে থাকা ঝরে যাওয়া হলদে পাতার রাশি এই ক’দিনেই যেন তিনগুণ হয়ে গেছে। অভী বুঝতে পারল, অরণ্য মরতে বসেছে। শীঘ্রই এর কোনো প্রতিকার না করতে পারলে সমরগরিমা চিরকালের মতো বৃষ্টিশূন্য হয়ে যাবে।

অদূর ভবিষ্যতের সমরগরিমার সেই মরুশুষ্ক, তৃষ্ণার্ত জনপদের কথা ভাবতেই মনে মনে শিউরে উঠল সে।

চলতে চলতে নীপা মন্তব্য করল, “যেন মনে হচ্ছে, গাছগুলো সব ভূত হয়ে গেছে।”

অভী একটু ম্লান হাসল। কথাটা নেহাত খারাপ বলেনি বাচ্চা মেয়েটা। সারি সারি এই মৃতপ্রায় গাছের দলকে দেখে প্রেতমূর্তি মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রুক্ষ, শুষ্ক, ধূসর হয়ে আসা শাখাপ্রশাখা আকাশের দিকে তুলে সমগ্র অরণ্য যেন ভিক্ষা চাইছে আকাশের কাছে— প্রাণদায়ী বৃষ্টি চাইছে।

তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বর্ণশেখর বোধহয় আন্দাজ করেছিল, তারা কী ভাবছে। সে বলল, “ওই দানবটা মাটিতে আগুন সিঞ্চন করে শুধু যে মাটিটার সর্বনাশ করছে, তা-ই নয়; এর ফলে গাছগুলোর মধ্যকার বৃষ্টি-আকর্ষণ মায়াও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আমি ভয় পাচ্ছি, এই শুকনো জঙ্গলে একবার যদি দাবানল লাগে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই আগুনকে শান্ত করার মতো জল গোটা সমরগরিমায় নেই।”

অভী চুপ করে রইল। দানবটার কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ কাল সন্দের ঘটনাগুলো আর লতাকাকিমার কথা মনে পড়ল তার। এতক্ষণে মেঘবর্ণ তাঁর কাছ থেকে কোনো কাজের তথ্য উদ্ধার করতে পারল কি? কে জানে।

ওরা এসে পড়েছিল কাল যেখানে দানব-সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেইখানে। অভী জায়গাটা দেখিয়ে দিল। স্বর্ণশেখর হাঁটু গেড়ে বসে পুড়ে যাওয়া ঘাসগুলোকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে সে বলল, “ইতঃপূর্বেও জঙ্গলে এসে এইরকম পোড়া মাটি আমি পরীক্ষা করে গেছি। এক সপ্তাহ আগেও দেখেছি, এই তরল আগুনটা অনেক কম জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত। আর এখন আগুনটার দাহিকাশক্তি এতটাই বেড়ে গেছে যে যেখানে ওটা পড়ছে, তার দশ হাত ব্যাসার্ধের পুরো জঙ্গলের মাটির উপরিভাগের সব কিছু পুড়িয়ে শুকনো করে দিচ্ছে।”

নীপা বলল, “এর মানে কী?”

স্বর্ণশেখর বলল, “এর মানে, দানবটার ধ্বংসক্ষমতা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। অভী, কাল তুই স্বচক্ষে দেখেছিস, দানবটার হাতের এক আঘাতে মাটির ওপর নরকগহ্বর খুলে যাওয়ার মতো ভয়ানক কাণ্ড ঘটছে। আর কিছুদিনের মধ্যে এই দানব যে কতখানি শক্তির আধার হয়ে উঠবে, ভাবতে গেলেও শিউরে উঠছি।”

অভী মনে মনে বুঝতে পারছিল, দানবটার পূর্ণশক্তি লাভ মানেই প্রলয়ের আবির্ভাব। তার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করার জন্যই তো ঐশিকরা ওটাকে তৈরি করেছেন। শেষ যুদ্ধ যখন হবে, তখন এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মায়াধর দানবের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হবে শুধু তার হিমকুশলতা দিয়ে?

অরণ্যের মাটিতে যেখানে যেখানে দানবটা আগুন ঢেলেছে, সেই জায়গাগুলোতে মাটির ওপর পোড়া দাগ হয়ে গেছে। রবিকাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল; বলল, “যা দেখার, দেখে নিয়েছি। এবার ফিরে গিয়ে অধিনায়ককে সব জানাব। নিধি আর নীপা গেল কোথায় রে?”

অভী বলল, “ওরা হাঁটতে হাঁটতে এইমাত্র গেল নদীর দিকে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “চল, আমরাও যাই। ওদের ডেকে নিয়ে ফিরতে হবে এবার।”

অরণ্যের সীমানা পেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেল ওরা। অদূরে দুই বোনকে দেখা যাচ্ছে; নদীর বালির ওপর বসে আছে তারা। সামনে দিয়ে নিশ্চিন্ত গতিতে বয়ে যাচ্ছে মৃত দেবতার নদীর সুন্দর কিন্তু বিষাক্ত হলুদ জল।

তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অভী আর স্বর্ণশেখর। অভী বসে পড়ল নীপার পাশে। আয়তন থেকে এতটা পথ হেঁটে আসার পর তার একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করছিল।

স্বর্ণশেখর তাড়া দিল, “তুই আবার বসলি কেন? অনেক বেলা হল, তাড়াতাড়ি আয়তনে ফিরে চল।”

অভী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় নদীর জলে একটা অদ্ভুত কিছু হচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেল সে। জলটার মাঝখানে হঠাৎ যেন একটা বিরাট ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে।

চমকে উঠে নিধি বলল, “নীরসেনারা আসছে।”

অভীও তা বুঝতে পারছিল। এর আগেও সে নীরসেনাদের এই নদীর জল থেকে উঠে আসতে দেখেছে। কিন্তু এখন ওরা আসছে কেন?

স্বর্ণশেখর বলল, “সবাই উঠে দাঁড়াও। ওরা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ জীব। সম্মান দেখিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবে সবাই।”

জলের ঘূর্ণির মধ্য থেকে এক এক করে তীরে উঠে এল ছ’জন নীরসেনা— তাদের প্রত্যেকের হাতে ত্রিশূল। মাথার শিং আর গায়ের সিন্ধু আঁশে রোদ চকচক করে উঠল তাদের। ওরা সকলেই তাদের নমস্কার জানাল।

সামনে যে ছিল, সে-ই সম্ভবত এই ছোটো দলটার নেতা। সে বলল, “এই মৃত দেবতার নদীর তীর অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তোমরা সেই নিয়ম ভঙ্গ করেছ কেন?”

অভী অবাক হয়ে বাকিদের দিকে তাকিয়ে নিল। কই, কেউই তো অস্ত্র নিয়ে আসেনি— সকলেরই হাত খালি! কারও সঙ্গে তরবারি, ধনুর্বাণ কিছুই তো নেই।

স্বর্ণশেখরও একটু আশ্চর্য হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নিধি নিজের পোশাকের মধ্য থেকে লুকানো অস্ত্রটি বার করে আনল। উর্মির দেওয়া সেই হিরার সর্বভেদক ছুরি।

ভ্রুকুটি করে তার দিকে তাকাল নীরসেনারা। “এই পবিত্র নদীতীরে অস্ত্র নিয়ে আসার শাস্তি জানো না তুমি?”

নিধি ভয় পেল না; মাথা উঁচু করে বলল, “জানি। কিন্তু আমি এই ছুরিকে অস্ত্র হিসাবে নিয়ে আসিনি। একে নিয়ে যুদ্ধ করার বাসনা আমার এই মুহূর্তে নেই, তা আপনারা জানেন। আমাদের মৃত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই বস্তুটি আমি পেয়েছি, এবং সেই কারণেই একে সবসময় আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াই।”

নীরসেনাদের হাসতে দেখা যায় কদাচিৎ। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নীরসেনার কঠোর মুখের হাসিটা দেখে অভী তাই একটু অবাক হল।

“নিধি, তুমি তোমার নিজের নীরসেনা জীবনের শিক্ষা ভোলোনি দেখছি। আমাদের সব নীতিনিয়ম তোমার স্মরণে আছে দেখে খুশি হলাম।”

নিধি আবার ছুরিটাকে তার পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। নীরসেনা ফিরে তাকাল অভীর দিকে। “প্রলয়যোদ্ধা!”

অভী মাথা নত করে আবার সম্মান প্রদর্শন করল। নীরসেনা বলে উঠল, “তুমি কি জানো, মৃত্যু আসছে?”

অভী তাকিয়ে রইল তার দিকে। নীরসেনা আর কোনো কথা না বলে ঘুরতে লাগল তার চারপাশে, অদ্ভুতভাবে গুঁকতে লাগল তার গা। অভীর রীতিমতো অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। বিমূঢ়ভাবে সে তাকাল স্বর্ণশেখরের দিকে।

স্বর্ণশেখর তাকে ইশারা করল, “ওরা যা করছে, করতে দে। বাধা দিস না।”

আকাশের দিকে তাকিয়ে এক নীরসেনা বলে উঠল, “প্রলয় এসে পড়েছে অতি নিকটে, বুঝতে পারছ না? নরকের আগুন আর প্রলয়ের হিম একত্র হতে

চলেছে, অনুভব করতে পারছ না? আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রলয়ের মেঘ, দেখতে পাচ্ছ না, প্রলয়যোদ্ধা?"

অভী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাকি পাঁচজন নীরসেনাও যোগ দিয়েছে তাদের নেতার সঙ্গে। ওদের শিংওয়ালা, আঁশে-ঢাকা বিরাট দেহগুলো ঘুরছে অভীকে কেন্দ্র করে, আর একসঙ্গে যেন মন্ত্র পড়ার মতো গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করে চলেছে, “মৃত্যু আসছে! মৃত্যু আসছে! মৃত্যু আসছে!”

অভী মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রশ্ন করল, “কেমন করে আসছে মৃত্যু?”

তার থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে একজন নীরসেনা বসে পড়ল মাটিতে; বাকি পাঁচজন তাকে ঘিরে ফেলল। মাঝে যে রয়ে গেল, তার হাতে দেখা দিল বাঁকানো তরবারি— ঠিক অভীর চন্দ্রহাসের মতো। নিজের হাতের ত্রিশূলটাকেই যে ভ্রমমায়ার সাহায্যে বাঁকানো তরবারির রূপ দিল সে, অভী বুঝতে পারল।

বক্ষিম তরবারিধারী মাঝের জনকে ঘিরে রইল বাকি পাঁচজন; পাঁচজনই হাত ধরে রেখেছে পরস্পরের; পাঁচজনেরই দৃষ্টি আকাশের দিকে।

অভীর হঠাৎ মনে হল, কিছুটা এই ধরনের একটা দৃশ্যই সে দেখেছিল স্বপ্ন-সরোবরের তীরে। সে প্রশ্ন করল, “এটা কি আমার মৃত্যুর দৃশ্য?”

হেসে উঠল নীরসেনারা। “মৃত দেবতার ইচ্ছা কি বুঝতে পারবে এত সহজেই, অভী? কী মনে হয় তোমার, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর?”

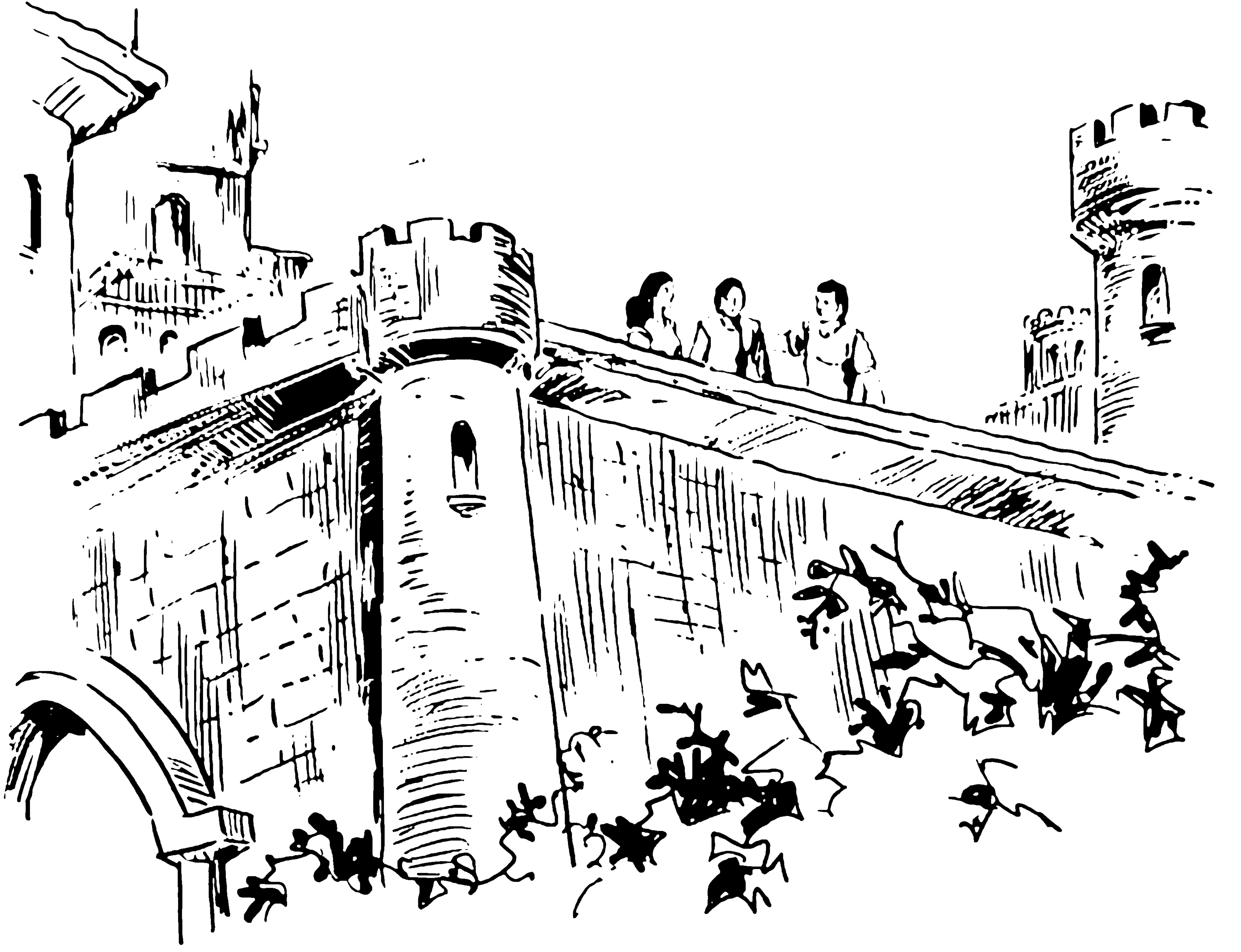
স্বর্ণশেখর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় আমরা সমরগরিমার যোদ্ধারা সর্বদা সজাগ থাকি। মৃত্যু যদি আসেন, তিনি দেখবেন, আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভয় পাই না।”

এইবার মাথা নত করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করল ছয় নীরসেনাই। “ধন্য সমরগরিমার সমরোত্তমগণ! মৃত দেবতা তোমাদের অধিনায়ক বজ্রধরের শেষ পরিকল্পনা জানেন। তিনি তোমাদের সাহসে মুগ্ধ হয়েছেন।”

পেছন ঘুরে এক-এক করে ওরা নেমে গেল নদীর জলে, তারপর ডুবে গেল নিঃশব্দে। অভী ফিরে তাকাল স্বর্ণশেখরের দিকে।

“রবিকাকা, ওরা অধিনায়কের কী পরিকল্পনার কথা বলে গেল?”

ম্লান হাসল স্বর্ণশেখর। “সে-কথা এখন তোকে বলা যাবে না রে।”



।। চতুর্দশ অধ্যায় ।।

নীলকান্তমণি

গন্ডগোলটা বাধল ওরা আয়তনে ফেরার পর।

পীতপত্রবনের মধ্য দিয়ে অনেকটা হেঁটে ওরা সেইমাত্র প্রবেশ করেছে সমরগরিমার মাঠে। দূর থেকেই দেখা গেল, উত্তেজিতভাবে কয়েকজন কথাবার্তা বলছে অনুশীলন মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে।

আর একটু কাছে আসতে বোঝা গেল, লোকদুটি চক্রবাক আর মৃগেন্দ্র। হাত নেড়ে তাদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, ঝগড়া করছে তারা দু'জন। চক্রবাকের আর একজন সঙ্গী আছে— দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, সে-ও মৃগেন্দ্রকে মারতে উদ্যত। মৃগেন্দ্র নিরস্ত্র; চক্রবাকের হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

স্বর্ণশেখর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। “আরে, ওই তো মেঘবর্ণ দাঁড়িয়ে আছে অনুশীলন মঞ্চের ওপরে! এই ঝগড়া-মারামারিতে ও হস্তক্ষেপ করছে না কেন?”

অভীরাও দ্রুত পা চালাল। পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত মনে হচ্ছে।

অনুশীলন মঞ্চের কাছে এসে দেখা গেল, মৃগেন্দ্র আর চক্রবাকের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। মেঘবর্ণ মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সব দেখছে, কিন্তু কলহ থামানোর কোনো চেষ্টা না করে কেবল মুচকি হাসছে।

স্বর্ণশেখর ওদের সামনে এসে চিৎকার করে আদেশ দিল, “থামো! এ-সব হচ্ছেটা কী?”

চক্রবাক এবং তার সঙ্গী তাকে দেখে নিজেদের কিছুটা সংবরণ করল। মৃগেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলল, “এই লোকটা আমাদের অর্ধরাক্ষস জাতিকে অপমান করেছে, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর।”

স্বর্ণশেখর মেঘবর্ণের দিকে তাকাল। এইবার সে মঞ্চ থেকে নেমে এল মাটিতে। স্বর্ণশেখর প্রশ্ন করল, “মেঘবর্ণ, তুমি উপস্থিত থাকতে আয়তনে এই বিশৃঙ্খলা ঘটতে দিচ্ছ কেন?”

মেঘবর্ণ হাসল। “চক্রবাক মনে করছে, অর্ধরাক্ষসমাত্রই বেইমান জাতির অংশ; সমরগরিমার উন্নতিসাধনে তাদের বিন্দুমাত্রও অবদান নেই। নিয়ামক যে তাদের সঙ্গে কুকুরের মতো আচরণ করেন, তা একদম ঠিক করেন। এইসব কথার প্রতিবাদ করেছে আমাদের যোদ্ধা নেতাক মৃগেন্দ্র। আমাকে সে অনুরোধ করেছে, আমি যেন এই ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ না করি। তাহলেই সে চক্রবাককে তার আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবে। আমি ভাবলাম, একবার দেখাই যাক, আমাদের নিয়ামকের পোষা রক্ষী না আমাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা শিক্ষার্থী— কার অস্ত্রশিক্ষা বেশি কার্যকর।”

নিধি প্রশ্ন করল, “এই চক্রবাককে তো সেনাবাহিনী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শুনেছিলাম। ও এখনও অস্ত্র বহন করার অনুমতি পাচ্ছে কোথা থেকে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “সেনাবাহিনীতে ও নেই ঠিকই, কিন্তু অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি ওর আছে, কারণ ওকে আমরা সেনা থেকে বহিষ্কার করার পরেই নিয়ামক ওকে এবং ওর মতো আরও জনা পনেরো লোককে নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পদে নিয়োগ করেছেন। দেশের আইনবলে ওইটুকু তিনি করতে পারেন; আমাদের তাতে আপত্তি করার জায়গা নেই।”

মৃগেন্দ্র বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ বলে দিয়েছেন, এই ঝামেলা নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বা অশান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে। আমি অশান্তিপূর্ণ পথটাই বেছে নিচ্ছি। আমি তোমাদের দু’জনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, চক্রবাক।”

চক্রবাক সঙ্গে-সঙ্গে তার তরবারি নিষ্কোষিত করল। “অতি উত্তম। হয়ে যাক তবে শক্তিপরীক্ষা।”

অনুশীলন মঞ্চে রাখা তরবারিগুলোর মধ্য থেকে একটা তুলে নিয়ে মৃগেন্দ্র এসে দাঁড়াল তার প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। স্বর্ণশেখর বলল, “আয়তনের নিয়ম অনুযায়ী একজন আর একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতেই পারে। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মৃগেন্দ্র একা, আর এরা দু’জন।”

নিধি বলল, “আমি তো আছি। আমি লড়াই করব মৃগেন্দ্রের পক্ষে।”

অভী বলল, “আমিও ওর পক্ষে লড়তে চাই।”

নিধি ততক্ষণে মঞ্চের ওপর যেখানে অস্ত্র রাখা থাকে সেখান থেকে একটা ত্রিশূল তুলে নিয়েছে। সে বলল, “অভী, তুমি খবরদার এর মধ্যে নাক গলাবে না! এই

লড়াই আমাদের অর্ধরাক্ষসদের নিজেদের লড়াই। তুমি অর্ধরাক্ষস নও। এ-ব্যাপারটা নিয়ামকের পদলেহী ভৃত্যের সঙ্গে আমাদের দু'জনকে বুঝে নিতে দাও।”

মেঘবর্ণ হাততালি দিয়ে উঠল। “সাধু, সাধু! তোমরা চারজন মন্দের ওপর উঠে এসো। বাকিরা গিয়ে বোসো দর্শকাসনে।”

নীপাকে নিয়ে অভী গিয়ে বসল দর্শকদের বসার জায়গায়। তার সামনে রইল মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখর। এ-ছাড়াও অন্তত জনা ত্রিশেক শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছে মজা দেখবে বলে। চক্রবাক ত্রুদ্বভাবে দীর্ঘ তরবারি উদ্যত করে মুখোমুখি হল মৃগেন্দ্রর।

চক্রবাক যোদ্ধা হিসাবে খারাপ নয়, কিন্তু নিধি বা মৃগেন্দ্রর মতো সমরোত্তমদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শেখেনি সে বা তার সঙ্গী। নিধি বলল, “মৃগেন্দ্র, তুমি যদি একপাশে সরেও দাঁড়াও, তাহলেও আমি এই দুটোকে একাই হজম করে ফেলতে পারি।”

মৃগেন্দ্র বলল, “সব মজা একা-একাই করার মতলব, না? ওটি হচ্ছে না। আমি চক্রবাককে ধরছি, তুমি ওর চ্যালাটাকে ধরো।”

চক্রবাক রে-রে করে তেড়ে এল উদ্যত তরবারি নিয়ে। মৃগেন্দ্র তৈরি ছিল, সে সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের তরবারি দিয়ে চক্রবাকের আঘাত প্রতিহত করল। নিধির প্রতিপক্ষও হাতে ত্রিশূল তুলে নিয়েছিল; সে এগিয়ে এল অস্ত্রটার ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে খোঁচা মারার ইচ্ছা নিয়ে।

দর্শকাসনে বসে অভী আপনমনে একটু হাসল। নিধির মধ্যে একসময় ত্রিশূলধর মায়া সক্রিয় ছিল, তার ওপর সে বেশ কিছুদিন নীরসেনার জীবন কাটিয়ে এসেছে। ত্রিশূলযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করতে পারে, এমন লোক মায়াজগতে নেই বললেই চলে। তার হাতে চক্রবাকের চ্যালার কী করুণ দশা হবে, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিধি অবহেলাভরে তার ত্রিশূল দিয়ে প্রতিপক্ষের অস্ত্রের মাঝ-বরাবর আঘাত করল। এমন অদ্ভুত একটা কোণ করে তার ত্রিশূলের মুখটা প্রতিপক্ষের ত্রিশূলের মাঝখানে আটকে গেল যে লোকটা কিছুতেই নিজের অস্ত্রটা ছাড়িয়ে নিতে পারছিল না। নিধি তার অস্ত্রে একটা মোচড় দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিপক্ষের ত্রিশূল ছিটকে এসে পড়ল মাটিতে। তার বুকে ত্রিশূলের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ঠেকাল নিধি। অভী-সহ বাকি শিক্ষার্থীরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। স্বর্ণশেখর জোরগলায় ঘোষণা করল, “নিধি বিজয়ী। পরাজিত ব্যক্তি নেমে এসো মঞ্চ থেকে।”

চক্রবাকের অনুচর মুখ শুকনো করে নেমে গেল অনুশীলন মঞ্চ থেকে।

ওদিকে মৃগেন্দ্রর সঙ্গে বেশ ভালোই লড়াই করছিল চক্রবাক। নিধি বলে উঠল, “আরে মৃগেন্দ্র, আর কতক্ষণ টানবে? এবার শেষ করো। ভবনে ফিরতে হবে, খিদে পাচ্ছে।”

দর্শকরা হেসে উঠল। চক্রবাকের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটা হুংকার ছেড়ে আবার সে লাফিয়ে পড়ল মৃগেন্দ্রর ওপর।

মৃগেন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে সরে গিয়ে সজোরে একটা ঘুষি মারল তার তলাপেটে। কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল চক্রবাক। কিন্তু সে শক্তপোক্ত লোক; পরক্ষণেই আবার ভূমিশয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে তরবারি উদ্যত করে। দর্শকরা তার সাহস আর সহ্যক্ষমতা দেখে হাততালি দিয়ে উঠল।

মৃগেন্দ্র ছদ্ম-প্রশংসার সুরে বলল, “নাহ্, যতটা অপদার্থ তোমাকে দেখে মনে হয়, ততটা তুমি নও দেখছি, চক্রবাক।”

উত্তর না দিয়ে চক্রবাক দাঁতে ঠোঁট কামড়ে আবার আক্রমণ করতে গেল। দুই তরবারির সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠল আকাশে। কিন্তু সুযোগসন্ধানী মৃগেন্দ্র হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত হানল প্রতিপক্ষের তরবারির একদম গোড়ায়। তার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে। মৃগেন্দ্র তার বুকে তরবারি ঠেকাতেই স্বর্ণশেখর ঘোষণা করল, “দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ। মৃগেন্দ্র বিজয়ী হয়েছে।”

মৃগেন্দ্র বলল, “মাননীয় সমরোত্তমগণ, চক্রবাক কিন্তু তার অন্যায় বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চায়নি এখনও।”

চক্রবাক মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। সেই অবস্থাতেই সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “কীসের ক্ষমা চাওয়া? যা বলেছি, সত্যি বলেছি। অর্ধরাক্ষসদের মতো জঘন্য জাতি মায়াজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই।”

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ত্রুদ্র গুঞ্জন শুরু হল। মৃগেন্দ্র তার তরবারির অগ্রভাগ সামান্য বিদ্ধ করল চক্রবাকের বুকের বর্মের ওপর। “আপনাদের সামনেই নোংরামি করছে লোকটা। আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি এর বিচারের ভার।”

মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। চক্রবাক পরাজিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার দুষ্ট স্বভাব যায়নি। একে নিয়ে কী করা যায় ভাবতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগছিল তাদের, এমন সময় নীপা বলে উঠল, “সমরোত্তম স্বর্ণশেখর, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি চক্রবাকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি।”

মেঘবর্ণ একটু অবাক হয়ে বলল, “কীরকম শাস্তি? দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আইনত আর শারীরিক আঘাত করা যাবে না ওকে। কিন্তু এই দুর্বিনীত মন্তব্যের কিছু শাস্তি ওর প্রাপ্য। আর কী শাস্তি দেওয়া যেতে পারে?”

নীপা মেঘবর্ণের কাছে গিয়ে নীচুগলায় কী বলল, অভী শুনতে পেল না। মেঘবর্ণ মুচকি হেসে বলল, “বেশ। তা-ই করো তবে।”

চক্রবাক কিছু বুঝে ওঠার আগেই শূন্য থেকে একটা ঘটি এসে উলটে পড়ল তার মাথার ওপর, আর জলে ভিজে সপসপে হয়ে গেল সে। অভী চমৎকৃত হয়ে দেখল, নীপা এরই মধ্যে মায়াবলে দূরের বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার মায়া দারুণভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছে। প্রতিভা আছে বটে বাচ্চা মেয়েটার!

চক্রবাকের হাত থেকে যে তরবারি পড়ে গিয়েছিল, এইবার সেটা ভেসে উঠল শূন্যে। পরক্ষণেই সেটা দুলতে লাগল তার মুখের সামনে; এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। চক্রবাক এবার ভয় পেয়ে গেল।

তারপরেই নিপুণভাবে তার ভেজা গোঁফের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়ে অস্ত্রটা ঝনঝন শব্দে এসে পড়ল মাটিতে। হো-হো করে হেসে উঠল দর্শকরা। মৃগেন্দ্র ও হাসতে হাসতে নিজের অস্ত্র সংবরণ করে পিছিয়ে গেল।

অপমানিত চক্রবাক মাথা নীচু করে রইল। মেঘবর্ণ বলল, “ওহে চক্রবাক, দুটি উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে। এক, জিহ্বাটা একটু সংযত রেখো। আর দুই, আমাদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে এসো না আর। তাতে অন্তত প্রাণটা রক্ষা পেলোও মানটা পাবে না। খামোকা অপমানিত হতে ভালোও লাগে?”

রাগে গরগর করতে করতে তার সঙ্গীকে নিয়ে স্থানত্যাগ করল চক্রবাক।

শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ভবনে ফিরল নিধি আর মৃগেন্দ্র। হাততালি দিতে দিতে তাদের পেছনে চলল অভী আর তার অন্য বন্ধুরা।

মিত্রভবনে ফিরে দুপুরের স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল অভী। তার মাথার মধ্যে বারবার একটা দৃশ্য ফিরে আসছিল— মৃত দেবতার নদীর তীরে দেখা নীরসেনাদের ওই অদ্ভুত অভিনয়। বাঁকানো তরবারি হাতে একজন ঝুঁকে বসে আছে মাঝে, আর বাকি পাঁচজন ঘিরে রেখেছে তাকে। দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা গা-শিরশিরে ব্যাপার ছিল যে, অভী কিছুতেই সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। কেনই বা ওই নীরসেনা বলে গেল, “মৃত দেবতার ইচ্ছা কি বুঝতে পারবে এত সহজেই?” তার মানে এই দৃশ্যের পেছনে মৃত দেবতার কোনো একটা ইচ্ছা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কী? প্রলয় যে আসছে, সে তো ওরা বলেই গেল। কিন্তু তারপর ওরা যেটা করল, তা যদি তার নিজের অনাগত মৃত্যুর দৃশ্যের রূপায়ণ না হয়, তাহলে কীসের পূর্বাভাস দিয়ে গেল দেবতার অনুগত নীরসেনারা?

নিধির সঙ্গে আলোচনা করলে হত, কিন্তু সে দেখেছে, তার মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠলে নিধি বিরক্ত হয়। কার কাছে একটু মন খুলে কথা বলা যায়? ভাবতেই বাবার কথা মনে হল তার।

বাবা নিশ্চয়ই আয়তনে আছে। একবার গিয়ে কথা বললে হয়।

বিকেল নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। রোদ একটু পড়ে এলে কাউকে কিছু না বলে মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে এসে আয়তনের দিকে হাঁটা দিল অভী।

মাঠের ওপর খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আজকে। সবুজ ঘাসগুলোর মধ্য দিয়ে যেন শিহরন বয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে। হাওয়াটা ভালো লাগছিল তার; গত কয়েকদিনের গুমোট গরমের পরে যেন একটু স্বস্তি লাগছিল।

আয়তনে প্রবেশ করতে প্রথমে রক্ষাবৈদ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। নীলাভ্রর খোঁজ করতে তিনি বললেন, “তোমার বাবা-মা দু’জনেই আয়তনের ছাদে আছেন; হাওয়া খাচ্ছেন। তুমিও যেতে পারো ওখানে।”

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভী চলল সিঁড়ির দিকে। এর আগে একবারই সে এসেছিল আয়তনের ছাদে— তার মহানীলগৃধ্রের পিঠে চেপে প্রথমবার স্বপ্ন-সরোবর থেকে ফেরার পর সে এসে নেমেছিল ছাদে। তখন রাত্রি ছিল বলে সে ছাদটা ঠিকমতো দেখে উঠতে পারেনি। আজ অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে সে বুঝতে পারল, ছাদটা কী বিশাল।

আয়তনের মাঠ পুরোটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। মানবমন্দির এবং সুদক্ষিণসারির রাস্তা পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে পীতপত্রবনের সামনের দিকের ঘন গাছের সারি। অস্তগামী সূর্যের আলোয় খোলা ছাদটা খুব সুন্দর লাগছে। হু-হু হাওয়া দিচ্ছে; সেই হাওয়ায় অভীর চুল উড়তে লাগল।

শ্যামশ্রীর সঙ্গে নীলাভ্র বসে গল্প করছিল ছাদের একপ্রান্তে বসে। তাকে দেখে নীলাভ্র ডাকল, “অভী, আয় এদিকে।”

অভী এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। শ্যামশ্রী হাত বাড়িয়ে দিলেন। মায়ের হাতে হাত রেখে সে বসে পড়ল ছাদের খোলা মেঝের ওপর। সারা দিনের রোদে পাথরের ছাদ গরম হয়ে আছে। বিকেল নেমে আসার পর পাথরটা একটু ঠান্ডা হয়েছে বটে, তবু প্রথমবার বসতেই তাপটা টের পেল অভী।

যদিও এত চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে যে ওইটুকু গরমে তার বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নীলাভ্র হেসে বলল, “ছ্যাঁকা লাগল নাকি রে? ও সয়ে যাবে এখুনি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “তারপর বল, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলার আছে?”— বলে আদর করে তার মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিলেন।

মায়ের এই স্নেহটুকু বড়ো ভালো লাগছিল অভীর। সে মুখ টিপে হেসে চুপ করে রইল। আর যেন যুদ্ধ, মৃত্যু এইসব কথা বলতে ইচ্ছাই করছে না তার।

তা-ও তার মাথায় ঘুরছে, যদি ইতোমধ্যেই ওই ঘটনা সম্বন্ধে রবিকাকা বাবা-মা-কে কিছু বলে থাকে। সে বলল, “মা, রবিকাকা কোথায়?”

শ্যামশ্রী বললেন, “ছাদে আসার আগে দেখে এলাম সে অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলছে। আজ চক্রবাকের সঙ্গে তোদের একটা হালকা ঠোকাঠুকি হয়েছে না? সেই বিষয়েই কথা বলছেন ওঁরা।”

নীলাভ্র বলল, “রবির কাছে শুনেছি ঘটনাটা। মৃগেন্দ্র আর নিধি তো বরাবরই উত্তম যোদ্ধা, কিন্তু নিধির বোন নীপাও যে এত ভালো মায়াবিদ্যা আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে এই ক’দিনের মধ্যে, এটা বেশ আশ্চর্য বলতে হবে। তরবারি দিয়ে একটা লোকের গোঁফের অর্ধেকটা নিপুণভাবে কেটে উড়িয়ে দেওয়া কিন্তু নিতান্ত সহজ কাজ নয়। মেয়েটার প্রতিভা আছে।”

অভী কিন্তু-কিন্তু করে বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করব ভাবছিলাম।”

শ্যামশ্রী তার মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন, অভী সংকোচ করছে। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। “কী হয়েছে, পরিষ্কার করে বল তো বাবা।”

নীরসেনাদের সঙ্গে তার আজকের অভিজ্ঞতা বাবা-মায়ের কাছে খুলে বলল অভী। শেষে বলল, “প্রলয়ের পূর্বাভাস দেওয়ার পর ওরা যেন কোনো একটা দৃশ্যের অভিনয় করছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল। মাঝখানে যে ছিল, সে বসে পড়ল মাটিতে। ভ্রমমায়ায় তৈরি তার হাতের বাঁকানো তরবারি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, ওটাকে যেন সে চন্দ্রহাসের রূপ দিতে চেয়েছে। তাহলে কি ওই ব্যক্তিটি আমি? প্রলয় এলে এইরকম কিছুই কি ঘটতে চলেছে আমার সঙ্গে? তাই যদি হয়, আমাকে ঘিরে যারা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল আকাশের দিকে মুখ তুলে, তারাই বা কারা?”

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী শঙ্কিতভাবে একবারে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন; দু’জনে চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল, তারপর নীলাভ্র বলল, “বর্ণনা শুনে তো কিছু বুঝতে পারছি না। কোনো একজনের হাতে বাঁকানো তরবারি আছে মানেই সে ব্যক্তি তুই, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।”

অভীর স্পষ্ট মনে হল, বাবা যেন কিছু একটা লুকোতে চাইছে। শ্যামশ্রী বললেন, “দেখ অভী, এই আয়তনে তোর বেশ কিছুদিন কাটানো হয়ে গেল। এখানে আমাদের জীবন তুই দেখেছিস। আমরা সবাই যোদ্ধা, আর যোদ্ধার জীবনের যে কোনো নিশ্চয়তা নেই, তুই নিশ্চয়ই জানিস। এক প্রিয় বন্ধুকে তুই হারিয়েছিস, তাই যুদ্ধক্ষেত্র যে কতটা নিষ্করণ জায়গা, সে-কথা আর তোকে বলে দিতে হবে না, আমি জানি। কিন্তু তবু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা কোনোদিন আমাদের সমরগরিমা ত্যাগ করিনি। আমরা আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করেছি আমাদের সর্বস্ব দিয়ে; অধিনায়ক বজ্রধর আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়হীন হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এমন দিন তো আসতেই পারে, যেদিন আমাদের কোনো অস্ত্রবিদ্যা আর কাজ করল না, তা-ই না?”

অভী চুপ করে রইল। মায়ের কথা শুনে হঠাৎ কেমন যেন ভয় করতে শুরু করেছে তার।

শ্যামশ্রী আবার বললেন, “প্রলয় যে আসছে, তা তো আমরা অনেকদিন আগে থেকেই জানি। সেই প্রলয়ের সামনে কে বাঁচবে, কে মরবে, তার কোনো ঠিক নেই। তাহলে যা অনিবার্য, তার জন্য এখন থেকে ভয় করে কী লাভ, বল? আমরা জন্মেছি মানে একসময় আমাদের মরতেই হবে, এই সত্য আমরা কে না জানি? আর আমরা যারা যোদ্ধা, তারা তো প্রত্যেকদিন মৃত্যুকে সামনে থেকে সাক্ষাৎ করি। তুই ভাবিস না এত। নিয়তি আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তার অন্যথা কোনোদিন হবে না।”

নীলাভ্র অভীর হাতের ওপর হাত রাখল। “অভী, তোর মা যা বলল, তা একদম সত্যি কথা। কিন্তু তার সঙ্গে আমি আর একটু যোগ করতে চাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা সবাই একসময় নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেও লড়াই করেছি। কেন বল তো?”

“কেন?”

“কারণ আমরা কখনও অন্যের প্রতি লোভ, ঈর্ষা এইসবের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করিনি। এই হচ্ছে আমাদের সমরগরিমার মূল কথা। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাইনি কখনও, কারণ আমরা যুদ্ধ করেছি আমাদের দেশের অসহায় মানুষ আর অর্ধরাক্ষসদের রক্ষা করার জন্য। জানিস অভী, যখন তুই অন্য কাউকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাববি, তখন দেখবি, মৃত্যুকে আর ভয় করছে না।”

অভী চুপ করে রইল। সে জানে, বাবা সমরগরিমার সকলকে রক্ষা করার জন্য নরকে যেতেও দ্বিধা করেনি। শ্যামশ্রী বললেন, “আমি জানি তুই কী ভাবছিস, অভী। তোর বাবা যে কাজ করেছিল, সেই একই কাজ তুইও করেছিস। তুই জানিস, আমরা সমরগরিমার যোদ্ধারা যুদ্ধ করি অসহায়কে রক্ষা করার ব্রত নিয়ে। যদি দেখি আমাদের জীবন বিসর্জন দিলে সকলের মঙ্গল হবে, তাহলে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করতে আমরা দু’বার ভাবব না। তুইও কি তা-ই ভাবিস না?”

অভীর মনে হল, মায়ের কথাগুলো তার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সাহস দিচ্ছে। সত্যিই তো, তার জীবন তো শেষ হয়েই আসছে, সে নিজে খুব ভালো করেই জানে। তাহলে প্রলয়ের সময়েই যদি তার শেষ নিশ্বাস পড়ে, তাতে আর বেশি ক্ষতি কী হবে? কিন্তু তার মৃত্যুর বিনিময়ে যদি সমরগরিমাকে প্রলয় থেকে রক্ষা করা যায়, তাহলে সে কি ইতস্তত করবে?

তার নিজের মনের মধ্য থেকেই উত্তর উঠে এল, ‘না।’

সে কাতরভাবে বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “তেমন পরিস্থিতি এলে আমিও হয়তো মরতে দু’বার ভাবব না, কিন্তু সত্যি বলছি, আমি মরতে ভয় পাই। আমি কি খুব ভীতু?”

নীলাভ্র তাকে বুকে টেনে নিল সস্নেহ আলিঙ্গনে। “না বাবা, তুই ভীতু নয়। তোর মতো সাহসী ছেলেকে নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। আর ভয় পাওয়ার কথা বলছিস? মৃত্যুভয় তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার; ওতে লজ্জার কী আছে? ওই ভয়ের অনুভূতি যার নেই, তাকে বাইরে থেকে দেখে হয়তো খুব বীর যোদ্ধা মনে হবে, কিন্তু চূড়ান্ত ভয় পাওয়ার পরেও যে তাকে সাহস করে জয় করতে পারে, তাকে আমি অনেক বড়ো বীর মনে করি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “মন থেকে ভালোবাসতে পারলে সব ভয় তার সামনে ছোটো হয়ে যায়, এ আমি তোর বাবাকে দেখে জেনেছি। তুইও একদিন পারবি সব ভয়কে জয় করতে, আমি বলছি তোকে, বিশ্বাস কর।”

নীলাভ্র বলল, “প্রলয় এলে কী হবে, কে বাঁচবে কে মরবে, কেউ বলতে পারে না। তাই আগে থেকেই বলে রাখছি তোকে, অভী। যদি দেখা যায়, তুই রয়ে গেলি কিন্তু আমরা আর থাকলাম না, তাহলে মনে রাখিস, বাবা-মা দু’জনেই তোকে ভীষণ ভালোবাসত।”

অভীর গলার কাছে কেমন একটা কান্না যেন দলা পাকিয়ে উঠছিল। সে বলল, “তুমি চুপ করো, বাবা।”

নীলাভ্র আর কিছু না বলে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখর উঠে এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। অভী একটু স্বস্তি পেল। এই প্রসঙ্গ তার আর ভালো লাগছিল না।

মেঘবর্ণ হেসে বলল, “কী রে নীল, ছেলেকে খুব আদর করা হচ্ছে বুঝি?”

নীলাভ্রও হাসল। “ছেলেটাকে তো তোরা সারাদিন ঘুরিয়ে মারিস। বাপ-মায়ের কাছে আসার সুযোগ আর কতটুকু পায় বেচারী?”

ওরা দু’জনও বসে পড়ল ছাদের মেঝের ওপর। ততক্ষণে পাথরগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে। সূর্য ডুবে গেছে। হাওয়া অবশ্য দিচ্ছে আগের মতোই। অন্ধকার নেমে আসা আকাশের বুকে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে পীতপত্রবনের দিকে।

মেঘবর্ণ একটু কেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অভী তার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করল সে এবার কী বলতে চলেছে।

শ্যামশ্রী বললেন, “কিছু বলবে, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “হুঁ। একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। রবিকে আমি এরই মধ্যে বলেছি সব ঘটনা। কিন্তু অধিনায়ককে জানানোর আগে আমি ব্যাপারটা তোমাদের দু’জনকে একবার বলে রাখতে চাই। অভীও সব জানে; ঘটনাটার সময় ও আমার সঙ্গেই ছিল।”

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী দু’জনেই সোজা হয়ে বসলেন। মেঘবর্ণ গত সন্ধ্যায় জঙ্গলের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা এইবার একটুও বাদ না দিয়ে বলে গেল। সব শুনে শ্যামশ্রী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, “লতা ছিল ওখানে দানবটার সঙ্গে! তুমি ভুল করছ না তো?”

মেঘবর্ণ শুকনো হাসি হেসে বলল, “না, ভুল করছি না। আজ সকালে আমি অভী আর নিধিকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও অস্বীকার করতে পারেনি নূপুরটা ওর। প্রকারান্তরে ও মেনেই নিল, দানবটাকে ও-ই সাহায্য করছে পীতপত্রবনে নিয়ে যেতে এবং লুকিয়ে থাকতে। ও এইটুকু শুধু বলেছে, ওর ওপর নাকি নজর রাখা হচ্ছে। কিন্তু কে নজর রাখছে, কীভাবে রাখছে, এবং কেনই বা রাখছে, সে বিষয়ে আমি একটি কথাও ওর মুখ থেকে বার করতে পারিনি।”

সকলেই চুপ করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শ্যামশ্রী বললেন, “এত ঘটনা ঘটছে, আমরা তো বুঝতেই পারিনি। কিন্তু দানবটাকে সাহায্য করে লতার কী লাভ?”

মেঘবর্ণ কাঁধ ঝাঁকাল। “ও বলেনি, আর আমি অনেক ভেবেও বার করতে পারিনি।”

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। তারপর মেঘবর্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নীরবতা ভঙ্গ করে নীলাভ্র বলল, “মেঘ, তোকে এখন মাঝেমধ্যেই খুব আনমনা দেখি। এই নিয়ে আমি আর শ্যামা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু তার মূল এতখানি গভীরে, আমরা বুঝতে পারিনি।”

মেঘবর্ণ দুঃখী একটা হাসি হাসল। “সবসময় হাসিঠাট্টা করি বলে আমার দুঃখটা বোঝা যায় না, আমি জানি। না হেসে কী করব বল? মুখ ভার করে বসে

থাকব? তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীদের কী হবে? আমি যদি শিক্ষক হয়ে নিজের দুঃখের বোঝা বইতে না পারি, তাহলে ওদের শেখাব কী? কিন্তু আমার কপাল দেখ, নীল। যে মানুষটাকে এত ভালোবাসলাম, তার দিক থেকে পূর্ণ ভালোবাসা পাওয়া আর আমার হয়ে উঠল না এই জীবনে। এখন আবার দেখছি, সে-ই আমার দেশের, আমার সমরগরিমার সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিশ্বাস কর নীল, ভেতরে ভেতরে যেন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছি আমি, কিন্তু সেই যন্ত্রণার কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না।”

শ্যামশ্রী হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন তার। “মেঘবর্ণ, মাঝে মাঝে বন্ধুদের কাছে মন খুলতে হয়। সব যন্ত্রণা একা বইতে নেই। তাতে শুধু জ্বালা বাড়ে, উপকার কিছু হয় না। তুমি মহাবীর, আমরা সবাই জানি। কিন্তু মহাবীরেরও কখনো-কখনো নিজের আঘাতগুলোর পরিচর্যা করতে হয়। তোমার ওপর আমাদের সবার অনেক ভরসা, বন্ধু। তুমি ভেঙে পড়লে আমাদের এত সাধের সমরগরিমা আয়তন অক্ষত থাকবে কী করে?”

মেঘবর্ণ একবার আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। নীলাভ্র বলল, “তুই যদি বলিস, তাহলে আমি একবার লতার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।”

মেঘবর্ণ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “একদম না। আর ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আমি বুঝে গেছি। এখন যা করার, আমাদেরই করতে হবে।”

স্বর্ণশেখর এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। সে বলল, “মেঘবর্ণ, তুমি বুঝতে পারছ তো, এবার এ-সব কথা অধিনায়ককে জানানো ছাড়া উপায় নেই?”

মেঘবর্ণ বলল, “কেন বুঝব না? সে যদি শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকে, সব জেনেও আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? অধিনায়ককে সব জানাতেই হবে। তারপর তিনি যা আদেশ করবেন, তাই হবে।”

এই আলোচনার মধ্যে বসে থাকতে অভীর অস্বস্তি হচ্ছিল। সে চুপচাপ উঠে গিয়ে ছাদের অন্যদিকে বসে রইল।

সন্ধ্যার নীলচে অন্ধকার ঘিরে ধরেছে পীতপত্রবনকে। সারিবদ্ধ মশালের আলোয় সমরগরিমার মাঠের বেশ কিছুটা অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু দূরের বনটাকে যেন একটা সুবিশাল অন্ধকারের পিণ্ডের মতো লাগছে। সেই নিকষ অন্ধকারের স্তূপের গায়ে উড়ে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি মৃদু সবুজাভ জোনাকির আলো। অভী সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

“কী ভাবছ, অভী?”

অধিনায়ক বজ্রধরের গলা পেয়ে চমকে উঠে দাঁড়াল অভী; তাড়াতাড়ি নমস্কার করল। বজ্রধর প্রতিনমস্কার করে বললেন, “বেশ কিছুক্ষণ এসেছি ছাদে। তোমার শিক্ষকদের সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলাম। তুমি নিজের চিন্তায় এমন ডুবে ছিলে যে টের পাওনি।”

অভী বোকার মতো হেসে বলল, “সত্যিই বুঝতে পারিনি।”

বজ্রধর বসলেন তার পাশে। অন্য সমরোত্তমরা এখনও ছাদে আছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ এদিকে এলেন না।

বজ্রধর বললেন, “ওদের কাছে শুনলাম, মৃত্যুর চিন্তা তোমাকে বেশ ভাবাচ্ছে?”

সঙ্গে-সঙ্গে অভীর মনে হল, ঠিক তো! মৃত্যুর অন্তরের কথা অধিনায়ক বজ্রধরের চেয়ে ভালো আর কে-ই বা জানেন? মানুষটা তো ফিরে এসেছেন মৃত্যুরও ওপার থেকে!

সে বলল, “অধিনায়ক, মৃত্যু কী? মৃত্যু কেমন? বেঁচে থাকার থেকে কতটা আলাদা?”

বজ্রধর বললেন, “অভী, আমি যেটুকু বুঝেছি, সারা বিশ্বজুড়ে একটাই প্রাণ নানান রূপে ফলে-ফুলে ফুটে উঠেছে। যা কিছু জীবন্ত, সব আসে একই উৎস থেকে। এ যেন এক বিরাট সমুদ্র, আর আমরা প্রত্যেকে এই প্রাণসমুদ্রের এক-একটি বুদবুদ। যাঁরা মৃত্যুকে দেখেছেন, তাঁরা এই সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারেন।”

অভী ঠিক ধরতে পারল না তাঁর কথাগুলো। সে বলল, “তবে মৃত্যু হলে আমরা কোথায় যাই?”

বজ্রধর বললেন, “কোথায় আবার যাব? আমরা যেখান থেকে আসি, সেখানেই ফিরে যাই। জগতের এই বিরাট প্রাণকে সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করে ভাবো। সমুদ্রে যে ঢেউ ওঠে, সে কি সমুদ্র থেকে আলাদা? তীরে আছড়ে পড়ার পর সে যায় কোথায়? যে বিরাট জলরাশিতে তার জন্ম, সেখানেই তো ফিরে যেতে হয় তাকে। আমাদের জীবনও ওই ঢেউয়ের মতো, ওই বুদবুদের মতো। যে প্রাণসমুদ্র থেকে আগমন, সেই প্রাণসমুদ্রেই মিশে গিয়ে প্রত্যাবর্তন। মৃত্যু মানে ‘শেষ’ নয়, অভী; মৃত্যু মানে ফিরে যাওয়া, মিশে যাওয়া।”

অভী চুপ করে রইল। এইভাবে সে কোনোদিন ভাবেনি। যেরকম প্রত্যয় নিয়ে বজ্রধর কথাগুলো বলছেন, তাতে সে আর তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারল না।

কে একজন এসে তাদের পাশে বসল। অভী মুখ তুলে দেখল, রবিকাকা।

বজ্রধর বললেন, “কিছু বলবে, স্বর্ণশেখর?”

সে বলল, “হ্যাঁ, অধিনায়ক। অভীকে মারীচের কথাটা বলে দেবেন দয়া করে।”

বজ্রধর বললেন, “ভালো মনে করিয়ে দিলে। অভী, প্রলয় যে অনিবার্য, তুমিও জানো। প্রলয় এলে বহু মানুষের মৃত্যু হবে, আমরা অনুমান করে নিতেই পারি। যদি তেমন কোনো পরিস্থিতি আসে, আগাম বলে রাখছি, একবার মারীচের দোকানে যেয়ো।”

রবিকাকার সঙ্গে গিয়ে মারীচের যে দোকানে প্রথম রাক্ষস দেখেছিল অভী, সেটার কথা মনে পড়ল তার। মায়াজগতের বাইরে মানুষদের দেশেও মেঘবর্ণের কিছু গুপ্তচর আছে, মারীচ তাদের একজন। স্বর্ণশেখর বলল, “প্রলয় আসার পর যদি তুই শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারিস অভী, তাহলে আমার ফুলঝুরিটা নিয়ে একবার অবশ্যই মারীচের কাছে যাস।”

অভী বলল, “কেন?”

“ওখানে তোর জন্য একটা জিনিস রাখা থাকবে। সমরগরিমায় যদি বড়োরকমের কোনো অঘটন ঘটে যায়, তখন ওটা তোর কাজে লাগবে।”

বজ্রধর বললেন, “অঘটন কিছু ঘটবে কি না, আগে থেকে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমার মন বলছে, ঘটবে। আমার যমদণ্ডের কম্পনে আমি বিপুল মৃত্যুর পূর্বাভাস পাচ্ছি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আপনার এই অনুমানগুলো আগেও মিলে গেছে, আমরা দেখেছি। ওই অগ্নিদানব-সহ ঐশিকরা তো আছেনই, তার ওপর সৌজন্য এবং মরুময় যেভাবে আমাদের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজছে, যে-কোনো দিন অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়।”

মরুময়ের নাম শুনে বজ্রধরের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, “মরুময় আমাকে কোনোদিনই পছন্দ করেন না, আমি বরাবরই জ্ঞানতাম। সেই বিরাগের মাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম সদ্য। গতবার মাল্যপর্বতে গিয়ে জেনে এলাম, তাঁর নাকি জীবনের সাধনা হচ্ছে আমাকে হত্যা করা!”

অভী একটু অবাক হয়ে বলল, “আপনি কার কাছে শুনলেন এ-সব কথা?”

বজ্রধর বললেন, “প্রজ্ঞা। তাঁর কাছেই জানলাম, সেই প্রথমবার সমরগরিমার ওপর আক্রমণ করতে এসে আমার কাছে লজ্জাকর পরাজয়ের অপমান তিনি আজও ভোলেননি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “সে সাধনায় ওঁর সিদ্ধিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। যা-ই হোক, অধিনায়ক, আপনার অনুমতি হলে আমি অভীকে নিয়ে একটু নিচে যেতে চাই। ওর সঙ্গে একটু কাজ আছে আমার।”

বজ্রধর বললেন, “এর জন্য আবার অনুমতি লাগবে কেন? যাও তোমরা। আমিও ওদের কাছে যাই একবার; মেঘবর্ণ আমাকে কী যেন বলবে বলছিল।”

বজ্রধর উঠে গেলেন।

হঠাৎ করে তাকে এইভাবে ডেকে নেওয়ায় অভী একটু অবাক হয়েছিল। স্বর্ণশেখর চাপাগলায় বলল, “একবার নিচে চল তো, অভী। অনেকক্ষণ ধরে পরিকল্পনা করেছি একটা কাজ করার। পর্বত ছাড়া এ-সব ভেতরের খবর এখনও কেউ জানে না।”

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অভী প্রশ্ন করল, “কী কাজ, রবিকাকা?”

স্বর্ণশেখর বলল, “অন্ধকারটা ভালো করে নামার অপেক্ষা করছিলাম। এইসব কাজ দিনের আলোয় না হওয়াই ভালো।”

অভী একটু অধৈর্য সুরে বলল, “কাজটা কী বলবে তো?”

চোখ বড়ো-বড়ো করে স্বর্ণশেখর বলল, “আর একটা ডাকাতি!”

নিচে এসে অভী জানতে পারল, যে সে জায়গা নয়, খোদ নিয়ামকের কার্যালয়ে ডাকাতির কথা বলছে রবিকাকা!

পরিকল্পনাটা দ্রুত গুনিয়ে দিল সে। পর্বত ইতোমধ্যেই চলে গেছে মিত্রভবনে; সেখান থেকে নিধিকে নিয়ে আসছে সে এখানে। নিধি এলে ওরা চারজন যাবে

নিয়ামক বিনীতেশের কার্যালয়ে। সেখানে দরকার হলে নিয়ামকের সিন্দুক ভেঙেও দেখতে হবে ভেতরে ঐশিকশ্রেষ্ঠের নীলকান্তমণিটি আছে কি না।

শুনেই রীতিমতো উত্তেজিত বোধ করতে লাগল অভী। একটা মনের মতো কাজ পাওয়া গেছে এতক্ষণে।

নিধি আর পর্বত এসে পড়ল অলক্ষণের মধ্যেই। স্বর্ণশেখর বলল, “এই তো সবাই জুটেছে। এবার চলো, নিয়ামকের কার্যালয় অভিযান করা যাক। তবে সবাই জেনে রাখো, নিয়ামক কিন্তু সহজে আমাদের কাছে ধরা দেওয়ার পাত্র নন।”

পর্বত বলল, “দরকার পড়লে একটু ভয় দেখাতে হবে। আমি রাফস বলে আমাকে উনি মনে মনে একটু ভয় পান, আমি জানি।”

হাঁটতে হাঁটতে স্বর্ণশেখর বলল, “তোমরা সবাই প্রথমে দেখা দিয়ো না। আমি আগে যাচ্ছি। নিয়ামকের কক্ষের সামনে অসিত বসে থাকে। ওকে গল্পগাছায় ভুলিয়ে আমি অন্যদিকে নিয়ে চলে যাব। তখন তোমরা ভেতরে ঢুকবে।”

অভী বলল, “তুমি ভেতরে যাবে না, রবিকাকা?”

স্বর্ণশেখর বলল, “যেতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু একজন সমরোত্তম হয়ে নিয়ামকের কার্যালয়ে ডাকাতি করতে যাওয়াটা একটু কাঁচা কাজ হয়ে যাবে। অনর্থক তখন নিয়ামক অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে অভিযোগ করে একগাদা বাজে বকবেন। কিন্তু তোরা যদি পর্বতের সঙ্গে যাস, নিয়ামক টুঁ শব্দটি করতে পারবেন না, দেখে নিস।”

অভী মেনে নিল, রবিকাকার কথায় যুক্তি আছে। নিয়ামকের কার্যালয়ে এই বেআইনি কাজে সমরোত্তমরা প্রত্যক্ষভাবে যত কম জড়িত থাকেন, ততই মঙ্গল।

কার্যালয়ের সামনে অনেকগুলো মশাল সারিবদ্ধভাবে জ্বলছে। সামনের কক্ষের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে অসিত বসে আছে। ওদের অপেক্ষা করতে ইশারা করে স্বর্ণশেখর এগিয়ে গেল। নিধি ফিসফিসিয়ে বলল, “আমরা ঢোকার পর নিয়ামকের মুখের অবস্থা কেমন হবে, ভাবতেই শিহরন হচ্ছে।”

অভী মুচকি হাসল। ওদিকে স্বর্ণশেখর তখন দিব্যি গল্প জমিয়েছে অসিতের সঙ্গে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, তারা দু’জন কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে। পর্বত বলল, “আমাদের পথ পরিষ্কার। চলো, যাওয়া যাক।”

হনহনিয়ে হেঁটে ওরা এসে ঢুকল নিয়ামকের কার্যালয়ে। সামনের কক্ষে অসিতের ফেলে যাওয়া কাষ্ঠাসনের পাশ দিয়ে ওরা পাশের কক্ষের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

পর্বত হালকা একটু ঠেলা দিয়ে দেখে নিয়ে বলল, “দরজা খোলাই আছে। এসো তোমরা।”

দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে ওরা এসে ঢুকল ভেতরে। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠে দাঁড়ালেন নিয়ামক বিনীতেশ। “কী হয়েছে? কী হয়েছে? ভেতরে ঢুকলে কী করে তোমরা?”

অভী আর নিধির হাতে খোলা তরবারি। তাদের শত্রু মুখ দেখে নিয়ামক বুঝতে পারছিলেন, এদের কাছ থেকে কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করাই ভালো। তা-ও তিনি চেষ্টামেচি করতে ছাড়লেন না। “এত সাহস তোমাদের? আমি সমরগরিমার নিয়ামক— আমার কার্যালয়ে অস্ত্র নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ তোমরা? সবাইকে কঠোর শাস্তি দেব আমি। কাউকে ছাড়ব না।”

নিধি এগিয়ে এসে তরবারি উদ্যত করল। “সাবধান, নিয়ামক মহোদয়। বাক্যপ্রয়োগে সংযমী হোন। আপনি বোধহয় খেয়াল করে দেখেননি, আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আপনার হাতে আছে নিজের জীবন।”

নিয়ামক চোঁচিয়ে উঠলেন, “অসিত! অসিত!”

অভী বলল, “অসিত এখন আসবে না। আপনি যদি নিজের ভালো চান, তাহলে যেমনটি বলা হচ্ছে, তেমনটিই করুন।”

নিয়ামক একবার শেষ চেষ্টা করলেন। “আমি অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে অভিযোগ করব তোমাদের নামে। তোমাদের এইসব কাজ তিনি নিশ্চয়ই জানেন না। তাঁকে বলে আমি তোমাদের ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা করব।”

নিধি ঠোঁট উলটে বলল, “করুন গে যান! অধিনায়ক আপনার থেকে আমাদের বেশি বিশ্বাস করেন। আপনি রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন, আর আমরা সেই যুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছিলাম। আপনার চেয়ে আমাদের কথার গ্রহণযোগ্যতা অধিনায়কের কাছে অনেক বেশি।”

নিয়ামক বেশ ঘামছেন। বাম হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপাল মুছে তিনি বললেন, “সমরগরিমার আইনবলে কোনো সমরোত্তম আমার কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তোমরা আইন ভাঙছ কিন্তু। এর শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে।”

এইবার পর্বত সামনে এসে দাঁড়াল। তার বিরাট চেহারা আর গনগনে ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে নিয়ামক মুহূর্তের মধ্যে কেঁচো হয়ে গেলেন।

গম্ভীর স্বরে সে বলল, “আমি সমরোত্তম নই, আর সমরগরিমার আদি বাসিন্দাও নই। তাই আপনাদের এইসব নিয়ম মানতেও আমি বাধ্য নই। শুধু অধিনায়ক বজ্রধর মানুষটাকে শ্রদ্ধা করি বলে আপনি আজও বেঁচে আছেন, বুঝলেন মাননীয় নিয়ামক? মাল্যপর্বতে আপনার মতো অতিচালাক লোককে মেরে রাজপথের ওপর বাঁশে টাঙিয়ে রাখা হয়। যা জিজ্ঞাসা করা হবে, তার উত্তরে আপনি মিথ্যে কথা বললে এখুনি আপনাকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলব। তাই নির্জলা সত্যি কথা বলুন। নীপার কাছে ঐশিকদের যে নীলকান্তমণি ছিল, সেটা আপনি চুরি করেছেন, তা-ই না?”

নিয়ামক মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছেন, তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত পর্বত গত যুদ্ধে আলোকপর্ণের কী দশা করেছিল, তাঁর মনে পড়ে গেছে। তার সামনে দু’হাত জোড় করে তিনি বলে উঠলেন, “আমি করিনি, আমি করিনি! চক্রবাক করেছে!”

নিধি বলল, “পথে আসুন তবে। চক্রবাক আপনার আদেশ ছাড়া কিছু করে না, আমরা সবাই জানি। আপনিই তাহলে ওকে হুকুম দিয়েছিলেন ওটা চুরি করে আনতে। কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্য থেকে জিনিসটা আপনারা হস্তগত করলেন কীভাবে?”

নিয়ামক বললেন, “তোমার বাবা দিঙ্‌নাগ-ই তো চক্রবাককে দিয়ে দিয়েছিল মণিটা।”

নিধি হাঁ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, “কী বললেন?”

নিয়ামক মাথা নীচু করে বললেন, “নীপা তখনও আয়তনের সরাসরি শিক্ষার্থী হয়নি, কিন্তু সমরোত্তমদের কাছে খুব যাতায়াত করত। আমি সংবাদ পেয়েছিলাম, ও নীলকান্তমণি ব্যবহার করে খুব সহজেই রূপান্তরমায়া প্রয়োগ করতে পারছে। আমার কথায় চক্রবাক দিঙ্‌নাগকে গিয়ে বলেছিল, ‘যদি ছোটোমেয়ের মঙ্গল চান, তাহলে তাকে এখানে আসতে নিষেধ করুন।’”

নিধি কড়াগলায় প্রশ্ন করল, “তারপর?”

“তারপর আমাদের নির্দেশে দিঙ্‌নাগ মণিটা লুকিয়ে চক্রবাকের হাতে দিয়ে দেয়, আর নকলটা নীপার জিনিসপত্রের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে চট করে বোঝা না যায় যে আসলটা হারিয়ে গেছে।”

নিধি বিধ্বস্তের মতো অভী আর পর্বতের দিকে তাকিয়ে বলল, “কোনো বাবার জন্য তার সন্তানকে এতখানি লজ্জা পেতে হয়, আমার বাবাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।”

পর্বত বলল, “দিঙ্‌নাগ বোধহয় ভেবেছিল, এতেই তার ছোটোমেয়ের মঙ্গল হবে। তোমাদের দুই বোনের আয়তনে আসাটা সে তো কোনোদিনই পছন্দ করেনি।”

অভীর একটা সন্দেহ হচ্ছিল। সে বলল, “কিন্তু একটা কথা নিয়ামক মহোদয়, এই মণিচুরির বুদ্ধিটা আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কার কথায় এ-সব করছেন আপনি?”

নিয়ামক চুপ করে রইলেন। অভী আন্দাজে ঢিল ছুড়ল। “সৌজন্য, না?”

নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন নিয়ামক বিনীতেশ। ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত সময় নিল সংবাদটা পরিপাক করতে। সৌজন্য তাহলে এখনও এত দূর থেকেও সমরগরিমার ভেতরের ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে!

পর্বত লাফ দিয়ে এসে পড়ল তাঁর সামনে; গর্জন করে বাঘের থাবার মতো দু’হাত তাঁর মাথার ওপর তুলে সে বলে উঠল, “আপনি একটা দেশদ্রোহী! শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনি নিজের দেশের সর্বনাশ করতে চান! আপনার আজ রক্ষা নেই!”

“আ-আ-আমি নই! ঐশিকরা! ঐশিকরা সব জানেন!” বলতে বলতে পর্বতের সেই মূর্তি দেখে নিয়ামক ভয়ে চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর ধপাস করে পড়ে গেলেন।

নিধি বলল, “আপদ গেল। এই তো চাই, পর্বতদা!”

পর্বত বলল, “আগে পরীক্ষা করে দেখে নাও বাটা সত্যিই অজ্ঞান হয়েছে কিনা। এই দুরাত্মার ছলের অভাব কোনোদিন হয় না, জেনে রেখো।”

নিধি নিয়ামককে নেড়েচেড়ে দেখে বলল, “না, ভান নয়। সত্যিই উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।”

পর্বত বলল, “বেশ হয়েছে। তোমরা চটপট কাজ সারো। ওই দেখো চাবি রাখা আছে।”

নিয়ামকের বসার আসনের পাশেই লোহার সিন্দুকটা দাঁড়িয়ে ছিল। অভী চাবিটা তুলে নিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলল।

সিন্দুকের মধ্যে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। কিছু কাগজপত্রের তলায় চাপা দিয়ে রাখা ছিল ঐশিকশ্রেষ্ঠের নীলকান্তমণি; কাগজগুলো সরে যেতেই মণিটা জ্বলজ্বল করে উঠল সিন্দুকের মধ্যে।

অভী খুশি হয়ে বলল, “এই তো পাওয়া গেছে হারানো জিনিস। নাও, নাও, নিধি, ওটা বার করে নিয়ে চলো অসিত আসার আগেই পালাই।”

মণিটা হাতে নিয়েই নিধি চমকে উঠল। “দেখো সবাই, কী অবস্থা হয়েছে এটার!”

অভী আর পর্বত দুজনেই দেখল, মণিটা আর আগের মতো নেই। সম্পূর্ণ গোলাকার নীল রঙের উজ্জ্বল পাথরটাকে মাঝ-বরাবর কে যেন কেটে ফেলেছে। একটা গোটা সুপারি কাটলে যেমন সমান দুটো অর্ধগোলাকার খণ্ডে তা বিভক্ত হয়ে যায়, এই মণিটারও একই অবস্থা হয়েছে।

পর্বত বলল, “খুব শক্তিশালী ঐশিকমায়া ছাড়া এইভাবে কোনো মায়ামণিকে কাটা যায় না। এই মণিচুরির পেছনে শুধু সৌজন্য নয়, ঐশিকদেরও হাত আছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এর বাকি আধখানা গেল কোথায়? কী উদ্দেশ্যেই বা সেটাকে সরিয়ে ফেলেছে ওরা?”

অভী বলল, “নিধি, একবার দাও, জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখি।”

নিধির হাত থেকে মণিটা সে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। ওদের চোখের সামনে প্রচণ্ড তীব্র একটা নীল আলোর ঝলক খেলে গেল, যেন ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল।

অভী দেখল, ঐশিকমায়ার সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো শব্দ আর আলোর প্রভাবে নিধি আর পর্বত দুজনেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সে তো এখনও দিব্যি সচেতন আছে। কী করে?

হাতের অর্ধগোলাকার নীলকান্তমণির দিকে তাকাতেই তার মধ্যে সে বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখতে পেল এমন একজনের মুখ, যাকে এ জীবনে আর কোনোদিন দেখার কথা ভাবেনি সে।

লীনা!

হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অভী। লীনাকে কী ভীষণ ক্লান্ত লাগছে; চোখের কোলে কালি, কপালে বলিরেখা, চুল উশকো-খুশকো। কিন্তু লীনা জীবন্ত! এ কোনো মায়া নয়; এই লীনার ছবি জীবন্ত।

লীনা ডাকল, “অভী! এ কি তুমি?”

শক্ত করে মণিটা চেপে ধরেছে অভী। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল তার। “হ্যাঁ, লীনা। আমিই। তুমি কোথায়? তুমি বেঁচে আছ? তোমাকে কীভাবে দেখতে পাচ্ছি আমি?”

লীনা বলল, “অভী, তোমার হাতের নীলকান্তমণিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ঐশিকমায়া, তাই ওই মণির প্রভাবে তুমি এইসব দেখছ। তাঁদের মায়ায় আমিও বদ্ধ, তাই তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তুমি যে আমাকে দেখছ, সেটা ওঁরাও বোঝেননি। নিয়ামক এই মণি কাছে রেখেছেন বলে তাঁর ওপর ওঁরা নজরদারি করতে পারেন। কিন্তু তুমি যে এইমুহূর্তে এই মণি হাতে ধরে আছ, তা ওঁরা জানেন না; যেহেতু তোমার শরীরেও ঐশিকরক্ত আছে, ওঁরা তাই তোমার উপস্থিতি বুঝতে পারছেন না।”

অভী বলল, “ওসব ছাড়ো, লীনা। আগে বলো, তুমি বেঁচে আছ?”

লীনা বলল, “একে বেঁচে থাকা বলে কি? কী জানি! না বোধহয়। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল।”

“কেন? কোথায় আছ তুমি?”

“সে-কথা আমার বলা নিষেধ। কিন্তু অভী, তোমার ভেতরে কী আছে, আমি এখন এই জীবন-মৃত্যুর মাঝের অবস্থায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার দৈবীদৃষ্টি খুলে গেছে। আমি তোমার ভেতরের ওই তেজোপুঞ্জকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।”

“কী? কী দেখছ তুমি? কীসের তেজোপুঞ্জের কথা বলছ?”

“প্রলয়ের জগৎবিধ্বংসী শক্তিকে আমি তোমার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি না এ-সব কথা শুনে তোমার মনের কী অবস্থা হবে, কিন্তু তোমাকে না বলেও আমি পারছি না। তুমি আজ পর্যন্ত নিজেকে জানতে পারোনি, নিজের স্বরূপ জানতে পারোনি। কিন্তু প্রলয় আসছে; এবার সব কথা তোমার জানা দরকার।”

“কী বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।”

“তুমি আসলে কী, তুমি জানো? যে রহস্যের কথা আজ পর্যন্ত কেউ তোমাকে খুলে বলেনি, আমি তা-ই বলছি তোমাকে। যে অস্ত্রে শিব জগৎ সংহার করেন, তুমিই সেই পাণ্ডপত, অভী। তুমি ওই অস্ত্রকে নিজের মধ্যে নিয়েই জন্মেছ। বা, ওই অস্ত্র জন্মেছে তোমার সত্তার মধ্যে— নিয়তির ইচ্ছায়। কেন তুমি শিবের চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধ করতে পারো? কেন নরকের আগুন তোমাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি? কেন তোমার দু’হাতেই নিয়তিলাঞ্ছন এত স্পষ্ট? কেন হিমকুশলতার মতো প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তিকে বারবার প্রয়োগ করেও তোমার মৃত্যু হয়নি? ভেবে দেখো অভী, তুমি আসলে কে, তুমি আসলে কী!”

এক হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল অভী। এ-সব কী বলছে লীনা?

লীনা বলল, “এত কিছুর পরেও তোমার মৃত্যু হয়নি, কারণ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো যে ধ্বংসের শক্তি, তা তোমার মধ্যেই স্থির হয়ে আছে, বেরিয়ে আসার

অপেক্ষা করছে। সেই শক্তি তোমার মধ্যে 'আছে' বললেও ভুল হবে, কারণ তুমি নিজেই সেই শক্তি। বুঝতে পারছ না তুমি?"

অভী বলল, "সত্যিই বুঝতে পারছি না। তুমি বলতে চাইছ, আমি ওই অস্ত্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছি?"

"না, শুধু ধারক নও, তুমিই এক অর্থে ওই অস্ত্র; ও তোমার সত্তার একটা অংশ। জল জমাট বেঁধে যেমন বরফের রূপ ধারণ করে, ওই শক্তি পৃথিবীতে নেমে এসেছে তোমার রূপ ধারণ করে। তুমিই প্রলয়যোদ্ধা, তুমি সাক্ষাৎ প্রলয়! নিয়তির ইচ্ছায় তুমি যে মুহূর্তে ওই শক্তিকে সচেতনভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারবে, সেই মুহূর্তেই নিজের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তুমি প্রলয় ডেকে আনবে।"

অভীর মনে হল, সে বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। এ-সব কী বলছে লীনা?

তারপর তার মনে পড়ল দ্রষ্টাদেবীর কথাগুলো। তার মধ্যকার এই প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তিকে তিনিও তো অনুভব করেছিলেন!

সে কাতরভাবে বলল, "কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আমি তো একটা সামান্য মানুষ! পাশুপত কীভাবে...?"

লীনা বলল, "পাশুপত এক মহাশক্তির নাম মাত্র; সেই শক্তি আবির্ভূত হয়েছে তোমার আধারে। তাকে তুমি যে নামে খুশি ডাকতে পারো, কিন্তু সে আছে। সেই মহাশক্তি জেগে ওঠে বিশ্বজগৎ ধ্বংসের সময় হলে। আর সেই শক্তির অবস্থান তোমার ভেতরেই— উর্মির রক্তপদ্মরাগের মতো, সুতসোমের বজ্রমাণিকের মতো। প্রলয়ের অস্ত্র আর প্রলয়যোদ্ধা আলাদা নয়; প্রলয় ঘটানোর জন্যই তোমার জন্ম।"

অভী বলল, "প্রলয় ঘটানোর কোনো ইচ্ছাই যে আমার নেই।"

লীনা দুঃখের সঙ্গে হাসল। "তবু সে কাজ তোমাকে করতেই হবে; তোমার নিয়তি তোমাকে দিয়ে করাবে। যেভাবে তোমার হিমকুশলতাকে মুক্ত করেছ এতদিন, সেইভাবেই পাশুপতের বিধ্বংসী শক্তিকেও তুমি একদিন মুক্ত করবে। আর সুতসোম বা উর্মির মতো এই ভেতরের শক্তিকে মুক্তি দিলেই তোমার মৃত্যু।"

অভী বলল, "কীভাবে এই শক্তিকে মুক্তি দিতে হয়, আমি কিছু জানি না, লীনা। তুমি থামো, আমার ভয় করছে।"

লীনা বলে চলল, "শেষ নিশ্বাস দিয়ে যে কাজ করা যায়, তাতে অভাবনীয় মায়াশক্তি আসে, জানো তো? আমার মৃত্যু, উর্মির মৃত্যু, সুতসোমের মৃত্যু— সবগুলোতেই অদ্ভুত শক্তিশালী ঘটনা ঘটেছিল, কারণ আমাদের প্রত্যেকের শেষ নিশ্বাস জড়িয়ে ছিল আমাদের জীবনের শেষ কাজগুলোর সঙ্গে। তোমার ক্ষেত্রেও তোমার শেষ নিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ওই মহাশক্তি মুক্তি পাবে, ছড়িয়ে পড়বে জগতের ওপর।"

কেমন যেন গা-ছমছম করতে লাগল অভীর। লীনাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার মৃত্যুর মুহূর্তটা যেন ও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। এমন অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি।

যেন একটা ঘোরের মধ্যে বলে চলল লীনা, "তুমিই স্বয়ং পাশুপত, অভী। তুমিই ধ্বংস, তুমিই জীবজগতের মৃত্যুস্বরূপ। মায়াজগতের বিনাশ আসন্ন। তার

সেই বিনাশের অস্ত্রকে তোমার ত্রিরক্তসম্পন্ন শরীরের মধ্যে নিয়ে নিয়তির ইচ্ছায় তুমি জন্মেছ। নিয়তির ইচ্ছাতেই একে মুক্তি তোমাকে দিতেই হবে। আর তাতেই তোমার মৃত্যু ঘটবে। আমি স্পষ্ট দেখছি, সে-দিনের আর দেরি নেই।”

অত্যাঙ্কুল নীল আলোটা ম্লান হয়ে আসছে। লীনার ছবিটা যেন গলে মিশে যাচ্ছে সেই আলোর মধ্যে। অভী ব্যগ্রভাবে বলল, “লীনা, আর কি দেখা হবে না?”

লীনা বলল, “দেখা হবে, অভী। প্রলয়ের দিনে।”

অভী ভয়ে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। লীনার অবয়ব হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।



।। পঞ্চদশ অধ্যায় ।।

দানব রহস্য

সকালবেলা স্বর্ণশেখর আর মেঘবর্ণ বসে ছিল অনুশীলন মঞ্চে। তাদের সামনে বসে ছিল অভী, নিধি আর পর্বত। অভীর কাছে গতরাতের অভিজ্ঞতা শুনে সকলেই চমকে গেছে।

নিধি জানতে চাইছিল, তারা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছিল। অভী তাদের সবই বলেছে; লীনার দেখা পাওয়ার কথাও বলেছে। শুধু পাশুপত নিয়ে লীনা যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো সে বাদ দিয়ে গেছে। ওই ভয়ংকর তথ্য কাউকে বলার মতো অবস্থায় অভী এখনও নেই। নিধিকেও সে এই নিয়ে কিছু বলেনি।

স্বর্ণশেখর বলল, “ঐশিকদের নীলকান্তমণি নিজের কাছে রেখেছেন বলেই ঐশিকরা নিয়ামককে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।”

মেঘবর্ণ কী যেন চিন্তা করছিল। সে বলল, “তা ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি, লীনা তাহলে এখনও বেঁচে আছে। নীলকান্তমণির মধ্যে যে মানুষটা আবির্ভূত হয়েছিল, সে নিশ্চয়ই ভূত নয়। তাহলে লীনা গেল কোথায়? তাকে কি ঐশিকরা কোথাও বন্দি করে রেখেছেন?”

অভীও ভাবছিল সেই একই কথা। উর্মি বলেছিলেন, লীনাকে তিনি মৃতদের জগতে খুঁজে পাননি; তাঁর ধারণা ছিল, লীনার আত্মাটা বোধহয় চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কাল যাকে সে দেখল নীলকান্তমণির আলোর মধ্যে, সে তবে কে?

ঐশিকদের কোনো মায়াচাতুরি হতে পারে কি? কোনো ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিবিভ্রম? এ-কথা অভীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না। কাল যাকে সে দেখেছে, সে নিঃসন্দেহে আসল লীনা। কোনো মায়াবলেই লীনার কণ্ঠস্বরের ওই আন্তরিকতা নকল করা সম্ভব নয়।

পর্বত বলল, “আর একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। নীপা তো ঐশিকশ্রেষ্ঠের এই নীলকান্তমণি অনেকদিন নিজের কাছে রেখেছিল। কিন্তু সে তো কোনোদিন এর মায়াপ্রভাব বুঝতে পারেনি। তাহলে অভী পারল কী করে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “এর দুটো কারণ হতে পারে। এক, এতদিন ঐশিকরা ওটাকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন না, তাই নীপা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। দুই, ওই মণির মধ্যে পরিপূর্ণ ঐশিকমায়া আছে। খেয়াল করে দেখো, ঐশিকরক্ত আছে একমাত্র অভীর শরীরেই। তাই ওর স্পর্শ পেতেই মণিটা ওর কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটাই আমার বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে।”

অভী চুপ করে রইল। লীনাও কাল তাকে এই একই কথা বলেছে।

স্বর্ণশেখর বলল, “মেঘবর্ণ, কাল আমরা ছাদ থেকে নিচে নেমে যাওয়ার পর অধিনায়ককে লতার কথা বললে?”

মেঘবর্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। “বললাম। তিনি বললেন, তিনি ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। দরকার হলে পরে তিনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলবেন। তবে এরই মধ্যে তাঁর আদেশে ওর বাড়ির কাছাকাছি কয়েকজন সেনাকে গোপনে প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়েছে। অধিনায়কের ধারণা, আমরা যে লতার সঙ্গে দানবটার যোগাযোগের কথা জেনে গেছি, এটা জানতে পারলে ঐশিকরা কোনোভাবে ওর ওপর আক্রমণ করাতে পারেন। তাই এই অগ্রিম সতর্কতা।”

নিধি জানতে চাইল, “কাল আমরা ওখান থেকে চলে আসার পর নিয়ামকের কী হল? কখন জ্ঞান ফিরল তাঁর? অধিনায়কের কাছে আবার তিনি অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন নাকি?”

স্বর্ণশেখর হেসে বলল, “আজ ভোরেই আমি অসিতের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। সম্ভবত কাল তোমরা চলে আসার কিছুক্ষণ পরেই নিয়ামকের চেতনা ফিরেছিল। অসিত কার্যালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁকে নিজের আসনে দেখতে পেয়েছিল। তাকে এত ব্যাপার নিয়ামক কিছু জানাননি, আর অধিনায়কের কাছেও এই নিয়ে কোনো অভিযোগ আসেনি। অর্থাৎ, নিয়ামক মহোদয় কিল খেয়ে কিল চুরি করেছেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “তা ছাড়া, ওঁর অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। নিষিদ্ধ ঐশিকমায়াসম্পন্ন মণি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে উনি নিজেই আমাদের সবার

বিপদ ডেকে আনছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে অধিনায়কের কাছে অভিযোগ করতে গেলে উনি নিজেই বিপদে পড়বেন, সেইটুকু না বোঝার মতো বোকা নিয়ামক নন।”

বিশেষ কিছু না বলে অভী চুপ করে সবার কথা শুনছিল। কাল রাতে লীনাকে দেখার স্মৃতিটা তার মন থেকে যাচ্ছে না কিছুতেই।

কী জীর্ণ চেহারা হয়ে গেছে লীনার। দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন ভীষণ অসুস্থ। কোথায় রেখেছেন ওকে ঐশিকরা? ওর নশ্বর দেহটা তো এখনও রাখা আছে আয়তনে। তাহলে যাকে ও দেখল নীলকান্ত মণির আলোর মধ্যে, সে কে? দেহহীন লীনা কীভাবে দেখা দিল তাকে? আর তার সম্বন্ধে, পাশুপত সম্বন্ধে— এত কথা লীনা জানল কোথা থেকে?

সে বলেছিল, সে নাকি দাঁড়িয়ে আছে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায়। মানে কী এ-কথার? জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি বলে আদৌ কিছু হয় কি?

ওদের ওখানে রেখে উঠে পড়ল অভী। তার মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। একটু একা থাকতে ইচ্ছা করছে এখন।

তাকে উঠতে দেখে নিধি বলল, “কোথায় যাচ্ছ? আমি আসব?”

“না, থাক। তুমি বোসো, গল্প করো। আমি একটু ঘুরে আসছি।”

সে যে কোথায় যাচ্ছে, তা সে নিধিকেও জানতে দিতে চায় না।

মাঠ পেরিয়ে আয়তনে এসে ঢুকল সে। অধিনায়ক বজ্রধর সংগ্রহশালায় আছেন, কক্ষটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখতে পেল। সম্মেলন কক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সেদিকে না গিয়ে সে চুপচাপ চলল রক্ষোবৈদ্যের সেবাকক্ষে।

রক্ষোবৈদ্য তখন নিবিষ্ট মনে বেশ কিছু শিশির তরল একটা কাচের পাত্রে পরিমাণমত ঢেলে নতুন ওষুধ তৈরি করছিলেন। অভী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, ভেতরে আসব?”

মুখ তুলে তাকে দেখে একটু অবাক হলেন রক্ষোবৈদ্য। “আরে, অভী যে! এসো, এসো।”

কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল অভী। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কী ব্যাপার? শরীর খারাপ নাকি? চোখ-মুখ ভীষণ শুকনো দেখছি যে। রাতে ঘুম হয়নি?”

অভীর মনে হচ্ছিল, ঐকে সব কথা খুলে বলা যেতে পারে। কিন্তু তা-ও সে চুপ করে রইল। রক্ষোবৈদ্য এগিয়ে এসে কপালে হাত রাখলেন। “নাহ্, জ্বর নেই। কিন্তু চোখগুলো লাল হয়ে আছে। ঠান্ডা লাগালে নাকি?”

অভী বলল, “না, শরীর মোটামুটি ঠিকই আছে। রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, একটি অনুরোধ আছে।”

“বলো।”

“আর একবার লীনাকে দেখা যাবে?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কেন আর নিজের যন্ত্রণা বাড়াচ্ছ, অভী? যে গেছে, তাকে যেতে দাও। মৃতকে আর পিছু ডেকে লাভ আছে কিছু?”

অভী এইবার বলল, “লীনা বোধহয় মারা যায়নি, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।”

ভীষণ চমকে উঠে তিনি বললেন, “তার মানে? মারা যায়নি তো কোথায় সে? ওই যে মৃতদেহ শুয়ে আছে, ও তবে কার?”

অভী বলল, “ওই দেহ লীনার-ই। কিন্তু ও নিজের হৃদয়শরের মাধ্যমে নিজের হৃদয় বিসর্জন দিয়েছিল স্বেচ্ছায়। আমরা যখন সে-বার ওর ছোড়া তিরটা খুঁজে আনলাম আকাশলোক থেকে, তখন তার মধ্যে ওর হৃদয়টা ছিল না। সেটা গেল কোথায়? তারপর কাল আমি ওকে দেখেছি, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়; ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলেছে, ও নাকি জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় আছে। এর মানে কী, বলতে পারবেন আমাকে?”

রক্ষোবৈদ্য তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, “হৃদয়শর মায়া প্রয়োগ করলে ঠিক কী হয়, কেউ জানে না। ওই নিষ্কিণ্ত তিরের সঙ্গে যোদ্ধার হৃদয় তার শরীর ছেড়ে চলে যায়, এইটুকু শুধু সবাই জানে। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে দিতে পারছি না, অভী। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি কোনো অবস্থার কথা আমি অন্তত শুনি নি কখনও।”

অভী বলল, “ওর হৃদয়টা যদি পাওয়া যায়, তাহলে কি এখনও ওকে বাঁচানো যাবে?”

রক্ষোবৈদ্য তার পিঠে সন্নেহে হাত রাখলেন। “প্রিয় মানুষের মৃত্যুর ব্যথা আমাদের সকলকেই কখনও না কখনও পেতে হয়। কিন্তু তুমি পাগলামি করো না, অভী। যে কথা তুমি বলছ, বাস্তবে সেরকম হয়নি কখনও।”

অভী বলল, “হয়নি, কিন্তু যদি হৃদয়টা পাওয়া যায়, এ কাজ করা সম্ভব কি? দরকার পড়লে আমি আবার আকাশলোকে যাব; চন্দ্রহাস নিয়ে ঐশিকদের আক্রমণ করব। ওঁদের কাছে যদি হৃদয়টা থাকে, যেভাবেই হোক কেড়ে আনব। আপনি শুধু বলুন, এ জিনিস সম্ভব কি না।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আবার বলছি, পাগলামি করো না। ঐশিকদের ওখানে তুমি চন্দ্রহাস নিয়ে গেলেও ওঁদের হারাতে পারবে না; উলটে ওঁরা তোমাকে বন্দি করলে অধিনায়ক বজ্রধর-সহ আমরা সবাই বিপদে পড়ে যাব। হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ো না একদম। তবে হ্যাঁ, লীনার হৃদয় যদি এখনও অক্ষত থাকে, এবং সেটি যদি উদ্ধার করে আনতে পারো, তাহলে একবার রক্তপদ্মরাগ ব্যবহার করে শেষ চেষ্টা করে দেখব আমি। তবে তাতে ফল আদৌ কিছু হবে কি না, তা বলতে পারি না।”

চুপ করে রইল অভী বেশ কিছুক্ষণ; তারপর বলল, “একবার ওকে দেখব?”

রক্ষোবৈদ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বেশ। যাও।”

পাশের কক্ষে মর্মরবেদিতে আগের মতোই শুয়ে আছে লীনার নিখর দেহ। অভী এসে দাঁড়াল তার পাশে।

মৃতদেহের আঙুলগুলো স্পর্শ করল সে। বরফের মতো ঠান্ডা!

তার যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না, লীনাকে সে সত্যি সত্যি দেখল কাল ওই নীলকান্তমণির আলোকে।

ফিসফিস করে সে বলল, “লীনা! কোথায় আছ তুমি? সত্যিই কি কোথাও আছ?”

লীনার মৃতদেহ পড়ে রইল পূর্ববৎ। আরও কিছুক্ষণ তার শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে রইল অভী; তাকিয়ে রইল অসাড় মুখটার দিকে। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

রক্ষোবৈদ্য শঙ্কিতমুখে বললেন, “অভী, আমাকে কথা দাও, আকাশলোকে যাবে না তুমি।”

অভী ম্লান হেসে বলল, “না, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, যাব না আমি ওখানে। কথা দিলাম।”

বেরিয়ে আসছিল সে সেবাকক্ষ থেকে, রক্ষোবৈদ্য পেছন থেকে ডাকলেন, “কোথায় যাচ্ছ?”

অভী বলল, “কোথাও না। এই আয়তনেই একটু ঘোরাফেরা করছি। একবার গ্রন্থাগারে যাব ভাবছি।”

আর কিছু বললেন না রক্ষোবৈদ্য। অভী চলে এল ওখান থেকে।

একটু একা থাকতে চাইছিল সে। লীনার স্মৃতি, তার পাশুপত-সত্তার সংবাদ— সব মিলিয়ে মনটা ভীষণ অস্থির হয়ে আছে।

গ্রন্থাগারে সে খুব একটা আসে না। কিন্তু আজ মনে হল, ওখানেই যেন সবার থেকে কিছুটা আড়াল পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাগার ফাঁকাই ছিল। সেখানে গিয়ে মায়াযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি পুথি বেছে নিয়ে পড়তে শুরু করল সে। পড়ায় যে খুব একটা মন বসছে, তা নয়। তবু কারও মুখের সামনে থাকতে হচ্ছে না, এই ঢের।

সে ভাবতে লাগল লীনার কথাগুলো। দ্রষ্টাদেবীর ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে লীনার কথা। সত্যিই কি সব ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই তার জন্ম?

অভী ভাবতে লাগল, ‘তাহলে আমি কী? পাশুপতের মতো বিধ্বংসী অস্ত্রের শক্তি আমার মধ্যে আছে বলে কি আমি একটা সম্পূর্ণ মানুষ নই? আমার কি কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই? আমি যদি না চাই, তবুও কি নিয়তি আমাকে দিয়ে ধ্বংসের কাজ করিয়ে নেবে?’

একটা পাহাড়প্রমাণ ঘৃণার স্রোত পাকিয়ে উঠছে তার অন্তরে, অভী বুঝতে পারল। তার দু’হাত অস্বাভাবিক ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। কার ওপর এই ঘৃণা? তার মনে হল, সারা জগৎ সংসারের ওপর এই ঘৃণাহিমের স্রোত তার ভেতর থেকে মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। পৃথিবীতে যেন কেউ তার যন্ত্রণা বুঝতে পারছে না। কেউ বুঝতে পারছে না সে কতখানি একা— কতখানি জ্বালা বুকে নিয়ে সে ঘুরছে। অভীর মনে হল, প্রচণ্ড একটা আবেগ যেন তার সর্বশরীর ফাটিয়ে তার মাথা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্ফোরণের মতো। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

“অভী! কী হল?”

ডাকটা শুনে বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল অভী। প্রবল শক্তিতে নিজের অন্তরের ঘৃণাকে সংবরণ করল সে। চোখে এখনও সে দেখতে পাচ্ছে না; অনুভবে বুঝতে পারল, কে যেন এসে বসল তার মুখের সামনে।

কণ্ঠস্বরটা প্রশ্ন করল, “চোখে কী হল তোমার?”

অভী বলল, “কী হয়েছে আমার চোখে?”

এতক্ষণ সে বোঝার চেষ্টা করছিল এই কণ্ঠস্বর কার। চেনা-চেনা লাগছিল, কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারছিল না। মৃদু হাসির শব্দটা শুনে এইবার সে চিনতে পারল। তার সামনে এসে বসেছেন মাল্যপর্বতের রাজা পুনর্বসু।

রাজা বললেন, “তোমার চোখের মণি কেমন যেন সাদাটে ধূসর হয়ে গিয়েছিল। এই এতক্ষণে দেখছি একটু একটু করে রং ফিরছে।”

সেই জগৎপ্লাবী ঘৃণার স্রোত মন থেকে সরে যাওয়ায় প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছিল অভী। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দৃষ্টি ফিরে এল তার চোখে। সে দেখল, রাজা বসে আছেন তার সামনে; তাঁর হাতে ধরা আছে একটি খাম। খামের ওপর সিলমোহরটা দেখা যাচ্ছে। মাল্যপর্বতের রাজার সিলমোহর!

সৌজন্য পাঠিয়েছে চিঠিটা!

রাজা পুনর্বসু বললেন, “জটায়ুটা তোমার কাছে আসতে চাইছিল, কারণ চিঠির খামের ওপর তোমার নাম লেখা আছে। আমি পাখিটাকে বললাম, আমি তোমাকে চিঠি দিয়ে দেব। বোকা পাখিটা তাতেই বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়ে চলে গেল। সাধারণত জটায়ুরা যার নামে চিঠি, তাকেই দিয়ে যায়। এই পাখিটা কেন এমন করল, কে জানে?”

অভী হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত থেকে চিঠিটা নিল। রাজা বললেন, “তোমার নামের চিঠি, তাই আমি খাম খুলিনি। কিন্তু সিলমোহর দেখেই বুঝেছি এটা কোথা থেকে এসেছে। সৌজন্য তোমাকে কী লিখেছে, জানার প্রচণ্ড কৌতূহলে আমি চলে এসেছি তোমার কাছে চিঠি নিয়ে। যদি অসুবিধা না থাকে, আমার সামনে পড়বে চিঠিটা?”

খাম খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অভী বলল, “শুনুন তাহলে।”

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে পড়তে শুরু করল।

অভী,

খুব গোপন কিছু সংবাদ দেওয়ার জন্য তোমাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি।

একটা বিষয়ে তোমার সাহায্য আমার দরকার।

গতবার তুমি এবং সমরোত্তম মেঘবর্গ যখন ধারাস্ত্রান মেঘনির্মাণশালা থেকে বিরাট একখণ্ড মেঘকে জমিয়ে এখান থেকে পালিয়েছিলে, তখন মরুময়ের আদেশে আমাদের সেনারা তোমাদের তির ছুড়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের নিবৃত্ত করেছিলাম, আশা করি ভুলে যাওনি। যদিও এই ঋণ তুমি চাইলেই অস্বীকার করতে পারো, তবু তুমি আমার কাছে ঋণী রয়ে গেছ, এটা সত্যি।

যদি সেই ঋণ শোধ করতে চাও, তাহলে একবার গোপনে মাল্যপর্বত এসো। গতবার ওই মেঘস্তুম্বের ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণদক্ষতা দেখেই বুঝেছিলাম, তোমার এই মায়াক্ষমতা আমার কাজে আসবে। তোমাকে সেদিন মরতে না দেওয়ার এটাও একটা কারণ। মরুময় আমার ওপর

নানাভাবে কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করছেন, এ-কথা হয়তো অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে তুমি ইতোমধ্যেই শুনেছ। এই কর্তৃত্ব আমাকে বাধা হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ দেশের সব মেঘ তথা জলের নিয়ন্ত্রণ ওঁর হাতে। রাজা পুনর্বসু কেন এতদিন ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন না, এইবার আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝাতে পারছি। তোমার শরীরে মরুময়ের মতোই ঐশিকমায়া আছে; তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহলে আমি মরুময়ের প্রভাব খর্ব করে মেঘগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই সাহায্য আমি বিনামূল্যে চাইছি না। তোমাদের পীতপত্রবনের গাছেদের যে মড়ক লেগেছে, তার পেছনে ঐশিকরা আছেন, তোমরা জানো। কোনো ওষুধেই ওদের রোগ সারবার নয়, যদি না বিপুল পরিমাণে জল বর্ষণ করে বনের মাটিকে আবার সরস করে তোলা যায়। আমি কথা দিচ্ছি, যদি মেঘনির্মাণশালার অধিকার আমার হাতে তুলে দিতে পারো, তাহলে তোমাদের অরণ্যকে বাঁচাতে যত জল দরকার, সব আমি মেঘরূপে তোমাকে উপহার দেব।

কাউকে এই মুহূর্তে এ-সব কথা জানিও না। যদি আসতে চাও, গোপনে এসো। মরুময়কে লুকিয়ে মেঘনির্মাণশালায় যদি ঢুকতে পারো, যত মেঘ দরকার সব তোমাকে দেব। একটাই শর্ত— শুধু ওই মেঘের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে তুলে দিতে হবে।

রাক্ষসরাজ সৌজন্য।

চিঠি শেষ করে অভী মুখ তুলে দেখল, রাজা পুনর্বসুর চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। তিনি বললেন, “কী করবে, অভী? যাবে ওখানে?”

অভী বলল, “বুঝতে পারছি না। এর আগে সৌজন্যের কিছু কথায় বিশ্বাস করে বিপদে পড়েছি আমরা। আবার ও যে গতবার আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছে, এটাও সত্য।”

রাজা বললেন, “সবসময় মনে রেখো, সৌজন্য তোমার কোনো ক্ষতি এই মুহূর্তে করবে না। নিজের স্বার্থ কীসে সুরক্ষিত হবে, তা ও ভীষণ ভালো বোঝে। মরুময়ের হাত থেকে নিজের ক্ষমতা উদ্ধার করতে তুমিই এখন ওর একমাত্র ভরসা। আর মরুময় যে কী ভয়ানকভাবে নিজের ইচ্ছা রাজার ওপর চাপিয়ে দেন, সে-কথা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?”

অভী ভাবছিল, পীতপত্রবনের গাছগুলোকে যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে সমরগরিমা চিরকালের মতো সুরক্ষিত থাকবে। ঐশিকদের অগ্নিদানব এতদিন ধরে গাছের গোড়াতে অগ্নিসিঞ্চন করে অরণ্যের উর্বর মাটির যে ক্ষতি করে এসেছে, সেই জায়গা থেকে আবার অরণ্যকে তার পুরোনো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া

যাবে। আর এটাও ঠিক, সৌজন্য চাইলে গতবারই তাকে মেয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু সে-ই তার এবং মেঘবর্ণের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

এই ঝুঁকিটা নেওয়াই বোধহয় উচিত হবে।

রাজা বললেন, “কী ভাবছ অভী? কী করবে?”

অভী মনস্থির করে বলল, “যাব।”

উত্তেজনাতে হাতে হাত ঘষলেন রাজা। “চমৎকার! তুমি তোমার মতো যাও। আমিও যাচ্ছি লুকিয়ে-লুকিয়ে।”

অভী বলল, “আপনি আর কী করতে যাবেন? মেঘনির্মাণশালায় প্রবেশ করতে গেলে প্রহরীদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বেধে যাওয়া অসম্ভব নয়। আপনি শুধু-শুধু বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন?”

রাজা বললেন, “যেতে তো আমাকে হবেই। ধরো, যদি সৌজন্য তার কথা না রাখে? যদি মরুময়ের আদেশে ধারাস্থানের রক্ষীরা কোনো ঝামেলা বাধায়?”

অভী বলল, “সে-রকম কিছু যদি হয়ও, আপনি কী-ই বা করবেন?”

রাজা গর্বিত স্বরে বললেন, “ওখানের পত্রতিলক রাক্ষসদের বেশিরভাগ এখনও আমাকেই মনে মনে রাজা বলে মানে। তুমি যদি ওখানে কোনো বিপদে পড়, আমি তোমাকে ঠিক উদ্ধার করে আনতে পারব। আমার কথা ওরা ফেলতে পারবে না। কখন যাবে?”

অভী বলল, “আজ দুপুরের পরেই যাব ভাবছি।”

রাজা বললেন, “বেশ, আমি তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়ি। মেঘনির্মাণশালায় কাছে গিয়ে লুকিয়ে তোমার আসার অপেক্ষা করব।”

উঠে দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। মায়াযুদ্ধ সংক্রান্ত পুথিটা নামিয়ে রেখে অভী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

সৌজন্যের চিঠি তাকে নতুন করে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আবার সবাইকে লুকিয়ে মাল্যপর্বতে গেলে সমরোত্তমরা নিঃসন্দেহে ত্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু না গেলে ওই অরণ্যের যে ক্ষতি দানবটা করে দিয়েছে, তাকে সারিয়ে তোলার আর কোনো উপায় নেই। অনুমতি নিয়ে যেতে চাইলে অধিনায়ক তাকে কিছুতেই ওখানে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। তা ছাড়া, এখনও যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, সৌজন্য এই মুহূর্তে সরাসরি সমরগরিমার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেতে রাজি নয়, যদিও মরুময়ের মনোভাব এর ঠিক উলটো। তিনি সমরগরিমার ক্ষতি চান— ঐশিকদের দলেরই তো একজন তিনি। তা ছাড়া, অধিনায়ক বজ্রধরের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা আছে। অভীর মনে হল, ওই লোকটার ক্ষমতা যদি মাল্যপর্বতের রাজনীতিতে হ্রাস করা যায়, তাহলে সমরগরিমা বেশ কিছুদিনের জন্য নিরাপদে থাকবে। সেটা সম্ভব হবে যদি ধারাস্থানের মেঘের নিয়ন্ত্রণ সৌজন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

ঐশিকদের কথা ভাবতেই দানবটার কথা আবার স্মৃতিতে ভেসে উঠল তার, আর সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল লতাকাঁকিমার কথা। অভীর মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল।

লতাকাকিমাকে লীনার কথাটা বলা উচিত হবে কি?

লীনার সঙ্গে যে তার কথা হয়েছে, এটা কি তাঁকে জানানো ঠিক হবে? লতাকাকিমা বিগত কিছুদিন ধরে যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি আর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি তার নেই। তবু...

তিনি লীনার মা; লীনাকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। পারলে লীনাও কি চাইত না একবার তার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে?

উঠে পড়ল অভী। মানুষটাকে এখন সে মনে-মনে যত অপছন্দই করুক, মাল্যপর্বত যাওয়ার আগে একবার কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যেতেই হবে তাকে। অভী ঠিক করল, লীনার কথাটা বলেই সে ওখান থেকে চলে আসবে।

গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এসে আয়তনের অলিন্দ দিয়ে আসতে আসতে সে ভাবছিল, ‘কাকিমা যখন শুনবেন লীনার চেনন অস্তিত্ব এখনও কোথাও অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তখন কী বলবেন তিনি?’

হঠাৎ তার মনে হল, ‘লীনার খবরের বিনিময়ে কাকিমা কি বলবেন সেদিন সন্ধ্যায় পীতপত্রবনে তাঁর সঙ্গে অন্য লোকটা কে ছিল?’

তার মন বলল, খুবই সম্ভব।

দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। আয়তন ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে মাঠের ওপর দিয়ে চলল মানবমন্দিরের দিকে। মাথার ওপরে সূর্যের তাপ বেশ বেড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে কপালের ঘাম মুছে নিল অভী।

মানবমন্দিরে লীনাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। অভী জানে, খুব একটা উষ্ণ অভ্যর্থনা ওখানে আর পাওয়া যাবে না। এগিয়ে যেতে-যেতে সে দেখল, বাড়িটা থেকে একটু দূরে দুটো লোক বসে আছে গাছতলায়। একটু অবাক হল সে। এই দুপুরের চড়া রোদে লোকগুলো এখানে বসে করছে কী?

তারপর তার মাথায় এল, এরা সম্ভবত অধিনায়ক বজ্রধরের পাঠানো সেনা, যদিও কারও পরনেই সেনাবাহিনীর পোশাক নেই। ঐশিকদের দিক থেকে লতার ওপর আক্রমণ হতে পারে, তাই এরা নজর রাখছে লতার বাড়ির ওপর।

লীনা বেঁচে থাকতে কতবার কত আনন্দ নিয়ে এসেছে ওরা এই বাড়িটাতে। আর আজ...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ির বন্ধ দরজায় করাঘাত করল অভী।

“কে?”— ভেতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

অভী বলল, “আমি অভী, কাকিমা। একবার দরজাটা খুলুন। জরুরি কথা আছে।”

কয়েক মুহূর্ত পরে শঙ্কিত চোখে দরজা খুলে মুখ বার করে চারপাশটা দেখে নিলেন লতাদেবী। অভীর সঙ্গে আর কেউ নেই দেখে একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে তিনি বললেন, “বলো, অভী, কী দরকার?”

অভী বলল, “বাইরে বলা নিরাপদ নয়, কাকিমা। ভেতরে আসব?”

আবার তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। ঢৌক গিলে তিনি বললেন, “আসবে? আচ্ছা, এসো।”

অভী ভেতরে ঢুকতেই তিনি দরজা লাগিয়ে দিলেন; বললেন, “বলো, কী বলবে।”

তার বাহুতে এখনও সেই সাদা কাপড়ের বন্ধনী জড়ানো আছে। মুখের ভাব ভীষণ করুণ; চোখের কোলে গভীর কালি পড়েছে। মানুষটার অসহায় মুখটা দেখে অভীর রাগের বদলে কেমন যেন করুণা হল।

সে বলল, “কাকিমা, আমি কাল লীনাকে দেখেছি।”

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধহয় এতখানি চমকে উঠতেন না লতাদেবী। বেশ কিছুক্ষণ তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না।

তারপর টলতে টলতে এসে খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন তিনি; স্থলিত স্বরে বললেন, “ক্-কোথায়?”

অভী বলল, “একটা মায়ামণির প্রতিফলনে। ও আমাকে বলেছে, ও আছে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি কোনো অবস্থায়।”

“আর কিছু বলেনি?”

“না।”

লীনা আর যেসব কথা তাকে বলেছিল, সেগুলো কাকিমাকে বলার প্রশ্নই ওঠে না।

লতাকাকিমা চোখ মুছলেন। “তোমরা সবাই আমাকে খুব খারাপ ভাবছ, না?”

অভী চুপ করে রইল। এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই শ্রেয়, সে জানে।

তিনি আবার বললেন, “মেঘবর্ণ তো আমাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে গেছে। আমি নাকি আয়তন-সহ গোটা সমরগরিমার সর্বনাশ করতে চাইছি। তোমারও কি তাই ধারণা, অভী?”

অভী এবারও কোনো উত্তর দিল না। লতাকাকিমা দুঃখিতভাবে হাসলেন। “তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমিও মেঘবর্ণের মতোই আমাকে বিশ্বাসঘাতক একটা মহিলা ভাবছ, শুধু সংকোচে আমার মুখের ওপর বলতে পারছ না।”

অভী বলল, “কাকিমা, আমি...”

“থাক, আমি ওতে কিছু মনে করিনি। যখন এই কাজে নেমেছিলাম, তখন কি আমি জানতাম না যে ফুলের মালা দিয়ে আমাকে বরণ করে নেওয়ার মতো কোনো কাজ আমি করছি না?”

অভী প্রশ্ন করল, “কিন্তু কেন আপনি করছেন এই কাজ? ঐশিকদের ওই প্রলয়ের অগ্নিদানবকে আশ্রয় দিয়ে আপনার কী লাভ?”

লতাকাকিমা বললেন, “কাউকে কোনোদিন এ-কথা বলতে পারব, ভাবিনি। কিন্তু তুমি এতদিনে লীনাকে দেখেছ, তার মুখ থেকে কিছু কথা নিজের কানে শুনেছ, তাই তোমাকে বলা যায়। কেন ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, জানো? কারণ আমি ছাড়া ওকে আশ্রয় দেওয়ার আর কেউ ছিল না। আমি ছাড়া আর কার কাছেই বা যাবে বেচারি?”

তীক্ষ্ণস্বরে অভী বলল, “মানে?”

চোখে আঁচল চাপা দিলেন লতাকা কিমা। “ওই দানবই লীনা, অভী। ওরই বুকের মধ্যে আছে আমার মেয়ের হারিয়ে যাওয়া হৃদয়।”

অভীর মনে হল তার চারপাশের জগৎ সংসার হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে শুরু করেছে।

নিজের মাথা দু’হাতে চেপে ধরল অভী। এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাবে সে।
লীনা...!

মানে নেই! কোনো কিছুই কোনো মানে নেই! প্রলয়ের যে দানবকে ঐশিকরা নির্মাণ করছেন, সে-ই লীনা! এ-সব কী অর্থহীন পাগলের প্রলাপ?

বহুক্ষণ সময় লাগল অভীর নিজেকে সামলাতে, কিন্তু অবশেষে মনকে শক্ত করল সে। বলল, “আপনি কী করে সন্ধান পেলেন ওর?”

লতাকা কিমা বললেন, “ও-ই একদিন এল আমার কাছে। নিয়ামক বিনীতেশ নিয়ে এসেছিলেন ওকে।”

“নিয়ামক বিনীতেশ!” অভী হাঁ করে রইল।

“ঐশিকদের আদেশে নিয়ামক বরাবর এই ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করেছেন। সেদিন সন্ধ্যায় তুমি যখন আমাকে পীতপত্রবনে লীনার সঙ্গে দেখেছিলেন, তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঐশিকরা নীপার নীলকান্তমণির প্রভাবে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তুমি হয়তো জানো না।”

আচ্ছা, সেই রহস্যময় ব্যক্তি তাহলে নিয়ামক স্বয়ং! অভী বলল, “কিছুটা জানি। আপনি বলুন।”

“লীনা এসে আমাকে বলল, রক্ত ছাড়া ও বেঁচে থাকতে পারবে না। আমি তো মা; আমি কী করে আমার মেয়েটাকে মরে যেতে দেব? এখন সে যেমনই হোক, তাকে ঐশিকরা যত ভয়ংকর দানবের চেহারাই দিন, আসলে তো ও আমার মেয়ে-ই!”

“কিন্তু লীনাকেই কেন?”

লতাকা কিমা বললেন, “সে ওর চরিত্রের দৃঢ় সমরগরিমার জন্য। ঐশিকরা দানবটাকে তৈরি করার জন্য এমন এক অকুতোভয় যোদ্ধার হৃদয় চাইছিলেন, যে কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে না। লীনার হৃদয়শর মোচনের ঘটনা আকাশলোকে ঘটায় তাঁদের সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।”

অভী শুনতে লাগল স্থির হয়ে। লতাকা কিমা বলে চললেন, “ঐশিকরা লীনাকে ব্যবহার করে তোমাকে হত্যা করতে চান। ওই আগুন দিয়ে তৈরি দানবের বুকের মধ্যে আছে ঐশিকশ্রেষ্ঠের নীলকান্তমণির অর্ধেক অংশ; তার ভেতরেই এখনও ধুকপুক করছে লীনার হৃদয়। যতক্ষণ ওই দানবের দেহের মধ্যে হৃদয়টা আছে, ততক্ষণ লীনার চেতনা ওদের আঙা বাহী; তার মুক্তির কোনো উপায় নেই। যত দিন যাচ্ছে, তার দহনক্ষমতা তত বাড়ছে।”

একটা কথা মনে পড়ে গেল অভীর। আকাশলোকে দানবটাকে দেখে ফেরার পথে সৌজন্য তাদের বলেছিল, ওকে রক্ত দিতে চায়, এমন লোকের অভাব নেই। সে বলল, “লীনা আপনারই রক্ত পান করছে, না?”

লতাকাকিমা লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। “আর কী বলি তোমাকে? ও এসে আমাকে বলল, মানুষের রক্ত ছাড়া ওর দানবদেহ বাঁচবে না, আর ওই দেহটা মরে গেলে তার ভেতরে ওর হৃদয়টাও মরে যাবে। আমার কী করার ছিল, বলো অভী? আমার মেয়ের চেতনাটা যে অন্য একটা বীভৎস শরীরের মধ্যে হলেও বেঁচে আছে, এই পাওয়াটুকু আমি ছাড়তে পারিনি। ও মাঝামাঝি এসে নিয়ামকের কার্যালয়ে লুকিয়ে থাকত, আবার কখনও আমিই ওকে লুকিয়ে রাখতাম এই ঘরে কিছুক্ষণের জন্য। ও এসে আমার হাত কামড়ে রক্ত খেয়ে যেত।”

দৃশ্যটা ভাবতেই অভীর গা গুলিয়ে উঠল। তার মুখের বিকৃতি দেখে লতাকাকিমা বললেন, “না, অভী; লীনা যখন এইসব করে, তখন ওর মধ্যে মানুষ-লীনার চেতনা কাজ করে না; ও তখন পুরোপুরি একটা হিংস্র দানব হয়ে যায়। কিন্তু পেট ভরলেই ওর মধ্যে আবার মানুষের সত্তাটা জেগে ওঠে। তখন ও-ও কাঁদে, আমিও কাঁদি। কী করব বলো? আয়তনের কাউকে তো আর বলতে পারি না আসল কথাটা। জানতে পারলেই ওরা আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইবে। মেঘবর্ণকেও আমি এ-সব খুলে বলতে পারিনি; তাই সে-ও ভুল বুঝেছে আমাকে। কিন্তু তাকে এ-সব বলা মানে একজন সমরোত্তম হিসাবে অধিনায়ক বজ্রধরকে এগুলো জানাতে সে বাধ্য থাকবে। এই ভয়ংকর দ্বিধায় ওকে ফেলতে চাইনি আমি, বিশ্বাস করো। নিয়তি আমার মতো নির্বিरोধ মানুষের কপালে এত যন্ত্রণা কেন রেখেছেন, তিনিই জানেন।”

অভী বলল, “ওই দানবের মধ্যে মানুষের, মানে লীনার চেতনা আছে এখনও?”

লতাকাকিমা বললেন, “আছে। সে সব বোঝে, কিন্তু ঐশিকমায়ার প্রভাব তাকে প্রায়শই আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশ্বাস করো অভী, লীনার যে মানুষী সত্তা আছে ওর মধ্যে, সে চায় না তোমার কোনো ক্ষতি হোক। কিন্তু দানবটার মস্তিষ্ক ঐশিকদের নিয়ন্ত্রণে। তাকে ওঁরা যা আদেশ করবেন, সে আদেশ না মেনে ওর উপায় নেই।”

অভীর মনে পড়ল, স্বপ্ন-সরোবরে সে দেখেছিল, লীনার ছোড়া হৃদয়শরটা হাতে নিয়ে সৌজন্য ধূর্ত হাসি হাসছে। সে বলল, “সৌজন্য সব জানে, তা-ই না?”

“জানে। সে তো ঐশিকদেরই দলের লোক।”

অভী ভাবতে লাগল, এর পরেও সৌজন্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাল্যপর্বতে যাওয়া ঠিক হবে কি না। যে অরণ্যকে রক্ষা করার প্রলোভন দেখিয়ে সৌজন্য তাকে ডাকছে, সেই অরণ্যকে নষ্ট করার জন্য সৌজন্য নিজেও তো সমানভাবে দায়ী।

দু-মুখো সাপ একটা!

লতাকাকিমা আবার বললেন, “অভী, এখন আমি বুঝতে পারি, ঐশিকদের বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। আমার লীনা কোনোদিনই ফিরবে না; ওই

দানবদেহের কারাগার থেকে ওর আর এই জন্মে মুক্তি নেই। কিন্তু এই ভুলটা বুঝতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওই দানবের মধ্যে থেকেই ও ঐশিকদের আদেশে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। তার ফল মঙ্গলদায়ক হতেই পারে না। সেই শেষ যুদ্ধের আগে ওকে ব্যবহার করেই বনের গাছগুলোকে ওরা ধ্বংস করে দিতে চাইছে। ওরা চাইছে ওকে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে প্রলয় ঘটাতে। আর প্রলয় এলে কেউ কি বেঁচে থাকবে? ওই দানবের পাথুরে বুকের মধ্যে অর্ধেক নীলকান্তমণির মায়ায় যত দৃঢ় সুরক্ষা-আবরণেই ঢাকা থাক ওর হৃদয়, প্রলয় এলে সবার আগে ওর দেহটাই ধ্বংস হবে, তা-ই না অভী? তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে তোমার দৈবী হিমকুশলতার সামনে কোনো আগুন কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে?”

অভীর মনে হল, কাকিমা ঘুরিয়ে জানতে চাইছেন, প্রলয়কালে সে নিজের হাতে লীনাকে হত্যা করবে কি না।

প্রশ্নটা এতটাই ভয়ংকর রকমের অস্বস্তিকর যে উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবই নয়। চুপ করে রইল সে।

লতাকাকিমা আস্তে আস্তে বললেন, “অভী, একটা কথা শুধু বলো। আমি কি ভুল করেছি? আমার জায়গায় থাকলে অন্য যে-কোনো মা-ই কি এই একই কাজ করত না?”

প্রজ্ঞার মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল অভীর। চূড়ান্ত প্রলোভনেও তাঁকে টলাতে পারেনি সৌজন্য।

অভী বলল, “কাকিমা, আপনি যা করেছেন, তা ঠিক না ভুল, বিচার করার আমি কেউ নই। এবার আমি উঠব। একটাই অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে যা যা বললেন, দয়া করে নিধিকেও এই কথাগুলো জানিয়ে দেবেন। লীনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল ও। এই সত্যটুকু জানার অধিকার আমার যতখানি আছে, ততখানি ওর-ও আছে।”

শঙ্কিত কণ্ঠে লতাকাকিমা বললেন, “ও কাউকে বলবে না তো?”

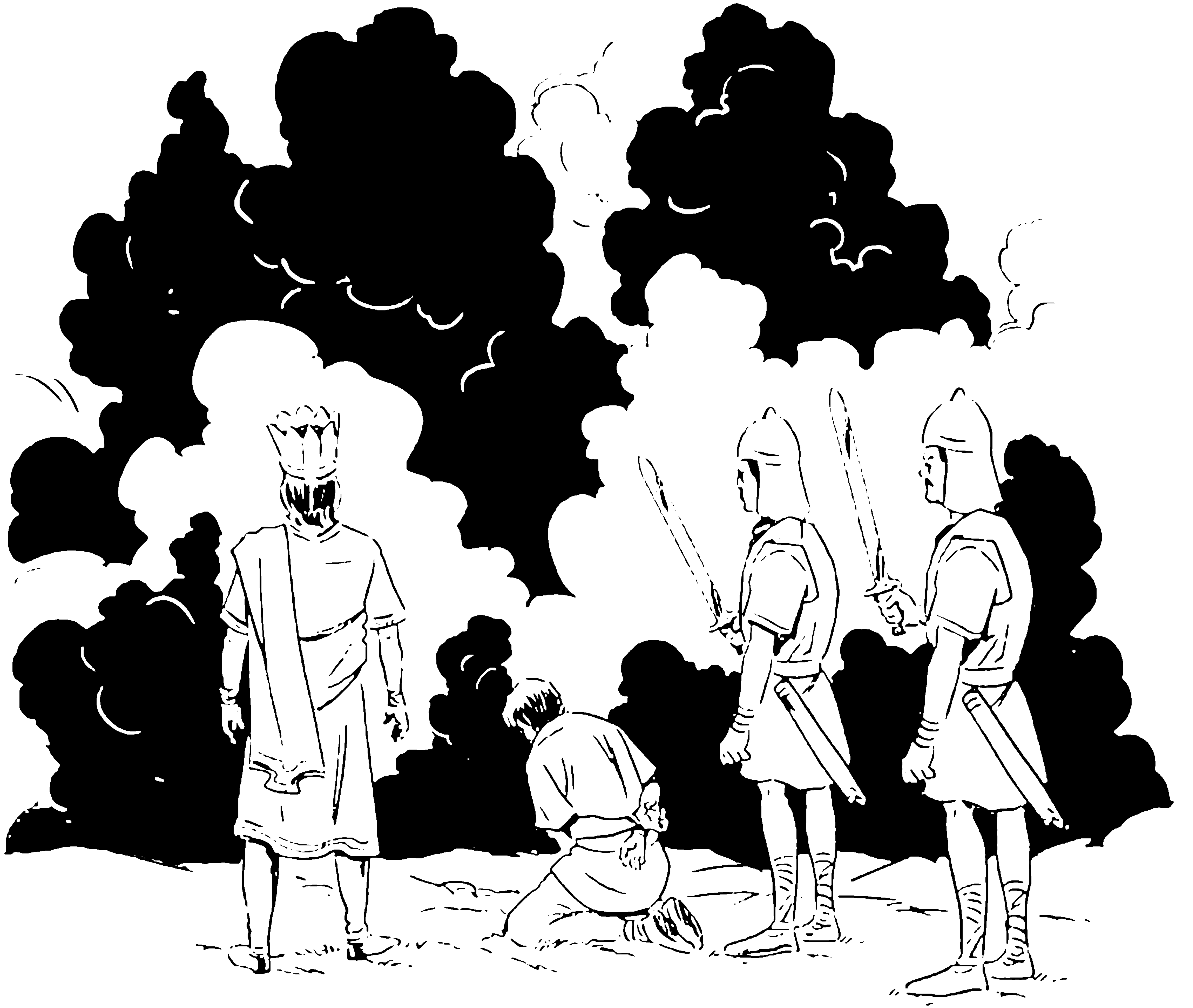
অভী ম্লান হাসল। “ওকে বলবেন, আমি বলেছি আমার সঙ্গে কথা না বলে ও যেন এ নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে। দেখবেন, তাহলে ও আর কাউকে কিছু বলবে না।”

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন লতা; চোখ মুছে বললেন, “বেশ, তা-ই হবে।”

অভী উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। দূরে সেই লোকদুটো এখনও দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়। অভী ফিরে চলল আয়তনের দিকে। তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে, বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হচ্ছে।

প্রলয় ঘটানোর জন্য ঐশিকরা নির্বাচন করেছেন যাকে সে ভালোবাসত, সেই মেয়েটিকেই।

এর চেয়ে ভয়ংকর প্রতিশোধ পৃথিবীতে আর কী-ই বা হতে পারে?



॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

মেঘমৃত্যু

রাজা পুনর্বসু বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে পড়েছেন আয়তন থেকে। অভীও চুপিচুপি চলল পীতপত্রবনের দিকে। আশা করা যায় এই দুপুরবেলা বনে কেউ থাকবে না। অপরাজিতাকে ডেকে নিয়ে ওখান থেকে যাত্রা করলে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম।

তার খিদে পাচ্ছিল, কিন্তু এখন মিত্রভবনে যাওয়া মানেই নিধি এবং মিত্রমাসির মুখোমুখি হওয়া। মিত্রমাসিকে যাহোক কিছু একটা বলে ভুল বুঝিয়ে দেওয়া গেলেও নিধিকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। আর সৌজন্যের আমন্ত্রণের চিঠির কথা শুনলে নিধি তাকে কোনোমতেই রক্ষোপুরী যেতে দেবে না।

পীতপত্রবনের মাঝামাঝি এসে যখন সে তার নীলশঙ্খ বাজিয়ে অপরাজিতাকে আহ্বান করল, তখন তার মনে হচ্ছিল, সে বোধহয় সত্যিই একটা ফাঁদে পা দিতে চলেছে। সৌজন্য যে আসলে কী প্রচণ্ড খল একজন রাক্ষস, সে কি জানে না? লীনার ব্যাপারটা হতভাগা গোড়া থেকে সব জানত। লীনার হৃদয়শর খুঁজে বার করে সে-ই ঐশিকদের দিয়েছিল তার মধ্য থেকে হৃদয় নিষ্কাশন করে

দানব-প্রস্তুতির জন্য। অভীর তথা সমরগরিমার বিরুদ্ধে এই পরিকল্পনার প্রধান অংশীদার সে। আকাশলোকে সে-ই তাদের ইচ্ছা করে নিয়ে গিয়ে দানবটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। দানবের অগ্নিমূর্তি দেখে চমকে গিয়ে অভীরা মগন গিরে আসছে, তখন মনে-মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়ই সৌজন্য।

বিরাট ডানা ঝাপটে পীতপত্রবনের গাছেদের মাথা হাওয়ার ধাক্কায় কাঁপিয়ে নেমে এল অপরাজিতা। অভী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “অপরাজিতা, একবার মাল্যপর্বত যেতে হবে যে।”

মাথা নাড়ল বিরাট পাখিটা। অভী উঠে পড়ল তার ওপর। অপরাজিতা ডানা মেলল শূন্যে।

নিচে মৃত দেবতার নদীর হলুদ স্রোত পেরিয়ে অভী আকাশপথে চলল মাল্যপর্বতের দিকে। মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে সে, মেঘনির্মাণশালার একেবারে সামনে সে নামবে না। ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে নেমে আগে রাজা পুনর্বসুকে খুঁজে বার করতে হবে। তিনি যদি তাঁর অনুগত প্রহরীদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মেঘনির্মাণশালার মধ্যে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। যদি তাকে প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়, তাহলে মরুময় সঙ্গে-সঙ্গে জানতে পেরে যাবেন। তখন সৌজন্য তাকে বাঁচাতে আসবে, সে সম্ভাবনা কম।

আপনমনে একটু হাসল অভী। প্রলয়ের মতো সর্বধ্বংসী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার আগে সে যদি মরেই যায়, তাহলে কি জগতের উপকারই হবে না?

মাল্যপর্বতে পৌঁছে ধারাস্রানের বেশ কিছুটা দূরে অপরাজিতার পিঠ থেকে নেমে এল অভী। এখান থেকে মেঘনির্মাণশালার প্রধান ফটক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এত দূর থেকে খুব ছোট লাগছে সেটাকে। অভী একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল। নাঃ, রাজা পুনর্বসুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা কী? তাঁর তো অনেকক্ষণ আগেই এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। তিনি প্রহরীদের বুঝিয়ে অভীকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবেন, এমনটাই কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। গেলেন কোথায় তিনি?

অপরাজিতাকে বিদায় দিয়ে অভী আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু রাজার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

অবশেষে অধৈর্য হয়ে অভী এগিয়ে চলল ধারাস্রানের মূল প্রবেশপথের দিকে। তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অভী ভাবতে লাগল, চন্দ্রহাস নিয়ে আক্রমণ করলে এরা তার সামনে তিন মুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু তার আগেই যদি এরা ওই বিশাল বিপদঘণ্টাটা বাজিয়ে দেয়, তাহলে যে বিপুল রাক্ষসসেনা ছুটে আসবে, তার মুখোমুখি হওয়া তার একার পক্ষে সম্ভব নয়।

তার চেয়ে রাজা পুনর্বসুর সেই অনুগত রাক্ষস প্রহরী— কী যেন নাম— সৃশোভনকে একবার অনুরোধ করে দেখলে ভালো হয় না কি? গতবার প্রাক্তন রাজার নির্দেশ অমান্য করতে পারেনি সেই বিশ্বস্ত পত্রতিলক রাক্ষস।

অভী দেখল, সুশোভন আছে ওই তিনজনের মধ্যে। একটু নিশ্চিত হওয়া গেল।
তাকে আসতে দেখেই প্রহরীরা অস্ত্র উদ্যত করল। তারপর সে কাছে আসতে
তাকে চিনতে পেরে প্রধান প্রহরী সুশোভন বলল, “প্রলয়যোদ্ধা, তোমার প্রতীক্ষাই
করছিলাম আমরা।”

অভী একটু অবাক হয়ে বলল, “তোমরা জানতে আমি আসব? সৌজন্য বলে
রেখেছে তোমাদের?”

সুশোভন বলল, “না, মহারাজ সৌজন্য কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি তোমার
সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী।”

অভী বলল, “কোথায় তিনি?”

সুশোভন বাঁকা হাসি হাসল। “তিনি আছেন মেঘনির্মাণশালার মধ্যে। তুমি
এলে তোমাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছেন। এসো।”

তার মুখের ভঙ্গিটা অভীর ভালো লাগল না। তবু সে চলল প্রধান প্রহরীর
সঙ্গে। বাকি দু’জন প্রহরী ফটক উন্মুক্ত করে দিল। তারা প্রবেশ করল ভেতরে।

মেঘনির্মাণশালার চত্বরে বিরাট-বিরাট আকাশছোঁয়া মেঘস্তম্ভগুলোর সামনে
দাঁড়িয়ে ছিল সৌজন্য। তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে আর একজন লোক—
তার দু’হাত পেছনে বাঁধা। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখেই চমকে উঠল অভী।

মহারাজ পুনর্বসু!

ধরা পড়ে গেছেন তিনি!

অভীকে দেখে প্রাণখোলা হাসি হাসল সৌজন্য। “এসো এসো, অভী। এই
উপহারটি আগাম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।”

অভীর হাত চলে গেল তার কোমরে ঝোলানো চন্দ্রহাসের হাতলে। সৌজন্য
তা দেখেও উপেক্ষা করল। “চন্দ্রহাস বার করার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে
আমার যেমন চুক্তি হয়েছে, সেই অনুযায়ীই কাজ হবে। তুমি এই মুহূর্তে আমাদের
শত্রু নও। আজ আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য মাল্যপর্বতের ভূতপূর্ব রাজা স্বয়ং
উপস্থিত হয়েছেন।”

অভী তাকিয়ে রইল রাজা পুনর্বসুর দিকে। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন মাথা
নীচু করে; সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর শেষ মুহূর্ত আগত।

সৌজন্য হঠাৎ তার বাম হাত শূন্যে তুলল; সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে একটা
জাল এসে জড়িয়ে গেল অভীর সর্বাঙ্গে। বন্দি হয়ে ছটফট করতে লাগল সে;
চেষ্টা করতে লাগল বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু তার আগেই দুই শক্তিশালী
রাক্ষস মিলে তার দু’হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

সৌজন্য মিষ্টি হেসে বলল, “তোমার মহৎ হৃদয়কেই বেশি ভয় আমার,
অভী। তুমি জানো, এখন তুমি যদি চন্দ্রহাস নিয়ে পুনর্বসুকে বাঁচাতে যাও, তাহলে
তোমার-আমার এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হবেই। কিন্তু তা আমিও চাই না, আর
এই মুহূর্তে তোমার পীতপত্রবনের গাছেদের জন্যও সেটা মঙ্গলজনক হবে না।
তোমাকে অনুরোধ করছি, হিমকুশলতা প্রয়োগ করে বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার

চেপ্টা কোরো না। তাহলে তোমাকে কঠিন আঘাত করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকবে না।”

অভী অসহায়ভাবে পড়ে রইল জালবন্দি হয়ে। সে বুঝতে পারছে, তার ওপর কড়া নজর রাখছে সৌজন্যের সেনারা। বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার চেপ্টা করলেই ওরা তাকে আঘাত করবে। অন্তত জনা সাতেক সশস্ত্র রাক্ষস ঘিরে রেখেছে তাকে।

সৌজন্য ফিরল রাজা পুনর্বসুর দিকে। “যে জটায়ুর হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম, তাকে নির্দেশ দেওয়াই ছিল, অভীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও বস্তুটা যেন আপনার হাতেই দিয়ে আসে। আপনার স্বভাব আমি ভালো করেই জানি। আপনি এই লোভ সামলাতে পারবেন না, আমি জানতাম। এখানে সুশোভনকে আদেশ দিয়েই রেখেছিলাম, আপনি এলেই যেন উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানায় আপনাকে।”

রাজা কোনো উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু অভী চমকে গেল। এটা একটা ফাঁদ তো বটেই, কিন্তু সেই ফাঁদের প্রধান লক্ষ্য সে ছিল না, ছিলেন রাজা পুনর্বসু। তাকে ব্যবহার করেই সৌজন্য রাজাকে টেনে এনেছে এখানে।

এবার রাজা মুখ তুলে তাকালেন; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল প্রধান প্রহরী সুশোভনের ওপর। ধিক্কারের সুরে তিনি বললেন, “তুমি পত্রতিলকদের কলঙ্ক, সুশোভন!”

সুশোভন তাঁর তিরস্কারের উত্তরে কিছু না বলে চুপ করে রইল। সৌজন্য দাঁত বার করে হাসল। “আজ এই শেষবেলায় আপনার চোখ খুলল, পুনর্বসু। কী জানেন, পত্রতিলকদের বিশ্বস্ততাও বিক্রি হয়, শুধু উপযুক্ত দাম দিতে জানা চাই।”

রাজা তীব্রচোখে তাকালেন তার দিকে। “উপযুক্ত দামটা কী শুনি?”

সৌজন্য বলল, “আমাদের দেশে সবচেয়ে দামি জিনিস কী, আপনি জানেন না? জল, জল! আপনার প্রাণের বিনিময়ে ও আজীবন পাবে অফুরন্ত জল। ও বুদ্ধিমান; খুব তাড়াতাড়ি ও বুঝে নিয়েছে, আপনার বিশ্বস্ততার চেয়ে সারা জীবনের তৃষ্ণানিবৃত্তির দাম অনেক বেশি।”

সৌজন্য যে কী প্রচণ্ড ধূর্ত, অভী এইবার বুঝতে পারছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পত্রতিলকদের রাজাকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিয়ে নিজের সিংহাসন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করার আয়োজন করে ফেলেছে ও। রাজা পুনর্বসু পথ থেকে সরে গেলে সিংহাসনে বসার মতো রাজবংশের আর কেউ থাকছে না। ভবিষ্যতে পত্রতিলক জাতির কারও রাজা হওয়ার সম্ভাবনাটিকেও এইভাবে নির্মূল করে দেওয়া যাবে।

সৌজন্যের চোখের ইঙ্গিতে এক সৈন্য এগিয়ে এল। তার হাতে ধরা আছে সোনার পানপাত্র।

তার হাত থেকে পানপাত্রটা নিয়ে সৌজন্য বাড়িয়ে দিল রাজার দিকে। “একদিন একই ভাবে আপনি আমার হাতে এই পানপাত্র তুলে দিয়েছিলেন, মনে আছে আপনার? আজ যাওয়ার আগে এইটুকু সম্মান আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, পুনর্বসু। এ যদি না গ্রহণ করেন, আমি উড্ডীনখর ডাকব।”

অভী জানে, ওটা বিষ। উর্মির কাছে একসময় শুনেছিল সে, মালাপর্বতের প্রথা অনুযায়ী পরাজিত রাজাকে বিজয়ী রাজা হাতে বিমের পাত্র তুলে দেন।

রাজা তাকালেন সৌজন্যের দিকে, তারপর একটু হাসলেন। বিমের পাত্র পাশে নামিয়ে রেখে গর্বিতভাবে বললেন, “তোমার দেওয়া মৃত্যুকে আমি অস্বীকার করি, সৌজন্য।”

সুশোভনের দিকে ফিরলেন তিনি। “তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমার ওপর আর আমার রাগ নেই, সৈনিক। কিন্তু তোমার মহারাজের শেষ অনুরোধ রক্ষা করো। আমাকে সম্মানের মৃত্যু দাও তুমি। তির নিষ্ক্ষেপ করে হত্যা করো আমাকে।”

সুশোভন অসহায়ভাবে তাকাল সৌজন্যের দিকে। তার আদেশ ছাড়া কিছু করার সাহস তার নেই।

সৌজন্য বলল, “বিষটা পান করে নিলেই ভালো করতেন আপনি; অনেক কম যন্ত্রণা নিয়ে মরতে পারতেন। সুশোভন আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। করলে ওর নিজের বিপদ ঘটবে, এইটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি ওর আছে। এবার আর কোনো উপায় রাখলেন না আপনি; ভয়ানক যন্ত্রণার মৃত্যুই বেছে নিলেন। তাই হোক তবে। মরুময়কে সংবাদ দিচ্ছি; তিনি এসে উড্ডীনখর আহ্বান করবেন।”

রাজা তার কথার উত্তর না দিয়ে তাকালেন অভীর দিকে। “তোমাদের অধিনায়ক বজ্রধর আর সমরোত্তম নীলাব্রকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো, অভী।”

অভী কী বলবে ভেবে না পেয়ে একটু মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” বলল। রাজা বললেন, “সৌজন্য, তোমার দেওয়া বিষ পান করতে আমি অস্বীকার করছি। মরুময়কে এখানে ডেকে আনতে সময় লাগবে, আমি জানি; তাই তুমি আমাকে উড্ডীনখর দিয়ে হত্যা করার আগে আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে ফেলব। আমিও উচ্চবংশজাত রাক্ষস, আশা করি ভুলে যাওনি। বহু কঠিন মায়াবিদ্যা আমারও করায়ত্ত। তুমি যদি পারো, আমাকে তির ছুড়ে হোক, তরবারি দিয়ে হোক, আটকে দেখাও। আর তোমাকে ভয় পাই না আমি। মৃত্যুর অধিক আর কী-ই বা এখন তুমি দেবে আমাকে?”

রাজা দু’হাত মেলে দিলেন সামনে; একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন বিড়বিড় করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর সামনে খুলে গেল নরকগহ্বরের মুখ; তার মধ্য থেকে উঠে আসা লেলিহান শিখা যেন এতদূর থেকেও অভীর মুখ ঝলসে দিল। সৌজন্য-সহ সব রাক্ষস-সেনা চমকে উঠল।

“তোমার দেওয়া মৃত্যুকে আমি ঘৃণা করি, সৌজন্য। আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, তোমার শেষ পরিণতি যেন আমার মতোই যন্ত্রণাদায়ক হয়।”

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নরকগহ্বরে লাফিয়ে পড়লেন রাজা পুনর্বসু। পরক্ষণেই তাঁর শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

অভী জানে, ওই গহ্বরের মধ্যে হিমকুশলতা ছাড়া কয়েক মুহূর্তও বেঁচে থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। চোখের পলকে ভস্ম হয়ে যাবেন রাজা।

নরকগহ্বরের মুখ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর সৌজন্য ফিরল অভীর দিকে। একটু হেসে সে বলল, “যাক, রাজা পুনর্বসু নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই চিরবিদায় নিয়েছেন, এতে আমি খুশি। অভী, এবার তোমার মায়াবিদ্যা প্রয়োগের সময় এসেছে।”

তার ইশারায় এক রাক্ষস সৈন্য এসে জাল কেটে অভীকে মুক্ত করে দিল; পেছনে বাঁধা হাতদুটোর বন্ধনও কেটে দেওয়া হল। দু’হাত সামনে এনে অভী কবজিতে হাত ঘষতে লাগল। কড়া বাঁধনের দাগ এরই মধ্যে যেন হাতের চামড়া কেটে বসে গেছে।

তার শুকনো মুখ দেখে সৌজন্য হেসে বলল, “আরে, কী হল? বুড়ো পুনর্বসুর জন্য মন খারাপ করছে নাকি? দ্যাখো, যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। রাজ্য হারিয়ে উনি এমনিতেই আধমরা হয়েছিলেন; আজ আমরা সেই আধখানা কাজকে পূর্ণতা দিলাম মাত্র।”

অভী বলল, “আমাকে এ-সবের বাইরে রাখো, সৌজন্য। আমি নিজে অকারণে কারও জীবন নেওয়া পছন্দ করি না, আর তোমাদের মাল্যপর্বতের রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই। তুমি আমাকে ব্যবহার করে রাজাকে এখানে টেনে এনেছ, এটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি।”

“তবু তুমি আজ আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছ। কী মহান তুমি— আমার চেয়েও মহান!”

সৌজন্যের ব্যঙ্গটা কানে লাগল অভীর। সে বলল, “লীনাকে অগ্নিদানবের রূপ দিতে ঐশিকদের সাহায্য করেছ তুমি; তাকে সমরগরিমায় অরণ্যের সর্বনাশ করতে পাঠিয়েছ তুমি। তুমি নিজেই গোপনে পীতপত্রবন ধ্বংস করতে চেয়েছ, আবার আমাকে সেই পীতপত্রবনের রোগ নিবারণের জন্য জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তোমার কাছে মহান হওয়ার শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। বরং যদি কোনোদিন শঠতা শেখার ইচ্ছা হয়, তোমার কাছে আসব!”

সৌজন্য একবার জ্র কুঁচকেই হা-হা করে হেসে উঠল। “আচ্ছা, লতাদেবী মুখ খুলেছেন, বুঝতে পারছি। যাকগে, এখন মঞ্চ প্রস্তুত; এখন সবাই সব জানলেও আর কিছুই যায় আসে না। অভী, তোমার সঙ্গে আমার যেমন চুক্তি হয়েছিল, তেমনটিই কিন্তু আছে। তুমি ওই মেঘগুলোকে মুক্তি দাও; ওদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমার হাতে তুলে দাও। তোমার শরীরে ঐশিকরক্ত আছে; মেঘগুলো তোমার আকর্ষণী মায়ায় সাড়া দেয়, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মরুময়কে ঠেকাতে এই মেঘকে নিয়ন্ত্রণ আমাকে করতেই হবে। বিনিময়ে আমি আমার কথা রাখব। তোমার যত ইচ্ছা, তত মেঘ তুমি নিয়ে যেতে পারো সমরগরিমায়।”

এতক্ষণ যে নিষ্ঠুর দৃশ্য সে চোখের সামনে ঘটতে দেখল, তারপর আর সৌজন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছা ছিল না অভীর। কিন্তু ওই মেঘস্তুম্বের জলটুকুই সমরগরিমার শেষ ভরসা। ওই জল না পেলে গাছগুলোকে বাঁচানো যাবে না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভী এগিয়ে গেল আকাশচুম্বী ধূসর মেঘস্তুম্বগুলোর দিকে।

মরুময়ের ঐশিকমায়ায় সারা মাল্যপর্বতের প্রায় সব জলাকে একত্র করে মেঘের রূপ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বিরাট স্তম্ভগুলো। এইগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তবে সে এদের অধিকার তুলে দিতে পারবে সৌজন্যের হাতে। বিপুলাকার থামগুলোর মধ্যে ধোঁয়ার মতো পাক খোয়ে উঠছে মেঘ; তাদের ভেতরে দেখা যাচ্ছে রূপোলি বজ্রের বিলিক। অভী সভয়ে ভাবছিল, এই অসম্ভব রকমের ব্যাণ্ড ও বিশাল মেঘগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার আদৌ আছে কি না।

তবু সে দু'হাত তুলে মায়া প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল তার সামনের মেঘস্তম্ভটার ওপর, এমন সময় পেছন থেকে তীক্ষ্ণস্বরে আদেশ এল, “অভী, থামো।”

চমকে উঠে ফিরে তাকাল সে। মরুময় এসে উপস্থিত হয়েছেন মেঘনির্মাণশালার ভেতরে।

খুঁড়িয়ে হাঁটা সেরে যাওয়ার পর থেকে মরুময় এখন অনেক দ্রুত চলাফেরা করেন। তাঁর হাতে উদ্যত ঋজু, দীর্ঘ তরবারি। অভী হাত নামিয়ে ফিরে দাঁড়াল তাঁর দিকে।

সৌজন্যও যে একটু চমকে গেছে, তাকে দেখে বুঝতে পারছে অভী। মরুময়কে এই মুহূর্তে এই জায়গায় আশা করেনি সে। সৌজন্য বলল, “মহামন্ত্রী মরুময়, আপনি এখানে?”

মরুময় ক্রুর হাসলেন। “সৌজন্য, তুমি বোধহয় ভাবো, আমি তোমার মনের কথা কিছু বুঝতে পারি না। মাল্যপর্বতে তোমার থেকে অনেক বেশি দিন আছি আমি; আমার চোখ-কান সর্বদা সর্বত্র খোলা থাকে। কেন তুমি অভীকে ডেকে পাঠিয়েছ, আমি কি জানি না? শুধু রাজা পুনর্বসুকে ফাঁদে ফেলে এখানে নিয়ে আসাই তো তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; তুমি মেঘগুলোর ওপরেও নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছ। ঠিক বলছি?”

সৌজন্য এক মুহূর্ত ভেবে নিল এবার তার কী করা উচিত। তারপর সে আক্রমণের বদলে আক্রমণের পথেই গেল। “ঠিকই বলছেন। আমি রাজা, তাই দেশের সব সম্পদের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতেই থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।”

মরুময় বললেন, “তোমার মনে করায় কিছুই যায় আসে না, এই সত্য তুমি যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে, ততই তোমার মঙ্গল। মেঘ নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ দুটিই বেশ কঠিন ঐশিকমায়া, কাজেই ও কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না কোনোদিনই। অতএব, যদি দেশে শান্তি রক্ষা করতে চাও, তাহলে আমি যেমন নির্দেশ দেব, তেমনটি মেনে চলো।”

সৌজন্য চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “ঐশিকমায়ার অধিকারী আমি নই, কিন্তু ঐশিকমায়ায় পারদর্শী একজন আমার পক্ষে আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।”

মরুময় ক্র তুলে অভীর দিকে তাকালেন। অভী সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল, “আমি মোটেই তোমার পক্ষে নেই, সৌজন্য। রাজা পুনর্বসু নরকগহ্বরে জীবন

দিয়েছেন তোমার শঠতার কারণেই। আমাদের ক্ষতি করেছ তুমি একটার পর একটা। তোমার পক্ষে আমি কোনোদিন ছিলাম না, কোনোদিন থাকবও না।”

মরুময় হাসলেন। “শুনে ভালো লাগল, অভী। সৌজন্য, এবার তুমি কী করবে? অভী তো পরিষ্কার জানিয়ে দিল তোমার সম্পর্কে তার মনোভাব। তাহলে ঐশিকমায়াসম্পন্ন একজন লোক তোমার পক্ষে না থাকলে মেঘগুলোকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করবে কী করে, মহামূর্খ?”

সৌজন্য দাঁতে দাঁত ঘষল। “এই কাজ করতে আপনি আমাকে বাধ্য করলেন, মহামন্ত্রী মরুময়। সেনারা, ওঁকে বন্দি করো এখনি!”

তার আদেশে সঙ্গে-সঙ্গে সাতজন সৈনিক উদ্যত তরবারি নিয়ে ঘিরে ধরল মরুময়কে। অভী চমকে উঠল। তার মনে হচ্ছে, সৌজন্য বোধহয় একটু বেশিই দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলল। মরুময় একজন ঐশিক; তাঁর প্রায়-অলৌকিক পর্যায়ে ক্ষমতার সামনে এই সামান্য রাক্ষস সৈনিকরা কতটুকুই বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে?

“সত্যিই বোধহয় তুমি ক্ষমতার লোভে উন্মাদ হয়ে গেছ, সৌজন্য!” হা হা করে হেসে উঠলেন মরুময়। “আমার সঙ্গে শত্রুতা করে তোমার ক্ষতি বই লাভ হবে না কখনও। আর আমার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমি পেরেও উঠবে না কোনোদিনই।”

সৌজন্য সে-কথার উত্তর না দিয়ে প্রহরী প্রধান সুশোভনের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল, “ওকে বন্দি করো।”

তরবারি উদ্যত করে মরুময়ের দিকে এগিয়ে গেল সুশোভন-সহ সাতজন সৈনিক। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মরুময় বললেন, “যেমন তোমার ইচ্ছা। তুমি যখন সংঘাতের পথই বেছে নিলে, তখন আমারও আর তোমার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা রইল না।”

অভী শুনেছিল, মরুময় একসময় ভয়ংকর যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁকে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে সে আগে কখনও দেখেনি। আজ তাঁর লড়াই দেখে তাক লেগে যাচ্ছিল তার।

ঝোড়ো হাওয়ার গতিতে তরবারি চালাচ্ছিলেন মরুময়। তরবারি-তরবারির সংঘর্ষে ছিটকে উঠতে লাগল আগুনের ফুলকি। একা হাতে সাতজন সৈনিককে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছিলেন তিনি। ওরা তাঁর দেহে অস্ত্রাঘাত করতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। অভীর মনে হল, এক মেঘবর্ণ ছাড়া আর কাউকে সে আজ পর্যন্ত তরবারি হাতে এইরকম ভয়ংকর যুদ্ধ করতে দেখেনি।

মরুময়ের অস্ত্রাঘাতে এক এক করে লুটিয়ে পড়ছিল রাক্ষস সেনারা। সব শেষে সুশোভনের বুকে নিজের তরবারি আমূল বিদ্ধ করে দিলেন তিনি; কাতর আর্তনাদ করে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রক্তাক্ত তরবারি তার বুক থেকে টেনে বার করে আনলেন মরুময়; তার দেহটা বার দুয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

অভী কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল লোকটার মৃতদেহের দিকে। আজীবন অফুরন্ত জল পাওয়ার লোভে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এ; সেই বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যটুকুও ভোগ করার সুযোগ হল না হতভাগ্যের।

মরুময় তার মৃতদেহের ওপরেই নিজের তরবারির ফলা মূছে নিয়ে অস্ত্রটাকে আবার কোষবদ্ধ করলেন। সৌজন্য তখন চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

সৌজন্য বললেন, “এবার কি তাহলে আপনি আমাকেও হত্যা করতে চান?”

মরুময় তার চোখে চোখ রেখে বললেন, “না, সৌজন্য। তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে, তাই তোমাকে এখনই হত্যা করতে পারলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু আমাদের ঐশিকদের অনেক বড়ো পরিকল্পনা আছে মায়াজগতকে নিয়ে, আর সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হবে। তাই এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করার কথা আমি ভাবছি না। এই সামান্য কয়েকটা রাক্ষসের প্রাণ নিলাম শুধু তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু মাল্যপর্বতের সব রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসের রাজা হলেও ঐশিকদের নিয়ন্ত্রক তুমি নও— এই কথাটা এবার তোমাকে কঠোরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে।”

সৌজন্য শুকনো খসখসে গলায় বলল, “কী করতে চাইছেন আপনি?”

“ক্ষমতার লোভ করতে-করতে তুমি আকাশ ছোঁয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছ। যে পবিত্র মেঘরাশিতে ঐশিকমায়ার অনধিকারী কোনো ব্যক্তির স্পর্শও নিষিদ্ধ, সেই মেঘকে তুমি নিজের কুক্ষিগত করতে চেয়েছ। যে মেঘে তোমার কোনো অধিকারই নেই, সেই মেঘ থেকে সমরগরিমার অরণ্যকে জলবিতরণ করতে চেয়েছ, যদিও তুমি জানো ওই অরণ্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে আমাদেরই আদেশে। সৌজন্য, যদি ওই মেঘ আর না থাকে, তোমার সিংহাসন থাকবে তো?”

অভী চমকে উঠল। এ কী বলছেন মরুময়?

সৌজন্যেরও মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে খুব ভালো করেই জানে, এই বিপুল পরিমাণ মেঘ থেকে সারা মাল্যপর্বতে জলের সরবরাহ হয়। এই মেঘ না থাকলে সারা দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে; দেশসুদ্ধ লোক জল না পেয়ে শুকিয়ে মরবে।

মরুময় এগিয়ে গেলেন ধারান্নানের গগনচুম্বী, ধূসর, বিরাট মেঘস্তম্ভগুলোর দিকে। অভী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

মেঘস্তম্ভগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দু’হাত আকাশে তুলে প্রচণ্ড শক্তিশালী মায়ার আঘাত করলেন মরুময়। সঙ্গে-সঙ্গে যে আকর্ষণী মায়াবলে ওই অকল্পনীয় পরিমাণ মেঘ অগুনতি স্তম্ভের আকারে স্থির হয়ে ছিল, সেই মায়া অপসারিত হল, আর তৎক্ষণাৎ সবক’টি মেঘস্তম্ভ ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে; আর তাদের চিহ্নমাত্রও রইল না কোথাও।

সৌজন্য যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। সারা দেশের সব মেঘ, সব জলের উৎসকে মরুময় ধ্বংস করে দিলেন।

“আর মেঘ বলতে কিছু রইল না, সৌজন্য। এবার দেখি তুমি কী করে প্রজা শাসন করো।”

চুপ করে রইল সৌজন্য। সে বুঝতে পারছে, মরুময় তাকে ঘোর বিপদে ফেলেছেন। অতীত মনে হল, সৌজন্যকে এতখানি চিন্তিত সে আগে কখনও দেখেনি।

মরুময় আবার ব্যঙ্গের সুরে বললেন, “রাজ্য চেয়েছিলে তুমি; রাজ্য পেয়েছ। একমাত্র যে শত্রু ছিল, সেই শত্রুকাঁটা একটু আগেই মরে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু এই শুকনো দেশের সিংহাসন তুমি উপভোগ করতে পারবে তো? জল ছাড়া ক’দিন বাঁচবে তোমার প্রজারা? আর কোনোদিন বৃষ্টি হবে না মাল্যপর্বতে। এই নিষ্ফলা ক্ষমতা নিয়ে কতদিন টিকবে তুমি, রাজা সৌজন্য?”

সৌজন্য কোনো কথা বলল না। বাঁকা হাসি হেসে মরুময় বললেন, “কিন্তু তোমাকে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে যাচ্ছি না। ঐশিকরা অনেকদিন তোমাকে বলেছেন, তুমি সিংহাসনে বসলে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাই তাঁদের। তুমি সে প্রতিজ্ঞা এখনও পালন করোনি।”

তাঁর এই কথাগুলোর মধ্যে কী যেন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পেল অতী। এদিকে তার শরীরের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি শুরু হয়েছে মেঘগুলো ধ্বংস হয়ে যেতেই। মনে হচ্ছে, তার বুকের মধ্য থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার শরীর ফাটিয়ে। নিজেকে অনেক চেষ্টায় সংযত করে মরুময়ের কথাগুলো শুনতে লাগল সে।

তার দিকেই ফিরে তাকালেন মরুময়; বললেন, “অতী, এবার তোমার খেলা শুরু হবে। দ্রষ্টাদেবীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে চলেছে। মাল্যপর্বতের নিজের জলের উৎস তো শেষ; তাহলে রাক্ষসরা জল পাবে কোথায়? সমরগরিমায় কিন্তু এখনও অনেক পানীয় জল আছে; পুকুর-দীঘিরও অভাব নেই ওখানে। তাহলে কি রাক্ষস বাহিনী তোমাদের ছেড়ে দেবে? ওই জলের দখল নিতেই সমরগরিমায় সশস্ত্র অভিযান করবে রাক্ষস-বাহিনী। রাক্ষস-সেনাকে উৎসাহিত করে তোলার চমৎকার একটা অজুহাত পাওয়া গেছে এতদিনে। তোমরা প্রস্তুত থেকো মহারাজ সৌজন্যের নেতৃত্বে আক্রমণকারী রাক্ষসসেনার জন্য।”

মরুময় যে এইভাবে প্ররোচনা দিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে সমরগরিমার যুদ্ধ লাগাতে চাইছেন, তা বুঝতে অতীত অসুবিধা হল না। মাল্যপর্বতের সব জল যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে রাক্ষসরা জলের জন্য সমরগরিমায় আক্রমণ করবেই। সৌজন্যের অনিচ্ছা থাকলেও জনমতের চাপে সে ‘না’ বলতে পারবে না।

ভয়ংকরভাবে তাদের দু’পক্ষকেই এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছেন ঐশিকরা, বুঝতে পারছে অতী। আর তার চেয়েও খারাপ বিষয় হল, একে আটকানোর জন্য তাদের আর কিছু করার নেই।

অতীত দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে মরুময় বললেন, “অতী, তোমার কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার আছে মনে হচ্ছে?”

অভীর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মাথা গরম করে লাভ নেই, সে বুঝে গেছে। সে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল, “এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?”

মরুময় আত্মতৃপ্ত ভাবে মাথা নাড়লেন। “না, নেই। আরও একটা সুসংবাদ দিয়ে রাখি। আমরা আকাশলোকে মায়া দিয়ে যে অগ্নিদানব তৈরি করার কাজ করছিলাম, তা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী যুদ্ধে সেই দানবকে যুদ্ধাঙ্গনে দেখাতে পারে, এই আশা করতেই পারো।”

অভী বুঝতে পারছে, ঐশিকদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় আবার তার হাত ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন মরুময় আত্মগর্বে আচ্ছন্ন অনেক ভেতরের খবর বলে ফেলছেন। এইসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে তাকে। সে বলল, “ওই দানবকে থামানোর কোনো উপায় আছে?”

মরুময় বললেন, “না, একমাত্র প্রলয়ের শক্তি ছাড়া ওই দানব অপ্রতিরোধ্য। যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের অগ্নিদানব যদি এসে সামনে দাঁড়ায়, তুমি ছাড়া তাকে হত্যা করার ক্ষমতা কারও নেই— এমনকি তোমাদের সমরোত্তমদেরও নেই। আজ মেঘগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ওই দানব আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ওই বিরাট আগুন-দানবকে তোমার প্রবল হিমকুশলতা দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু সে-কাজ করতে গেলেই তুমি মরবে। ওই দানবকে থামানোর মতো শক্তিশালী হিমকুশলতা প্রয়োগ করতে গেলেই তোমার অন্তরে যে বিপুল নরকবিষ আছে, তা বিস্ফোরিত হবে। আর তা হলেই প্রলয় এসে উপস্থিত হবে।”

অভী বলল, “জল ঢেলে নেভানো যাবে না ওই আগুন?”

মরুময় হেসে উঠলেন। “আজ এই ধারামানের মেঘগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ওই দানবের অফুরন্ত আগুনকে নেভানোর মতো পর্যাপ্ত জল আর গোটা মায়াজগতের কোথাও নেই। তার মায়া-অগ্নিকে পরাস্ত করতে গেলে আরও শক্তিশালী কোনো আগুন চাই— সর্বসৃষ্টিধ্বংসী পাশুপতের মতো আগুন। সেই আগুনে-আগুনে সংঘাত হলে প্রলয় অনিবার্য। আর অভী, তোমার সর্বসত্তা জুড়ে আছে ওই সর্বনাশী অস্ত্রের তেজ। তুমি যে মুহূর্তে দানবের বিরুদ্ধে পাশুপতের শক্তিকে তোমার অন্তর থেকে নির্গত করবে, সেই মুহূর্তেই তোমার মৃত্যু হবে।”

অভী দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে পারল, আজ মেঘগুলোকে ধ্বংস করে মরুময় প্রলয়ের আগমন নিশ্চিত করে দিলেন। সৌজন্যকে জলের জন্য রাক্ষসবাহিনী নিয়ে সমরগরিমা আক্রমণ করতেই হবে। আর সেই আক্রমণ হলেই ঐশিকরা যুদ্ধে নামাবেন লীনার অগ্নিদানবকে। সেই দানব ধ্বংসলীলা চালানো শুরু করলে তাকে বধ করার জন্য পাশুপতকে মুক্ত করা ছাড়া অভীর আর উপায় থাকবে না।

নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে তার অন্তিম মুহূর্ত যে অতি দ্রুত গতিতে কাছে এগিয়ে আসছে, সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল।

তাকিয়ে দেখল সে মেঘস্তম্ভগুলো এতদিন যেখানে থাকত, সেইদিকে। ধূসর স্তম্ভগুলোর সুউচ্চ চূড়া এই একটু আগেও ঢেকে রেখেছিল আকাশটাকে। এখন যেন আকাশের দৃশ্যটাকে কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগছে।

ওপরের দিকে মুখ তুলতেই হঠাৎ চমকে উঠল অভী।

বর্ষার মেঘগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু কোথা থেকে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে বিকট আকৃতির লাল রঙের মেঘের দল। সুতসোমের মৃত্যুর সময় এইরকম মেঘ দেখেছিল সে মাল্যপর্বতের আকাশে।

অভীর মনে পড়ল, রাক্ষসেরা বিশ্বাস করে, এগুলো ধ্বংসের মেঘ— অতি অশুভ লক্ষণ।

পুঞ্জ-পুঞ্জ দানবাকার লাল মেঘ ঢেকে ফেলছে তাদের মাথার ওপরটা; বিকেলের নীল রংটাকে যেন গিলে খাচ্ছে ওরা; সারা আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে রক্তের মতো। স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।



।। সপ্তদশ অধ্যায় ।।

মহাসর্পিণীর বিষ

অভী দেখছিল, লীনার দেহ থেকে ধোঁয়া উঠছে; তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল, ঠোঁটের পাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তার সুন্দর মুখটা বেঁকে গেছে যন্ত্রণায়। কাতরস্বরে সে বলছে, “অভী, আর পারছি না আমি; এই জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি বাঁচাও আমাকে!”

অভী কোনো উত্তর দিতে পারল না। সে জানে, লীনার চেতনা এখন বন্দি হয়ে আছে ঐশিকদের অগ্নিময় ধ্বংসদানবের মধ্যে। তাকে ব্যবহার করে ওঁরা সমরগরিমা তথা সমগ্র মায়াজগতের সর্বনাশ করতে চান।

সে চুপ করে আছে দেখে লীনা চোখ মুছে নিল। তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে অভীর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, “অভী, আমি যদি তোমার সামনে আসি, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে?”

অভী অসহায়ভাবে বলল, “আমি জানি না।”

কে যেন তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে তাকে; দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর তাকে ডাকছে, “অভী! অভী!”

ঘুম ভেঙে সে চমকে উঠে বসল। চোখের সামনে যেন চাপ-চাপ অন্ধকার জমে আছে। কয়েক মুহূর্ত তার সময় লাগল বাস্তবে ফিরতে।

সে বসে ছিল রক্ষোপুরীর সভাকক্ষের একটি গদি-আঁটা কাঠাসনে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সৌজন্য, তার পাশে আছেন সেনানায়িকা প্রজ্ঞা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে। মাল্যপর্বতে রাক্ষসদের প্রাসাদে ফিরে এসে সে ঢুকেছিল সভাকক্ষে। তাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে একটু আগে চলে গিয়েছিল সৌজন্য। বসে থাকতে থাকতেই অসম্ভব ক্লান্তিতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে নিজেই বুঝতে পারেনি।

তারপর ওই স্বপ্নটা... লীনা...!

অভী বুঝতে পারল, চোখের দৃষ্টি ভীষণ ঝাপসা লাগছে তার; প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে— কেবল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ব্যক্তির অবয়বটুকু অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে। সে বলল, “আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।”

সিংহাসনে না বসে তার মুখোমুখি একটা কাঠাসনে বসল সৌজন্য। প্রজ্ঞা বসলেন না; সৌজন্যের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

সৌজন্য বলল, “তোমার চোখের মণি সাদাটে ধূসর হয়ে আছে। তুমি যে দেখতে পাচ্ছ না, আমরাও বুঝতে পারছি। কী করে এমনটা হল, তুমি নিজে বুঝতে পারছ?”

অভী বলল, “হিমকুশলতা প্রয়োগ করতে গেলে ইদানীং এইরকম হচ্ছে। কিন্তু আমি তো ওই মায়া প্রয়োগ করিনি। মরুময়ের ওপর ঘৃণায় আমার হাত ঠান্ডা হয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।”

প্রজ্ঞা তার হাত স্পর্শ করে বললেন, “এখন কিন্তু তোমার হাত ঠান্ডা নয়— স্বাভাবিক উষ্ণতাই আছে।”

সৌজন্য বলল, “আমি বুঝেছি কী হয়েছে। হিমকুশলতার শক্তি তোমাকে ধীরে-ধীরে গ্রাস করছে। তোমার নিয়ন্ত্রণক্ষমতার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে ওটা। নরকবিষ নিজের শরীরে ধারণ করার পর এই ঘটনা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। মেঘনির্মাণশালায় যেসব দৃশ্য তুমি দেখেছ, তার পর তোমার মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগ জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক; সেজন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু নিজেকে যেহেতু হিমকুশলতা প্রয়োগ থেকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করেছ, তাই সাময়িকভাবে ওই প্রচণ্ড ঘৃণার শক্তি বেরিয়ে আসতে না পেরে তোমাকেই অন্ধ করে দিয়েছে।”

অভীর মনে হল, ঠিকই বলছে সৌজন্য। প্রলয় যদি না-ও আসে, তা-ও তার শরীরের মধ্যকার নরকবিষ তাকে এইভাবেই একদিন শেষ করে দেবে।

প্রজ্ঞা বললেন, “চিন্তা করো না, অভী। এই দৃষ্টিহীন অবস্থা কেটে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বরং ওই মায়া প্রয়োগ করোনি, ভালোই হয়েছে। হিমকুশলতা প্রয়োগ করলে তোমাকে অত্যধিক দুর্বল করে দিত ওটা।”

অভী চুপ করে রইল। রাক্ষসদের প্রাসাদে সে একা দৃষ্টিহীন অবস্থায় আছে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে জানে। সৌজন্য

এখন যেভাবেই হোক তাকে মরুময়ের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইবে। কাজেই সে তাকে সুরক্ষিত রাখবে যে-কোনো মূল্যে। আর প্রজ্ঞা অসম্ভব নীতিপরায়ণা নারী; কোনোভাবেই তার অসহায় অবস্থার সুযোগ তিনি নোবেন না, সে ভরসা তার আছে।

সৌজন্য একটু কেশে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে; নীচু গলায় বলল, “অভী, এবার তোমার সাহায্য চাই।”

অভী একটু রেগে গিয়ে বলল, “আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না! তুমি উর্মিকে মেরেছ, লীনার সর্বনাশ করেছ। নিধিকেও মারতে চেয়েছিলে, কিন্তু একটুর জন্য পারোনি। আজ রাজা পুনর্বসুকেও মেরে ফেললে। আমাকেও কি তুমি সে-বার দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে উর্মির সঙ্গেই শেষ করে দিতে চাওনি? এতকিছুর পরেও তুমি আমার সাহায্য চাইছ? না, সৌজন্য। তুমি আমার বন্ধু নও, কোনোদিন ছিলেও না, কখনও হবেও না। তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

সৌজন্য বলল, “রাজার আবার বন্ধু কী, অভী? রাজার শুধু শত্রু আর অশত্রু। রাজার বন্ধু কেউ হয় না, রাজা কাউকে বিশ্বাস করেন না। করলে তাঁকেই মরতে হবে। পুনর্বসুর পরিণতি দেখে শিক্ষা নিয়ো জীবনে।”

“নিয়েছি বইকি। সেই কারণেই আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি না। আমার কাছ থেকে সাহায্যের আশা করো কী করে তুমি?”

“কারণ, আমি দেওয়ায়-নেওয়ায় বিশ্বাসী। তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে, বিনিময়ে আমি তোমার একটা কাজ করে দেব। তাহলেই তো আর কোনো সমস্যা থাকছে না।”

“কী দেবে? আর তার বদলে কী চাও তুমি?”

“তোমাদের পীতপত্রবনের গাছগুলোর জন্য অটেল জল দেব, কথা দিয়েছিলাম। তা যে আর সম্ভব নয়, তুমিও বুঝতে পারছ। কিন্তু তার বদলে আমি তোমাকে ঐশিকদের খবর দেব। মরুময় প্রকাশ্যে আমার শত্রুতা করা শুরু করেছেন, অতএব ঐশিকদের প্রতি আমি খুব একটা ভরসা রাখছি না। এইটুকু অবশ্য আমার বিশ্বাস আছে, আমার সঙ্গে যেমন চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী ওঁরা কাজ করবেন— আমাকে ঐশিকত্ব প্রদান করবেন, কারণ এখনও রাক্ষস-বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আমার সাহায্য ওঁদের লাগবেই। কাজেই আমার কাছে আকাশলোকের ভেতরের খবর তুমি অনেক পাবে। এর বিনিময়ে আমি চাই তুমি হিমকুশলতা দিয়ে একটু একটু মেঘ করে তৈরি করা শুরু করো। তুমি নিজের শরীর থেকে অফুরন্ত বরফ তৈরি করতে পারো, আমি জানি। সেই বরফ থেকে জল হবে, জল থেকে মেঘ। অনেক সময় লাগবে, কিন্তু কাজটা নিতান্ত অসম্ভব নয়। ঐশিকত্ব লাভের পর নিজের নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত মেঘ পেয়ে গেলে ওই মরুময় আর বাকি ঐশিকগুলোকে হটিয়ে দিয়ে আমি আকাশলোকেরও রাজা হয়ে বসব। তখন ওই ভয়ানক উড্ডীনখরগুলো শুধু আমার কথাই শুনবে। আমার

ইচ্ছা আছে, ওদেরকে ওদেরই উড্ডীনখর দিয়ে খাওয়াব। আর তখন তোমার উপকারের প্রতিদান হিসাবে ওই মেঘ দিয়ে সমরগরিমার অরণ্যে প্রচুর বৃষ্টির ব্যবস্থাও আমিই করে দেব। হ্যাঁ, একদম বিনামূল্যে।”

অভী চমকে উঠল। সৌজন্যর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে এত মারাত্মক, সে ভাবতে পারেনি।

ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে, নয়তো অনেক বড়ো ঝামেলায় তাকে ফেলে দেবে সৌজন্য। অভী বলল, “পরে তুমি পীতপত্রবনে বৃষ্টি দেবে, সেই ভরসায় আমি এত বড়ো কাজে নামতে রাজি নই। এই মুহূর্তে আমাকে কী দিতে পারো তুমি?”

“ঐশিকরা ঠিক কী চাইছেন, তা তোমাকে এই মুহূর্তেই স্পষ্ট বলে দিতে পারি। তাঁরা ভীষণভাবে চাইছেন, একটা যুদ্ধ লাগাতে। আমিও তাতে অরাজি নই, অরাজি হওয়ার উপায়ও নেই আমার। সমরগরিমায় আমরা শীঘ্রই যাচ্ছি সেনা নিয়ে অতর্কিত অভিযান করতে, যদিও আমি জানি, বজ্রধর-সহ সব সমরোত্তমকে এই মুহূর্তে আমরা যুদ্ধে হারাতে পারব না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ঐশিকরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। ফলাফল যা-ই হোক, অবিলম্বে একটা যুদ্ধ চাই, অনেকগুলো প্রাণহানি চাই, নয়তো ঠিকমতো পুষ্টি হচ্ছে না ওঁদের। যুদ্ধ লাগলে বহু রাক্ষস মরবে, বহু মানুষ-অর্ধরাক্ষসও মরবে। কিন্তু তাতে কী? তাদের মৃত্যু ঐশিকদের জোগাবে বিশৃঙ্খলার শক্তি; তাঁদের পুষ্ট করবে। আমি যে ওঁদের প্রতি বিশ্বস্ত আছি, তা প্রমাণের জন্য আমাকে এই যুদ্ধে যেতেই হবে। ওঁরা আমাকে কথা দিয়েছেন, সমরগরিমায় সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলে ওঁরা সবার সামনে আমাকে ঐশিকপদে অভিষিক্ত করবেন। তার কিছু মায়া-অনুষ্ঠান আছে। বাহিনীর সামনেই সে-সব কাজ সম্পন্ন করে আমাকে ঐশিকত্ব দান করবেন ওঁরা।”

অভী তো প্রায় অন্ধ, কিন্তু সৌজন্যও দেখতে পেল না, কথাগুলো শুনে তার আড়ালে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন প্রজ্ঞা।

অভী বলল, “তার মানে তুমি বলতে চাইছ, তুমি আমার দেশ আক্রমণ করবে, আর সেইজন্য মেঘ তৈরি করে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে হবে আমাকে?”

সৌজন্য হেসে উঠল। “আহা, ব্যাপারটাকে ওইভাবে দেখছ কেন? রাক্ষসরা যুদ্ধে যাবে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে বলে আমার মনে হয় না। বলতে পারো, যুদ্ধে জেতার সুযোগ করে দিচ্ছি তোমাদের।”

অভী চুপ করে গেল। সৌজন্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর আগেও নিজেদের রাক্ষসসেনাকে নরকাগ্নিতে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল; তার বিবেকবোধের যে বিশেষ উন্নতি হয়নি, তা এই ভয়ংকর পরিকল্পনা শুনেই বোঝা যাচ্ছে।

সৌজন্য বলল, “সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, আপনার ওপর দায়িত্ব রইল আমাদের বাহিনীকে প্রস্তুত করার। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করব আমরা।”

প্রজ্ঞা বলল, “মহারাজ সৌজন্য, এই ব্যাপারে আমার একটি বক্তব্য আছে।”

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই অভী বুঝতে পারল, ভেতরে-ভেতরে রাগে ফুঁসছেন তিনি। সৌজন্য বলল, “বলুন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “মহারাজ, এই যুদ্ধ আর রাক্ষসদের যুদ্ধ নেই। আমি যেদিন থেকে সেনানায়িকার দায়িত্ব পেয়েছি, সেদিন থেকেই সর্বদা রাক্ষস-বাহিনীকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি; নিজের জাতির স্বার্থে কোনোদিন যুদ্ধ নিয়ে আপস করিনি—সিংহাসনে যিনিই থেকেছেন, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। আমার রূঢ়বাক্য ক্ষমা করবেন, মহারাজ; কিন্তু আজকের এই যুদ্ধ আর ‘রাক্ষসদের যুদ্ধ’ নয়; এ আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণের প্রচেষ্টামাত্র। যদি আদেশ করেন, একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব ঠিকই, কিন্তু এতে সেনাবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জানিয়ে এই মুহূর্ত থেকেই আমি সেনানায়িকা পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি।”

মাথা ঈষৎ নত করে নমস্কার জানিয়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অভী চমৎকৃত হয়ে গেল।

সৌজন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার প্রতি একটুও সহানুভূতি হচ্ছে না অভীর। সৌজন্য অতি বদ লোক; সমরগরিমা এবং মাল্যপর্বত দুই জায়গাতেই বহু দুষ্কৃতকার্যের জন্য সে ছাড়া কেউ দায়ী নয়।

অভী বলল, “সৌজন্য, যদি আমার সাহায্য চাও, তাহলে লীনার সঙ্গে তোমরা ঠিক কী করেছ, আমাকে খুলে বলো।”

সৌজন্য বলল, “বলছি, কিন্তু জেনে রাখো, লীনাকে আর রক্ষা করা তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়, অভী। ওর ওই হৃদয়শর আকাশলোকের অরণ্য থেকে খুঁজে এনে আমিই দিয়েছিলাম ঐশিকদের। তাঁরা ওই তিরের মধ্য থেকে মায়াবলে হৃদয়টা উদ্ধার করে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন বেশ কিছুদিন। তারপর দানবটাকে যখন তৈরি করা শুরু হল, তখন দেখা গেল ওটার দেহের তাপ এমন মারাত্মক যে ওর শরীরে যদি লীনার হৃদয়কে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে তা সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হতে দেওয়া যায় না। লীনার সত্তার একটা অংশ না থাকলে দানবটাকে ঐশিকরা নিজেদের আভ্যাত্মিক করতে পারছিলেন না। তখন আমার বুদ্ধিতেই নীপার কাছে ঐশিকশ্রেষ্ঠের যে নীলকান্তমণিটা ছিল, সেটার মধ্যে ওর হৃদয়কে ভরে দেওয়া হয়। ওই মণি অসম্ভব শক্তিশালী এবং দুর্ভেদ্য মায়ামণি— ওর মধ্যে কোনো বস্তুকে সংরক্ষিত রাখলে কোনো উত্তাপেই তাকে গলানো সম্ভব নয়। ওই মণির মধ্যে লীনার হৃদয় লুকিয়ে রেখে ঐশিকরা মণিটাকেই বসিয়ে দিলেন দানবটার বুকের মধ্যে; তার ওপর আর এক প্রস্থ সুরক্ষা হিসাবে পাথরের আবরণ দিয়ে দেওয়া হল তার বুকে, যাতে যুদ্ধের সময় মণিটা স্থানচ্যুত না হয়ে যায়।”

শুনতে-শুনতে রাগে অভীর দু’হাত আবার ঠান্ডা হয়ে আসতে চাইছিল। মেয়েটাকে কী ভয়ংকর কষ্ট দিয়েছে ওরা! মৃত্যুর পরেও শান্তি দেয়নি তাকে।

সৌজন্য বলে চলল, “দানবটাকে যখন প্রথম তৈরি করা হয়, তখন দেখা গেল, রক্ত ছাড়া ওকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। নরকের আগুন দিয়ে ওকে গড়া

হচ্ছিল; সেই আঙনে ওর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন পশুর রক্ত দিয়ে ওকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল, সে রক্ত ওর শরীর গ্রহণ করতে পারছে না। তখন মরুময় উপায় বলে দিলেন, ওর নিজের বংশের কারও রক্ত পেলে ওকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হবে। ব্যস, আমাকে অমনি কাজে নামতে হল।”

“তুমি গিয়ে লতাকাকিমাকে সব বললে? আর উনিও দিব্যি রাজি হয়ে গেলেন?”

সৌজন্য হাসল। “সন্তান-হারা মা-কে সন্তান ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাসের চেয়ে বড়ো প্রলোভন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই, বুঝলে? ওই টোপ দিয়েই আমরা লতাকে ব্যবহার করেছি। আমরা তাঁকে বললাম, যদি তিনি ওকে নিজের রক্ত পান করান, তাহলে এই দানবের শরীরের মধ্যে লীনা চিরকাল বেঁচে থাকবে। মা তো উনি, তাই এই দুর্বল জায়গায় ঘা দিতে সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। প্রজ্ঞার ওপরেও একবার এই একই ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি দেখলাম অন্য ধাতুতে গড়া। সে যা-ই হোক, সবাই তো আর প্রজ্ঞার মতো ব্যতিক্রমী নন। লতাকে কাজে লাগাতে তাই অসুবিধা হয়নি, আর নিয়ামক বিনীতেশও আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।”

অভী ক্রুদ্ধভাবে বলল, “নিজের স্বার্থের জন্য তুমি করতে পারো না, এমন কাজ নেই, না সৌজন্য?”

সৌজন্য একগাল হেসে বলল, “এই সুখ্যাতি আমার অনেকেই করে। যা-ই হোক, তুমি কিন্তু তৈরি থাকো। যুদ্ধে ঐশিকরা তোমাকে দিয়ে পাশুপত মুক্ত করতে চাইবেন লীনার দানবকে ব্যবহার করে। এতদিন নরকবিষ নিজের মধ্যে ধারণ করার পর তোমার শরীরের যা ঝাঁঝের অবস্থা, ওই বিধ্বংসী অস্ত্রকে মুক্তি দিতে গেলেই তুমি মরবে, আর লীনাও মরবে বহু মানুষ-অর্ধরাক্ষসের মৃত্যু ঘটিয়ে। ঐশিকরাও তাই চান। এর ফলে যে চূড়ান্ত হিংস্রতা, বিশৃঙ্খলা, প্রাণহানি ঘটবে, তাতে ওঁদের বিপুল আনন্দ।”

শুনতে শুনতে অসহায় একটা রাগ আর বিরক্তি ঘিরে ধরছিল অভীকে। সে বলল, “আচ্ছা সৌজন্য, তোমার লজ্জা করে না এই ধরনের জঘন্য কাজ করতে? মানবিকতার কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে?”

সৌজন্য বলল, “রাজনীতি করতে নামলে লজ্জা থাকতে নেই, অভী। মানবিকতা আবার কী? ওসব শুধু অক্ষমের অজুহাত। ক্ষমতা পেতে হলে এবং ধরে রাখতে হলে ওইসব ধারণাকে নরকে পাঠিয়ে না দিলে ওরা তোমাকেই একদিন গলা ধরে টেনে নামিয়ে দেবে সিংহাসন থেকে।”

এ-কথার উত্তর দিতে আর প্রবৃত্তি হল না অভীর। সৌজন্য বলল, “যাক, এই আলোচনা তোমার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি। তুমি তো কখনও প্রতি পদে নিজের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নামোনি, তাই আমার কথার গুরুত্ব তুমি কখনও বুঝতেও পারবে না। আপাতত মেঘনির্মাণমায়ার নমুনা যদি আমাকে কিছু দেখাতে পারো, তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হই।”

অভীর চোখের দৃষ্টি এখনও বাপসা হয়ে আছে। এবার দৃষ্টিটা ফিরতে যেন একটু বেশিই সময় লেগে যাচ্ছে। কেন? তার নিজের সময় ঘনিয়ে আসছে বলে? অস্বস্তিকর চিন্তাটা জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অভী বলল, “দেখছি চেষ্টা করে।”

হিমকুশলতা দিয়ে নিজের হাত ঠান্ডা করতেই হঠাৎ তার বুকের মধ্যে দুরন্দুর করে উঠল। মনে হতে লাগল, বুকের খাঁচার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন খুব জোরে ছটফট করতে শুরু করেছে। হাত ঠান্ডা, কিন্তু কপাল ঘেমে উঠল তার।

সৌজন্য দেখেও পরোয়া করল না। সে বলতে লাগল, “এই তো, হচ্ছে এবার। চেষ্টা করো, চেষ্টা করো।”

হাতের আঙুল দিয়ে হালকা বরফের একটা মেঘ বার করে আনার চেষ্টা করল অভী। নিজের হাতটা সে একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না, এমন নয়। অস্পষ্টভাবে হাতটাকে দেখছে সে, যেন ঘষা কাচের ওপার থেকে দেখা যাচ্ছে দৃশ্যটা।

বুকের কষ্ট উপেক্ষা করে অভী নিজের হাতে মনঃসংযোগ করল। শৈত্যপ্রবাহটা বেরিয়ে আসতে চেয়েও পারছে না; কী যেন এক অদৃশ্য বাধায় আটকে যাচ্ছে। সৌজন্য উৎসাহ দিয়ে বলল, “তোমার আঙুলের ডগা বরফের মতো সাদা হয়ে গেছে। এইবার মনে হচ্ছে বরফ বা মেঘ যাহোক কিছু একটা বেরোবে।”

মেঘ বেরোল অভীর হাত থেকে, কিন্তু সে বর্ষার কালো মেঘ নয়। শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে প্রবল শক্তিতে নিজের মনের ক্ষমতাকে অভী চালনা করল নিজের হাতে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত থেকে নদীর স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল লাল রঙের মেঘের পিণ্ড। নিজের বাপসা দৃষ্টিতে অভীর মনে হল, তার হাত থেকে যেন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোত।

লাল রঙের অমঙ্গলসূচক ধ্বংসের মেঘ ঘুরতে লাগল কক্ষের মধ্যে, জমাট বাঁধতে লাগল সৌজন্যের মাথার ওপর। এই মেঘে বৃষ্টি হয় না, সৌজন্য জানে। সে হতাশ হয়ে বলল, “তোমার ভেতরটাও বোধহয় নরকবিষের কারণেই বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছে।”

অভী শান্ত হয়ে তার হাতের মধ্য দিয়ে শক্তিচালনা বন্ধ করল। সঙ্গে-সঙ্গে ক্লান্তিতে তার শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইল। সভাকক্ষের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল সে। সৌজন্য গম্ভীর মুখে বসে রইল; অভীকে তোলার কোনো উদ্যোগই নিল না।

আপনমনে সে বলল, “তাহলে এখন ঐশিকত্ব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।”

অভী মাটিতে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। গলা শুকিয়ে গেছে, তার সঙ্গে বেশ শ্বাসকষ্টও হচ্ছে তার।

সৌজন্য উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, “উত্তরা!”

সভাকক্ষের বাইরেই সম্ভবত দাঁড়িয়ে ছিল উত্তরা। সে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

সৌজন্য বলল, “অভীকে নিয়ে যাও তোমার সেবাকক্ষে। শুশ্রূষা করো। ও একটু সুস্থ হয়ে উঠলে একটা জটায়ু ডেকে ওকে সমরগরিমায় পাঠিয়ে দিয়ো।”

আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়িয়ে কক্ষত্যাগ করল সে।

অভীকে ভূমিশয়া থেকে টেনে তুলল উত্তরা। বলল, “চলো আমার সঙ্গে। মুখ তো শুকিয়ে গেছে দেখছি। খুব খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে?”

অভীর মনে পড়ল, আজ সারাদিন প্রায় কিছুই খায়নি সে। মাথাটা বোধহয় সেই কারণেই আরও বেশি ঘুরছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে।

উত্তরার কাঁধে ভর দিয়ে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে চলল সে। যেতে যেতেই সে বুঝতে পারল, উত্তরা তাকে সেবাকক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না।

অন্য একটা ঘরে নিয়ে এসে তাকে শক্তপোক্ত একটা কাষ্ঠাসনে বসতে দিল উত্তরা। একটা থালায় আঙুর, আপেল, কলা ইত্যাদি বেশ কয়েক রকম ফল এনে দিয়ে বলল, “খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। তারপর তুমি একটু সুস্থ হলে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।”

পাশেই একটা পাত্রে জল ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে নিল সে। গলার ভেতরটা ভীষণ শুকনো হয়ে এসেছিল; জল খেতে এবার একটু ভালো লাগল শরীরটা।

একটা আপেল নিয়ে খেতে শুরু করল অভী। কয়েক কামড় দেওয়ার পর সে ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পেল, উত্তরা তার পোশাকের মধ্য থেকে একটা বেশ লম্বা কাগজ বার করছে।

অভী বলল, “এটা কী, বউদি?”

“একটা চিঠি এসেছে তোমার নামে। তুমি তখন সভাকক্ষে রাজা সৌজন্য আর সেনানায়িকার সঙ্গে কথা বলছ বলে আমি ইচ্ছা করেই দিইনি।”

অভী একটু অবাক হয়ে বলল, “আমাকে আবার কে চিঠি লিখল?”

“নিধি।”

অভী বলল, “বউদি, আমি এখনও চোখে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একটু পড়ে দেবে চিঠিটা?”

মাথা নেড়ে উত্তরা পড়তে শুরু করল।

অভী,

তোমাকে পাঠানো সৌজন্যের চিঠি রক্ষাবৈদ্য আবিষ্কার করেছেন গ্রন্থাগারে। সেখান থেকেই আমরা সবাই জেনেছি তুমি এখন মাল্যপর্বতে গেছ। রাজা পুনর্বসূকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; তাই অধিনায়ক বজ্রধর অনুমান করে নিয়েছেন, তিনিও গেছেন তোমার সঙ্গে। তোমার বাবা সমরোত্তম নীলাভ্রেরও একই ধারণা।

কিন্তু এদিকে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা তোমাকে জানানো দরকার।

নিয়ামক বিনীতেশ মারা গেছেন। 'মারা গেছেন' বললে ভুল হবে; তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।

পুরোটা তোমাকে গুছিয়ে লিখছি, যাতে পরপর ঘটনাগুলো বুঝতে তোমার অসুবিধা না হয়। লতাকাকিমা এসেছিলেন আমার কাছে আয়তনে। তাঁর কাছে লীনার ব্যাপার সব শুনলাম। আমার প্রতিক্রিয়া চিঠিতে বিস্তারিত লিখছি না, শুধু এইটুকু জানাচ্ছি, এতখানি হতবাক আমি জীবনে হইনি। নীপা তখন ছিল আমার সঙ্গে; ও-ও সব শুনে আমার মতোই হাঁ হয়ে গেছে। তাঁর পুরো বক্তব্য শুনে আমি শুধু কাকিমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, “অভীকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়েছিল লীনা। নিজেকে এই প্রশ্ন করেননি কখনও, অভী মরে গেলে লীনা কি খুশি হত?” উনি এর উত্তরে আর কিছু বলেননি, বুঝতেই পারছি। বলার মুখ-ই নেই ওঁর।

এর পরে যা ঘটেছে, তা আমার অজান্তেই ঘটেছে। বিকেলের দিকে হঠাৎ হই-চই শুনে জানলাম, নিয়ামক বিনীতেশ সুদক্ষিণসারি গিয়েছিলেন; সেখানেই অর্ধরাক্ষসরা তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

জানি তুমি আমার মতোই অবাক হচ্ছ। অর্ধরাক্ষসরা থাকে বলে নিয়ামক পারতপক্ষে সুদক্ষিণসারিতে পা দিতেন না। সেখানে তিনি তাহলে আজ কী করতে গিয়েছিলেন?

পরে জানতে পারলাম, পুরো ঘটনাটা ঘটিয়েছে নীপা। লতাকাকিমা আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর ও গিয়ে আড়ালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছে, “অভীদাদার সঙ্গে আপনি অনেক বড়ো অন্যায় করেছেন। আমাদের সমরগরিমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এর প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে আপনাকে।” তুমি হয়তো জানো, নির্মম সত্যকথাগুলো মুখের ওপর বলে দিতে ওর আটকায় না। লতাকাকিমা ওর কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর দিতে পারেননি। তখন ও বলেছে, “নিয়ামককে বলুন, ঐশিকদের আদেশ আছে, উনি যেন নীলকান্তমণিটা নিয়ে সুদক্ষিণসারিতে আসেন।” উনি প্রথমটা রাজি হচ্ছিলেন না; তখন ও এমন একটি কথা বলেছে যে আর উনি ‘না’ বলতে পারেননি। ও বলেছে, “যদি দানবটার বুক থেকে মণিটা বার করে আনতে পারি আমরা, তাহলে লীনাদিকে বাঁচানোর একটা ক্ষীণ আশা থেকেই যায়। আমার কথা শুনলে সেই চেষ্টা আমরা করব, এই আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি।” তখন কাকিমা সব জেনেবুঝেই এই কাজ করতে রাজি হয়েছেন। একবার অবশ্য তিনি জানতে চেয়েছিলেন, “নিয়ামক সুদক্ষিণসারিতে এলে কী হবে?” নীপা শুধু বলেছে, “তার পরের কথা আপনি যত কম জানেন, ততই ভালো থাকবেন।”

এর পরেই সুদক্ষিণসারি গিয়ে ওখানে সাধারণ অর্ধরাক্ষসদের রীতিমতো খেপিয়ে তুলেছিল ও। অর্ধরাক্ষসরা প্রায় কেউই নিয়ামককে

পছন্দ করে না, তুমি খুব ভালো করেই জানো। সকলেই খাপ্পা হয়ে ছিল তাঁর ওপর। নীপা এর পর সবার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে উনি এতদিন কী করছিলেন। উনিই যে ঐশিকদের সঙ্গে নীলকান্তমণি দিয়ে যোগাযোগ রাখছেন এবং উনিই যে অগ্নিদানবটাকে জঙ্গলে আনতে সাহায্য করেছেন, এ-সব কথা সে সবার সামনে ফাঁস করে দিয়েছে। তারপর নিয়ামক যেইমাত্র লতাকাকিমার কথায় বিশ্বাস করে সুদক্ষিণসারিতে পা দিয়েছেন, অমনি উত্তেজিত অর্ধরাক্ষসদের হাতে পড়েছেন। তারা তো তৈরি হয়েই ছিল; তিনি আসতেই সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তাঁকে ধরে একটু অনুসন্ধান করতেই তাঁর কাছ থেকে মায়ামণিটাও বেরিয়ে পড়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথায়? অর্ধরাক্ষসদের তো পুরোনো রাগ ছিলই তাঁর ওপর; এর আগে বহু অত্যাচার তিনি করেছেন ওদের ওপর। উত্তেজিত জনতা প্রচুর লাথি কিল-চড়-ঘুষি বর্ষণ করেছে তাঁর ওপর। কয়েকজনের হাতে মোটা মোটা লাঠিসোঁটাও ছিল। মার খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে ওরা লাঠিপেটা করেছে। মার খেতে খেতেই কখন তিনি মরে গেছেন, খেপে থাকা লোকজন তাও বুঝতে পারেনি। সমরোত্তম নীলাভ, সমরোত্তম শ্যামশ্রী আর রক্ষোবৈদ্য এ-সবের অনেক পরে যখন গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন, ততক্ষণে নিয়ামক রক্তমাংসের একটা পিণ্ড হয়ে গেছেন।

অধিনায়ক বজ্রধর স্বাভাবিকভাবেই এ-সংবাদে বিচলিত, যদিও গোটা সমরগরিমাতে চাপা খুশির হাওয়া বইছে; কারণ লোকটাকে মানুষ-অর্ধরাক্ষস নির্বিশেষে কেউই সহ্য করতে পারত না। অনেকেই মনে করছে, তাঁর উচিত শাস্তি হয়েছে। এই একটু আগে নীপা আমাকে বলে গেল, ওখানে অর্ধরাক্ষস জনতাকে সে-ই প্ররোচনা দিয়েছিল। গতবার তার দিদিকে যে নিয়ামকের জন্যই শেষমুখের বিষাক্ত তির খেতে হয়েছিল আর তার বাবাকে পুড়ে মরতে বসতে হয়েছিল, এটা সে ভোলেনি। আমি ওকে একটু বকাবকি করছিলাম; ও আমাকে মুখের ওপর বলে দিল, “দিদি, তুই চুপ কর। চোখের বদলে চোখ যদি তুলে নিতে পারিস, তাহলে বৃথাই এত অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিস তুই।”

ওর রাগে গনগনে মুখটা দেখে আমি আর কিছু বললাম না। এখন ওকে শান্ত হওয়ার কথা বললেও ও শুনবে না, আমি জানি। কিন্তু আমি এ-ও জানি, তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচরটিকে হত্যা করার দায় ঐশিকরা সমরগরিমা আয়তনের ঘাড়েই চাপাবেন; তাই তাঁদের দিক থেকে একটা প্রত্যাঘাত খুব সম্ভবত আসন্ন।

তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, ফিরে এসো, অভী।

নিধি

চিঠি শেষ করে উত্তরা থামল। অভী স্তব্ধ বিষ্ময়ে এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। নিয়ামক বিনীতেশকে সে-ও মোটেই পছন্দ করত না, কিন্তু লোকটার এইরকম ভয়ংকর পরিণতি হবে, সে ভাবতে পারেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভী বলল, “ওইটুকু মেয়েটার মধ্যে যে এতখানি প্রতিশোধস্পৃহা আছে, আমি কখনও বুঝতেই পারিনি।”

উত্তরা হাসল। “অন্যায় যার সঙ্গে হয়, ওই যাতনা একমাত্র সে-ই বোঝে, অভী। বাকিরা শুধু বাইরে থেকে শুকনো সাস্থনা দিতে পারে। প্রতিশোধ ছাড়া অন্যায়ের জ্বালা কি কখনও শান্ত হয়?”

অভী উত্তর দিতে পারল না। উত্তরার সঙ্গেও একসময় ভয়াবহ অন্যায় হয়েছিল, সে জানে খুব ভালো করেই।

তার হাতে নিধির চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে উত্তরা উঠে দাঁড়াল। “অভী, একটা কথা বলি?”

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে অভী অবাক হয়ে তাকাল। এখনও সে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না; দৃষ্টির অস্পষ্টতা কাটেনি। তবু সে বুঝতে পারল, কুণ্ঠিতভাবে নিজের দু’হাত ঘষছে উত্তরা।

অভী বলল, “হ্যাঁ বউদি, বলো।”

উত্তরা প্রায় ফিসফিস করে বলল, “আমার অপরাধ নিয়ো না তুমি। আপাতত এই ঘরটায় তোমাকে আমি বন্দি করে যাচ্ছি। তোমার বামদিকে এই ঘরের দেয়ালের ওপারে আর একটা ঘর আছে। তোমার দৃষ্টি ফিরে এলে তুমি দেখতে পাবে ও-ঘরের দৃশ্য। কিন্তু যাতে তুমি ওখানে যেতে না পারো, তাই এখানে তোমাকে বন্দি করে গেলাম আমি।”

কথাটা বলেই দ্রুত বাইরে গিয়ে কাঠের ভারী দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে অর্গলবদ্ধ করে দিল উত্তরা।

অভী হাঁ করে বসে রইল। কী হল ব্যাপারটা?

ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ। একবার অভীর মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ফেরেনি এখনও, তাই উঠে দিয়ে অনুসন্ধান করার অবস্থায় নেই সে।

অভী বুঝতে পারল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা তাকে করতেই হবে।

চুপ করে বসে রইল সে। হ্যাঁ, খুব মৃদু একটা যন্ত্রণাকর গোঙানির শব্দ আসছে। কোনো পুরুষের কণ্ঠস্বর।

চেনা-চেনা লাগছে কি? অভী কান খাড়া করে রইল।

না, চেনা যাচ্ছে না। যদি পরিচিত কারও গলা-ও হয়, সম্ভবত যন্ত্রণায় এতটাই বিকৃত লাগছে যে বোঝা যাচ্ছে না কণ্ঠস্বরের অধিকারীটি আসলে কে। তবে আওয়াজটা খুব একটা দূর থেকে আসছে না।

সামনের ধূসর পাথর দিয়ে তৈরি দেয়ালটা এবার দেখতে পাচ্ছে অভী। তার মানে, দৃষ্টি ফিরছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মোটামুটি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পেল সে। উঠে দাঁড়িয়ে বামদিকে ফিরল অভী।

ওদিকে একটা কক্ষ আছে নির্ঘাত। ওখান থেকেই আসছে শব্দটা।

দরজা বাইরে থেকে লাগানো। কেউ এসে খুলে না দিলে বেরনোর উপায় নেই। অভী আবার দেয়ালটার দিকে মনঃসংযোগ করল।

দুই ঘরের মধ্যে জানালা নেই বটে, কিন্তু বেশ কিছুটা উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি আছে। যে কাষ্ঠাসনে সে এতক্ষণ বসে ছিল, সেটা টেনে এনে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতেই পাশের ঘরের ভেতরটা দেখতে পেল সে।

পাশের ঘরের ভেতরটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া; আলো বেশি নেই এখানে। তার মধ্যেই সে দেখল, এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা লোক।

অভী ডাকল, “কে ওখানে?”

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। অভী চমকে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

“আলোকপর্ণ!”

আলোকপর্ণের যে চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল পর্বতের সঙ্গে শেষ লড়াইতে, তার ওপর বাঁধা আছে কালো রঙের পট্ট। অভী দেখতে পেল, মাটিতে পড়া অবস্থায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে সাদা ফেনা; তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মুখ যন্ত্রণাকাতর। বোধহয় সে তাকে চিনতেও পারল না।

লক্ষণ দেখেই অভী বুঝতে পারল, বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তার ওপর।

দয়া হল তার। সে বলল, “আলোকপর্ণ, আমি অভী। একবার একটু কষ্ট করে এই ঘুলঘুলির কাছে আসতে পারবে? তোমাকে স্পর্শ করতে পারলে তোমার বিষ আমি হরণ করতে পারব।”

আলোকপর্ণ আর একবার মাথা তুলে তাকে দেখে নিল। তারপর বলল, “থাক অভী। আর পারছি না আমি। বাঁচার ইচ্ছাও আর নেই আমার। মৃত্যুতেই এখন আমার একান্ত প্রার্থিত মুক্তি।”

“কী করে হল তোমার এই অবস্থা?” অভী প্রশ্ন করল।

“উত্তরা বিষ দিয়েছে আমাকে। ছুরির ফলায় তীব্র বিষ মাখিয়ে আমার হাতে চিরে দিয়েছে। তারপর এই ঘরে এনে বন্দি করে রেখে গেছে। তোমাকেও সে ওই ঘরে ইচ্ছা করেই আটকে রেখেছে, যাতে তুমি আমার বিষহরণ করে নিতে না পারো।”

অভী এইবার বুঝতে পারছে ‘প্রতিশোধ’ নিয়ে বলা উত্তরার শেষ কথাগুলোর গভীর অর্থ। তার জীবনটা শেষ করে দেওয়ার পেছনে আলোকপর্ণই যে সম্পূর্ণ দায়ী, তা তো আর অস্বীকার করার নয়।

আলোকপর্ণের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে একদলা ফেনা। বাম হাত দিয়ে কোনোক্রমে তা মুছে নিয়ে সে বলল, “উত্তরা অভিশাপ দিয়েছিল আমাদের তিনজনকে।”

“তিনজন? কে কে?”

“রাজা পুনর্বসু, প্রজ্ঞা আর আমাকে। ওর ধারণা ছিল, আমাদের তিনজনের জন্যই ওকে মহাসর্পিণীরূপে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বহু বছর ধরে। আমাদের জন্যই ওর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের জন্যই ও আর কোনোদিন মা হতে পারবে না।”

অভী শুনতে লাগল। মৃত্যুপথযাত্রী রাক্ষস আলোকপর্ণ বলে চলল, “ও অভিশাপ দিয়েছিল, ও যেমন সন্তান হারিয়েছে, আমরাও তেমন করেই বেঁচে থাকতে নিজেদের সন্তানের মৃত্যু দেখে যাব। রাজা দেখে গেছেন তাঁর মেয়ে উর্মির মৃত্যু, প্রজ্ঞাকে দেখতে হয়েছে সুতসোমের মৃত্যু। আমার কোনো সন্তান নেই, তাই ওই অভিশাপ সরাসরি এসে পড়েছে আমার ওপরেই। সন্তানহারা মায়ের অভিশাপে ভয়াবহ মায়াজক্তি থাকে, অভী। ওকে আটকানোর কোনো উপায় সমগ্র মায়াজগতে নেই।”

অভী বলল, “কিন্তু তুমি উত্তরাবউদিকে মহাসর্পিণীতে রূপান্তরের অভিশাপ দিয়েছিলে কেন, আলোকপর্ণ? সে তো তোমার কোনো ক্ষতিই করেনি কখনও।”

আলোকপর্ণের শরীরটা একবার থরথরিয়ে কেঁপে উঠল— আবেগে, না বিষক্রিয়ার যন্ত্রণায়, অভী বুঝতে পারল না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল, “কেন জানো? প্রজ্ঞা ছিলেন আমার অস্ত্রগুরু। তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য যে রক্তপদ্মরাগমণি কাজে লাগতে পারত, সেইটি পর্বত আর উত্তরা মিলে লুকিয়ে রেখেছিল নিজেদের কাছে। প্রজ্ঞার স্বামীর মৃত্যুর জন্য তখন উত্তরাকেই দায়ী মনে হয়েছিল আমার। আমি বরাবর মাথাগরম লোক— প্রজ্ঞার বিপর্যয় দেখে তখন আর রাগ সামলাতে পারিনি। রাজা পুনর্বসু আমাকে ভয় পেতেন; তিনিও আমাকে বাধা দেননি।”

“কিন্তু কেন? সেনানায়িকা প্রজ্ঞার জন্য তুমি পর্বতদার স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে গেলে কেন?”

আলোকপর্ণ ধীরে-ধীরে বলল, “কেন, বুঝতে পারেনি? ভালোবেসে ফেলেছিলাম ওঁকে।”

অভী স্তম্ভিত হয়ে রইল। আলোকপর্ণ তার ঠোঁটের পাশ থেকে গড়িয়ে পড়া ফেনা মুছে নিয়ে আবার বলল, “আমি খুব একটা ভালো লোক নই, আমি নিজেও জানি। কিন্তু তাই বলে কি আমার ভালোবাসতে নেই?”

অভী দেখল, আলোকপর্ণের একমাত্র চোখের জ্যোতি স্তিমিত হয়ে আসছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বলল, “প্রজ্ঞা আমার গুরু হলেও মনে-মনে ভালোবাসতাম তাঁকে, যদিও এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সাহস হয়নি কখনও। যখন পর্বতের স্বার্থপরতার কারণে তাঁর স্বামী মারা গেল, তখন আমি ভেবেছিলাম, পর্বত আর তার বউকে কঠিন শাস্তি দিলে নিশ্চয়ই তাঁর মন জয় করতে পারব। কিন্তু প্রজ্ঞা আমার চেয়ে অনেক উঁচুদের ব্যক্তিত্ব, অভী। বরাবর আমার প্রতি শীতলই থেকেছেন তিনি।”

অভীর কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। সে বলল, “এগুলো তুমি আমাকে বলছ কেন?”

আলোকপর্ণ একবার যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল, তারপর কষ্ট করে একটু হাসল। “কাকে আর এ-সব কথা বলব এই রক্ষাপুরীতে? আসলে কিছু কথা এমন হয়, যা বন্ধুদের কাছে বলা যায় না, কিন্তু শত্রুদের বলা যায়।”

আলোকপর্ণ এর আগে তাদের বহুবার ক্ষতি করতে চেয়েছে। তবু এই মরণাপন্ন রাক্ষসকে দেখে অভীর করুণা হল। সে আবার বলল, “কোনোভাবে এই ঘুলঘুলির কাছে আসতে পারবে না? একবার আমি তোমাকে ছুঁতে পারলে তোমার বিষ হরণ করে নিতে পারতাম।”

আলোকপর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “না, থাক, অভী। আর আমার বাঁচার ইচ্ছা নেই। যুদ্ধ নিয়েই বেঁচে ছিলাম এতদিন; এখন হাত ভেঙে আমি একেজো যোদ্ধা হয়ে গেছি। তা ছাড়া, প্রজ্ঞার সঙ্গে আমি সরাসরি কথা বলেছিলাম সমরগরিমায় গতবারের সেই ব্যর্থ অভিযানের পরেই। তাঁর মনের কথা আমি জেনে গিয়েছি। উত্তরা এই বিষ দিয়ে আমাকে মুক্তিই দিল আজ। তবে কী জানো, যখন উত্তরাকে আমি অভিশাপটা দিয়েছিলাম, তখন ওর পেটের বাচ্চাটার কথা আমি জানতাম না। আমি খারাপ লোক ঠিকই, কিন্তু এত বড়ো অমানুষ আমি নই।”

আলোকপর্ণের কথা থেমে গেল। ঘুলঘুলি দিয়ে অভী দেখতে পেল, তার শরীরে ভয়ানক খিঁচুনি হচ্ছে।

ওদিকের কক্ষের দরজা খুলে গেল। ছায়াচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল একটা নারীমূর্তি; সে এসে দাঁড়াল মাটিতে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় রাক্ষসের পাশে।

আলোকপর্ণ মুখ তুলে দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু আর মাথা তুলতে পারল না। দূর থেকে তার চোখ দেখে অভীর মনে হল, তার দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ভাঙা, ফ্যাসফেসে গলায় সে কোনোক্রমে বলল, “কে তুমি?”

ছায়ামূর্তিটা মৃদুস্বরে বলল, “চিনতে পারলে না? আমি মহাসর্পিণী।”

আরও বার কয়েক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে আলোকপর্ণের শরীরটা স্থির হয়ে গেল। অভী দেখল, প্রায়াক্রকার ঘরে সেই নারীমূর্তি তার আঁচলের গিঁট খুলে সাদা সাদা কীসব যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে মৃতদেহটার ওপর।

ভাঙা ডিমের খোলা!

আরও কিছুক্ষণ মৃত আলোকপর্ণের কালচে হয়ে আসা মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটি; তারপর আস্তে-আস্তে ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তার কিছুক্ষণ পর অভীর কক্ষের দরজা খুলে গেল।

উত্তরার মুখ এখন প্রশান্ত; ঝড় পেরিয়ে যাওয়ার পরের বীতরাগ শান্তি তার মুখে। তাতে আর কোনো ক্রোধের চিহ্ন নেই, বরং আছে শোক। পুরোনো শোক মানুষকে শান্ত করে। উত্তরার মুখে সেই সমাহিত শোকের ছায়া দেখতে পেল অভী।

দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে সে ধীর স্বরে বলল, “অভী, এবার তুমি যেতে পারো।”



।। অষ্টাদশ অধ্যায় ।।

যুদ্ধারম্ভ

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বর্ণশেখর বলল, “ভালোবাসা মানুষকে দিয়ে অদ্ভুত সব কাজ করায় রে, অভী। কখনও ভালো, কখনও মন্দ। কিন্তু বড়ো অদ্ভুত।”

অভীর মনে পড়ল, তাদের সবাইকে ভালোবেসে তার বাবাও একসময় স্বেচ্ছায় নরকে গিয়েছিল। তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতে পেরেছিল বলেই বিনা দ্বিধায় একসময় নিজের সমরোত্তম ত্যাগ করেছিল রবিকাকা স্বয়ং।

ভালোবাসা ব্যাপারটাই খুব অদ্ভুত, ঠিকই বলেছে রবিকাকা।

আয়তনে ফিরে এসে অধিনায়ক-সহ সবাইকে সে মাল্যপর্বতের সব সংবাদ দিয়েছে। রাজা পুনর্বসুর মৃত্যু সংবাদে অধিনায়ক একটু বিচলিত। শ্যামশ্রী অবশ্য বেশি চিন্তা করছেন সৌজন্যের আসন্ন সেনা-অভিযান নিয়ে। তিনি বলছিলেন, “ঐশিকরা রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ চান। ফলাফল যা-ই হোক, তাতে ওঁরা আগ্রহী নন। ওঁদের আনন্দের জন্য আমাদের লড়াই করে মরতে হবে, এটা ভাবতেই রাগে আমার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছে।”

অধিনায়ক বজ্রধর অস্ত্রাগারে গিয়ে নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার পরীক্ষা করে দেখছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ। নীলাদ্র সমরগরিমার

সেনাদের সজ্জিত করা শুরু করে দিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুরো বাহিনী তৈরি হয়ে নেমে আসবে উন্মুক্ত প্রান্তরে। অভী চুপচাপ ওখান থেকে সরে এসে আয়তনের বাইরের মাঠে অনুশীলন মঞ্চের সামনে নিধি আর স্বর্ণশেখরের সঙ্গে একটু গল্প করছিল। সদ্য-সদ্য এতগুলো খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে যে কিছুতেই যেন তার মনটা ভালো হচ্ছে না।

নিধি বলল, “সৌজন্য তাহলে সেনাসজ্জা শুরু করে দিয়েছে?”

অভী বলল, “সেইরকমই তো শুনে এলাম। ও এখন যথেষ্ট চাপে আছে। মরুময়-সহ ঐশিকরা ওকে একরকম জোর করে সমরগরিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছেন। খুব তাড়াতাড়িই রাক্ষসসেনা ঢুকবে আমাদের সীমানা লঙ্ঘন করে। সৌজন্য এখন চুপচাপ তাঁদের সব কথা মেনে নিচ্ছে, কারণ ওর আশা, ঐশিকরা ওকেও ঐশিকত্ব প্রদান করবেন। তারপর ও তাঁদেরকেই মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে।”

স্বর্ণশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ওর পরিণতি ভালো হবে না, দেখে নিস তুই। বিষধর সাপ নিয়ে যারা খেলে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই সাপের ছোবলেই মরে। ঐশিকরা মায়াজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী মায়াদর প্রাণী; তার ওপর খলবুদ্ধিতেও তাঁদের ওপরে কেউ নেই। সেই ঐশিকদের এত সহজে পরাস্ত করতে পারবে ভাবলে সৌজন্য খুব ভুল করেছে।”

অভী চুপ করে তাকিয়ে রইল তার চন্দ্রহাসের দিকে। এই সকালের রোদ চন্দ্রহাসের মসৃণ বক্ষিমফলকে এত উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। অভীর একবার মনে হল, চন্দ্রহাস যেন খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে— যেন আসন্ন মৃত্যু-উৎসবের আভাস পেয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

শিবের তরবারি চন্দ্রহাস! শিবের জগৎধ্বংসী অস্ত্র পাশুপত!

অদ্ভুত সব চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে। নিজের শরীরের মধ্যেও সে ওই চন্দ্রহাসের মতো একটা সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করতে পারছে। বুক দূরদূর করছে তার। চন্দ্রহাসের ফলায় নিজের মুখের প্রতিফলন দেখতে পেল অভী।

পাশে নিধি আর রবিকাকা কীসব যেন বলে যাচ্ছে, নিজেদের মতো গল্প করে যাচ্ছে। কিন্তু অভী আর ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে ছিল চন্দ্রহাসের দিকে।

চন্দ্রহাসের ফলায় সে দেখতে পাচ্ছে অদ্ভুত এক দৃশ্য। তার নিজের মুখের যে প্রতিচ্ছবি এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তরবারিটার মসৃণ উজ্জ্বল গাত্র, তাতে এখন তার মাথার চারপাশে ঘনিয়ে আসছে মত্ত হস্তীর মতো কালো মেঘপুঞ্জ; তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। সেই মেঘ এসে গ্রাস করছে অভীর মাথা; তার দু'চোখ বরফের মতো সাদা!

চমকে উঠে তরবারিটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিল অভী।

স্বর্ণশেখর অবাক হয়ে বলল, “কী হল রে?”

দু'হাতে চোখ ঘষে অভী বলল, “কিছু না, রবিকাকা।”

স্বর্ণশেখর হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু তার আগেই নিধি বলে উঠল, “ওই যে, ওঁরা আসছেন।”

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, অধিনায়ক বজ্রধর এদিকেই আসছেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণকে নিয়ে।

বজ্রধর এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে; বললেন, “নীলাদ্র তৈরি করছে সেনাদলকে। ওরা জমায়েত হবে এই মাঠেই। এখান থেকেই আমরা যাব মৃত দেবতার নদীর তীরে।”

নিধি প্রশ্ন করল, “রাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধটা কি ওখানেই হবে, অধিনায়ক?”

বজ্রধর বললেন, “হ্যাঁ, প্রায় সেরকমই বলতে পারো। আমাদের সুরক্ষাব্যবস্থা দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকবে। মূল সেনাদল মৃত দেবতার নদীর তীর বরাবর বিস্তৃত থাকবে, যাতে রাক্ষসরা আক্রমণ করতে এলেই প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এ-ছাড়া, মানবমন্দির এবং সুদক্ষিণসারির যতজন সমর্থ নারীপুরুষ আছে, সকলেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়ে পাহারা দেবে সমরগরিমা আয়তনের মাঠে। নদীতীরে আমাদের সেনাদলকে এড়িয়ে কোনো শত্রু যদি এই মাঠ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেও পারে, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওরা তৈরি থাকবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “অধিনায়ক এবার সমরগরিমার সাধারণ অধিবাসীদের জন্য দ্বি-স্তরীয় নিরাপত্তার কথা ভেবেছেন। আমরা উপযাচক হয়ে রাক্ষসদের আক্রমণ করতে যাচ্ছি না। কিন্তু আক্রান্ত হলে শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের সাধারণ নাগরিকদেরও যেন উত্তম সুরক্ষা দেওয়া যায়, সে ব্যবস্থা যতটা সম্ভব করা হয়েছে।”

নিধি বলল, “আমার একটা প্রশ্ন আছে। মৃত দেবতার নদীর তীরে কিন্তু অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষেধ। আমাদের পুরো বাহিনী ওখানে উপস্থিত হলে দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন না?”

বজ্রধর বাকি সমরোত্তমদের দিকে পর্যায়ক্রমে একবার ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকিয়ে নিলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, “প্রলয়কালে আর বিধিনিষেধের সব নিয়ম চলে না, নিধি। দেবতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি অনুমতি দিয়েছেন ওখানে অস্ত্র নিয়ে জমায়েত হওয়ার, যদিও এর জন্য যে বিপুল মূল্য আমাদের দিতে হবে, সে-কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।”

অভীর হৃৎপিণ্ডটা একবার ‘ধক্’ করে উঠল। প্রলয়কাল! তবে কি আজকেই...!

তার মন বলল, আজকেই যা হওয়ার হবে। এই যুদ্ধের সময়েই তো ঐশিকদের অগ্নিদানবের সঙ্গে তার মুখোমুখি হওয়ার কথা। লীনার শেষ কথাটা মনে পড়ল তার— “দেখা হবে, অভী। প্রলয়ের দিনে।”

মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে সে বলল, “পর্বতদা কোথায়?”

মেঘবর্ণ বলল, “তাকে আমি পাঠিয়েছি জটায়ুতে চেপে আকাশ থেকে নজর রাখতে। রাক্ষসসেনাকে আসতে দেখা গেলে সে আমাদের অগ্রিম সাবধান করবে।”

বজ্রধর বললেন, “নীলাভ্র শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবে আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে। ওদের কিছু কথা বলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অবশ্য আমাদের সেনারা বহু কঠিন যুদ্ধের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, আজ রাক্ষসদের পক্ষে ঐশিকরাও থাকবেন। সৌজন্যকে আজ সবার সামনে ওঁরা ঐশিকত্ব প্রদান করবেন, তা-ই না অভী?”

অভী মাথা নেড়ে বলল, “সৌজন্য তো তা-ই বলছিল।”

শ্যামশ্রী বললেন, “ঐশিকরা সবাই আসবেন কি না জানি না, তবে মরুময় তো থাকছেনই।”

বজ্রধর বললেন, “উনি তো থাকবেনই। আমাকে হত্যা করে যমদণ্ডি অধিকার করার ইচ্ছা যে ওঁর অনেকদিনের।”

অবাক হয়ে অভী আর নিধি একসঙ্গে বলে উঠল, “তা-ই নাকি?”

বজ্রধর মৃদু হাসলেন। “সে-বার এই দণ্ডের ভয়ংকর শক্তি দেখার পর থেকেই এই লোভ জেগেছে ওঁর মনে। আমার কাছে এর আগে অনেকবার সংবাদ এসেছে, মরুময় আমার এই যমদণ্ড দিয়ে আমাকেই হত্যা করতে চান। সেটাই নাকি আমার ওপর ন্যায়সংগত প্রতিশোধ হবে। তিনি একজন ঐশিক হওয়া সত্ত্বেও আমার মতো সামান্য মানুষের কাছে বিপুল সেনাদল নিয়েও হেরেছেন শুধু যমদণ্ডের কারণে, এই তাঁর ধারণা। তাই ওটিকে হস্তগত করার ইচ্ছা ওঁর অনেকদিনের।”

অভী বলল, “কিন্তু মরুময় কি ওই অস্ত্র আদৌ ব্যবহার করতে পারবেন?”

“অন্য কোনো সাধারণ যোদ্ধা হলে পারত না। কিন্তু উনি অত্যন্ত শক্তিশালী ঐশিক মায়াধর। উনি পারবেন।”

“কিন্তু দৈবাস্ত্র নিয়ে যে যুদ্ধ করা যায় না?”

“যায় না। কিন্তু আমার দণ্ডটিও তো আসল যমদণ্ড নয়। তার অংশশক্তি আছে কেবল এর মধ্যে। তাই পুরোপুরি ‘দৈবাস্ত্র’ একে বলা যায় না। এটা হাতে পেলে উনি একে ব্যবহার করতে পারবেন। মরুময় যেহেতু একজন ঐশিক, তাই এই অংশত-দৈব অস্ত্র চালনার উপযুক্ত মায়া ওঁর অধিকারে আছে।”

শ্যামশ্রী মৃদু হেসে বললেন, “মরুময় মনে করেন, যমদণ্ড কেড়ে নিলে বজ্রধর তাঁর ক্ষমতা হারাবেন। অহংকারী লোকেদের চিন্তা এইরকমই হয়। উনি জানেন না, যোদ্ধার গুণে অস্ত্র তার ‘যোগ্য’ হয়ে ওঠে; অস্ত্রের গুণে যোদ্ধা কখনও ‘যোগ্য’ হয় না। যে যোদ্ধা অস্ত্রের প্রকৃত অধিকারী নয়, তার হাতে সে অস্ত্র কোনোদিন শোভা পায় না।”

স্বর্ণশেখর বলল, “নীলাভ্র আসছে।”

অভী মুখ ফিরিয়ে দেখল, সমরগরিমার বিরাট সেনাদল সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে নীলাভ্র। শ্যামশ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে রইলেন সেই দিকে।

নীলাভ্রর পেছনে আছে যোদ্ধানায়কেরা। মৃগেন্দ্র, অরিত্র, উষসী— এরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। চক্রবাকও আছে সেনাদলের পুরোভাগে; তাকে দেখে একবার ভ্রুকুণ্ডন করল নিধি।

মেঘবর্ণ তা লক্ষ করে বলল, “এই আপৎকালে চক্রবাককে সাময়িকভাবে আমরা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছি, বুঝলে নিধি? অস্ত্র ধরতে জানে, এমন লোক যত বেশি পাওয়া যায়, ততই আমাদের ভালো।”

উষসীর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল তরবারি হাতে নীপা। অতী আর নিধির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে, কিন্তু বাহিনীর সারিভঙ্গ করে এগিয়ে এল না।

নীলাভ এসে অধিনায়কের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, “মাননীয় অধিনায়ক, আপনার আদেশ অনুসারে সমরগরিমার সেনারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। নিজেদের সমরগরিমা অটুট রেখে আর্তের রক্ষায় আমরা জীবনপণ সংগ্রাম করব।”

বজ্রধর তার কাঁধে হাত রাখলেন। “তোমাদের মতো সহযোদ্ধা পেয়ে আমি গর্বিত, সমরোত্তম নীলাভ।”

তাঁর ইঙ্গিতে বাকি চারজন সমরোত্তম এসে দাঁড়ালেন সেনাবাহিনীর সামনে। বজ্রধর তাঁর তরবারি নিক্ষেপিত করে তুলে ধরলেন আকাশের দিকে। প্রত্যুত্তরে বাহিনীর প্রত্যেকে তাদের তরবারি ওপরে তুলে তাঁর আহ্বানকে সম্মান জানাল প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে।

মেঘগম্ভীর স্বরে বজ্রধর বলে উঠলেন, “সমরগরিমার সেনারা, আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোনো।”

বিরাট বাহিনী স্থির হয়ে গেল। সমরগরিমার মাঠ জুড়ে নীরবতা। সবাই উৎসুক হয়ে রইল অধিনায়কের বক্তব্য শোনার জন্য।

বজ্রধর বললেন, “রাক্ষসরাজ সৌজন্য বিনা প্ররোচনায় আমাদের আক্রমণ করতে আসছেন। এই যুদ্ধ আমাদের লড়াইতে হবে আমাদের আপনজনদের জন্য, আমাদের প্রিয়জনদের জন্য। ঐশিকরা চাইছেন অসংখ্য মৃত্যু, যাতে তাঁদের পৈশাচিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হতে পারে আমাদের জীবন বলিদানের মধ্য দিয়ে। যত বেশি মৃত্যু, ওঁদের তত বেশি আনন্দ। মনে রেখো সেনারা, যদি একবার আমাদের বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে রাক্ষসরা এই জনপদে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে আমাদের বাড়ির বৃদ্ধ এবং শিশুরা কেউ নিরাপদ নন। এই লড়াই তাই আমাদের ন্যায়ের লড়াই, আমাদের গৃহরক্ষার লড়াই।

“কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হবে, ওদের চেয়ে আমাদের শক্তি অনেক বেশি। আমরা পাঁচজন সমরোত্তম উপস্থিত আছি আজ যুদ্ধক্ষেত্রে; আমরা কথা দিচ্ছি, আমরা প্রাণ দিয়ে হলেও তোমাদের সকলকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। ওদের মহাযোদ্ধা আলোকপর্ণ মারা গেছে, ওদের অত্যন্ত দক্ষ যুদ্ধবিশারদ সেনানায়িকা প্রজ্ঞা পদত্যাগ করেছেন। ওদের রাজা সৌজন্য অতিশয় ধূর্ত রাক্ষস ঠিকই, কিন্তু শুধু ধূর্ততা দিয়ে যুদ্ধজয় করা যায় না, তোমরা সবাই জানো। এত বড়ো সেনাবাহিনীকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চালনা করে জয় ছিনিয়ে আনার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা সৌজন্যের নেই। তাই নিয়তির ইচ্ছা অন্যরকম না হলে এই যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। প্রলয়কেও আমরা ভয় পাই না— সৌজন্য তো

কোন ছার! আজ বহু মৃত্যু ঘটবে; মৃত্যুদেবতা স্বয়ং আমাদের সকলের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে নিয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু আমাদের তাতে কীসের দ্বিধা?

“এসো সমরগরিমার অকুতোভয় সেনারা, আমার সঙ্গে সনাই শপথ করো, আমরা আমাদের সমরগরিমা ত্যাগ করে ভীরুর মতো পালার না। মৃত্যু যদি আসে, তাকে পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে বরণ করব। প্রলয়কে আমাদের কীসের ভয়? মৃত্যুর অধিক ক্ষতি কী-ই বা হবে? মৃত্যু তো আমাদের বন্ধু— এই জীবনের প্রত্যেক নিশ্বাসে আমরা কি তার ঋণ শোধ করছি না? বীরের মৃত্যুতে যোদ্ধাদের ক্ষয় নেই, বরং পূর্ণতা আছে। শপথ করো, আমরা প্রাণ দিয়েও নির্দোষকে রক্ষা করব, আমাদের সমরগরিমাকে রক্ষা করব, আমাদের প্রিয়জনদের রক্ষা করব।”

সারা মাঠ একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, “শপথ করছি! শপথ করছি!”

সবার সঙ্গে এই শপথবাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে অভী অনুভব করল, তার সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

সবার আগে সেনাদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন অধিনায়ক বজ্রধর। তাঁর পেছনে রইলেন অন্য চারজন সমরোত্তম। তাঁদের ঠিক পেছনেই অন্য যোদ্ধানায়কদের সঙ্গে চলল অভী আর নিধি। অভীর হাতে চন্দ্রহাস, নিধির হাতে ত্রিশূল।

যেতে-যেতে নিধি বলল, “আজ সৌজন্য বুঝবে, ঐশিকদের পদলেহন করে সমরগরিমাকে আক্রমণ করার ফল কী হয়।”

অভী মাথা নাড়ল। সে কাউকে বলেনি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ করেই আবার ঝাপসা হতে শুরু করেছে। বললে পাছে অন্যরা ভয় পায়, বা তাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে, তাই সে এই ব্যাপারে মুখ বুজে আছে। এখনও সে দেখতে পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে দেখা যেন অনেকটা ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দেখার মতো— অবয়ব বোঝা যায়, কিন্তু মুখ-চোখ স্পষ্ট নয়।

পীতপত্রবনের মধ্যে প্রবেশ করল বিরাট বাহিনী। সকালের রোদ এসে পড়েছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। আগে এই অরণ্যের গাছগুলোতে এত পাতা ছিল যে অরণ্যচারী মানুষগুলোর মাথায় সবসময় চাঁদোয়ার মতো ছায়া হয়ে থাকত। কিন্তু আজ অভী লক্ষ করে দেখল, বেশিরভাগ গাছের পাতা ঝরে গেছে। শুকনো, ম্রিয়মান ডালগুলো আকাশের দিকে তুলে রেখেছে তাদের কঙ্কালসার হাত— যেন বৃষ্টিভিক্ষা করছে। পায়ের তলায় জমে আছে মরা, হলুদ পাতার রাশি; ওদের পায়ের চাপে মড়মড় করে সে-সব ভাঙছে শুকনো পাঁজরের মতো। ধুলো উড়ছে সেনাবাহিনীর প্রতি পদক্ষেপে। একটা গিরগিটি ঘোলাটে চোখে ওদের দেখছে একটা শুকিয়ে আসা গাছের ডাল থেকে। এই নিষ্করণ, মৃতপ্রায় অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভীর হঠাৎ মনে হল, তার দু’হাত যেন আবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আর ভেতর থেকে প্রবল গতিতে বেরিয়ে আসতে চাইছে বরফের স্রোত।

না, এখন কিছুতেই হিমকুশলতা প্রয়োগ করা চলবে না। এখনি যুদ্ধ শুরু হবে; তার আগে অকেজো হয়ে পড়লে চলবে না।

মেঘবর্ণ হঠাৎ তাকে ডাকল। “অভী, একবার এসো তো এদিকে।”

একটু অবাক হয়ে অভী এগিয়ে গেল তার দিকে। সেনাদল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে।

তার হাত ধরে গাছটার পেছনে তাকে নিয়ে গেল মেঘবর্ণ। “অভী, আমাকে বিশ্বাস করো তো?”

অভী অবাক হয়ে বলল, “এ আবার কী কথা? তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করি আমি।”

“তাহলে তোমার চন্দ্রহাসটা আমাকে দাও।”

“সে কী? কেন?”

“আহ্! এত কথার উত্তর এখন দিতে পারব না তোমায়। তুমি আমাকে ওটা দাও; আমার কাজ মিটে গেলে তোমাকে ফেরত দেব। আর যতক্ষণ না আমার কাছ থেকে ওটা ফিরে পাচ্ছ, ততক্ষণ এই নিয়ে মুখ বন্ধ রাখো। নিধি অবশ্য তোমাকে ছাড়বে না জানি; ওকে বলতে পারো, কিন্তু আর কাউকে নয়। ঠিক আছে?”

এই অদ্ভুত অনুরোধের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না অভী; তবু সে বঙ্কিম তরবারিটা ধরিয়ে দিল মেঘবর্ণের হাতে। না, তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে মুচকি হাসল মেঘবর্ণ। “বেশ, বেশ। এবার ফিরে যাও তোমার সেনাদলের কাছে। এ-জিনিস আপাতত আমার কাছে রইল; পরে ফেরত পাবে।”

সে ফিরতেই নিধি যথারীতি জানতে চাইল, “কোথায় গিয়েছিলে? মেঘবর্ণ ডাকছিল কেন তোমাকে?”

অভী তাকে সবই বলল। নিধি অবাক হয়ে বলল, “চন্দ্রহাস নিয়ে ও কী করবে? ওই তরবারি নিয়ে তুমি ছাড়া আর কারও যুদ্ধ করার ক্ষমতাই তো নেই।”

অভী বলল, “ওর হাসি দেখে মনে হয়েছিল, ওটা নিয়ে যুদ্ধ করার কথা ও ভাবছেই না। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ওর। যাকগে, যা-ই ঘটুক আমরা পরে জানতে তো পারবই।”

আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ওদের বাহিনী এসে পৌঁছল নদীর তীরে। বেলা বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজ। অভীর কপালে ঘাম দিচ্ছে। জামার হাতায় মুখ মুছে নিল সে।

অধিনায়ক বজ্রধর নদীর হলুদ জলের একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। বাহিনীর অগ্রগতি থেমে গেল।

বজ্রধর বললেন, “এইখানেই আমরা অপেক্ষা করব। পর্বত সংবাদ নিয়ে এলে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হব।”

অভীর পাশে এসে দাঁড়াল নীলাভ্র; একবার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে। “অভী, ভয় করছে নাকি রে?”

“না, বাবা।”

শ্যামশ্রীও এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার সামনে। তিনি বললেন, “আজ যা-ই ঘটুক, অভী, সাহস হারাস না। মনে রাখিস, মৃত্যুই জীবনের একমাত্র নিশ্চিত পরিণাম; তাই এর জন্য ভয় পাওয়ার কোনো মানে নেই।”

অভী বলল, “আমি ভয় পাচ্ছি না, মা।”

“যদি আজ কোনো প্রিয়জনকে হারাতে হয়, তা-ও শোক করিস না। এই কথাটা কখনও ভুলিস না, আমরা যোদ্ধারা সবাই এসেছি অসহায়কে রক্ষা করার ব্রত নিয়ে। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, তাতে আমাদের আপশোশ করা চলবে না।”

অভী বুঝতে পারল না মা ঠিক কী বলতে চাইছে। কিন্তু কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করার আগেই স্বর্ণশেখর চোঁচিয়ে উঠল, “আসছে! পর্বত আসছে।”

সঙ্গে-সঙ্গে সবার চোখ চলে গেল আকাশের দিকে। মাল্যপর্বতের দিক থেকে জটায়ুতে চেপে উড়ে আসছে পর্বত। অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “সবাই তৈরি হও। ধানুকী-সেনা, নিজের পূর্বনির্ধারিত জায়গায় চলে যাও। পর্বত ফিরে আসছে মানে রাক্ষসবাহিনী কাছেই এসে পড়েছে।”

সঙ্গে-সঙ্গে সেনাবাহিনীর সকলে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনুর্বাণ হাতে একদল সেনা এসে দাঁড়াল নদীর পাড়ে। পর্বতের জটায়ু নেমে এল নদীতীরে বজ্রধরের সামনে।

বাকি সমরোত্তমদের সঙ্গে অভী আর নিধিও এগিয়ে গেল তার দিকে। শ্যামশ্রী বললেন, “ওরা কতদূরে, পর্বত?”

পর্বত বলল, “বেশি দূরে নেই; শীঘ্রই এসে পড়বে। কিন্তু আমার কাছে অবিশ্বাস্য একটি সংবাদ আছে।”

বজ্রধর বললেন, “বলো, শুন।”

পর্বত বলল, “মরুময় আসছেন বাহিনীর সঙ্গে। শুনলাম, বাহিনী এখানে পৌঁছলে আকাশলোক থেকে বাকি পাঁচজন ঐশিকও নেমে আসবেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাক্ষসদের নজর এড়িয়ে আমি দেখা করেছিলাম উত্তরার সঙ্গে। যে চিকিৎসকের দল আসছে আহত রাক্ষসদের সেবা করার জন্য, উত্তরা সেই দলের মধ্যে আছে। তার পরামর্শেই লুকিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে দেখা করে এলাম।”

মেঘবর্ণ অবাক হয়ে বলল, “বলো কী হে? একদম শত্রুপক্ষের রাজার সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ?”

“হ্যাঁ। সৌজন্যের কাছে যা শুনলাম, তাতে আমি হাঁ হয়ে গেছি।”

“কী শুনলে?”

“সৌজন্য নিজের মুখে আমাকে বলেছে, এই যুদ্ধযাত্রা করতে তার আদৌ সম্মতি ছিল না; শুধু ঐশিকদের চাপে পড়ে তাকে আসতে হচ্ছে। সব ঐশিকদের হয়ে মরুময় তাকে কথা দিয়েছেন, সে সেনা নিয়ে সমরগরিমায় পা দিলেই তাকে ওঁরা ঐশিকত্ব প্রদান করবেন। তার জন্য কিছু মায়া-অনুষ্ঠান করতে হয়; সেগুলো

সবার সামনেই সম্পন্ন করা হবে। সৌজন্য আমাকে বলল, ‘পর্বত, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। তুমি গিয়ে অধিনায়ক বজ্রধরকে সংবাদ দাও, আমার ঐশিকত্ব বরণ করার আগে পর্যন্ত আমাদের বাহিনী সমরগরিমাকে আক্রমণ করবে না। আর একবার যে-ই আমি ঐশিকত্ব লাভ করব, সঙ্গে-সঙ্গে মাল্যপর্বতের রাক্ষসবাহিনী আর সমরগরিমার বাহিনী আক্রমণ করবে ঐশিকদের। ওঁরা যত বড়ো যুদ্ধবিদই হোন না কেন, এই দুই বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ কোনোমতেই ঠেকাতে পারবেন না। ওঁদের ঘিরে ধরে ওখানেই আমরা মেরে ফেলব। আর তারপরেই সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতে চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে।’”

সৌজন্যের পরিকল্পনা শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা ফুটল না। তারপর স্বর্ণশেখর বলল, “লোকটা অত্যন্ত বদমাশ, আমি জানতাম। কিন্তু এতখানি ভয়ানক পরিকল্পনা ওর মাথায় আসতে পারে, আমি অন্তত ভাবতে পারিনি।”

বজ্রধর বললেন, “আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কথাগুলো কতটা বিশ্বাসযোগ্য? সত্যিই কি সৌজন্য আমাদের সঙ্গে মিলে ঐশিকদের হত্যা করার কথা ভাবছে? না কি এটাও ওর কোনো নতুন চাল?”

মেঘবর্ণ বলল, “সৌজন্যকে বিশ্বাস করে এর আগে আমরা অনেকবার ঠকেছি, তা-ই নয় কি?”

নীলাভ্র বলল, “তা ঠিক। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি একটু আলাদা। সৌজন্য নিজেই অসম্ভব চাপের মধ্যে আছে। মাল্যপর্বতের সব মেঘ ধ্বংস করে দিয়ে মরুময় ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় ঐশিকদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারলে ওর সিংহাসনের কাঁটা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। আমার মনে হয়, এই প্রস্তাবটা মেকি নয়।”

ততক্ষণে বজ্রধরের আদেশে মৃগেন্দ্র আর উষসীর নেতৃত্বে ধনুর্ধারী সেনারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নদীতীর বরাবর। বিপক্ষের সৈন্যকে তারা কিছুতেই নদী পেরিয়ে আসতে দেবে না; নাগালের মধ্যে এলেই রাশি-রাশি বাণ বর্ষণ করে পর্যুদস্ত করে দেবে। বজ্রধর বললেন, “আমার মনে হয়, এই ঝুঁকিটুকু নিয়ে দেখা যেতে পারে। ওরা এখন আমাদের এলাকায় আছে। একবার ওরা যদি এদিকে এসেও পড়ে, তাহলেও ওরা ফাঁদের মধ্যেই থাকবে। পেছনে বিষাক্ত জলের নদী, সামনে অস্ত্রধারী সমরগরিমার সেনা। চট করে আক্রমণ করতে ওরা পারবে না। করতে গেলে নিজেরাই বিপদে পড়বে। তোমরা কী বলো?”

পর্বত বলল, “আমি বলি, সৌজন্যকে একটা সুযোগ দিয়েই দেখুন। সত্যি-সত্যিই যদি ঐশিকদের বাগে পাওয়া যায়, তাহলে এত বড়ো একটা যুদ্ধ এড়ানো যাবে।”

নীলাভ্র বলল, “সৌজন্যকে যেটুকু বুঝেছি, ও স্বার্থের জন্য সব করতে পারে। ওর নিজের স্বার্থেই এখন আমরা ওর বন্ধু, ঐশিকরা শত্রু। তাই ও যদি তাঁদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে, মন্দ কী?”

শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণেরও সমর্থন পাওয়া গেল। বজ্রধরের আদেশে ধানুকী-সেনা ধনুতে বাণরোপন করে প্রস্তুত হয়ে থাকল বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ না পেলে তারা অস্ত্রমোচন করবে না।

অল্লক্ষণের মধ্যেই নদীর ওপারে দৃশ্যমান হল বিশাল রাক্ষস-বাহিনী। বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মরুময় স্বয়ং— তাঁর হাতে খোলা তরবারি; তাঁকে অনুসরণ করে আসছে রাক্ষস সেনাদল। প্রজ্ঞাও আছেন দলে; কিন্তু সেনানায়িকার শিরোভূষণ আর তাঁর মাথায় নেই। দলের বেশ কিছুটা পেছনে আছে সৌজন্য। তার হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি, মুখে চতুর হাসি।

নদীর তীরে এসে বিপক্ষকে ধনুর্বাণ হাতে প্রস্তুত দেখে মরুময় একটু থমকে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন, “অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন নদীর তীরে তাঁর সেনাদের পাশে। তাঁর পায়ের কয়েক আঙুল সামনে দিয়েই ছলছল শব্দে বয়ে যাচ্ছে মৃত দেবতার নদীর বিষাক্ত হলুদ জল। তাঁর পায়ের চাপে একমুঠো ঝুরঝুরে বালি গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।

তাঁকে দেখে মরুময় বললেন, “আমরা সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছি, কিন্তু যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং শান্তির প্রস্তাব নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের নির্বিঘ্নে ওপারে যেতে দিন, তাহলে আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের প্রস্তাবটি জানাতে পারি।”

বজ্রধর হাসলেন। “যুদ্ধের জন্য পুরো তৈরি বাহিনী নিয়ে আপনি শান্তির কথা বলতে এসেছেন! বাহু, মরুময়! একটা কথা বলুন তো, অশান্তি শুরু হল কবে যে আজ শান্তিপ্রস্তাবের দরকার পড়ল? মাল্যপর্বত আর সমরগরিমার মধ্যে বিগত বেশ কিছুকাল যাবত শান্তি তো অক্ষুণ্ণ আছে।”

অভী দেখল, মরুময় সবার সামনে অপ্রস্তুত হয়ে রাগে দাঁত দিয়ে চোঁট কামড়াচ্ছেন। বজ্রধরের ওপর তাঁর অনেকদিনের জমানো রাগ আছে, এ-কথা এখন সমরগরিমায় আর কারও জানতে বাকি নেই।

তিনি বললেন, “বাহিনী নিয়ে এসেছি কেবল আত্মরক্ষার কারণে। আপনি যদি আক্রমণ না করে আমাদের ওপারে যেতে দেন, তাহলে পুরো বিষয়টাই শান্তিপূর্ণ ভাবে আমরা মিটিয়ে নিতে পারি।”

বজ্রধর বললেন, “আপনার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, মরুময়। কিন্তু নিতান্ত কৌতূহলবশেই আপনাদের এপারে আসা অনুমতি দিচ্ছি। মনে রাখবেন, অশান্তি পাকাবার চেষ্টা করলে আপনাদের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।”

মরুময় মুখ বিকৃত করলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। অধিনায়ক বজ্রধরের ইঙ্গিতে ধানুকী-সেনা তিরনিষ্ক্ষেপ থেকে বিরত রইল; তবে তাদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকল রাক্ষস-বাহিনীর দিকে।

রাক্ষসেরা ততক্ষণে সারি-সারি নৌকায় চেপে এদিকে আসতে শুরু করেছে। অভী কোমরে হাত দিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল, চন্দ্রহাস নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মেঘবর্ণের দিকে চোখ গেল তার। কই, তার কাছেও তো অস্ত্রটা দেখা যাচ্ছে না! কোথায় ওই মহার্ঘ দৈবাস্ত্রকে রেখে এল সে?

অভীর কাছে অবশ্য মেঘবর্ণেরই দেওয়া ময়ূরবজ্র তরবারি আছে এখনও। সেটিকেই নিষ্কোষিত করে নিধির পাশে দাঁড়িয়ে রাক্ষস-সেনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

মরুময় এসে নামলেন নদীর এপারে। তাঁর সঙ্গেই ছিল সৌজন্য; সে নৌকা থেকে নামার সময় অভীর দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপল; ভাবখানা হচ্ছে, “যা বলেছি, মনে আছে তো?”

নিধি ফিসফিস করে অভীর কানে-কানে বলল, “মুখটা দেখো হতভাগার। হাসি যেন আর ধরছে না।”

অভী বলল, “তা হবে না কেন? আজ ওর অনেকদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে কিনা! ঐশিকরা ওকে এখানেই ঐশিকত্ব দান করবেন যে।”

মরুময় এসে দাঁড়ালেন বজ্রধরের সামনে। কেউই কাউকে নমস্কার করলেন না।

বজ্রধর বললেন, “আপনি একটা প্রস্তাব দিতে চাইছিলেন, মরুময়। বলুন, শোনা যাক আপনার বক্তব্য।”

মরুময় বললেন, “হ্যাঁ, আমি শান্তিপ্রস্তাব নিয়েই এসেছি, বজ্রধর। আপনি সবার সামনে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের মধ্যে সম্পর্ক যে কোনোদিনই খুব মধুর ছিল, এমনটা নয়। তাই একটা স্থায়ী শান্তিচুক্তি দরকার বলেই আমার মনে হয়।”

বজ্রধর বললেন, “সম্পর্ক মধুর ছিল, এমন দাবি তো আমিও কখনও করিনি। আর শান্তির কথা বলছেন? হিসাব করে দেখুন, বিগত সব কয়টি যুদ্ধে আপনারাই সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে এসেছেন; আমরা কিন্তু একবারও মাল্যপর্বত আক্রমণ করতে যাইনি। শান্তির বিষয়ে আমাদের সদিচ্ছার অভাব কোনোদিন হয়নি, এ-কথা নিশ্চিত জানবেন।”

মরুময় একটু কেশে বললেন, “আচ্ছা, অতীতের কথা থাকুক, বর্তমানের কথা হোক। এই মুহূর্তে সমরগরিমার সঙ্গে আমি সন্ধি চাই। আকাশলোকে অন্য যে ঐশিকরা আছেন, তাঁরা সব ধ্বংস করে দিতে চান বটে, কিন্তু আমি আপনাদের শেষ সুযোগ দিতে চাই। সমরগরিমার কাছে আমাদের একটাই দাবি, আপনাদের জলের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে তুলে দিন এবং এই পীতপত্রবন ধ্বংস করে দিন। তাহলে আর প্রলয় আসবার দরকার পড়বে না। আমি আবার মেঘ তৈরি করে আপনাদের জলের সংস্থান করে দেব।”

বজ্রধর সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। “অর্থাৎ জলের জন্য আমাদের দাস বানিয়ে রাখতে চান আপনারা, তা-ই না? এই প্রস্তাবে রাজি

হওয়ার মতো উন্মাদ আমরা নই। আপনাদের সদিচ্ছা নিয়েও আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আর এই সৌজন্যের তো একটা কথাও বিশ্বাস করা যায় না।”

মরুময় সৌজন্যের দিকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। “সৌজন্যকে নিয়ে আপনাদের যে সমস্যা, তার একটা উপায় আমি করতে পারি।”

“কী উপায়?”

“বলছি। কিন্তু তার আগে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে যান। সম্মানিত অতিথিরা আসছেন; আমি চাইছি, তাঁদের সামনেই সব আলোচনা হোক।”

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অভী আকাশের দিকে তাকাল। একটা কালচে ছায়া নেমে আসছে তাদের মাথার ওপরে। দেখেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

এই বস্তুটিকে আগেও দেখেছে সে।

আকাশলোকের স্বর্ণরথ নেমে এল মৃত দেবতার নদীর তীরে। দুপুরের আলোয় আগুনের মতো ঝকঝক করছে তার সোনায় মোড়া দেহ। সূর্য আর তরবারি আঁকা পতাকা উড়ছে রথের চূড়ায়। রথ থেকে নেমে ঐশিকরা এসে দাঁড়ালেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু আজ আর কেউ তাঁদের দেখে মাথা নোয়াল না।

অভীরা এর আগে আকাশলোকে গিয়ে যে মূর্তি দেখেছিল, সেইরকমই একটি দেহে পাঁচমাথায়ুক্ত অবয়ব নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা। সমরগরিমা এবং মাল্যপর্বতের বেশিরভাগ লোকই ঐশিকদের কখনও দেখেনি। তাঁদের এই ভয়ংকর আকৃতি দেখে দু’পক্ষের সেনাদলের মধ্যেই একটা উত্তেজিত গুনগুন শুরু হল।

বজ্রধরকে দেখে তাঁরা হাসলেন। বজ্রধর হাসলেন না, শুধু একটু মাথা নাড়লেন। ঐশিকরা বললেন, “আপনি তো বুদ্ধিমান মানুষ, বজ্রধর। মরুময় আপনাকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা গ্রহণ করলেই সমরগরিমার মঙ্গল হবে, এ-কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?”

বজ্রধর বললেন, “আমি যা বোঝার ঠিকই বুঝেছি। সমরগরিমার অরণ্য ধ্বংস করার জন্য যাঁরা রাতের অন্ধকারে অগ্নিদানব পাঠিয়ে গাছ পোড়ানোর ষড়যন্ত্র করেন, তাঁদের কাছ থেকে সমরগরিমার কীসে মঙ্গল হবে, সে বুদ্ধি নিতে আমি রাজি নই।”

মরুময় বললেন, “প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করব আপনাকে। তবে তার আগে তোমার ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যাক, কী বলো সৌজন্য?”

সৌজন্য দাঁত বার করে হাসল। “আপনি তো জানেন, মহামন্ত্রী মরুময়, আমি কতদিন ধরে অধীর আগ্রহে এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছি!”

বলেই অভীর দিকে ফিরে চোখ টিপল সে। অভী ভাবতে লাগল, ঐশিকত্ব পেয়ে গেলে কি সঙ্গে-সঙ্গেই সৌজন্য ঐশিকদের ওপর আক্রমণ করবে? ওর সেনাদলকে কি সেইরকম নির্দেশই দেওয়া আছে? এদের মধ্যে কিছু পত্রতিলক থাকলেও বেশিরভাগই তো বিমোহক রাক্ষস; তার মানে, এরা সৌজন্যের অনুগত হওয়ারই কথা।

বজ্রধরের সামনে থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মরুময় দ্রুত মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের সামনে নদীর বালির মাঝখানে জেগে উঠল একটা নরকগহ্বরের জ্বলন্ত মুখ।

শ্যামশ্রী পাশ থেকে বললেন, “নরকগহ্বর আহ্বান করছেন কেন আপনি?”

মরুময় বললেন, “প্রয়োজন আছে। সৌজন্যকে আমরা কথা দিয়েছি, তাকে ঐশিকত্ব প্রদান করে আমাদের একজন করে নেব। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য অল্প পরিমাণে নরকান্নির উপস্থিতি দরকার। সমরোত্তমগণ, এ-ও মনে রাখবেন, ইচ্ছা করলে এই নরকের আগুন ছড়িয়ে আমরা সমরগরিমাকে বিপর্যস্ত করতে পারি, পীতপত্রবনকেও পুড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমরা জানি, অভী একজন বিষনিয়ন্তা; নরকবিষকে থামানোর ক্ষমতা তার আছে। তাই সে-কথা আমরা আপাতত ভাবছি না।”

“তাহলে এটা ডাকলেন কেন?” নীলাভ্র জিজ্ঞাসা করল।

“কারণ আছে। বলব। আপাতত আমরা কিন্তু বন্ধুত্বের হাত বাড়াতেই চাই।”

বজ্রধর বললেন, “সেই হাত গ্রহণে আমরা আবার আমাদের অক্ষমতা জানাচ্ছি।”

মরুময় দারুণ ভ্রুকুটি করে তাকালেন তাঁর দিকে। বজ্রধর মাথা উঁচু করে পালটা তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

অভী দেখল, সমরগরিমার সেনাদল এবং শিক্ষার্থীরা স্তব্ধ হয়ে দেখছে এই বাকযুদ্ধ। অধিনায়কের সামান্য ইশারা পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এবার একটু হেসে মরুময় বললেন, “আমাদের সদিচ্ছার একটা প্রমাণ আপনাদের এখুনি দেব। দেখা যাক, তারপর আপনাদের মত পরিবর্তন হয় কিনা।”

তাঁর হাতের ইশারায় সৌজন্য এসে দাঁড়াল জ্বলন্ত নরকগহ্বরের পাশে। মরুময় উচ্চকণ্ঠে বললেন, “সৌজন্য এতদিন আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে, আমাদের বহু কঠিন আদেশ বিনাপ্রশ্নে পালন করেছে। আকাশলোকের কল্যাণকামনায় তার এই অবদান আমরা ভুলব না কোনোদিন। তাই এর প্রতিদান হিসাবে সৌজন্যকে আমরা কথা দিয়েছি, ঐশিকপদে আমরা তাকে বরণ করে নেব। আপনাদের সামনেই আমরা এই অতুলনীয় সম্মান তাকে প্রদান করতে চাই।”

সৌজন্য হাসিমুখে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করল তাঁর প্রতি। অভীর বারবার মনে পড়তে লাগল, এই সদ্য মেঘনির্মাণশালার মেঘ ধ্বংস করে দেওয়া নিয়ে এদের দু'জনের মধ্যে কী প্রবল অশান্তি হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে তাদের এই গলায়-গলায় বন্ধুত্ব অটুট আছে, বোঝা যায়নি! নাকি এ-ও পুরোটাই অভিনয়?

নিধি পাশ থেকে তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, “সৌজন্যের মতো দুষ্ট লোক ঐশিকত্ব লাভ করলে আমাদের জন্য ভালো হবে না মোটেই।”

অভীও ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল, “যে মকটগুলো এখন আছে, সেগুলোই আর কী এমন ভালো?”

নিধি ফিক্ করে হেসে ফেলল। সমরোত্তমরা চুপ করে দেখাচ্ছেন ঐশিকদের এই নাটক। নীলাদ্র শ্যামশ্রীর কানে কানে কী একটা যেন বলল। শ্যামশ্রী মাথা নাড়লেন একবার।

অন্য ঐশিকরা এসে দাঁড়ালেন মরুময়ের পাশে। একসঙ্গে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে রইলেন সৌজন্যের দিকে, মস্ত পড়তে লাগলেন গুনগুন রবে। তাঁদের মস্তোচ্ছারণের সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের দীর্ঘ শিখা রক্তিম জিহ্বার মতো লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল নরকগহ্বরের মধ্য থেকে।

বাকিদের সঙ্গে অভী আর নিধিও খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিল ঐশিকত্ব প্রদানের অনুষ্ঠানটা ঠিক কেমন হয়। মরুময় গম্ভীর স্বরে বললেন, “সৌজন্য, নরকগহ্বরের দিকে তিন পা এগিয়ে যাও। তারপর দু’হাত বুকের কাছে জড়ো করে চোখ বন্ধ করো।”

অভীর দিকে তাকিয়ে আরো একবার দুট্ট হাসি হাসল সৌজন্য, তারপর গুনে-গুনে তিন পা এগিয়ে গেল সে জ্বলন্ত অগ্নিগহ্বরের দিকে। চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

মরুময় উপস্থিত দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, “এবার সেই মুহূর্ত সমাগত।”

সৌজন্য দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত নরকগহ্বরের দিকে মুখ করে; তার চোখ বন্ধ। মরুময় ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন তার পেছনে। তারপর প্রবল শক্তিতে তিনি ধাক্কা মারলেন সৌজন্যের পিঠে।

বন্ধ চোখ খোলারও সুযোগ পেল না সৌজন্য; কেবল অসহায় “আঁ-আঁ” করে একটা বিকট চিৎকার করতে করতে সে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা অগ্নিময় নরকগহ্বরের মধ্যে। দু’পক্ষের সেনাবাহিনী চূড়ান্ত অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল এই ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে।

অভী জানে, শরীরে বজ্রমাণিক থাকলেও নরকের ওই অকল্পনীয় উত্তাপ থেকে নিজেকে কয়েক মুহূর্ত রক্ষা করার ক্ষমতাও সৌজন্যের নেই। এরই মধ্যে নির্ঘাৎ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার দেহটা।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। রাক্ষস-সেনারা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে; যুদ্ধ গুরুর আগেই তাদের নতুন রাজার এই পরিণতি হবে, তারা ভাবতে পারেনি।

নিধি পাশ থেকে নীচুগলায় বলল, “অতি চালাক ভেবেছিল নিজেকে সৌজন্য! ভেবেছিল, ঐশিকদের চেয়েও বেশি বুদ্ধি ধরে ও!”

অভী চুপ করে রইল। তার কানে তখনও যেন বাজছে সৌজন্যের মরণান্তিক আর্তনাদটা।

“আপনাদের শত্রুপক্ষের রাজাই আর নেই, বজ্রধর। রাজা না থাকলে তার সেনারা লড়াই করবে কার জন্য?” মরুময় মৃদু হেসে ফিরে তাকালেন বজ্রধরের দিকে। “আশা করি প্রমাণ দিতে পারলাম যে আপনাদের মঙ্গলসাধনে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হয়নি?”

বজ্রধর-সহ সব সমরোত্তমের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বজ্রধর বললেন, “সৌজন্য আপনাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, আমরা সবাই জানি। তার সাহায্য ছাড়া মাল্যপর্বত এবং সমরগরিমা— কোনো জায়গাতেই আপনারা এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। ব্যক্তি হিসাবে তাকে আমরা খুব পছন্দ করতাম না ঠিকই, কিন্তু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না— এই প্রতিদান কি তার প্রাপ্য ছিল?”

পাঁচমাথায়ুক্ত ঐশিকদের দেহটা এবার এগিয়ে এল সমরোত্তমদের দিকে। “ছিল, বজ্রধর। সৌজন্য ভেতরে-ভেতরে কী ভাবছে, কী করতে চাইছে, সব জানতাম আমরা। ও সর্বদা রাজ্য চেয়েছে, ক্ষমতা চেয়েছে। আমাদের সহায়তায় সেই লক্ষ্যপূরণে ওর অসুবিধা হয়নি। তারপরেও ও মনে করেছে, ও আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, আমাদের দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নেবে। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম, আকাশলোকেরও ক্ষমতা দখল করতে চাইছিল সৌজন্য। তাই আজকের এই ঘটনাটা ওর কৃতকর্মের ফল বলেই ধরে নিতে পারেন।”

মরুময় বললেন, “নিজেকে খুব চালাক মনে করত সৌজন্য, কিন্তু এইটুকু শুধু জানত না যে শরীরে ঐশিকরক্ত না থাকলে ঐশিক পদে আসা যায় না। ওই মায়াকে কার্যকর করার জন্য ঐশিকরক্ত লাগে। অতী যদি চাইত, তাহলে সে একজন ঐশিক হতে পারত, কিন্তু সৌজন্যের পক্ষে কোনোদিন তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই মায়ার এত গভীরের কথা ও জানত না, আর ওর পক্ষে তা জানা সম্ভবও ছিল না। তাই আমাদের মুখের কথাতেই ও বিশ্বাস করে বসেছিল। মেঘগুলোকে দখল করে যে ও পূর্ণ ক্ষমতা পেতে চাইছিল, আমরা কি তা বুঝিনি? তখন থেকেই আমাদের কাছে ওর দরকার ফুরিয়ে গেল। সৌজন্যের মতো ক্ষমতালোভী লোকের চিন্তা সর্বদা একই পথে চলে, বজ্রধর। ও ভেবেছিল আমাদের ব্যবহার করে ও খুব চালাকি করছে, কিন্তু আসলে ও-ই ব্যবহৃত হয়েছে। চিরজীবন তাই ও আঙা বাহী সৈনিকই রয়ে গেল, প্রকৃত রাজা আর হতে পারল না। আর কে না জানে, রাজার স্বার্থে সৈনিকগুলোকে মাঝেমধ্যেই বলি দিতে হয়?”

বজ্রধর বললেন, “মরুময়, আপনার শুভবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস আমার কোনোকালেই ছিল না, কিন্তু সৌজন্যের মতো অত্যন্ত চালাক এবং সাবধানী একজন রাক্ষস কীভাবে আপনাদের বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দিল, এটা ভাবতেই আমার অবাক লাগছে।”

ঐশিকদের একদেহে পাঁচটা মাথা একসঙ্গে হেসে উঠল। “সৌজন্য খুব চালাক ঠিকই, কিন্তু ওরও দুর্বল জায়গা ছিল। সে হল ওর লোভ— ক্ষমতার লোভ। আর বেশিরভাগ প্রাণী কেন ফাঁদে পা দেয় বলুন তো? লোভে পড়ে।”

মরুময় বললেন, “তাহলে সমরগরিমার সমরোত্তমগণ, আপনারা কী বলেন? আমরা কি এখন আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আশা করতে পারি?”

বজ্রধর মাথা নাড়লেন। “আপনি এর আগে পীতপত্রবন বিনাশ করে সমরগরিমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন, আমি ভুলে যাইনি, মরুময়। এখনও আপনাদের মিত্রতার বিনিময়ে ওই একই মূল্য আপনারা চান, তা-ই না? আমাদের

জল, আমাদের জীবন, আমাদের স্বাধীনতা— আকাশলোকের বন্ধুত্বের বিনিময়ে এইগুলোই কি আপনারা চাইছেন না?”

মরুময়ের মুখ থেকে ছদ্ম-ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল। গরগর করে তিনি বললেন, “সবই তো বোঝেন আপনি। তাহলে দেরি করছেন কেন? নতজানু হয়ে বসুন আমাদের সামনে। বশ্যতা স্বীকার করুন, তাহলে হয়তো আপনাদের জীবন্ত ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবে দেখতে পারি আমরা। ওই শুকিয়ে আসা অরণ্যকে আপনারা কোনোভাবেই আর বাঁচাতে পারবেন না। ত্যাগ করুন আপনার সমরগরিমা, তাহলে মেঘনির্মাণ করে কিছুটা জলের ভিক্ষা দিয়ে যেতে পারি আপনাদের!”

ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল সমরগরিমার সেনাদল। পর্বত আর স্বর্ণশেখর এগিয়ে এসে দাঁড়াল বজ্রধরের দু'পাশে। স্বর্ণশেখর বলে উঠল, “সাবধান, মরুময়! মনে রাখবেন, সমরগরিমার মাটিতে দাঁড়িয়ে অধিনায়ক বজ্রধরের প্রতি অসম্মানবাক্য প্রয়োগ করে এখান থেকে জ্যান্ত বেরোতে পারবেন না আপনারা।”

মরুময়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন বাকি পাঁচ ঐশিক। “কাকে ভয় দেখাচ্ছ, স্বর্ণশেখর? আমাদের অতুলনীয় মায়াশক্তির সামনে তোমাদের ক্ষমতা কতটুকু? বজ্রধর, আপনি তাহলে সংঘাত ছাড়া আর কোনো উপায় রাখছেন না। এখনও বলছি, যদি ভালো চান, তাহলে আমাদের অধীনতা স্বীকার করুন এবং আপনার ওই যমদণ্ডটি আমাদের হাতে তুলে দিন।”

বজ্রধর একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। “যমদণ্ড চাই আপনার, মরুময়? আপনি-সহ আপনার সব ঐশিকবন্ধুকে ইচ্ছা করলেই এই দণ্ড প্রয়োগ করে হত্যা করতে পারি আমি। কিন্তু আমি মৃত দেবতাকে কথা দিয়েছিলাম, নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনোদিন এই অস্ত্র আমি প্রয়োগ করব না। আর আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি এর অপমান করতেও পারব না।”

ক্রুদ্ধভাবে দাঁতে দাঁত ঘষলেন মরুময়। অভী দেখল, মেঘবর্ণ হঠাৎ এগিয়ে যাচ্ছে অধিনায়কের দিকে।

মেঘবর্ণের ঠোঁটের কোণে একটা সূক্ষ্ম হাসি যেন দেখতে পেল সে।

অধিনায়ক বজ্রধরের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে সে মৃদুস্বরে ডাকল, “অধিনায়ক। একটা কথা।”

একটু অবাক হয়ে বজ্রধর ফিরে তাকালেন তার দিকে। “বলো, মেঘবর্ণ।”

“আপনার যমদণ্ডটি দয়া করে আমার হাতে দিন।”

বজ্রধর তার মুখের দিকে ভালো করে একবার দেখে নিলেন। তিনি কী বুঝলেন তিনিই জানেন, কিন্তু দ্বিধা না করে দণ্ডটি তিনি মেঘবর্ণের হাতে দিয়ে দিলেন। মেঘবর্ণের হাতে একটা চামড়ার ঢাকনামতো জিনিস ছিল; সেটা দণ্ডের হাতলে পরিয়ে নিয়ে সে পিছিয়ে গেল।

অভী একবার অবাক হয়ে ভাবল, ‘সবক’টা বিধ্বংসী অস্ত্র মেঘবর্ণ নিজের কাছে নিয়ে নিচ্ছে কেন? মতলবটা কী ওর?’

একবার মুখ ফিরিয়ে মেঘবর্ণ তাকাল নীলাভ্রর দিকে। অভীও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, তার বাবার ঠোঁটের একপ্রান্তে একটা ছোট হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

“বাবা কিছু একটা বুঝতে পেরেছে।”

মরুময় এবং বাকি পাঁচজন ঐশিক ভ্রুকুটি করে দৃশ্যটা দেখছিলেন। মরুময় ডাকলেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

মেঘবর্ণ তবু সামনে এল না। বজ্রধরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দণ্ডটা নিজের পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে সে উত্তর দিল, “বলুন।”

“সামনে এসে দাঁড়াও।”

অগত্যা মেঘবর্ণ যেন কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল তাঁর মুখোমুখি। মরুময় বললেন, “কেন তুমি বজ্রধরের কাছ থেকে যমদণ্ডটা নিলে, আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, ওটি এই মুহূর্তে আমার হাতে সমর্পণ করো।”

মেঘবর্ণ মাথা ফিরিয়ে তাকাল অধিনায়ক বজ্রধরের দিকে। “আপনি কী আদেশ করেন, অধিনায়ক?”

বজ্রধর বললেন, “তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো।”

ধীরে-ধীরে নিজের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আবার যমদণ্ডটি বার করে আনল মেঘবর্ণ। তার বাড়িয়ে দেওয়া দণ্ডের হাতল ধরে টেনে বস্তুটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন মরুময়। সমরগরিমার শিক্ষার্থীরা একযোগে হায়-হায় করে উঠল।

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী একসঙ্গে বলে উঠলেন, “সেনারা শান্ত হও।”

নদীতীর আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসছে না। উভয়পক্ষের বিরাট দুই সেনাদল নীরবে অপেক্ষা করে আছে এর পর কী হয় দেখার জন্য।

মেঘবর্ণ তাচ্ছিল্য সহকারে বলল, “নিন, এইটার জন্য আপনার এত লোভ তো? এটা নিয়ে এবার বিদায় হোন। এই মহান অস্ত্র ধারণ করতে গেলে এর যোগ্য হতে হয়। বজ্রধর হলেন প্রকৃত যোগ্য মানুষ, আপনি নন। যমদণ্ডের অংশশক্তি ধারণ করে তিনি ওই অস্ত্রকেই সম্মানিত করেছেন, এবং ওটি কাছে না থাকলেও তিনি সকলের কাছে একই রকম শ্রদ্ধার পাত্র থাকবেন। অন্যায়ভাবে পাওয়া দৈব-অস্ত্র অধিকার করে বীরত্ব অর্জনের চেষ্টা করে শুধু কাপুরুষেরা; বজ্রধর কোনোদিন সেই নির্লজ্জ ভীরুদের দলে পড়েননি।”

নিধি অভীর কানের পাশে বলে উঠল, “কিন্তু মরুময়ের হাতে অস্ত্রটা তুলে দিয়ে মেঘবর্ণ ঠিক কাজ করল না, অভী।”

অভী উত্তর দিতে গিয়েও পারল না, কারণ ততক্ষণে মরুময় যমদণ্ড উদ্যত করেছেন বজ্রধরের বুকের দিকে।

কুটিল হাসিতে ভরে উঠেছে তাঁর মুখ। চিবিয়ে-চিবিয়ে তিনি বললেন, “অনেকদিন অপেক্ষা করেছি এই মুহূর্তটার জন্য। এই দণ্ডের ক্ষমতা তোমার

কাছে ছিল বলে তুমি একদিন আমাকে অনেক অপদস্থ করেছ। আজ সেই হিসাব মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে। তোমারই যমদণ্ড দিয়ে আমি তোমাকে মৃত্যু দিলাম, বজ্রধর।”

বজ্রধর অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মরুময় তাঁর দিকে অস্ত্রটা তাক করে ঘাতক মায়াশক্তি প্রয়োগ করতে যেতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। মুহূর্তের মধ্যে যমদণ্ড চন্দ্রহাসের রূপ ধারণ করল।

সবাই জানে, এই ভয়ানক দৈবাস্ত্র নিয়ে প্রলয়যোদ্ধা ছাড়া আর কারও যুদ্ধ করা নিষেধ। বজ্রধরকে হত্যার উদ্দেশ্যে মরুময় মায়াপ্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাতের মধ্যে চন্দ্রহাস বলসে উঠল বাঁকা চাঁদের মতো। মরুময় তীব্র আতর্জনাদ করে উঠলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রহাস তাঁর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ল মরুময়ের প্রাণহীন দেহ। তাঁর বুকের ওপর গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে রইল শিবের বক্ষিম তরবারি। তার ফলকে বলমল করতে লাগল মধ্যবেলার সূর্যের উজ্জ্বল আলো।

মেঘবর্ণ বলল, “এই নিন অধিনায়ক আপনার আসল যমদণ্ড।”

পোশাকের মধ্য থেকে আসল যমদণ্ডটি বার করে অধিনায়কের হাতে ফিরিয়ে দিল সে।

নিধি হাঁ করে বলে উঠল, “ভ্রমমায়া! কী অদ্ভুত নিপুণ ভ্রমমায়া! আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারিনি!”

শ্যামশ্রী বললেন, “মরুময় নিজে একজন ঐশিক হয়েও পারেননি। এবার বুঝতে পেরেছি, যমদণ্ডের হাতলে চামড়ার আবরণটা কেন দিয়ে রেখেছিল ও।”

করতালি দিয়ে উঠল সমরগরিমার শিক্ষার্থী আর সেনারা। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাক্ষসরাও। ওদিক থেকে শোনা গেল প্রজ্ঞার উচ্চরবে প্রশংসাধ্বনি, “সাধু সাধু, সমরোত্তম মেঘবর্ণ!”

উল্লাস একটু কমলে সমরোত্তমদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন বাকি পাঁচজন ঐশিক। তাঁদের পাঁচটি মুখে খেলা করছে একাধিক অভিব্যক্তি; সেগুলোর মধ্যে ক্রোধ আর প্রতিহিংসা— এই দুটো চিনতে অভীর ভুল হল না।

সমবেত কণ্ঠে তাঁরা বলে উঠলেন, “আপনারা চাতুরি করে হত্যা করলেন মরুময়কে। এর প্রতিফল আপনাদের না দিয়ে আমরা কী করে যাই বলুন তো?”

বজ্রধর স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁদের দিকে। এই এত বড়ো আঘাতের অন্তত দশগুণ শক্তিশালী প্রত্যাঘাত না করে ঐশিকরা যাবেন না, অভীও স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

আকাশের দিকে মুখ তুললেন তাঁরা; দু’হাত প্রসারিত করলেন উর্ধ্বপানে। অভী ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠল। সেই ভূতবিশেষজ্ঞ সুমন্ত্রের মৃত্যুর সময় এইভাবে হাত তুলে কাদের যেন আহ্বান করতে সে দেখেছিল ঐশিক মরুময়কে?

বিপদ বুঝেই সমরোত্তম শ্যামশ্রী চিৎকার করে উঠলেন, “সবাই সাবধান! ঢাল তৈরি করো, অস্ত্র প্রস্তুত করো! ওরা আসছে!”

ওদিক থেকে প্রজ্ঞাও বুঝতে পেরে গেছেন কী হতে চলেছে। সৌজন্যের অনুপস্থিতিতে তিনি দ্রুত রাক্ষস-বাহিনীর দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন; চেষ্টা করে আদেশ দিতে লাগলেন, “রাক্ষসরা, ধনুতে বাণ যোজনা করো। মুক্ত করো আকাশের দিকে।”

রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস-মানুষ সবাই তৈরি হয়ে গেল আসন্ন আক্রমণের জন্য।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অভীর মনে হল, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু ও কী? ও তো মেঘ নয়? ওগুলো কারা নেমে আসছে আকাশ থেকে?

রাশি-রাশি, হাজারে-হাজারে উড্ডীনখর! অভীর বুক কেঁপে উঠল।

মাথার ওপরের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে ওরা। অজস্র বৃষ্টিবিন্দুর মতো নেমে আসছে প্রাণীগুলো মৃত দেবতার নদীর তীরে জমা হওয়া দুই দেশের বাহিনীর ওপর। রাক্ষস-সেনা, মানুষ-সেনা সবাই তির ছুড়ছে, তরবারি ঘোরাচ্ছে, কিন্তু সেসব দিয়ে কি আর ওই অগণিত দানবীয় খেচরবাহিনীকে আটকানো যায়?

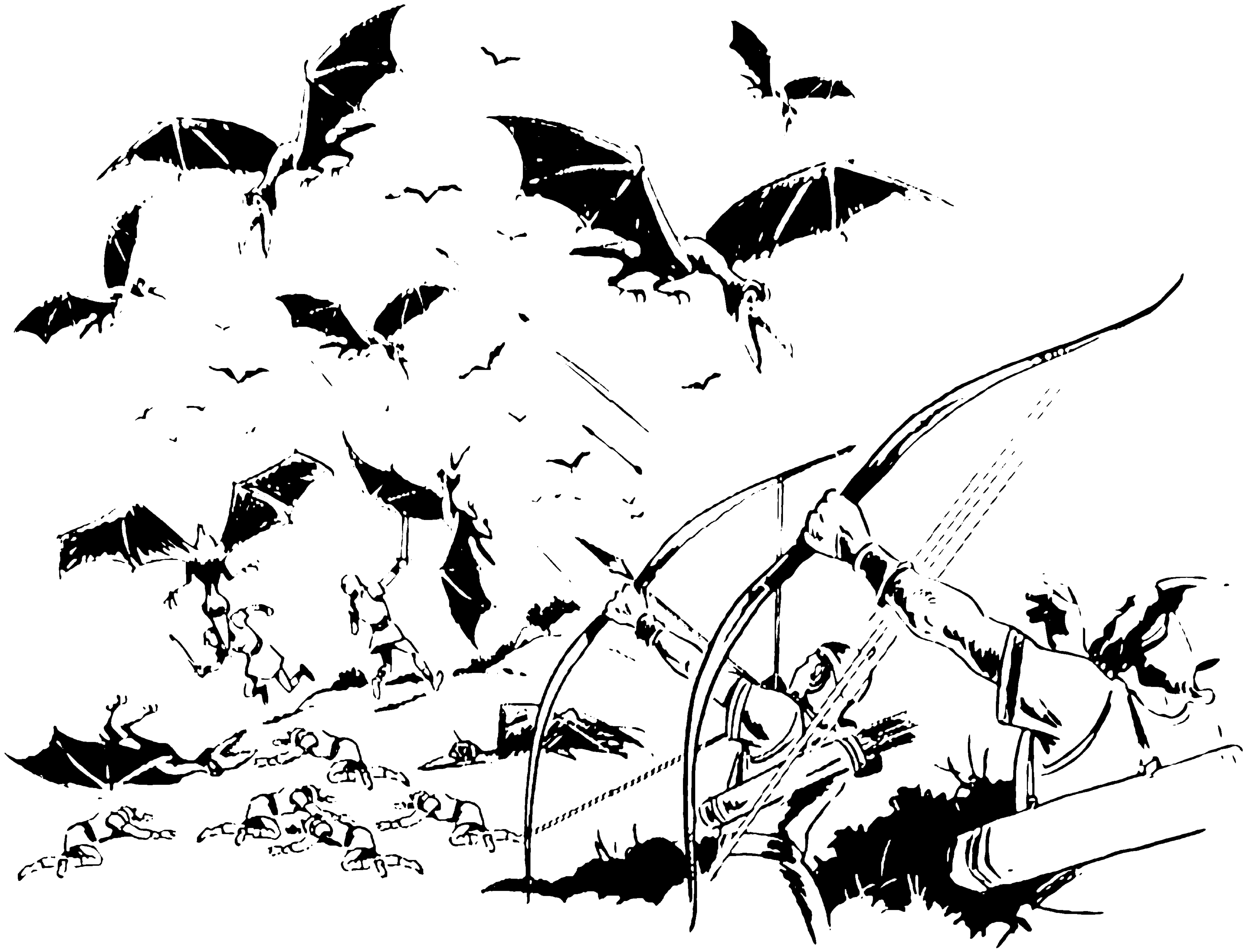
অভী বুঝতে পারছে, আজ আর কারও রক্ষা নেই। তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ধড়ফড় করছে, যেন এক্ষুনি তার শরীর ফেটে পড়বে বিপুল বিস্ফোরণে। তার শরীরের মধ্যস্থ সব ঘৃণা, সব বিষ, সব হিমকুশলতা যেন আবর্তিত হচ্ছে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর মতো। এতদিনে অভী তার সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করতে পারছে, সত্যিই প্রলয় আসছে।

আজ আর তার রক্ষা নেই। আজ আর কারও রক্ষা নেই।

এই মহাসর্বনাশকে ডেকে আনার জন্য ঐশিকদের ওপর ঘৃণায় মনে হল সে ডুবে যাচ্ছে। তার দু’হাত তো বটেই, তার সর্বশরীর ঠান্ডায় যেন জমে গেল।

পরমুহূর্তেই তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভরা যুদ্ধক্ষেত্র— তার মধ্যস্থলে অভী একদম অন্ধ হয়ে গেল।

বিকট তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তার ওপর নেমে এল নখদাঁতসর্বস্ব হিংস্র প্রাণীগুলো।



।। উনবিংশ অধ্যায় ।।

প্রলয়মেঘ

মায়াজগতের ইতিহাসে এমনটি আগে কখনও হয়নি। রাক্ষস-মানুষ-অর্ধরাক্ষসরা একসঙ্গে মিলে ঐশিকদের বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু করল মরণপণ সংগ্রাম। মৃত দেবতার নদীর তীর ভরে উঠল যোদ্ধাদের গর্জন, আর্তনাদ আর হিংস্র উড্ডীনখরদের কণ্ঠবিদারী চিৎকারে।

রাক্ষসবাহিনীর তিরন্দাজরা দ্রুত ধনুকে বাণ আরোপ করে ছুড়ে দিতে লাগল উর্ধ্বপানে। সবগুলো যে ওদের গায়ে আঘাত করল, তা নয়, কিন্তু যে উড্ডীনখরগুলো তিরবিদ্ধ হল, তারা বিকট শব্দ করে আছড়ে এসে পড়ল মাটিতে।

বিরাট বাদুড়-আকৃতির প্রাণীগুলোর ঠোঁট লম্বা ছুরির মতো, তার ভেতরে কুমীরের মতো দাঁত। সেই ধারালো চঞ্চু দিয়ে ওরা আঘাত করছে উড়ন্ত অসিফলকের মতো; যে একবার বিদ্ধ হচ্ছে, তার শরীরে গভীর গর্ত হয়ে যাচ্ছে পলকের মধ্যে। হুৎপিণ্ড বা ফুসফুসে যাদের আঘাত করতে সক্ষম হচ্ছে ওরা, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু ঘটছে।

কিন্তু ওদের দ্বারা যারা একবার আহত হচ্ছে, তাদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠছে। অতীত থেকে দশ হাত দূরে রাক্ষসদের এক সৈনিকের পায়ে

লেগেছিল প্রথম আঘাতটা। সে পড়ে যেতেই আরও চারটে উড্ডীনখর এসে ঘিরে ফেলল তাকে। এখন জ্যান্ত অবস্থায় তাকে ঠুকরে-ঠুকরে মারছে ওরা।

মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসদের রণভংকার, আর্তনাদ আর উড্ডীনখরদের সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে ভরে উঠেছে পীতপত্রবনের শেষে মৃত দেবতার নদীর তীর। বজ্রধর তাঁর যমদণ্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন কোমরে; দু'হাতে তিনি দুটো তরবারি নিয়ে বনবন করে ঘোরাচ্ছেন; যথাসম্ভব শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে করতে উড্ডীনখর নিধন করে চলেছেন।

শ্যামশ্রী একটা মাঝারিমানের মায়া-সুরক্ষা বর্ম গড়ে তুলেছেন তাঁর আর নীলাভ্রর চারপাশে। বর্মটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে উড্ডীনখরের স্রোত ঠেলে তাঁরা যেতে চেষ্টা করছেন অভীর কাছে। কিন্তু মাথার ওপর ছাতার মতো যে অর্ধস্বচ্ছ মায়াবর্মকে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে অটুট রাখার চেষ্টা করছেন, তার ওপরে মুষলধারা বৃষ্টির মতো এসে ঠোকর মেরে যাচ্ছে রাশি-রাশি হিংস্র উড্ডীনখর-চঞ্চু। নীলাভ্র সেই বর্মের তলা থেকে দীর্ঘ তরবারি নিয়ে অদ্ভুত কৌশলে হাত বাড়িয়ে মারছে উড়ন্ত দানবগুলোকে, কিন্তু তার উন্মুক্ত বাহু ওদের ধারালো আক্রমণে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

পর্বত আর স্বর্ণশেখর যুদ্ধ করছে একসঙ্গে। স্বর্ণশেখর তার ফুলঝুরি ঘোরাচ্ছে পুরোদমে; দেখলে মনে হচ্ছে, একটা আগুনের চক্র প্রবলগতিতে ঘুরে চলেছে তার শরীরের চারপাশে। সেই চক্র থেকে চতুর্দিকে ছিটকে যাচ্ছে প্রাণঘাতী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই আগুনের ফুলকিগুলো প্রচণ্ড গতিতে গিয়ে আঘাত করছে দানব বাদুড়গুলোকে। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের নিস্প্রাণ দেহগুলো এসে পড়ছে নদীর বালির ওপর। পর্বত দু'হাতে দুটো লোহার কাঁটাওয়ালা ভারী মুণ্ডর নিয়ে উন্মত্তের মতো আঘাত করতে করতে ছুটছে জন্তুগুলোর মধ্য দিয়ে। তার চলার পথের দু'পাশে স্তূপাকারে জমা হচ্ছে উড্ডীনখরের রক্তাক্ত মৃতদেহ। পর্বতের নিজের দেহ ওদের ধারালো নখ আর চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার ক্রক্ষেপ নেই।

মেঘবর্ণ যুদ্ধ করতে করতে কিছুটা চলে গিয়েছিল রাক্ষসদের দিকে। তার একহাতে তরবারি, আর অন্য হাতে একটা দীর্ঘ মুষল। মুষলের মাথায় কাপড় জড়িয়ে সেটাকে সম্ভবত সে ভিজিয়ে নিয়েছে কোনো দাহ্য পদার্থে। এখন সেই মুষলটা তার হাতে দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত আয়ুধ একহাতে নিয়ে সে আত্মরক্ষার্থে আঘাত করছে একদম মাথার ওপরে এসে পড়া পাখিগুলোকে, আর একটু দূরে যাকেই বিপদগ্রস্ত দেখছে, তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করছে তার আক্রমণকারী উড্ডীনখরগুলোর বুকে অন্য হাতের তরবারি দিয়ে আঘাত করে।

রাক্ষসবাহিনীর মাঝখানে কেউ মেঘবর্ণকে আটকাল না। তারা সকলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত।

প্রজ্ঞা বিপদে পড়েছিলেন। তিনটে উড্ডীনখর একসঙ্গে আক্রমণ করেছে তাঁকে। তাদের একজন নিজের ধারালো ঠোঁট গেঁথে দিল তাঁর ডান হাতে। আর্তনাদ করে তরবারি ফেলে দিয়ে বামহাতে পাখিটার গলা ধরে মুচড়ে দিলেন

তিনি; তারপর সেটাকে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনলেন হাত থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে।

বাকি দুটো পাখি ততক্ষণে তাঁর মাথায়, গলায় উপর্যুপরি আঘাত করতে শুরু করেছে। প্রজ্ঞা আর সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন বালির ওপর। তাঁর হাত থেকে প্রচুর রক্ত ছিটকে বেরোচ্ছে; সাদাটে বালির ওপর লাল রক্তের দাগ জমতে লাগল।

একটা উড্ডীনখর আবার যে-ই আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তাঁর কণ্ঠনালি লক্ষ্য করে, অমনি তার শরীর ভেদ করে ঢুকে গেল মেঘবর্ণের তরবারি। দ্বিতীয় বাদুড়টা অবাক হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকানোর জন্য মুখ তোলামাত্র তার গায়ে এসে পড়ল মুষলের আঘাত। বিশ্রী একটা “ক্যাঁচ-ক্যাঁচ” আওয়াজ করে সে ছিটকে এসে পড়ল মাটিতে; সঙ্গে-সঙ্গে প্রজ্ঞা মাটি থেকে নিজের তরবারি তুলে নিয়ে বাম হাতে তার শিরশ্ছেদ করলেন।

মেঘবর্ণের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি; একবার মৃদুস্বরে বললেন, “ধন্যবাদ, সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

মাথা নেড়ে মেঘবর্ণ সরে গেল পাশের দিকে। সেখানে তখন মৃগেন্দ্র, সন্দীপ আর অরিত্র চারজন রাক্ষসসেনার সঙ্গে মিলে প্রাণপণে ঠেকাতে চাইছে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে আসা অন্তত বারোটা মৃত্যুদূতকে, কিন্তু খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না তারা। আগুনজ্বলা মুষলটা ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ল মেঘবর্ণ। ততক্ষণে একটা উড্ডীনখর গভীরভাবে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে অরিত্রের গলায়। কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল সে।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপ গদার আঘাতে জন্তুটার মাথা গুঁড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু ইতোমধ্যেই ক্ষতি যা হওয়ার, হয়ে গেছে। মেঘবর্ণের যুদ্ধাভিজ্ঞ চোখ; সে দেখেই বুঝতে পেরে গেল, আর এ-ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেল অরিত্র।

ওদিকে অন্ধ অভী পড়ে ছিল মাটির ওপর; তার ওপর আক্রমণ করতে নামছিল হিংস্র উড্ডীনখরের দল। একটা দীর্ঘচঞ্চু বাদুড় তার শরীরের ওপর ডানা ঝাপটিয়ে নেমে আসছিল দ্রুতগতিতে। এমন সময় দু’দিক থেকে নিধি আর নীপা এসে দাঁড়াল তার পাশে। নিধির ত্রিশূল মুহূর্তের মধ্যে বিদ্ধ করল উড়ন্ত আততায়ী দানবটাকে। নীপা তার তরবারি ঘুরিয়ে প্রতিহত করল ডানদিক থেকে নেমে আসা আরও দুটো আক্রমণকারীকে।

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী ওদের বেশ কিছুটা কাছে এসে পড়েছেন ততক্ষণে। তাঁরা একসঙ্গে চোঁচিয়ে উঠলেন, “নিধি, তোমার বামদিকে দেখো।”

নিধি চমকে উঠে আবার উদ্যত করল তার ত্রিশূল। দুই দেশের বাহিনীর মিলিত আক্রমণে উড্ডীনখরেরা মরছে ঠিকই, কিন্তু তারা সংখ্যায় অফুরন্ত; কত আর মেরে শেষ করা যায়? দশটাকে মারলে তাদের জায়গা নিচ্ছে আরও পনেরোটা। বাম দিক দিয়ে উড়ে আসা চারটে উড্ডীনখরকে ত্রিশূল দিয়ে প্রতিহত করতে-করতে নিধি বলে উঠল, “মনে হচ্ছে, এদের আর শেষ নেই!”

একটা উড্ডীনখর কামড়ে ধরেছে নিধির ডানকাঁধে; নীপা সঙ্গে-সঙ্গে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করল জন্তুটাকে। ধড়টা তার মাথা থেকে আলাদা হয়ে গেল বটে, কিন্তু মোক্ষম কামড়ে কাটা মাথার দাঁতগুলো তখনও ধরে রেখেছে নিধির কাঁধের মাংস। “দিদি, সামলে!” বলে চেষ্টা করে তার হাড়ের মতো শক্ত চপ্পতে তরবারির আঘাত করল নীপা। যন্ত্রণায় নিধি মুখ বিকৃত করল। নীপার আঘাতে এইবার খট করে মরা উড্ডীনখরের ঠোঁটদুটো খুলে গিয়ে মাথাটা এসে পড়ল নদীর বালির ওপর। নিধি তাকিয়ে দেখল, তার কাঁধে কুমীরদেঁতো চোয়ালের দাগ বসে গেছে; রক্ত ফুটে উঠছে চামড়ার ওপর।

অভী অসহায়ের মতো বসে ছিল মাটিতে। চোখের দৃষ্টি নেই; চন্দ্রহাসও নেই তার কাছে। তাকে ঘিরে যে প্রবল মৃত্যু-উৎসব চলছে, তার আভাস পাচ্ছিল সে এই উন্মাদ রণক্ষেত্রের বিপুল বিশৃঙ্খলার শব্দ শুনে। তার কানে আসছে শুধু সহস্র রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস-মানুষের মিলিত যুদ্ধগর্জন, আহতদের আর্তনাদ আর উড্ডীনখরদের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার।

নিজের ঘৃণার সমুদ্রে যেন ডুবে যাচ্ছিল অভী। তার দু’হাত ঠান্ডা বরফের মতো জমাট হয়ে গেছে; হাতদুটো এতটাই ভারী লাগছে যে, সে যেন আর সে-দুটোকে তুলতে পারছে না। নাকে আসছে যোদ্ধাদের ঘাম, রক্ত আর মরা উড্ডীনখরের মাংসের গন্ধ। কোথায় যেন কীসব পুড়ছে। সে শুনতে পাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ঐশিকদের ব্যঙ্গহাসির ধ্বনি। তাঁরা হাসছেন, যেন এই ভয়াবহ প্রাণধ্বংসী যুদ্ধে তাঁদের নারকীয় আনন্দ আর তাঁরা সংবরণ করতে পারছেন না। অভী কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, যত মানুষ মরছে, ততই শক্তিধর হয়ে উঠছেন তাঁরা, ততই পুষ্ট হয়ে উঠছেন। ঘৃণায় তার শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ফেটে পড়তে চাইছে; তার মনে হচ্ছে, তার ভেতরে যে অকল্পনীয় প্রলয়ংকর শক্তি জেগে উঠতে চাইছে, তাকে প্রবল বিস্ফোরণে মুক্ত করে নিজের সঙ্গে ওই ঘৃণ্য জীবগুলোকে সে শেষ করে দেয়।

একটা আর্ত আহ্বান তার কানে এল। “নিধি, বাঁচাও!”

চমকে উঠে মুখ ফেরাল অভী; চোখে দেখতে না পেলেও গলাটা চিনতে পারল সে। উষসীদি!

তাদের থেকে সাত-আট হাত দূরেই মাটিতে পড়ে গেছে উষসী; তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিনটে উড্ডীনখর। ইতোমধ্যেই তার দুই হাতে কামড় বসিয়েছে ওরা। রক্তে ভরে গেছে তার সারা শরীর।

নিধি সেইদিকে তাকিয়েই দৌড় দিল। “নীপা, আমি ওদিকে যাচ্ছি। অভীকে দেখিস।”

উষসীর পাশে লাফ দিয়ে এসে পড়ল নিধি; নিমেষের মধ্যে ত্রিশূলে গাঁথে ফেলল সে দুটো উড্ডীনখরকে। তৃতীয়টা উড়ে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে দেবদত্ত তির নিক্ষেপ করল। গলায় তিরবিদ্ধ হয়ে পাখিটা এসে পড়ল নিচে; বারদুয়েক ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

উষসী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ধন্যবাদ, নিধি। দারুণ লক্ষ্যভেদ, দেবদত্ত! একটু দেরি হল, এই যা!”

লাজুক হাসি হেসে দেবদত্ত বলল, “দিদি, বাদুড়টা তোমাকে এমনভাবে ধরেছিল, আমি ভয়ে তির ছুড়তে পারছিলাম না, পাছে তোমাকে মেরে বসি।”

নিধি আর উষসী একসঙ্গে একটু হেসে ফিরতে যাচ্ছিল অভীর দিকে, কিন্তু ততক্ষণে আরও আট-দশটা নতুন উড্ডীনখর এসে আক্রমণ করেছে ওদের। ইচ্ছাসত্ত্বেও অভীর কাছে যেতে পারল না নিধি; আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল তাকে।

সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের সম্মিলিত বাহিনী প্রবল লড়াই করছে এই আকাশদানবদের সঙ্গে, কিন্তু এদের সংখ্যা এত বেশি যে কারও পক্ষেই এই অসম যুদ্ধে অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়। অধিনায়ক বজ্রধর বুঝতে পারছিলেন, আর বেশিক্ষণ চালানো যাবে না সংগ্রাম। ইতোমধ্যেই সমরগরিমার বহু সেনা মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত দেবতার নদীর বালি লাল হয়ে গেছে রক্তে। রাক্ষস-বাহিনীর অবস্থাও ভালো নয়। প্রচুর সৈন্যক্ষয় হয়েছে তাদেরও। আহত প্রজ্ঞা তাদের নেতৃত্ব দিয়ে এখনও যুদ্ধে টিকিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ তারাও পারবে না।

পালিয়ে যাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পালাবেই বা কোথায়? আকাশ থেকে তো বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারার মতো নেমে আসছে অগণিত হিংস্র মহাকাশ বাদুড়ের দল, আর পেছনে বিষাক্ত জলের নদী। এখন এই যুদ্ধে অনিবার্য মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কী-ই বা উপায় আছে তাদের?

অভী নিজেকে সংহত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। একবার— শুধু একবার যদি দৃষ্টিশক্তিটা ফিরে পাওয়া যেত! তাহলে অন্তত হিমকুশলতা দিয়ে হোক, চন্দ্রহাস দিয়ে হোক, সবার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে মরার চেষ্টা করত। কিন্তু ছোট্ট নীপা আছে তার পাহারায়। এই অপরিমেয় উড্ডীনখর-দলের সামনে ওই বাচ্চা মেয়েটার আর কতটুকুই বা ক্ষমতা?

আর একটা চিৎকার কানে এল তার। “বাঁচাও, বাঁচাও!”

এই কণ্ঠস্বরটাও চেনা লাগছে তার। দূর থেকে নিধি চিৎকার করে বলছে, “নীপা, তোর ডানদিকে দেখ! ও পড়ে গেছে, ওকে রক্ষা কর! উড্ডীনখরটার পিঠে ঢুকিয়ে দে তোর তরবারি।”

নীপা নীরব হয়ে রইল। ভয়াবহ পুরুষকণ্ঠে যন্ত্রণাকাতর চিৎকারটা হয়েই চলল।

অভী দেখতে পেল না, নীপা তার পাশেই ঘটে চলা ভয়ংকর দৃশ্যটার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। একটা লোক পড়ে গেছে মাটিতে; তার ওপর নেমে এসেছে দুটো উড্ডীনখর। লোকটার হাতের অঙ্গ ছিটকে পড়ে গেছে দূরে। ধারালো ঠোঁট দিয়ে জ্যান্ত লোকটার মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে হিংস্র বাদুড়দুটো। নীপা চাইলে অনায়াসে রক্ষা করতে পারত লোকটাকে; তার হাত পাঁচেকের মধ্যেই ঘটছে

ঘটনাটা। কিন্তু সে চুপ করে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল অতীকে; একবারও গেল না বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে।

দূর থেকে নিধি আবার চিৎকার করল, “কী হল রে, নীপা? ওকে বাঁচা! উড্ডীনখরগুলোকে মার!”

এবার নীপা উত্তর দিল, “না, দিদি। ওকে আমরা মারিনি ঠিকই, কিন্তু ওকে বাঁচানোর দায়ও আমাদের নেই। ওর জন্যই মারা গিয়েছিল তরুণ, আমি ভুলিনি।”

অতী বুঝে ফেলল, কাকে এতক্ষণ ধরে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে উড্ডীনখরগুলো, আর কার মৃত্যুদৃশ্য দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নীপা।

চক্রবাক!

তার দেহটা স্থির হয়ে যাওয়ার পর নীপা এগিয়ে গেল প্রাণীদুটোর দিকে; তাকে দেখেই রক্তমাখা ঠোঁটে লাল-লাল চোখ নিয়ে বিশ্রী চিৎকার করে উঠল ওরা।

নীপা দ্রুতগতিতে তরবারির উপর্যুপরি আঘাতে দুটোকেই হত্যা করল, কিন্তু ততক্ষণে আরও কয়েকটা উড়ন্ত দানব ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। অন্ধ অতী যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে একা হয়ে গেল।

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী এখনও পৌঁছতে পারেননি তার কাছে। বাকিদের সাহায্য করতে করতে তাঁরাও কিছুটা সরে গেছেন অন্যদিকে। ঐশিকরা দৃশ্যটা দেখে একটু হাসলেন।

আকাশের দিকে হাত তুলে তাঁরা নির্দেশ দিলেন, “প্রলয়যোদ্ধা একা আছেন। এবার তোমরা তাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করো, উড্ডীনখরগণ।”

সঙ্গে-সঙ্গে অতীর মাথার ওপর ঘূর্ণাবর্তের মতো পাক খেতে শুরু করল অন্তত তিরিশটা মূর্তিমান মৃত্যুদূত; প্রবল ডানা ঝটপটানির সঙ্গে তারা নেমে আসতে শুরু করল তার ওপর। অন্ধ অতী বুঝতে পারছিল, ওদের ডানার শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে; দ্রুতগতিতে ওর ওপর নামছে ওদের হিংস্র তরবারির মতো চঞ্চু। নিরস্ত্র অতী অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথম আঘাতটা এসে পড়ল তার মুখের ওপরেই। বিশ্রী গন্ধযুক্ত জন্তুটার ডানার স্পর্শ লাগল তার গালে; তার সঙ্গে একটা ছুরির মতো চঞ্চু তার বামগাল আর ঠোঁটের বামদিকটায় ঘষা দিয়ে চলে গেল। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে। আর একটা বাদুড়ের ধারালো নখযুক্ত পাঞ্জা এসে আঘাত করল তার পিঠে। হুমড়ি খেয়ে সে নদীর সাদা বালির ওপর পড়ে গেল।

তার মুখের মধ্যে এখন করকর করেছে নিজেরই রক্তমিশ্রিত নোনতা বালির স্বাদ। ‘থু’ করে একদলা রক্ত-বালি-মেশা থুথু ফেলে উঠে দাঁড়াল সে।

মাথা ঘুরছে; আঘাতের জায়গাগুলোতে ভীষণ জ্বালা করছে। কিন্তু ঘৃণায় তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। তার শরীরের মধ্যে জেগে উঠেছে নরকবিষের জ্বালা; অসহনীয় কষ্টে মনে হচ্ছে দেহটা বোধহয় পুড়ে যাচ্ছে ভেতর থেকে। সে ভাবতে লাগল, এই কষ্টের চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে একবার শুধু মনঃসংযোগ করতে হবে, তাহলে হিমকুশলতার বিস্ফোরণে এদের শেষ করে দেবে সে।

কিন্তু সে সুযোগ অভী আর পেল না। বাকি জন্তুগুলো প্রবলভাবে বাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর; একসঙ্গে ওরা আঘাত করতে লাগল তার সর্বশরীরে। তার হাত, পা, মুখের চামড়া ফালাফালা হয়ে গেল। রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল তার সারা দেহ। নিধি আর নীপা দৃশ্যটা দেখছে দূর থেকে অসহায়ের মতো; কিন্তু তারা এতটাই দূরে চলে এসে আবার নতুন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে যে কিছুতেই আর যেতে পারছে না অভীর কাছে।

অভী পাগলের মতো হাত ছুড়ছে; কিন্তু কিছুই দেখতে না পাওয়ায় তার একটা আঘাতও লাগছে না ওদের গায়ে।

সে বুঝতে পারছে, ঐশিকরা ইচ্ছা করে তাকে খেলিয়ে-খেলিয়ে মারতে চাইছেন। চাইলে একটা উড্ডীনখর অনায়াসেই তার কণ্ঠনালি ছিন্ন করে তাকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করতে পারত, কিন্তু তা যখন ওরা করছে না, তার মানে ওকে যতটা বেশি সম্ভব যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছেন ঐশিকরা। সে এ-ও বুঝতে পারছে, এই অসমযুদ্ধে শুধু সে কেন, সমরগরিমার কোনো যোদ্ধার পক্ষেই জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

ক্ষণে-ক্ষণে তাকে নতুন আঘাত দিয়ে যাচ্ছে জন্তুগুলো। সারা শরীর তার ভরতি হয়ে গেছে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে। এত রক্তক্ষরণ হয়েছে যে অসম্ভব দুর্বল লাগছে। যন্ত্রণায় যেন সব ইন্দ্রিয়গুলো বধির হয়ে গেছে তার। ক্ষতবিক্ষত অভী আর পারছিল না। ক্রমাগত নিষ্ঠুর আক্রমণে প্রায় অসাড় হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল বালির ওপর। উড্ডীনখরদের মারাত্মক আঘাত, নিজের ঘৃণার ভার আর নরকবিষের জ্বালায় নিখর হয়ে সে পড়ে রইল যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে।

সে জানে, এ-ই শেষ। পরাজয়ের গ্লানি আর মৃত্যুসম ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল।

তখনই একটা হুংকারধ্বনি কানে এল তার। “সমরগরিমার জন্য!”

তার সামনে লাফ দিয়ে পড়লেন অধিনায়ক বজ্রধর, আর তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়ালেন বাকি চার সমরোত্তম।

অভী আবার চোখ খুলল। এইবার যেন একটু ফিরেছে দৃষ্টিটা; ঝাপসাভাবে হলেও কিছুটা দেখতে পাচ্ছে সে।

সে দেখল, তাকে কেন্দ্রে রেখে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন পাঁচজন সমরোত্তম। সমরোত্তমরা নিজেদের দেহ দিয়ে তার চারপাশে একটা দেয়াল গড়ে তুলেছেন— একটা বাধার দেয়াল, যাতে কোনো উড্ডীনখর তার অঙ্গস্পর্শ করতে না পারে। তাঁদের দেহ আলোময় হয়ে উঠেছে; সম্ভবত কোনো সুরক্ষামায়া প্রয়োগ করছেন তাঁরা একসঙ্গে। দৃশ্যটা দেখে ঠিক সেই সংগ্রহশালায় রাখা হাতের ভাস্কর্যটার কথা মনে পড়ে গেল অভীর। তার মনে হল, প্রবল তেজ দিয়ে তৈরি একটা হাতের পাঁচটা আঙুল যেন ঘিরে রেখেছে তাকে।

তারপর তার মনে পড়ল স্বপ্ন-সরোবরের তীরে দেখা দৃশ্যটা। আর সেই নীরসেনারা...!

পাঁচ সমরোত্তম একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, “চলো, একসঙ্গে যাই।”

অভী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁদের দিকে। সে যেন বুঝতে পারছে, এবার কী ভয়ংকর ঘটনা হতে চলেছে।

অধিনায়ক বজ্রধর আর মেঘবর্ণের চোখ বন্ধ; স্বর্ণশেখর— তার রবিকাকা— দু'চোখ মেলে রেখেছে সূর্যের দিকে; নীলাভ আর শ্যামশ্রী মায়াভরা চোখে তাকিয়ে আছেন তারই দিকে। অভী কথা বলতে পারল না, শুধু মনে মনে বলতে লাগল, 'না, না, না!'

তারপর নীলাভ আর শ্যামশ্রী তাকালেন পরস্পরের দিকে; একটু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, "চলো, একসঙ্গে যাই।"

সুতীর আলোয় ভরে উঠল তাঁদের দেহ; দেখে মনে হল, পাঁচটা অত্যাঙ্গুল মানবশরীর যেন একত্র হয়েছে পুঞ্জীভূত তেজ রূপে। অভীর একবার মনে হল, বাবা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল মেঘবর্ণের দিকে।

বজ্রধর যমদণ্ড উত্তোলন করেছেন শূন্যে। দণ্ডটা জ্বলছে অন্তর্লীন আলোকপ্রভায়। পাঁচজন হাত ধরে আছেন পরস্পরের। বজ্রধর জোরগলায় বলে উঠলেন, "সমরগরিমার জন্য!"

সবাই একসঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। "সমরগরিমার জন্য!"

পরক্ষণেই যমদণ্ড থেকে প্রচণ্ড শক্তির একটা বিস্ফোরণ ঘটল; সেই বিস্ফোরণে যেন নিজেদের জীবনটাকে মিলিত একটা শক্তিপ্রবাহে মুক্ত করে দিলেন ওঁরা। অভী অনুভব করল, যমদণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা শক্তির মধ্য দিয়ে একসঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সমরোত্তমরা। তাঁদের শরীরনির্গত তেজ উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেল সমরগরিমার আকাশে-বাতাসে।

সেই তেজে মুহূর্তমধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আকাশজোড়া উড্ডীনখরের দল। শূন্য থেকে ঝরে পড়তে লাগল তাদের ভস্মীভূত দেহাবশেষ। সমরোত্তমদের নিষ্প্রাণ, শিথিল দেহ এসে পড়ল মৃত দেবতার নদীর সাদা বালির ওপর।

অভী-সহ সমগ্র সমরগরিমার সব মানুষ-অর্ধরাক্ষস-রাক্ষসকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে গেলেন তাঁরা।

বেশ কয়েক মুহূর্ত সারা যুদ্ধক্ষেত্র যেন শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যে রক্তাক্ত সৈনিকরা এতক্ষণ যুদ্ধ করছিল অপ্রতিরোধ্য উড়ন্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে, তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল, হিংস্র উড্ডীনখরগুলো আর নেই। তার পরিবর্তে তাদের ছাই ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে; সেই ছাই জমে ছোটো-ছোটো পাহাড় হয়ে গেছে মাটির ওপর। মৃত দেবতার নদীর তীরের সাদা বালি ধূসর হয়ে গেছে মৃত উড্ডীনখরের ছাই জমে-জমে। সেই ছাই বাতাসে ভাসতে-ভাসতে নেমে আসছে ওদের সারা গায়ে, মুখে, চোখে।

বিরাত যুদ্ধক্ষেত্র; তাই সকলে এখনও বুঝে উঠতেই পারেনি ঠিক কী হয়ে গেল। তারপর একে একে শিক্ষার্থীরা, সৈনিকেরা আবিষ্কার করল পাঁচটি নিষ্পন্দ দেহ। আতঙ্কে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল তারা। কেউ-কেউ মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল শব্দ করে।

অভী তখনও বসে আছে স্থির হয়ে। এখনও যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিধি আর নীপা দাঁড়িয়ে আছে বজ্রাহতের মতো। দু'চোখে চূড়ান্ত অবিশ্বাস নিয়ে পর্বত বসে পড়েছে ছাইঢাকা বালির ওপর; তার মুখেও আর কোনো কথা নেই।

সন্দীপ কেঁদে উঠল পর্বতের হাত ধরে। “এ কী হয়ে গেল, পর্বতদা?”

ঐশিকরাও এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিলেন এই দৃশ্য। এইবার তাঁরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মৃত বজ্রধরের অসাড় হাত থেকে তুলে নিলেন যমদণ্ডটি।

একটু পরীক্ষা করে তাঁরা মন্তব্য করলেন, “নাহ্, এর মধ্যে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, এই মহাসুরক্ষামায়া ব্যবহার করতে গিয়ে পুরোটাই খরচ করে দিয়েছেন বজ্রধর আর তাঁর সঙ্গীরা।”

অবহেলাভরে তাঁরা দণ্ডটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন বালির ওপর।

অভী বুঝতে পারছে, তার চোখের দৃষ্টি অনেকটাই ফিরে আসছে। সে দেখতে পাচ্ছে, তার প্রিয় সমরোত্তমরা মরে পড়ে আছেন তার চারপাশে। কেন? কেন এমন করলেন ওঁরা? এ-ছাড়া কি আর পথ ছিল না?

বোধহয় ছিল না। থাকলে কি অধিনায়ক সে পথ নিতেন না?

কিন্তু এখন কী করবে সে? আজ তো প্রলয় আসার কথা ছিল। আজ তো তার মরার কথা ছিল। ওঁরা কেন চলে গেলেন? এবার সমরগরিমার কী হবে?

চোখ দিয়ে অব্যোম্বরে জল নেমে এল অভীর।

তখনই পর্বত চিৎকার করে উঠল, “অভী! নিধি! সন্দীপ! ওই দ্যাখো। মেঘবর্ণকে দ্যাখো।”

তার এই একটা কথায় সারা মাঠের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল ওই একদিকে। অভী চমকে উঠে দেখল, মেঘবর্ণের শরীরটা হঠাৎ কাঁপতে শুরু করেছে।

এ কী হচ্ছে? এ কী?

মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস নির্বিশেষে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। এমনকি ঐশিকদের পাঁচটা মাথাও বিস্ময়ে অভিভূত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ঘটনা। এমন আশ্চর্য মায়া তাঁরাও কোনোদিন দেখেননি।

মেঘবর্ণের হাত নড়ছে, মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে। মাটিতে পড়ে থাকতে থাকতেই চোখ খুলে গেল তার। সঙ্গে-সঙ্গে সে বুঝতে পারল, সে শুয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে। সম্ভবত প্রতিবর্তীক্রিয়াতেই তার হাত চলে গেল কোমরে। তার তরবারি সেখানে নেই। তৎক্ষণাৎ বামপাশে গড়িয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল সে।

একবার টলে গেল সে বসতে গিয়ে, কিন্তু তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে একই সঙ্গে প্রচণ্ড অবাক এবং হতাশ হয়েছে।

সারা মাঠ হর্ষধ্বনি করে উঠল। “জয়, সমরোত্তম মেঘবর্ণের জয়!”

পর্বত ছুটে গেল তার দিকে। তার হাত ধরে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। মেঘবর্ণের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখনও যেন সে বাস্তবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

বালির ওপর পড়ে থাকা বাকি সমরোত্তমদের মৃতদেহ দেখে মেঘবর্ণ কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে সে বলল, “কেন, পর্বত? কেন? কেন? আমিও তো সবার সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার মায়া প্রয়োগ করেছিলাম। অধিনায়ক আমাদের যেমন নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, আমিও তো সবার মতো তা-ই করেছিলাম। তাহলে আমি ওদের মতো মরলাম না কেন?”

পর্বত তার হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে সাদৃশ্য দিতে লাগল। মেঘবর্ণ দুর্বলভাবে আবার বসে পড়ল বালির ওপর।

অভী এতক্ষণে মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে চোখে। তার অন্তরের ঘৃণার বোধ এখনও জেগে আছে ঠিকই, শরীরটা জ্বালাও করছে, কিন্তু নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে অনেকখানি। হেঁটে গেল সে ঐশিকদের সামনে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াল; বলল, “যুদ্ধ শেষ। আজ এই যে হত্যালীলা আপনারা এখানে চালালেন, এর প্রতিফল আপনাদের পেতে হবে!”

ঐশিকরা হাসলেন। “আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, প্রলয়যোদ্ধা। সমরোত্তমদের চারজন এক ধাক্কায় বিদায় নিলেন, এটা উপরি পাওনা। কিন্তু উড্ডীনখরদের পরেও তোমার সঙ্গে লড়াই করার জন্য আরও একজন আছে, ভুলে গেলে? যুদ্ধ শেষ, কে বলল তোমাকে? আসল যুদ্ধ তো এখনও শুরুই হয়নি। এই কয়েকটি মাত্র মৃত্যুতে আমাদের তৃপ্তি হয়নি। আরও মৃত্যু, আরও ধ্বংস চাই আমাদের! সেই মহাপ্রলয় আনার কাজটা তুমি ছাড়া আর কে করবে, অভী? প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করবে না?”

পীতপত্রবনের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করলেন তাঁরা।

সর্বান্তঃকরণে কেঁপে উঠল অভী। বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটা চেনা আকৃতি। এই দিনের আলোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে তার শরীর থেকে জেগে ওঠা লালচে আগুনের শিখাগুলো। তার সুবিশাল দেহব্যাপী মোটা-মোটা লাল শিরা-উপশিরাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অগ্নিস্রোত। ধোঁয়া উঠছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। দৃষ্ট ভঙ্গিতে সে যখন এগিয়ে আসতে লাগল মৃত দেবতার নদীর দিকে, তখন তার পায়ের চাপে মাটি কাঁপতে লাগল। তার প্রত্যেক পদক্ষেপে মাটির বুকে জেগে উঠতে লাগল একটা করে নরকগহ্বর। সেই গহ্বরের লেলিহান অগ্নিশিখার উত্তাপে কেঁপে উঠতে লাগল গরম বাতাস। আকাশ জুড়ে আবির্ভূত হল পিণ্ডাকার লাল মেঘের দল। সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের সেনারা ভয়ে, বিস্ময়ে নিঃসুত্ক হয়ে দেখতে লাগল তাকে।

অভী তাকিয়ে রইল দানবটার মুখের দিকে। না, লীনার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নেই সেখানে। এ শুধুই মূর্তিমান ধ্বংসের এক অবতার— এর কোনো মায়া নেই, মমতা নেই, নিজস্ব ইচ্ছা নেই; ঐশিকদের আদেশে অপ্রতিরোধ্য অগ্নিসংযোগে সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই যেন এর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এসে দাঁড়াল সে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে। সব যোদ্ধা হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ঐশিকরা আদেশ দিলেন, “যাও, পীতপত্রবনের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি প্রাণীকে ধ্বংস করে আমাদের তৃপ্ত করো।”

দ্রুতবেগে বনের দিকে ফিরে চলল লীনার হৃদয়ধারী দানব। অতী বুঝতে পারছে, এই শুকনো হয়ে আসা বনে যদি ওই দানব একবার কিছুটা আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, তাহলে আর গাছগুলোকে রক্ষা করার কোনো উপায় থাকবে না। একবার শুধু নিধির দিকে তাকিয়ে নিল সে; নিধি মাথা নাড়ল। পরক্ষণেই দু'জনে ছুটল দানবটার পিছু পিছু।

ততক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্যদেব ঢলে পড়েছেন পশ্চিম আকাশে। অতীদের যেতে দেখে পর্বতের সঙ্গে সমরগরিমার বেশ কয়েকজন যোদ্ধা তাদের অনুসরণ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন প্রজ্ঞা। নদীর বালুচর পেরিয়ে এসে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন বনের প্রবেশমুখের কাছে।

প্রজ্ঞার পেছনে আর একজন এগিয়ে এল ধীরপায়ে— উত্তরা। প্রজ্ঞা তাকে মুখ ফিরিয়ে দেখে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

বিরাট দানব প্রবেশ করেছে বনের মধ্যে, যদিও বেশি গভীরে যেতে পারেনি সে এখনও। এখান থেকে অতী চিৎকার করে বলল, “থামো!”

একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখল দানব, কিন্তু থামল না। তার সারা শরীর জুড়ে গর্জন করে আগুন জ্বলে উঠল সুবিশাল চিতার মতো। সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল যোদ্ধারা।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ওরা কারা? অতীরা চমকে উঠে দেখল, মানবমন্দির আর সুদক্ষিণসারিতে যত মানুষ আর অর্ধরাক্ষস ছিল, প্রায় সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে। সমরোত্তমদের মৃত্যুর সময় যে প্রচণ্ড আলোর ঝলক আর কম্পন বয়ে গিয়েছিল পুরো সমরগরিমার জুড়ে, তাতেই প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে রাশি-রাশি সাধারণ মানুষ ছুটে আসছে নদীর তীরে। অরণ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তারা; কেউ-কেউ আবার এখান থেকেই দেখতে পেয়েছে বজ্রধর-সহ বাকি সমরোত্তমদের নিখর শরীরগুলো। অনেকের নজরে পড়েছে করেছে ভুলুষ্ঠিত প্রিয়জনের মৃতদেহ। কাঁদছে তারা, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছে, ছুটে আসতে চাইছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

দুটো চেনা মুখ এই ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেল অতী— নিধির বাবা দিগ্‌নাগ আর রক্ষোবৈদ্য। তাঁরাও বাকিদের সঙ্গে মিলে যত দ্রুত সম্ভব আসার চেষ্টা করছেন অকুস্থলে; কিন্তু দু'জনেই বৃদ্ধ, তাই অন্যদের তুলনায় অতটা তাড়াতাড়ি আসতে পারছেন না তাঁরা— হাঁফিয়ে যাচ্ছেন।

সেই অবস্থাতেই অগ্নিদানবকে দেখতে পেল ওরা সবাই। সামনের শুকিয়ে আসা একটা বটগাছের গায়ে অগ্নিসংযোগ করল দানবটা। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল তার অগণিত গুচ্ছ ঝুরি-সহ মূল কাণ্ডটা; দেখে মনে হল, একটা ছোটোখাটো পাহাড় যেন জ্বলে উঠেছে জঙ্গলের মধ্যে।

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে অতী অনুভব করছিল, এইবার তার শরীরের মধ্যস্থিত মহাশক্তি বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রচণ্ড বেগে; সে বুঝতে পারছিল, আর একে আটকাতে পারবে না সে। আর আটকানোর কোনো অর্থও হয় না। লীনার

দানবের শরীর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে গাছে-গাছে; প্রতিবার তার পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ হয়ে মাটির গায়ে খুলে যাচ্ছে নরকের আগুনমুখো দ্বার; ইতোমধ্যেই শুকনো পাতার স্তূপে আগুন ধরে গেছে; জ্বলন্ত গাছ থেকে, পাতার রাশি থেকে কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠতে শুরু করেছে আকাশপানে। নিম্ন পুড়ছে, সেগুন পুড়ছে, জারুল পুড়ছে। অসম্ভব একটা ঘৃণা তাকে আবার আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। এবার আর সেই ঘৃণাকে আটকানোর চেষ্টা করল না অভী। সমরোত্তমরা প্রাণ দিয়ে গেছেন সমরগরিমাকে রক্ষা করার জন্য। আর তার কীসের ভয়? আজ এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে যে বেঁচে ফিরবে না, অভী স্পষ্ট বুঝতে পারছে। যা হওয়ার হয়ে যাক, এই ভয়ংকরকে আটকাতেই হবে যে-কোনো মূল্যে।

গাছে-গাছে প্রচণ্ডভাবে আগুন ধরে গেছে। সমরগরিমার যেসব মানুষ আর অর্ধরাক্ষসরা এসে প্রবেশ করেছিল অরণ্যে, তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোনোমতে ছুটছে নদীর চরের দিকে। বায়ুবাহনে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে যাচ্ছে রক্তাভ আগুনের শিখা। চড়চড় শব্দে পুড়ছে শুকনো কাঠ। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অধিনায়ক বজ্রধরের সাধের পীতপত্রবন।

অভী ডাকল, “লীনা! থামো!”

কে যেন হেসে উঠল পেছন থেকে। ঐশিকরা এসে দাঁড়িয়েছেন অরণ্যের মধ্যে। আগুন তাঁদের স্পর্শ করছে, কিন্তু পোড়াচ্ছে না। অভী বুঝতে পারল, আগুন থেকে সুরক্ষামায়া নিয়েই তাঁরা প্রবেশ করেছেন অরণ্যভূমিতে।

এই পিশাচগুলোর সঙ্গে কি কোনোকিছু দিয়েই আঘাত করা যায় না?

চন্দ্রহাসও আর নেই তার কাছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছেন মরুময়। অভী নিজেও নিরস্ত্র। কী দিয়েই বা আঘাত করবে সে এই দুর্ভেদ্য মায়ার অধিকারী মহাশক্তিশালী ঐশিকদের?

ঐশিকরা বললেন, “লীনা তোমার কথা আর বুঝতে পারবে না। দানবটাকে গঠন করতে ওই মেয়েটার যেটুকু প্রয়োজন ছিল, তা ফুরিয়েছে। ওর হৃদয়টাকে আমরা নিয়ন্ত্রণমায়ার অধীন করে রেখেছিলাম, কারণ পুরোপুরি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওই দানবকে আমাদের আত্মবাহ করে রাখার দরকার ছিল। এখন তোমার হিমকুশলতার চূড়ান্ত প্রয়োগ ছাড়া ওকে পরাস্ত করতে পারবে না তুমি। আর ওই কাজ করতে গেলেই তোমার অন্তরে যে ভয়ানক ঘৃণার শক্তি আছে, তা তোমার প্রাণহরণ করবে। ওই শক্তিকে অনুভব করছ না তুমি নিজের মধ্যে?”

অভী বুঝতে পারছে, ওঁরা একেবারে ঠিক বলছেন। এই বিষজ্বালার মতো বিপুল শক্তি যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে চাইছে তার শরীর ফাটিয়ে। তার চোখের মণিগুলো সাদা হতে শুরু করল; হাত দুটো হিমশীতল হয়ে গেল। পর্বত পেছন থেকে এসে বলল, “অভী, নিজেকে সামলাও। এ কী হচ্ছে?”

অভী আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মনের প্রবল ঘৃণা তার শরীরটাকে যেন জমিয়ে সংকুচিত করে ফেলছে।

হঠাৎ নিধির গলা শুনতে পেল সে। “পর্বতদা! এইবার!”

চমকে উঠে সামনে তাকাল অভী। দেখল, পর্বতের কাঁধের ওপর উঠেছে নিধি; পর্বত তার দুটো হাত ধরে রেখেছে শক্ত করে। অভী অবাক হয়ে ডাবল, 'এ আবার কী করতে চাইছে ওরা?'

পরক্ষণেই নিধির শরীরটাকে হাওয়ায় ছুড়ে দিল পর্বত, আর শূন্যে এক পাক দিয়ে উড়ে গেল নিধি। অভী দেখতে পেল, নিধির হাতে ধরা ছুরিটায় বিালিক দিল পড়ন্ত বিকেলের রোদ।

উর্মির সেই হিরার তৈরি সর্বভেদক ছুরি! সে-ই তো নিধিকে রাখতে দিয়েছিল ওটা!

লাফ দিয়ে সেই ছুরি বিদ্ধ করল নিধি বিশাল দানবটার বুকে। তার পাথরের আবরণ ভেদ করে ঢুকে গেল ছুরিটা। কড়কড় শব্দ করে ভেঙে গেল ধূসর পাথর, আর তার মধ্য থেকে উজ্জ্বল নীল রঙের একটা বস্তু ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল নিধি। দানবটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে, যেন এতখানি স্পর্ধা কারও হতে পারে, সে ভাবতে পারেনি।

ঐশিকরা হেসে উঠলেন। “এখন আর লীনার হৃদয় সংগ্রহ করা নিরর্থক, নিধি। বললাম না, ওই অগ্নিদানবের দেহে লীনার হৃদয়ের কাজ ফুরিয়েছে। এখন ওর মস্তিষ্ক চালিত হবে শুধু একটাই কর্মে— আগুন দিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়া। আর এই মুহূর্তে এই আগুনকে নেভাতে পারে, এমন কেউ সারা মায়াজগতে নেই।”

নিধি বলল, “সেই জন্যই সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ওর দেহ থেকে এটা সরিয়ে নিলাম। আমরা কেউ বাঁচব না, আমি জানি। তবু আমার প্রিয় বন্ধুর হৃদয় শেষ মুহূর্তে আপনাদের তৈরি এই দানবের শরীরে থেকে যাক, তা আমি চাই না।”

সারা বনে আগুন লেগে গেছে। দানবটা যা-ই স্পর্শ করছে, তা নিমেষে জ্বলে উঠছে মোম-মাখানো কাগজের মতো। সারি-সারি মশালের মতো জ্বলছে পীতপত্রবনের গাছগুলো। অসংখ্য নরকগহ্বর জেগে উঠেছে তাদের চারপাশে। বহু জায়গায় মাটি ভেঙে ভেঙে কালো গুঁড়ো হয়ে চলে যাচ্ছে লোহিতশীর্ষ আগুনের গ্রাসে। সগর্জনে পুড়ছে শুষ্ক অরণ্য। দিকপ্লাবী কালো ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে সকলের। সর্বগ্রাসী এক ঘৃণা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করে ফেলেছে অভীকে। তার মনে হচ্ছিল, আর নয়; এইবার তার শরীরের হিমকুশলতার বিপুল শক্তি নির্গত করবে সে। তাতে পাণ্ডপতের বিস্ফোরণ হোক, ঐশিকরা মরুক। আর কাউকে না বাঁচানো যাক, ওই পিশাচগুলোর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সর্বশরীর হিমশীতল হয়ে গেছে তার। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্নিদানবটার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

পাণ্ডপতের ধ্বংসক্ষমতা মুক্তি চাইছে। অভী বুঝতে পারছে, সে আর এই ভুবনপ্লাবী মূর্তিমান ধ্বংসকে আটকাতে পারবে না। আটকানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তার নেই।

সারা পৃথিবীর সব আগুন, সব বাত্মা, সব সমুদ্রের প্রলয়ংকর জলোচ্ছাসের শক্তিকে যেন অভী অনুভব করতে পারল তার শিরায় শিরায়। সর্বধ্বংসী পাশুপত জেগে উঠছে তার মধ্যে। আকাশের বজ্র, ভূমিকম্পের চন্ডনৃত্য আর নক্ষত্রদের বিস্ফোরণে যত শক্তি আছে, সব ধ্বংসের সেই অমোঘ শক্তিকে অভী তার সর্বসত্তায় স্পন্দিত হতে অনুভব করছে। এই অরণ্যের আগুন তার সামনে তুচ্ছ; এই মায়াজগতের প্রাণশক্তি তার সামনে তুচ্ছ— সেই মহাশক্তি জাগরিত হলে বিশ্বের লয় হয়ে যায়।

প্রলয় আসছে। প্রলয় জাগছে। আর কারও রক্ষা নেই।

অভী তার দু'চোখ বন্ধ করল। “হে আমার সত্তাপ্রাণ পাশুপত, তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি। ধ্বংস করো এই আগুন, ধ্বংস করো এই হিংস্রতা, ধ্বংস করো এই পৈশাচিকতা!”

তার শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছে তার শরীরের সবক'টি অঙ্গকে ত্যাগ করে। এই নিশ্বাস বেরিয়ে এলে তার সঙ্গেই মুক্ত হবে পাশুপতের অকল্পনীয় শক্তি। অভী মনে-মনে প্রস্তুত হল দেহত্যাগ করার জন্য।

আকাশ জুড়ে তার মাথার ওপর জমা হয়ে উঠেছে রক্তলাল মেঘের মিনার। সমরগরিমার বাহিনী স্তব্ধ আতঙ্কে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পাশুপতের শক্তি একবার মুক্ত হলে আর কারও রক্ষা নেই, তারা জানে। ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতিও।

অভীর দেহ তপ্ত লোহার মতো অন্তর্লীন তাপে লাল হয়ে উঠল।

পর্বতের পাশে এসে দাঁড়াল উত্তরা; কোনো কথা না বলে শুধু হাত জড়িয়ে ধরল তার। পর্বত আর এক হাত দিয়ে তার মাথাটা টেনে নিল নিজের বুকে।

জঙ্গল জ্বলছে। তবু মেঘবর্ণ এগিয়ে এসেছে নদীতীর ছেড়ে বাকিদের কাছে। তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিধি আর নীপা। এসেছে অভীর অন্য বন্ধুরা, সতীর্থরা। তারা নিঃশব্দে দেখছে কীভাবে অভীর শরীরের বাইরেটা ঢেকে যাচ্ছে সাদা বরফে, আর সেই অর্ধস্বচ্ছ বরফের আবরণের মধ্যে তার চামড়া লাল হয়ে উঠছে ভেতরের প্রচণ্ড উত্তাপে। এমনকি ঐশিকদের দানবটাও তার ধ্বংসলীলা কয়েক মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দিয়ে দেখছে তার সামনে এসে দাঁড়ানো ছেলেটার অদ্ভুত কার্যকলাপ।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আর পূর্ব আকাশে জেগে উঠেছে সাদাটে হলুদ রঙের বাঁকা চাঁদ।

হঠাৎ যেন কান্নার শব্দ কানে ভেসে এল তার। কারা যেন খুব মৃদু স্বরে কাঁদছে।

অভী চোখ খুলল।

তার কপালে দুই ভ্রু-র মাঝখানে ধকধক করে জ্বলে উঠল লাল আগুন। তারা সারা দেহ জ্বলে উঠল মধ্যাহ্নসূর্যের মতো; সেই তীব্র আলোয় ভরে উঠল দশদিক। কিন্তু সে আলোয় কোনো ছায়া হচ্ছে না।

কে কাঁদে? কাঁদে কে?

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার ঠিক আগে কৌতূহলী অভী তাকাল চারপাশে। কান্নার আওয়াজ তার কানে আসছে ঠিকই, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? তার মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল, “শুনতে পাচ্ছ ওদের ক্রন্দন?” এই কণ্ঠস্বর অভী চেনে। মৃত দেবতা! দেবতা তাকে কথা দিয়েছিলেন, তার মৃত্যুকালে দেখা হবে তাঁর সঙ্গে।

সে মনে মনে বলল, “পাচ্ছি, দেবতা। কারা ওরা?”

“তুমি নিজেই দেখে নাও।”

অভীর চোখের দৃষ্টি সেই দগ্ধ অরণ্যের মধ্যে সহসা যেন কোন মস্তবলে অলৌকিকভাবে প্রসারিত হয়ে গেল। সে দেখতে পেল, হরিণেরা পালাচ্ছে উর্ধ্বশ্বাসে; তাদের পেছনে তাড়া করে আসছে লোলুপ অগ্নিশিখা। বাবা-মা-ছানা-সহ চিতাবাঘেদের কয়েকটা পরিবার লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে আগুন এড়িয়ে। ছানাগুলো এখনও ভালো করে ছুটতে শেখেনি; তারা বারবার পিছিয়ে পড়ছে। আগুন এসে ধরে ফেলছে ওদের। মা চিতাটা যত জোরে ছুটতে পারত, তার চেয়ে অনেক কম গতিতে ছুটছে, পাছে তার কোনো ছানা পেছনে রয়ে যায়। অভীর মনে হল, বজ্রধরের প্রিয় সেই মা-চিতাটা বোধহয় এটা। আগুনের তাপে তার পিঠের লোম পুড়ে গিয়ে মাংস বেরিয়ে পড়েছে। চড়চড় শব্দে পুড়েছে বৃক্ষরাজি; জ্বলন্ত ডাল ভেঙে ভয়ানক রবে আছড়ে পড়ছে মাটিতে, আর সঙ্গে-সঙ্গে লাল কমলা সহস্র স্ফুলিঙ্গ উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

মাটিতে, গাছের তলায় গর্ত করে যে খরগোশ আর ইঁদুররা ছিল, তাদের অবস্থা আরও করুণ। গর্তের বাইরে মা-খরগোশ ইতোমধ্যেই মরে গেছে। গর্তের মধ্যে বাবা-খরগোশ তার শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছে অসহায় ছানাগুলোকে। নিষ্ঠুর আগুন লোলজিহ্বা প্রসারিত করে ছুটে আসছে ওদের দগ্ধ করবে বলে।

ইঁদুরের দলের আর পালানোর উপায় নেই। শুকনো মাটির গর্তের ওপরে যে গাছ ছিল, সেটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। সেই পোড়া গাছের নিচের গর্তও নরকসমান গরম হয়ে আছে। তবু এক ইঁদুর-মা তার ছানাদুটিকে তুলে রেখেছে নিজের গায়ের ওপর, যাতে মাটির প্রবল তাপ তাদের শরীরে না লাগে। গোঁফগুলো পুড়ে গেছে তার; শরীরের নিচের দিকের মাংস ঝলসে গেছে। ওই অসহায় প্রাণীগুলোর চোখের জলবিন্দুগুলিও ভীষণ স্পষ্টভাবে দেখতে পেল অভী।

পাখিদের অবস্থাও বড়ো করুণ। পুড়ে যাওয়া গাছগুলোতে বহু পাখির বাসাতেই ডিম ছিল। সেগুলো প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে। চোখ ফোটেনি এমন ছানারা মরে গেছে আগুনের গ্রাসে। কত পাখির ডানা পুড়ে গেছে আগুনে; তার সঙ্গে কারও কারও পুড়ে গেছে পা-গুলোও। অসহায়ভাবে কোনোক্রমে লাফিয়ে লাফিয়ে কেউ কেউ পালাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোথায় পালাবে? চতুর্দিক জ্বলে যাচ্ছে ভয়াবহ অগ্নিদাহে; মাটিতে পড়ে থাকতে থাকতে নিরুপায়ভাবে আগুনে দগ্ধ হয়ে মরছে তারা। যারা উড়ে পালাতে গিয়েছিল, তাদের বহুজনের চোখ ঝলসে গেছে আগুনের ফুলকিতে।

জঙ্গল জ্বলছে; তার সঙ্গে জ্বলছে জঙ্গলের সব প্রাণী। আর শুধু জন্তুরা নয়, কাঁদছে মানুষও। সমরগরিমার মানুষ-অর্ধরাক্ষস সবাই বুঝতে পারছে, শেষের সময় আগত। ওই দানব ছুটে আসছে তাদের দিকে। ঐশিকরা হাসছেন মহানন্দে। তাদের সামনে অগ্নিময় অরণ্য, পেছনে ঘোর বিষাক্ত মৃত দেবতার নদী। অগ্নিদানব এগিয়ে যাচ্ছে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মতো।

অভী সব দেখছে— শুধু দেখছে সে। সমগ্র জীবজগতের এই কষ্ট দেখতে দেখতে আর তার রাগ হচ্ছে না, আর তার ঘৃণা হচ্ছে না; তার সর্বসত্তায় শুধু জেগে উঠছে এক বিপুল সমুদ্রপরিমাণ করুণা।

কী যেন একটা বদলে গেছে তার মধ্যে!

তার ভেতরের হিমকুশলতা স্থির হয়ে আছে, স্থির হয়ে আছে নরকবিষ, স্থির হয়ে আছে পাশুপতের অকল্পনীয় জগৎধ্বংসী শক্তি। অভী আর কিছু অনুভব করছে না; তার মধ্যে এখন শুধু এই অসহায় প্রাণীগুলোর জন্য মঙ্গলাকাজ্জ্বল ছাড়া আর কিছু নেই। তার অন্তরে আর ঘৃণা নেই, তার শরীরের হিমকুশলতাকে সে এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। তার আবেগ, তার বুদ্ধি এখন সম্পূর্ণ তার পরিচালনার অধীনে। সে দেখতে পাচ্ছে, মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ হাত নেমে আসছে প্রত্যেকটি প্রাণীর ওপর, সে হাতের আঙুলগুলো অগ্নিময়। কিন্তু তার মন বলছে, ওই আগুনকে সে দমন করতে পারবে।

কীভাবে? পাশুপত দিয়ে?

পাশুপতের কথা চিন্তা করতেই তার মাথার মধ্যে মৃত দেবতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। তার মনে হল, চোখের সামনে একটা আলোকময় জানালা খুলে যাচ্ছে। এমন জানালা একবার স্বপ্ন-উপলে সে দেখেছিল বজ্রধরের সামনে খুলে যেতে।

সেই জানালা দিয়ে আলোর মতো বেরিয়ে আসছে সর্বব্যাপী মৃত্যু। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যেমন আলো পৃথিবীর সর্ববস্তুকে স্পর্শ করে, এই আলোও সবাইকে সেই সকালের রৌদ্রের মতো স্পর্শ করছে। অভী দেখতে পাচ্ছে, সেই অমোঘ মৃত্যুর স্পর্শে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমগ্র জীবজগৎ; কেউ বাকি থাকছে না। অদ্ভুত একটা কষ্টে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে।

সে আর ভয় পাচ্ছে না, ক্রোধও অনুভব করছে না। তার হৃদয় জুড়ে এখন শুধু একটিই আবেগ— কারও ক্ষতি আর সে চাইতে পারছে না।

শুকনো মাটির কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ছে মৃত্যু। অভী প্রার্থনা করল, “দেবতা, দয়া করুন।”

দেবতা উত্তর দিলেন, “বলো। আমাকেই ডেকেছ তুমি পাশুপতের মধ্য দিয়ে। কী চাও বলো, প্রলয়যোদ্ধা। আজ আমি তোমার কথা রাখব। এই প্রলয় থেকে যদি তুমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষা করতে চাও, তা-ও হবে। কিন্তু মৃত্যু আজ আসবেই। প্রলয়যোদ্ধার ক্রোধ থেকে আজ আর কারও নিস্তার নেই।”

“না দেবতা, আমার কারও প্রতি ক্রোধ নেই। আমি সবার জন্য শান্তি কামনা করি। নিতে হলে শুধু আমার জীবন নিন, কিন্তু আর কারও যেন ক্ষতি না হয়।”

“কিন্তু পাশ্চপত তো আজ মুক্ত হবেই। প্রলয়ের সেই ভয়াবহ শক্তিকে থামানোর ক্ষমতা তোমারও নেই, অভী। আমি মৃত্যু আজ স্বয়ং তোমার ইচ্ছাপূরণে উপস্থিত হয়েছি।”

“আমি জানি, হে দেবতা। আপনি প্রসন্ন হোন। কিন্তু আমি আর কাউকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করি না।”

যে আলোকপূর্ণ বাতায়ন অভীর সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল, তার মধ্যে যেন নেচে উঠল সুতীর তেজপুঞ্জ। দেবতা প্রশ্ন করলেন, “কেন?”

“আমি... আমি জানি না।”

দেবতা হাসলেন। “আমি জানি। তুমি এতদিনে যোগ্য হয়েছ। নাও, যে করুণার আভাস তুমি পেয়েছ, তাকে পূর্ণরূপে দেখার চোখ দিলাম আমি তোমাকে। যে একমাত্র প্রাণ ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্ব জুড়ে, তোমার মৃত্যুর পূর্বে একবার দেখে নাও তার এই খেলা।”

সঙ্গে-সঙ্গে অভী দেখতে পেল সেই মনুষ্যদুর্লভ দৃশ্য। সে স্পষ্ট দেখতে পেল, ছোটো-বড়ো প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণী তো বটেই, এমনকি পৃথিবীর ঘাসটি পর্যন্তও সেই একই প্রাণ, একই প্রদীপ্ত চেতনা নিয়ে জেগে উঠেছে। প্রতিটি জীবনের মধ্যে শুধু সেই ‘এক’ আছে, আর কিছু নেই। সকলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই একই উৎসপ্রাণ। সে নিজে যে বিরাট প্রাণের অংশ, সেই প্রাণই ছড়িয়ে আছে জগতের প্রতিটি কণায় পরিব্যাপ্ত হয়ে। আর কাকেই বা ঘৃণা করবে সে?

সে বুঝতে পারছে, তার শেষ নিশ্বাস এইবার এক প্রচণ্ড টানে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার শরীর ছেড়ে। আর দেরি করা চলবে না; একে কাজে লাগাতে হবে। সে মায়াজগতের আজ পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী হিমকুশল। মরার আগে এই হিমকুশলতা দিয়েই সবচেয়ে বড়ো মায়াজগৎ প্রয়োগ করে যাবে সে।

পাশ্চপতের অসীম শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার মুহূর্তে সে অনুভব করতে পারল, কারা যেন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। কারা এরা? ওই তো বাবা, মা, রবিকাকা, বজ্রধর। আর ও কে? রাজকন্যা উর্মি না? উর্মি এগিয়ে আসছেন তার দিকে, হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন। উর্মি বলছেন, “সারা বিশ্বে একটাই শক্তি সৃষ্টি করছে, ধ্বংসও করছে। সেই শক্তি আশ্রয় নিয়েছে তোমার মধ্যে। অভী, একে ব্যবহার করো, কাজে লাগাও। কীসের ঘৃণা? কাকেই বা তুমি ঘৃণা করবে? তুমিও জীবন, তুমিও শক্তি— প্রত্যেকটি জীবের মতো। চেয়ে দেখো, কেউ তোমার থেকে আলাদা নয়। সারা বিশ্বই তুমি, তুমিই সারা বিশ্ব। এইটুকু অনুভব করো; তাহলেই আর ঘৃণা নেই, সব ভালোবাসা হয়ে যাবে।”

অভী বুঝতে পারছে, উর্মির প্রত্যেকটি কথা সত্য। তার নিজের উপলব্ধিতে সে বুঝতে পারছে, এর চেয়ে সত্য কথা তাকে কেউ কোনোদিন বলেনি।

সমগ্র সৃষ্টির প্রতি যে অনিবার করুণা তার জেগে উঠেছে, তার সহায়ে নিজের ভেতরের নরকবিষরূপী শীতল, জমাট বরফসম ঘৃণার স্রোতকে জল করে দিল অভী। সেই জলের টানে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল, বজ্র ডাকতে লাগল।

অভী অনুভব করছে, তার নিজের শরীরও যেন জলের মেঘ হয়ে মিশে যাচ্ছে বাতাসে; অনেকটা মরুময়ের মেঘকারখানার মেঘের মতো— কিন্তু তার চেয়েও অকল্পনীয়, বিপুলতর আকারে; সে ছড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশজুড়ে। আকাশপ্লাবী নদী হয়ে গেল সে, যেন সে সমগ্র সৃষ্টিকে ডুবিয়ে ফেলতে চায়। সহস্র তরঙ্গদল দুলে উঠল সেই অপরিমেয় জলরাশির মধ্যে।

তার একমাথা কালো চুল খুলে পড়েছে, মাথা থেকে বেরিয়ে আসছে প্রাণদায়ী জলস্রোত। তার এতদিনের সব হিম, সব ঘৃণা গলে ভালোবাসা হয়ে যাচ্ছে, আর অনাবিল জলধারা হয়ে বেরিয়ে আসছে। জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী হিমকুশলতা সে প্রয়োগ করছে, কিন্তু আর ঘৃণা দিয়ে নয়, সর্বজীবের প্রতি তার ভালোবাসা বেরিয়ে আসছে শান্তিদায়ী জল হয়ে।

করুণায় পূর্ণ অভী তার শেষ নিশ্বাস দিয়ে প্রয়োগ করল হিমকুশলতা, হয়তো এ-ই শেষবারের মতো। নিজের দেহের পাশুপতের অগ্নিশক্তিকে সে শীতল করে বিস্ফোরিত করল আকাশে। নীরবে প্রার্থনা করল সে, “হে পাশুপত-অগ্নি, তুমি শান্তিজল হও। মৃত্যু নয়, তোমার স্পর্শে সর্বজীবের কল্যাণ হোক।”

রক্তিমবর্ণের অমঙ্গলবাহী মেঘগুলোকে যেন ফুৎকারে সরিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ছেয়ে গেল অপরিমেয় কালো মেঘে; গম্ভীররবে ডেকে উঠল বজ্র। আর তার সব ভালোবাসা, সব হিমশক্তি দিয়ে অভী সেই মেঘে জলসঞ্চার করল। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে, এই বিরাট জলরাশি তারই দেহ, আর এর প্রত্যেক কণায় আসলে সে-ই আছে। ফিসফিস করে সে উচ্চারণ করল, “শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক।” নিজের পূর্ণ অস্তিত্বকে সে মিলিয়ে দিল পাশুপতের সঙ্গে, আর বৃষ্টির কণায়-কণায় সে ঝরে পড়তে লাগল মাটির ওপর। তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকা পরম ভালোবাসায় পান করে নিল তাকে।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, তার এই শান্তিকামনামাত্রই ঐশিকরা শুকিয়ে গেলেন। তাঁরা বিশৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি, যুদ্ধ আর নৃশংস মৃত্যুতে তাঁদের পুষ্টি। এই প্রশান্তির বৃষ্টি তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। আকাশ থেকে নেমে আসা সুস্নিগ্ধ বৃষ্টির ফোঁটা তাঁদের স্পর্শ করতেই তাঁরা পুড়ে গেলেন; তাঁদের অভেদ্য সুরক্ষামায়া গলে নষ্ট হয়ে গেল। আগুনের স্পর্শে জমাট ঘৃত যেমন গলে যায়, তেমন করেই বৃষ্টির ছোঁয়ায় তাঁদের দেহ গলে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল চিরতরে। পীতপত্রবনের মাটিতে বৃষ্টিধোয়া কাদাজলে মিশে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তাঁদের শরীরের অবশেষ।

সমরগরিমার অরণ্যের দাউদাউ আগুন নিভে গেল মেঘভাঙা বর্ষণে। দু’হাত উঁচুতে তুলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসরা। আকাশ থেকে আশীর্বাদের মতো নেমে আসা জলধারায় ধুয়ে গেল নদীতীরে উড্ডীনখরদের ছাই, জুড়িয়ে গেল দগ্ধ অরণ্যের ক্ষত। অগ্নিদানবের শরীরের আগুন নিভে গেল ওই অঝোর বারিধারায়; তার নির্বাপিত শরীরও গলে গিয়ে কাদার সঙ্গে মিশে বয়ে গেল নদীর দিকে। আনন্দ করতে শুরু করল পশুপাখিরা, মানুষেরা। অভী দেখতে পেল, এতকালের মরুত্বমার পর জল নিতে এসে

উপস্থিত হয়েছে মৃতরাও। নরকে গতবার যে ভূতগুলোকে দেখেছিল সে, তারা হাজির হয়েছে। তাকে ঘিরে রেখেছে তার চলে যাওয়া প্রিয়জনেরা। এক-এক করে তাদের হাসিমুখগুলো দেখতে লাগল সে— সুতসোম, উর্মি, রাজা পুনর্বসু, তরুণ, প্রফুল্ল, অরিত্র, চক্রবাক, বিনীতেশ। সে দেখতে পাচ্ছে তার সমরোত্তমদের ছায়াশরীরগুলো; তাঁদের মুখে গর্বের হাসি, চোখে আনন্দের অশ্রু। ওই তো হাত নাড়ছে বাবা, মা, বজ্রধর, রবিকাকা। তার জলে তৃপ্ত হয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে সেই একমাত্র উৎস-জীবনের সঙ্গে। যেন প্রাণসমুদ্রের এক একটা ঢেউ ছিল ওরা; জন্মের তীর থেকে ফিরে এসে সেই ঢেউ আবার মিশে যাচ্ছে সাগরে। অনাদ্যন্তকাল ধরে জগৎ জুড়ে হয়ে চলা এই খেলাটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল অভী। মৃত্যুর দেবতা আজ জীবন-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করে দিলেন তার চোখের সামনে। যা থেকে সৃষ্টি, তাতেই আবার লয়। অভী তার চোখের সামনে প্রলয় দেখতে পেল, তাকে অনুভব করতে পারল। প্রলয় মানে যে কী, সে উপলব্ধি করতে পারল। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে প্রত্যেকের জলের তৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণার নিবৃত্তি প্রার্থনা করল সে।

অভী এখন বুঝতে পারছে, সে নিজেও ওই বিরাট, সর্বব্যাপী প্রাণের সমুদ্রের একটা ঢেউ মাত্র।

তার মাথার মধ্যে বেজে উঠল মৃত দেবতার কণ্ঠস্বর। “প্রলয়যোদ্ধা মানে যে প্রলয় আনে, শুধু সে নয়। যে যোদ্ধা প্রলয়কে শান্ত করে, প্রলয়ের ধ্বংসলীলার পরের সৃষ্টিকে ভালোবেসে সংরক্ষণ করে, সে-ও প্রলয়যোদ্ধা। নিজের ঘৃণাকে জয় করে তুমি ধ্বংসাত্মিক প্রলয়কে সৃষ্টিতে নিয়োজিত করেছ। নিয়তির দেওয়া মহাকার্য তুমি সম্পূর্ণ করেছ। এই শরীরের সমাপ্তিতে আজ থেকে তোমার মুক্তি হল।”

অপরিসীম তৃপ্তি নিয়ে নিজের মৃত্যুর মুহূর্তেও সে বলতে লাগল, “শান্তি হোক, শান্তি হোক পৃথিবীর।”

অভীর শরীর— তার সর্বসত্তার করুণা— রেণু-রেণু জল হয়ে মিশে যেতে লাগল মেঘের সঙ্গে। তারপর সে অবিরত ঝরে পড়তে লাগল সমগ্র মায়াজগতের ওপর। সেই ধরাপ্লাবী বর্ষণে ভিজতে লাগল রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস-মানুষ সবাই— তাকে পান করে তৃপ্ত হল মাটি।

ভিজে যাওয়া বাতাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে আকাশস্পর্শী মেঘের মধ্যে মিশে গেল অভী। সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের যত খানাখন্দ, পুকুর, মাল্যপর্বতের গুঁকিয়ে যাওয়া জলাশয়— সব ভরে উঠল সুপেয়, মিষ্টি জলে। আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেই বৃষ্টির জল মৃত দেবতার নদীকে স্পর্শ করা মাত্রই তার হলুদ রং মুছে গিয়ে স্বচ্ছ সাদা হয়ে গেল।

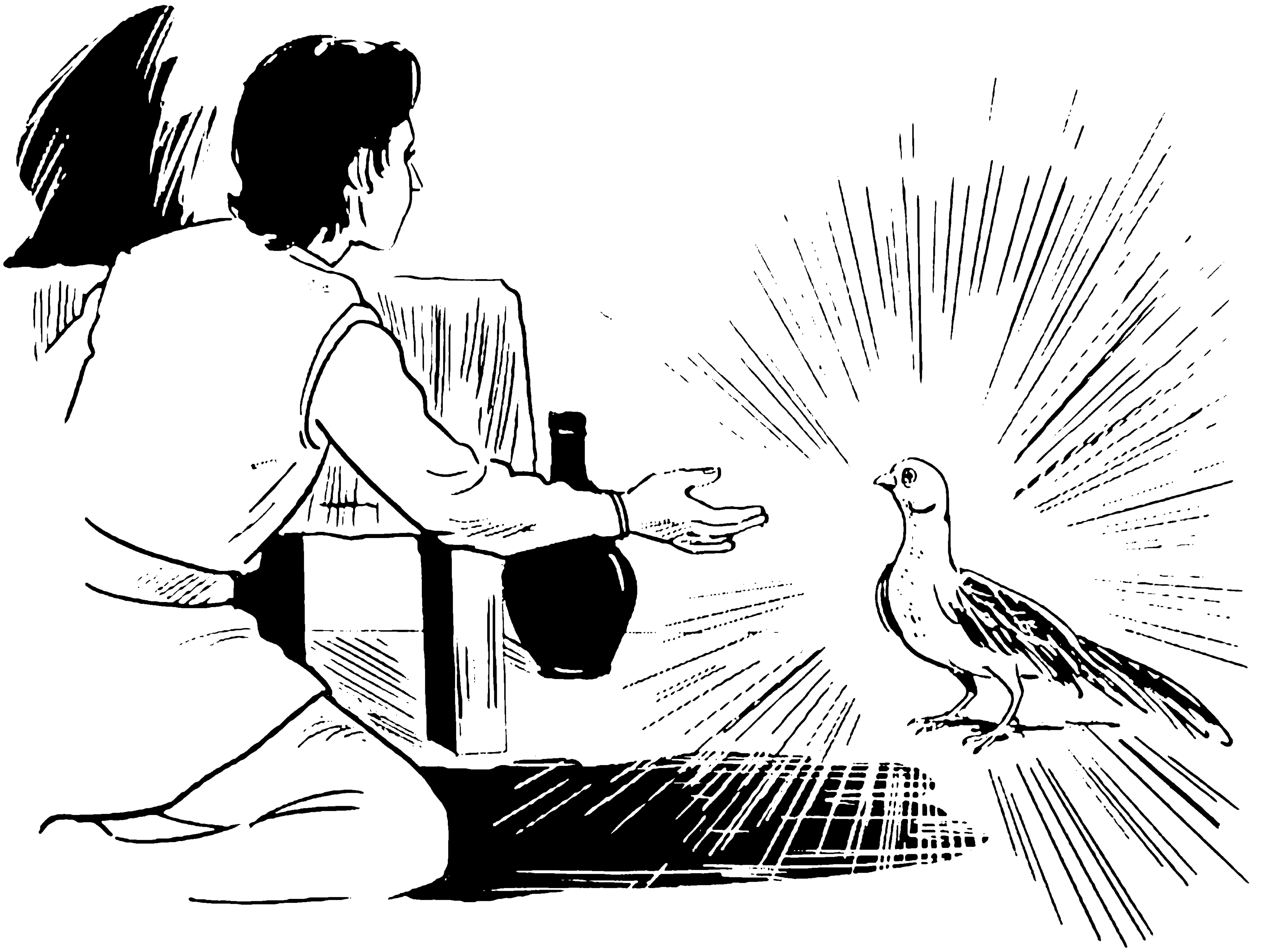
যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকরা জীবিত ছিল, তারা ভিজতে লাগল মহানন্দে। নিধি, নীপা, মেঘবর্ণ আর পর্বত ভেজা চোখে তাকিয়ে রইল আকাশ ঘিরে আসা কালো বাদলমেঘের দিকে। যুদ্ধক্ষেত্রে মরুময়ের মৃতদেহে গঁথে থাকা চন্দ্রহাস বাতাসে গলে মিলিয়ে গেল। দৃশ্যটা স্তব্ধ হয়ে দেখল সমরগরিমার শিক্ষার্থীরা।

সন্দীপ প্রশ্ন করল, “এ কী হল, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ চোখ মুছে বলল, “অভী মারা যাওয়ার পর চন্দ্রহাসের আর কোনো কাজ নেই এখানে। নিয়তির ইচ্ছায় প্রকট হয়েছিল সে অভীর জন্যই। অভী চলে যেতে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।”

এতক্ষণ পরে দু’হাতে মুখ চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠল নিধি। নীপা তার মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে তাকে সাঙ্ঘনা দিতে লাগল।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে, থামার কোনো লক্ষণ নেই। অভীর মহানীলগৃধ্র অপরাজিতা শব্দ করে কাঁদতে লাগল ধূসরকৃষ্ণ আকাশের মেঘের মাঝে উড়ে উড়ে।



।। বিংশ অধ্যায় ।।

পরিসমাপ্তি

চতুর্দিকের নিরন্ধ্র কালো অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠল অভীর চেতনা।

তার শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই, কোনো দহনজ্বালা নেই। নরকবিষকে এতদিন ধারণ করে রাখার সময় যেমন একটা অস্বস্তি হত শরীরের মধ্যে, সেটাও মিলিয়ে গেছে।

শরীরটাই আদপে আছে কি না, অভী বুঝতে পারছে না।

তার ধারণা, চোখ মেলেছে সে। কিন্তু 'চোখ' জিনিসটা আছে কি আদৌ? চারপাশ এমন গহীন অন্ধকার যে চোখ মেলা আর চোখ বন্ধ করার পার্থক্য বোঝা অসম্ভব।

কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোথাও কোনো আলো নেই। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কিছু নেই। তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেন হারিয়ে গেছে। অভী ভাবতে লাগল, এ-ই কি তবে মৃত্যুর পরের অবস্থা?

স্থির হয়ে রইল সে বহুক্ষণ। তারপর মনে হল, সামান্য একটু আলোর আভা যেন সে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। লালচে বেগুনি রঙের একটা মৃদু আলো জেগে উঠছে অন্ধকারের গায়ে।

আলোর এই রংটা এত পরিচিত লাগছে কেন? কোথায় দেখেছে সে এই আলো?

আলোটা ধীরে-ধীরে ছেয়ে ফেলছে তার দৃষ্টির সামনের অংশটুকুকে। ওটা কী? আকাশ? আর তার নিচে ওটা কি জল? জলে কি লালচে আকাশের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে?

এইবার অভী বুঝতে পারছে সে কোথায় এসে পড়েছে। স্বপ্ন-সরোবর!

“স্বপ্নরাজ্যে স্বাগত, অভী,” তার মাথার মধ্যে বেজে উঠল মৃত দেবতার কণ্ঠস্বর।

অভী বলল, “আমি এখানে কেন? আমি কি মরে গেছি? না কি স্বপ্ন দেখছি?”

দেবতার মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেল সে। “সব জীবনেরই দুটো পিঠ থাকে। একটা জাগরণের জীবন, আর একটা স্বপ্নের জীবন। তোমার জেগে থাকার জীবন শেষ হয়েছে, কিন্তু স্বপ্নে এখনও তুমি অস্তিত্বমান।”

অভী ঠিক বুঝতে পারল না কথাটা। সে বলল, “আমি কি এখন থেকে এখানেই থাকব?”

“স্বপ্নে কি কেউ চিরকাল থাকে? এই স্বপ্ন-অস্তিত্ব থেকে তুমি হয় যাবে মৃতদের মাঝখানে, অথবা জেগে উঠবে জীবিতদের পাশে। নিয়তি যে কাজ করার জন্য তোমার দু’হাতে নিয়তিলাঞ্ছন ঐকে পাঠিয়েছিলেন, সে-কাজ তুমি উত্তমরূপে শেষ করেছ। এই একই কথা একবার বজ্রধরকেও আমি বলেছিলাম, তোমাকেও বলছি। তুমি কি আর একবার সমরগরিমায় ফিরতে চাও, না কি মৃতদের জগতে পাড়ি দিতে চাও? ফিরতে চাইলে বজ্রধরের মতোই কিছুদিনের ছুটি নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। তারপর যখন আবার ডাক পড়বে, তখন আবার ফিরে আসতে হবে মৃত্যুর এপারে। কী চাও বলো তুমি।”

সমরগরিমা! তার সাধের সমরগরিমা! অভী বলল, “যদি অনুমতি করেন, আমি ফিরে যেতেই চাই। তারপর যখন মৃত্যু আমাকে আহ্বান করবেন, আমি সানন্দে ফিরে যাব।”

“তাই হবে। স্বপ্ন-সরোবরের মায়া নতুন শরীর নির্মাণ করে দেবে তোমার বিষহরণের প্রতিদান হিসাবে।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “বিষহরণ? আমি আবার কার বিষহরণ করলাম?”

দেবতার তৃপ্ত হাসি শোনা গেল। “‘কার’ নয়, ‘কীসের’। এত বড়ো প্রলয়ের সুদূরপ্রসারী কোনো প্রভাব থাকবে না, তা-ই কি হয়? সর্বজগতের কল্যাণ কামনা করে যে শান্তির বৃষ্টি তুমি এনেছিলে, তার স্পর্শে মৃত দেবতার নদীর বিষাক্ত জল পরিশ্রুত হয়ে গেছে। ওই জল এখন মানুষ, রাক্ষস নির্বিশেষে সবাই পান করতে পারবে। নিজের জীবন দিয়ে তুমি বিষকে অমৃত করেছ। প্রলয়ের পরের সৃষ্টিকে রক্ষা করেছ তুমি সার্থক প্রলয়যোদ্ধার মতোই।”

অভী একই সঙ্গে অবাক এবং আনন্দিত হয়ে উঠল। সমরগরিমা তো বটেই, মাল্যপর্বতেরও ভয়ানক জলকষ্ট এতদিনে ঘুচল তাহলে! ওই নদী তো ওদের দেশের মধ্য দিয়েও গেছে।

দেবতা আবার বললেন, “সব প্রলয়, সব ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত থাকে নতুন সৃষ্টির বীজ। কাজ এখনও শেষ হয়নি তোমার। প্রলয়যোদ্ধার কাজ, পাশুপতের কাজ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু ‘অভী’র কাজ এখনও বাকি আছে।”

একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে ঘুরছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সে বলল, “দেবতা, আমার মধ্যকার ওই বিপুল ঘৃণা— যাকে ব্যবহার করে আমি হিমকুশলতা প্রয়োগ করেছি এতদিন— সে কি আবার আমায় ভবিষ্যতে গ্রাস করতে পারে?”

দেবতা বললেন, “অতীত কি পুরোপুরি মুছে যায়, অভী? তোমার বর্তমানে, তোমার ভবিষ্যতে সে-ও থাকে— হয়তো অপ্রকাশিতভাবে, হয়তো সুপ্ত হয়ে, কিন্তু থাকে। হয়তো হঠাৎ কখনও সে একঝলকের জন্য ফিরে আসতেও পারে। যদি আসে, তাকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না?”

“জানি না। হয়তো পারব।”

“দেখা যাক; সময়ই দেবে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর। তোমার স্বপ্নসত্তাকে আমি স্থাপন করেছি তোমার নবগঠিত শরীরে। এইবার ফিরে যাও তুমি; আয়তনের দরকার আছে তোমাকে।”

অভী এতক্ষণে হাত দিয়ে অনুভব করতে পারল নিজের শরীরকে। নিজেকে ভীষণ হালকা লাগছে তার।

“তোমার বিদায়-উপহার দিয়েছি তোমার পায়ের সামনে। এই নতুন জীবনের অধিকার তুমি অর্জন করেছ। মঙ্গল হোক, অভী।”

দেবতার কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল। মৃদু লাল আলোয় ভরা নিস্তরঙ্গ স্বপ্ন-সরোবরের তীরে অভী ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। সত্যিই তার পায়ের সামনে কালচে রঙের কী যেন একটা রাখা আছে।

জিনিসটা হাতে তুলে নিল সে। কালচে নয়, এ তার সেই নীলশঙ্খ— জীবিতদের মাঝে তার ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র।

মনে-মনে দেবতার উদ্দেশে নমস্কার করে শাঁখটা তুলে নিয়ে ফুঁ দিল সে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুবিশাল ডানায় ঝটাপট শব্দ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল বিস্মিত মহানীলগৃধ্র অপরাজিতা।

এতখানি উত্তেজিত অপরাজিতাকে আগে কখনও দেখেনি সে। তাকে সামনে দেখতে পেয়ে বিরাট পাখিটা যে কী করবে, যেন ভেবে পাচ্ছিল না। একবার তার মুখে, মাথায় তার নিজের ঠোঁট ঘষে দিল শকুনটা, তারপর ডানা দিয়ে সে ঘেঁটে একাকার করে দিল অভীর চুলগুলো। বারবার ‘কঁ-অ’ ‘কঁ-অ’ আওয়াজ করে সে বোঝাতে চাইছিল সে কতখানি খুশি হয়েছে। স্বপ্ন-সরোবরের আকাশের মৃদু লালচে আলোয় অভী দেখতে পাচ্ছিল, তার চোখে জল চিকচিক করছে।

অভী বুঝতে পারছিল, অপরাজিতা মনে করেছিল সে মরে গেছে। হঠাৎ তার অপ্রত্যাশিত ডাক পেয়ে এখানে এসে সে আর যেন আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। এই নিখাদ ভালোবাসার স্পর্শে অভীরও দু’চোখ সজল হয়ে এল।

অপরাজিতার গলা জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ আদর করল সে। তারপর বলল, “অপরাজিতা, আমাকে সমরগরিমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না এখান থেকে?”

খুশিতে তার মাথায় আলতোভাবে ঠুকরে দিল অপরাজিতা, তারপর পিঠ বাঁকিয়ে বসে পড়ল তার সামনে। অভী উঠে পড়ল তার পিঠে।

তারপর আকাশপথের সেই আলোবাতাসহীন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে সে যখন সমরগরিমার আকাশে বেরিয়ে এল, তখন সদ্য ভোর হচ্ছে। প্রভাতসূর্যের স্নিগ্ধ লাল আলোয় অন্ধকার সরে যাচ্ছে; মাটির বুকে জেগে উঠছে সদ্য ঘুমভাঙা প্রাণ। এই মধুময় আলো ছড়ানো ভোরের আকাশের মধ্য দিয়ে ধুলোয় ভরা মাটির দিকে নেমে আসতে আসতে বুকভরে শ্বাস নিল অভী; শুধু এই বেঁচে থাকাটুকুর জন্যই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হল তার।

অপরাজিতা তাকে নামিয়ে দিল মিত্রভবনের সামনে। মিত্রভবনের দরজা বন্ধ; এখনও বোধহয় নিধি, মিত্রমাসি বা বাড়ির অন্য কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। আন্তে আন্তে বন্ধ দরজায় দু'বার ঘা দিল অভী।

“কে?” মিত্রমাসির সাড়া পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

অভী বলল, “আমি।”

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর ভেতরে একটা হুড়মুড়-দুড়দাড় শব্দ পাওয়া গেল। কারা যেন সবকিছু ধাক্কা দিয়ে ফেলে সরিয়ে ছুটে আসছে দরজার দিকে। পরক্ষণেই সশব্দে খুলে গেল দরজার পাল্লা দুটো। অভী দেখতে পেল, সারা পৃথিবীর বিস্ময়, আনন্দ আর অশ্রু চোখে নিয়ে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন মিত্রমাসি, তাঁর পেছনেই নিধি।

তাকে কিছু বলতে না দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে মিত্রমাসি জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপর কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। মিত্রমাসির পেছন থেকে নিধি একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল তার হাত; যেন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে লাগল সে সত্যিই বেঁচে আছে কি না।

অভী কাতরস্বরে বলল, “মিত্রমাসি, এবার ছাড়ুন। আমি ঠিক আছি, ভালো আছি।”

তাকে বন্ধনমুক্ত করে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন প্রৌঢ়া মহিলা। এই অযাচিত স্নেহটুকু বড়ো ভালো লাগল অভীর। সে তাঁর হাত ধরে বলল, “কাঁদছেন কেন? আমি তো বেঁচে আছি, ভালো আছি।”

মিত্রমাসি এখনও কথা বলতে পারছেন না। অভী অনুমান করল, তার ‘মৃত্যু’র পর উনি যে গভীর আঘাত পেয়েছেন, তার প্রভাব কাটাতে ওঁকে আরও কিছুটা সময় দিতে হবে।

তাঁকে আরও কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে সে ফিরল নিধির দিকে। নিধিরও মুখে হাসি, চোখে জল। অভী বলল, “নিধি, কেমন আছ?”

জোরে একটা গাঁটা মারল নিধি তার মাথায়। “আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কেমন আছি! গাধা!” বলে শোঁ-শোঁ শব্দ করে নাকের জল টেনে নিল সে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বোকার মতো হাসল অভী। নিধি বলল, “মরে গিয়ে শান্তি পাবে ভেবেছিলে বুঝি? আয়তনে চলো। কাজ আছে।”

“কী কাজ?”

একটা উজ্জ্বল নীল রঙের পাথর তার নাকের সামনে তুলে ধরল নিধি।
“আর একটা বন্ধুর প্রতি কিছু কর্তব্য আমাদের বাকি রয়ে গেছে।”

সেবাকক্ষে রক্ষোবৈদ্যের সঙ্গে বসে কথা বলছিল মেঘবর্ণ। তাকে ঢুকতে দেবে দু’জনেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

নিধি বলল, “দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি।”

মেঘবর্ণ উঠে গিয়ে হাত ধরল অভীর। কোনো কথা না বলে তাকে সে জড়িয়ে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। কীভাবে সে বেঁচে ফিরে এল, এই নিয়ে মেঘবর্ণ একটি কথাও জানতে চাইল না।

তারপর সে একটু সামলে নিলে নিধি বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।”

রক্ষোবৈদ্য সচকিতে বললেন, “বলো।”

“আপনার জন্য একটি কাজ নিয়ে এসেছি।”

দানবটার বুক কেটে বার করে আনা নীলকান্তমণিটা সে রাখল তাঁর সামনের প্রস্তরবেদির ওপর।

মেঘবর্ণ হাঁ করে তাকাল সেদিকে। “লীনার হৃদয়?”

“হ্যাঁ। এর মধ্যেই ওটাকে সংরক্ষিত করে রেখেছিল সৌজন্য আর ঐশিকরা। কিন্তু এতে কাজ হবে কি না, রক্ষোবৈদ্য বলতে পারবেন।”

মেঘবর্ণ উঠে গিয়ে নিধির হাত ধরে বলল, “নিধি, এতে কাজ হবে কি না, আমিও জানি না। কিন্তু তুমি এই সব-হারানো লোকটাকে আজ পরপর দু’বার আশার সংবাদ দিলে। অভীকে তুমিই নিয়ে এলে এখানে, আর লীনাকে...”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, এখনই এত উল্লসিত হবেন না। নিধি যে মায়া প্রয়োগ করতে বলছে, সে মায়ার কোনো উল্লেখ আজ অবধি চিকিৎসাশাস্ত্রের কোথাও পাইনি। মৃত ব্যক্তির হৃদয়কে নীলকান্তমণির মধ্যে সংরক্ষিত রেখে সেই হৃদয় আবার শরীরে প্রতিস্থাপিত করা— এ-জিনিস মায়াজগতের ইতিহাসে আগে কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।”

অভী বলল, “একবার চেষ্টা করতে দেখতে তো ক্ষতি নেই।”

“না, তা অবশ্য নেই।”

ওরা চারজনে এসে দাঁড়াল পাশের কক্ষে। এখানেই শোয়ানো আছে লীনার সংরক্ষিত মৃতদেহ। অভী একবার আড়চোখে দেখল, মেঘবর্ণের দু’চোখের নিচে গভীর কালি পড়ে গেছে; যেন একদিনের মধ্যে মানুষটার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

তার এতকালের সঙ্গী সমরোত্তমরা সবাই চলে গেছেন, রয়ে গেছে শুধু সে একা। এই যন্ত্রণা যে মরে যাওয়ার চেয়েও অধিক, অভী তা অনুমান করতে পারছিল।

লীনা শুয়ে আছে নিথর হয়ে। তার মুখে কোনো কষ্টের অভিব্যক্তি নেই; দু’চোখ বন্ধ, হাত বুকের ওপর রাখা।

রক্ষোবৈদ্য বার করে আনলেন উর্মির রক্তপদ্মরাগ মণিটি। তারপর বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, অভী, একটা কথা।”

মেঘবর্ণ বলল, “বলুন।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “লীনার দেহে বহু পুরোনো পচনরোধী, সংরক্ষক ঔষধ মাখানো আছে। আমি জানি না, এই নীলকান্তমণির ভেতর থেকে হৃদয়টা নিষ্কাশন করে ওর শরীরে বসিয়ে আদৌ ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারব কি না। যদি এই অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহলে আপনাদের দু’জনকে অনুরোধ করব, বাইরের সেবাকক্ষে গিয়ে বসুন। লীনা যদি বেঁচে ওঠে, তাহলে তখন ওকে ভেতরেই একবার স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে আমরা বাইরে নিয়ে যাব। নিধি, তুমি আমার কাছে থাকো, আর অভী, তুমি উত্তরাকে সংবাদ দাও। মাল্যপর্বতের সেবাকক্ষটা উর্মির পরে ও-ই চালাত; ওর মোটামুটি চিকিৎসাবিষয়ে জ্ঞান আছে, দেখেছি। ওর সাহায্য আমার লাগবে।”

মেঘবর্ণ বলল, “অভী, তুমি বাইরে বোসো, আমি যাচ্ছি। পর্বতের কাছে আছে উত্তরা। আমি এখুনি গিয়ে ডেকে আনছি ওকে।”

হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। অভী বাইরের কক্ষে এসে বসে রইল চুপ করে। নিধি তার পাশে এসে বসল।

অভী আর যেন উত্তেজনা সংবরণ করতে পারছিল না। সে বলল, “নিধি, কী হবে?”

নিধি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, “আজকের দিনটা খুব ভালো। আজ যা হবে, ভালোই হবে। ভরসা রাখো।”

রক্ষোবৈদ্য পাশের কক্ষে শিশি-বোতল নাড়াচাড়া করছেন, তার ঠুনঠুন শব্দ কানে আসছে। অভীর হঠাৎ মনে হল, প্রলয়ের আগের আয়তনের অবস্থা আর এই এখনকার আয়তনের অবস্থা— দুটোর মধ্যে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে।

এখনকার আয়তন যেন বড়ো শূন্য লাগছে। কেউ যেন নেই আর এখানে; বাবা, মা, রবিকাকা, অধিনায়ক বজ্রধর— ওদের ছাড়া কী ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে তার।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অভীর।

নিধি বুঝতে পেরেছিল তার মনের অবস্থাটা। সে বলল, “এই শূন্যতা আমাকেও যেন গিলে খেতে আসছে, জানো? তবু জানি, একে মানিয়ে নিতেই হবে। মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।”

অভী মাথা নাড়ল। ততক্ষণে মেঘবর্ণ আবার ছুটে এসে ঢুকেছে সেবাকক্ষে। ঢুকেই সে হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘোষণা করল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, উত্তরা আসছে। নতুন একটা পোশাক আনতে বলেছি সঙ্গে।”

রক্ষোবৈদ্য পাশের কক্ষ থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, “কেন ডেকেছি, ওকে কিছু বলোনি তো?”

মেঘবর্ণ একটু হেসে বলল, “অত বোকা নই আমি। জানি, বললেই হাঙ্গারটা প্রশ্ন হবে; তাতে শুধু-শুধু সময় নষ্ট হবে। এমনকি অভীর ফিরে আসার কথাটাও বলিনি কাউকে। পর্বত জিজ্ঞাসা করছিল আমি কেমন আছি। ‘ভালো আছি’ বলেই পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে।”

একটা কাপড়ের মোড়ক হাতে নিয়ে উত্তরা এসে ঢুকল সেনাকক্ষে, আর সঙ্গে-সঙ্গে অভীকে দেখেই তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। মুখে হাত চাপা দিয়ে সে অস্ফুটে কী একটা বলে উঠল, বোঝা গেল না।

অভী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “হ্যাঁ বউদি, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু তার থেকেও বড়ো ব্যাপারের জন্য রক্ষাবৈদ্য মহোদয় তোমাকে ডেকেছেন। শান্ত হয়ে তুমি নিধির সঙ্গে ও-ঘরে যাও।”

মেয়েদুটি পাশের ঘরে চলে যাওয়ার পর মেঘবর্ণ এসে বসল অভীর পাশে। অভীর মনে হল, তার কিছু একটা বলা দরকার। সে বলল, “মৃত দেবতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। তিনি আমাকে ফেরত পাঠালেন। বললেন, প্রলয়যোদ্ধার কাজ ফুরিয়েছে, কিন্তু ‘অভী’র কাজ এখনও বাকি আছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “ভাগ্যিস ফিরে এলে তুমি। সত্যি বলছি, তোমরা সবাই চলে গেলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু অভী, একটা ব্যাপার এখনও আমি বুঝতে পারছি না।”

“কী?”

“অধিনায়ক বজ্রধর অনেক দিন আগেই অনুমান করেছিলেন, ঐশিকরা আমাদের বিরুদ্ধে অগুনতি উড্ডীনখর প্রয়োগ করে আক্রমণ করতে চাইবেন। আমরা খুব ভালো করেই জানতাম, ওই বিপুলসংখ্যক উড্ডীনখরের আক্রমণ ঠেকানো কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই সম্মেলন কক্ষে গোপনে সব সমরোত্তম বসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যদি পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়, তাহলে আমরা সকলে মিলে যমদণ্ডের শক্তিকে নিজেদের শরীরের মধ্য দিয়ে চালনা করব। অধিনায়ক বলেছিলেন, আমরা যদি আমাদের শেষ নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মিলিতভাবে যমদণ্ডের শক্তিকে চালনা করি, তাহলে উড্ডীনখরের পুরো বাহিনী একসঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। অধিনায়কের যুদ্ধপরিস্থিতি অনুমানের ক্ষমতা অসাধারণ; বাস্তবে হয়েছিলও তা-ই। আমরা সবাই জানতাম, এই কাণ্ড ঘটলে আমরা কেউই বাঁচব না। আমার আশ্চর্য লাগছে, অন্য চারজনের সঙ্গে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার মায়া আমিও প্রয়োগ করেছিলাম; কিন্তু তাহলে আমি মরলাম না কেন?”

এর উত্তর অভীর কাছে নেই। সে চুপ করে রইল। মেঘবর্ণের মুখে বেদনা, হতাশার ছাপ স্পষ্ট। কিছুক্ষণ পর সে আন্তে-আন্তে বলল, “মেঘবর্ণ, আমার মনে হয়, সব মন্দের মধ্যেও এইটুকু বোধহয় ভালোই হয়েছে। সমরোত্তমদের একজনও না থাকলে এই আয়তন ধ্বংস হয়ে যেত।”

মেঘবর্ণ আবার সেই একই কথা বলল, “কিন্তু আমি বাঁচলাম কী করে? অধিনায়ক বজ্রধরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমারও তো মরার কথা!”

অভী তার মুখের দিকে তাকাল। কী ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাকে! গতবার সৌজন্য যখন তাকে বজ্রমাণিকের বিষ প্রয়োগ করেছিল, তখনও যেন এতখানি ভেঙে পড়েনি মেঘবর্ণ।

পাশের ঘরে রক্ষোবৈদ্য লীনার মৃতদেহের ওপর জটিল সঞ্জীবনী মায়া প্রয়োগ করছেন রক্তপদ্মরাগ দিয়ে। অভী যেন আর ভরসা রাখতে পারছিল না।

এতদিন পরে মৃত মানুষকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব? হতেই পারে না। এত ভালো ভাগ্য তার নয়।

দু'জনেই নিঃশব্দে বসে রইল। কথা যেন ফুরিয়ে গেছে, কথা যেন আর আসছে না কারও মুখে। মৃত্যুর বিষণ্ণতা আর রয়ে যাওয়ার একাকিত্ব মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়। দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে রইল মেঘবর্ণ; অভী চোখ বন্ধ করে হেলান দিল পাথরের ঠান্ডা দেয়ালে।

কতক্ষণ পর পেছন থেকে নিধি ডাকল, “অভী!”

চোখ খুলে মাথা ফিরিয়ে তাকাল অভী, আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার বুকের মধ্যে ‘ধক্’ করে উঠল।

লীনাকে ধরে ধরে পাশের কক্ষ থেকে বার করে নিয়ে আসছে নিধি। লীনার মুখ খুব ফ্যাকাশে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে শরীর ভীষণ দুর্বল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটি অভীর ভীষণ পরিচিত। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতে থাকতে অবসাদে মেঘবর্ণ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল; তার পিঠে একটা খোঁচা মেরেই অভী তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; ছুটে গেল সে ওদের দিকে।

লীনা একটা হাত বাড়িয়ে দিল; অভী শক্ত করে চেপে ধরল হাতটা। তার চোখ দিয়ে অব্যোমধারায় নেমে এল জল। লীনা একটু হেসে বলল, “দূর বোকা! এত কাঁদে?”

অভী আর যেন নিজেকে সামলাতে পারছে না। লীনার হাতটাকে স্পর্শ করে থাকতে-থাকতে তার যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না, এই মানুষটা আবার ফিরে এসেছে তার জীবনে। বাচ্চাছেলের মতো কাঁদতে লাগল সে।

লীনা দুর্বল গলায় বলল, “নিধি, আমাকে ছেড়ে দিয়ে বরং ওকেই সামলাও তুমি। যা কাঁদছে, সেবাকক্ষে বন্যা বইয়ে ছাড়বে মনে হচ্ছে।”

চোখের জল মুছে হেসে ফেলল অভী। রক্ষোবৈদ্য উত্তরার সঙ্গে বেরিয়ে আসছিলেন নিধির পেছন-পেছন। তিনি সাবধান করে দিলেন, “আস্তু, অভী। এখন ওকে বেশি উত্তেজিত কোরো না। এই পুরোনো শরীরটায় আবার অভ্যস্ত হতে ওর কিছুটা সময় লাগবে।”

তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেঘবর্ণ; বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে আছে লীনার দিকে। লীনা হেসে বলল, “কেমন আছ, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ যেন অনেক যুগ পরে মন খুলে হাসল। “ভালো ছিলাম না; এই মুহূর্ত থেকে ভালো হয়ে গেলাম।”

নিধির গায়ে ভর দিয়ে আস্তু-আস্তু এসে প্রস্তরবেদির ওপর বসে পড়ল লীনা। অভী আর নিধি বসল তার দুই পাশে; এক হাত দিয়ে নিধি জড়িয়ে রাখল

তাকে। রক্ষোবৈদ্যের নির্দেশমতো একটা কাচের পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল এনে তার হাতে দিল উত্তরা। আন্তে-আন্তে চুমুক দিয়ে জলটা পান করতে লাগল লীনা।

অভীর মনে হল, একটু একটু করে গালের ওপর লালচে আভা ফিরে আসছে তার। সকালটা যেন হঠাৎ করেই কী সুন্দর হয়ে উঠল।

রক্ষোবৈদ্য এসে বসলেন তার সামনে। “কেমন লাগছে, লীনা?”

লীনা কাচের পাত্রটা নামিয়ে রেখে বলল, “বেঁচে আছি মনে হচ্ছে এতক্ষণে।”

অভী আর নিধি দু’জনেই হাসল। রক্ষোবৈদ্য স্নেহে হাত রাখলেন তার মাথায়। “বড়ো চিন্তায় ছিলাম গো। এত কঠিন সঞ্জীবনী মায়ার প্রয়োগ আজ পর্যন্ত কারও ওপর করা হয়নি কখনও। তুমি যে ফিরে এসেছ, তা কেবল নিয়তির ইচ্ছায়।”

মেঘবর্ণ বলল, “নিয়তি যে শুধু কেড়েই নিলেন না, ফিরিয়েও দিয়ে গেলেন, এতেই আমার আনন্দ।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “লীনা, তোমার কাছে এবার আমার একটা অনুরোধ আছে।”

লীনা একটু অবাক হয়ে বলল, “হ্যাঁ, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, বলুন।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এক দণ্ডকালের মধ্যেই তোমার শরীর প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। তখন আমার অনুরোধ, তুমি সমরোত্তম মেঘবর্ণকে সঙ্গে নিয়ে একবার তোমার মায়ের কাছে যেয়ো।”

মেঘবর্ণ বিব্রত স্বরে বলল, “আহ, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আবার ওকে এ-সবের মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আপনি দয়া করে নীরব হোন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। লীনা, এই মানুষটা অনেক মানসিক জ্বালায় জ্বলেছেন এতদিন; তোমরা সবাই পুরোটা জানো না হয়তো, কিন্তু আমি সবটাই জানি। এবার কিছুটা শান্তি এঁর প্রাপ্য। লীনা, আমার এই অনুরোধ তুমি রাখবে তো?”

লীনা মৃদু হেসে বলল, “রাখব। মানসিক শান্তি আমার মায়েরও দরকার। কিন্তু শুধু আমি ফিরে এলেই শান্তি হবে না তার; যে ব্যক্তি এতকাল নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সর্বদা ভালো রাখার চেষ্টা করেছে, তাকেও মায়ের দরকার। আপনি নিশ্চিত থাকুন রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আজকেই আমি যাচ্ছি মায়ের কাছে। মেঘবর্ণ, তুমি অন্তত সঙ্গে যেতে ‘না’ বোলো না।”

মেঘবর্ণ আন্তে করে বলল, “বেশ, বলব না।”

লতাকাকিমার কাছে লীনাকে রেখে মেঘবর্ণ ফিরে এসেছে দুপুরে। নিধি গিয়েছিল ওদের সঙ্গে; অভী যায়নি। তার বাবা আর মায়ের ব্যবহার করা তরবারি, অধিনায়ক বজ্রধরের যমদণ্ড, রবিকাকার ফুলঝুরি— সবক’টি অস্ত্রকে যত্ন করে মুছে পরিষ্কার করে সে সাজিয়ে রাখছিল সংগ্রহশালায়। ভবিষ্যতে যে শিক্ষার্থীরা আসবে, তারা যেন দেখতে পায়, একসময় এই আয়তনের অকুতোভয় সমরোত্তমরা কী অসাধারণ সব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

চন্দ্রহাসের শূন্য কাচের বাক্সটার সামনে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। চারজন সমরোত্তমের মতো চন্দ্রহাসও চলে গেছে চিরদিনের মতো; আর কোনোদিন আসবে না।

নিধি ডাকল, “অভী, ব্যস্ত?”

অভী মুখ তুলে তাকাল। “না, ব্যস্ত নই। সমরোত্তমদের রেখে যাওয়া অস্ত্রগুলো একটু গুছিয়ে রাখছি। তুমি চলে এলে লীনার বাড়ি থেকে?”

নিধি বলল, “হ্যাঁ। মেঘবর্ণ আর লতাকাকিমাকে একটু একান্তে থাকার সুযোগ করে দিয়ে এলাম। আসার পথে নীপাকে খবর দিয়ে এসেছি। তুমি আর লীনা দু’জনেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছ শুনে আনন্দে ও প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। এখনই আসতে চাইছিল ও তোমার কাছে; আমি নিষেধ করলাম। আমি জানি, এখন তোমার মন খারাপ।”

অভী ম্লান হাসল। “ও ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, লতাকাকিমা আর মেঘবর্ণের মধ্যে ভাব হয়েছে তো?”

“হয়েছে। সুস্থ লীনাকে নিয়ে আমরা যখন ওঁর বাড়িতে ঢুকলাম, তখন কাকিমা খুব কাঁদছিলেন। মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে সে কান্না আর থামতেই চায় না। তারপর উনি মেঘবর্ণের কাছে খুব ক্ষমা-টমা চাইছিলেন। আমি আর দাঁড়াইনি; লীনাকে ইশারা করে পালিয়ে এসেছি। অত কান্নাকাটি বাপু আমার পোষায় না।”

অভী বলল, “তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? একবার তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম জ্বলন্ত পীতপত্রবনে। ভালো আছেন তো উনি?”

নিধি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। “জানি না। ভালোই থাকবে নিশ্চয়ই। খারাপ থাকলে নীপা অন্তত বলত।”

অস্ত্রগুলো দেখতে দেখতে অভীর হঠাৎ মনে পড়ল, রবিকাকা তাকে বলেছিল, অঘটন যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে ওই ফুলঝুরি লাঠিটা নিয়ে একবার মারীচের দোকানে যেতে। ওখানে নাকি তার জন্য একটা কাজের জিনিস রাখা থাকবে।

মায়াজগতের বাইরে মানুষদের পৃথিবীতে সে একা যেতে চায় না। সে বলল, “নিধি, মেঘবর্ণ কখন লীনাদের বাড়ি থেকে আসবে, কিছু জানো?”

নিধি বলল, “বেশি দেরি বোধহয় হবে না। রক্ষাবৈদ্য বারবার বলে দিয়েছেন, লীনাকে এখন ক’দিন খুব বেশি উত্তেজিত হতে দেওয়া চলবে না। মেঘবর্ণ তা জানে খুব ভালো করেই; তাই বেশিক্ষণ ওখানে থাকার পাত্র সে নয়।”

হাত বাড়িয়ে ফুলঝুরিকে হাতে তুলে নিল অভী। তারপর সংগ্রহশালার দরজা বন্ধ করে ওরা যখন বেরিয়ে আসছে, তখন বাইরে থেকে পর্বত ডাকল, “অভী আছ নাকি এখানে?”

অভী এসে দাঁড়াল আয়তনের অলিন্দে। বিস্ফারিত চোখে মৃগেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের পাশে। অভী একটু হেসে বলল, “পর্বতদা, মৃগেন্দ্র, কেমন আছ?”

তার জ্যোন্ত ফিরে আসার খবরটা আয়তনের সবাই এখনও জানে না। উত্তরার কাছে তার আর লীনার সংবাদ শুনেই পর্বত এসেছে ছুটতে-ছুটতে। আসার পথে মৃগেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তাকেও সংবাদটা দিয়েছে সে।

হাঁ করে তাকে দেখছে মৃগেন্দ্র। পর্বত পাগলা হাতির মতো ছুটে এসে অভীকে কোলে তুলে নিল। তার প্রচণ্ড আলিঙ্গনে অভীর মনে হল তার দম আটকে আসছে।

“আঃ, পর্বতদা, কী করছ? ছাড়ো, ছাড়ো!”

তার দশা দেখে নিধি হাসছে হি-হি করে। মৃগেন্দ্র বলছে, “পর্বতদা, একদম ছেড়ো না। ফিরে আসার খবরটা পর্যন্ত এখনও কাউকে জানায়নি ছেলেটা!”

তাকে নামিয়ে দিয়ে পর্বত বলল, “উত্তরার কাছে সব শুনেছি আমি। লীনা কই? তার মায়ের কাছে গেছে?”

ততক্ষণে মেঘবর্ণ এসে উপস্থিত হয়েছিল ওখানে। সে-ই উত্তর দিল, “হ্যাঁ, পর্বত। লীনাকে আপাতত তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি। একটু সুস্থ হয়ে নিক ও; তারপর আবার শিক্ষার্থী-বাহিনীতে যোগ দেবে।”

পর্বত বলল, “এত বড়ো খবর দুটো তুমি আমাকে বললে না, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “আরে, আমি নিজেই এত অবাক হয়ে গেছি যে তোমাকে আর বলার সুযোগ হয়নি। তবে উত্তরা তোমাকে বলবেই, আমি জানতাম।”

মৃগেন্দ্র ততক্ষণে একদৌড়ে বাইরে গিয়ে যতজনকে সামনে পেয়েছে, সবাইকে অভীর ফিরে আসার খবর জানিয়ে দিয়েছে। তারা হই-হই করে ছুটে আসছে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে আসা প্রলয়যোদ্ধাকে দেখবে বলে। এই কলরবের মধ্যেই অভী নীচুগলায় বলল, “মেঘবর্ণ, একবার রবিকাকার লাঠিটা নিয়ে মারীচের দোকানে যেতে হবে। রবিকাকা আমাকে বলেছিল, ওখানে নাকি একটা কাজের জিনিস রাখা থাকবে। তুমি কিছু জানো এ ব্যাপারে?”

একটু অবাক হয়ে মেঘবর্ণ বলল, “রবি তোমাকে এই কথা বলেছে? আমি তো কিছু জানতাম না!”

অভী বলল, “শুধু রবিকাকা নয়, অধিনায়ক বজ্রধরও একই কথা বলেছিলেন।”

মাথা চুলকে মেঘবর্ণ বলল, “আমি সত্যিই এ-বিষয়ে কিছু জানি না। তাহলে কি এই ব্যাপারটাই ওঁরা আমার কাছে লুকোতে চাইছিলেন? যা-ই হোক, চলো, তবে যাওয়া যাক। অধিনায়ক আদেশ দিয়ে গেছেন মানে তো সে আদেশ পালন করতেই হবে।”

আপাতত সমবেত ছাত্রছাত্রীদের শান্ত করে অভী আর মেঘবর্ণ বেরিয়ে এল বাইরের মাঠে। দুপুরের রোদ আজকে বেশ স্নিগ্ধ। সদ্য হয়ে যাওয়া বিপুল বৃষ্টির শৈত্য এখনও ছড়িয়ে আছে সমরগরিমা জুড়ে। মেঘবর্ণ ধূসর শঙ্খ বাজিয়ে তার গৃধ্র আহুদিকে আহ্বান করল।

রবিকাকার ফুলঝুরি লাঠিটা হাতে নিয়ে পাখিটার পিঠে চেপে পীতপত্রবন পেরিয়ে মাল্যপর্বতের দিকে উড়ে যেতে-যেতে অভী দুটো জিনিস খেয়াল করল। প্রথমত, পুড়ে যাওয়া পীতপত্রবনের গাছগুলোর চারপাশে নতুন করে গজিয়ে উঠেছে কচি-কচি সবুজ চারাগাছ, আর দ্বিতীয়ত, নিচে বয়ে যাওয়া মৃত দেবতার নদীর জলের সেই হলুদ রং আর নেই; তার পরিবর্তে সুন্দর, স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে প্রবল গতিতে। দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল তার।

অল্প কিছুক্ষণের জন্য আকাশের গায়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল ওরা। চারপাশটায় কেমন দমচাপা আঁধার ঘনিয়ে এল; হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আর অভীর ভয় করছে না। সে জানে, এই অন্ধকার সাময়িক।

তারপর ওরা বেরিয়ে এল মানুষের জগতের দিকে। নিচে দেখা যাচ্ছে অভীর চেনা বৈকালির বন। ওই বনেরই পারে মাঠের ধারে সেই ছোট বাড়িটায় সে আর রবিকাকা কাটিয়েছে এতগুলো বছর।

মেঘবর্ণ বোধহয় তার মনের কথা বুঝতে পারল। “কী অভী, একবার যাবে নাকি বাড়িটায়?”

“গেলে তো ভালোই হত।”

আত্মা অমনি হু-হু করে বাতাস কাটিয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। বুড়ো বটগাছটার মাথা স্পষ্ট হতে শুরু করল। ওই গাছের তলায় বসে গল্প করত রণিতের দলবল।

অভীদের পুরোনো বাড়ির সামনে মেঘবর্ণের জটায়ু নেমে এল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

বাড়িটার দরজা বরাবরের মতোই খোলা। অভীর মনে আছে, রবিকাকা সাধারণত দিনের বেলা দরজা বন্ধ রাখত না। ঘরের মধ্যে ঢুকল সে। মেঘবর্ণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, ভেতরে এল না।

বিছানাটা আগের মতোই গুছিয়ে রাখা আছে, জলের কুঁজো দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এককোণে। তবে মেঝেটা ধুলোয় ভরতি। কতকাল তাদের কারও পা পড়েনি এই ঘরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভী। রবিকাকা নেই; আর সে-ও কোনোদিন আসবে না এখানে।

জানালার এককোণে ঝোলানো আছে স্বর্ণখেচরের খালি খাঁচাটা। অভীর মনে পড়ল, একসময় সে আর রবিকাকা যেত বৈকালির বনে অভিযানে। নিজের শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল তার; মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল বারবার।

হঠাৎ একটা মৃদু ‘ক্যাঁ-ক্যাঁ’ আওয়াজ শুনতে পেল সে বিছানার তলা থেকে। অবাক হয়ে গেল অভী। খাটের নিচে আবার কী ঢুকল?

ঝুঁকে পড়ে খাটের তলায় তাকাতেই অভী হাঁ হয়ে গেল। সেই স্বর্ণখেচর পাখিটা টুক-টুক করে হেঁটে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে; ঘাড় বাঁকিয়ে যেন প্রশ্নের সুরে বলল, “ক্যাঁ?”

পাখির আওয়াজ শুনে মেঘবর্ণ ভেতরে ঢুকল। স্বর্ণখেচরকে দেখে সে বলল, “আরে, এ তো ভীষণ দুর্লভ স্বর্ণখেচর দেখছি।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, রবিকাকা এই সোনার পাখি ধরে পালক বিক্রি করত মারীচের দোকানে, তারপর আবার পাখিটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিত। গতবার সে এটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, আমার মনে আছে। এই পাখির তো এখানে থাকার কথা নয়!”

মেঘবর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “পাখিটা বুঝতে পেরেছিল, তোমরা ওর ক্ষতি চাও না। তাই ও এখানে ফিরে এসেছিল রবিকে খুঁজতে। আমি অধিনায়কের কাছে একবার শুনেছিলাম, স্বর্ণখেচর যদি একবার কাউকে ভালোবেসে ফেলে, তার সঙ্গ ছেড়ে যেতে চায় না।”

অভী বলল, “এবার আমি কী করব একে নিয়ে?”

সোনার পাখির গায়ে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে আসা দুপুরের রোদ; উজ্জ্বল হলদে আলোয় ঝলমল করছে তার সারা গা। মুখ তুলে পাখিটা তাকিয়ে আছে অভীর দিকে। অভীর মনে হল, স্বর্ণখেচর তাকে এতদিন পরেও চিনতে পেরেছে।

মেঘবর্ণ বলল, “এক কাজ করো তো। তুমি বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। দেখো পাখিটা কী করে।”

তার কথামতো অভী পায়ে পায়ে পিছিয়ে এল দরজার দিকে। যেইমাত্র সে বেরিয়ে গেল, অমনি স্বর্ণখেচর ক্যাঁ-ক্যাঁ করতে করতে ছুটে গেল তার দিকে। অভীকে সে যেতে দেবে না!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঘবর্ণ বলল, “তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়ে নাও। তোমাকে আর রবিকে ওর পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমাকে ও ছেড়ে যাবে না কিছুতেই। এই পাখির স্বভাব আমি জানি। যদি জঙ্গলে ওকে রেখে আসো, তাহলে ও না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে।”

পাখিটাকে হাতে তুলে নিয়ে তার সোনারঙের গলায় আঙুল বুলিয়ে দিল অভী; আরামে, খুশিতে স্বর্ণখেচরের চোখ বন্ধ হয়ে এল। তাকে কাঁধে বসিয়ে ঘরে রেখে যাওয়া রবিকাকার স্মৃতির উদ্দেশে একটা নমস্কার করে অভী বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।

আর নয় এখানে। রবিকাকার মতোই তার ছোটোবেলা আর ফিরবে না কোনোদিন, সে জানে।

বৈকালির বনের মধ্য দিয়ে ওরা চলল মারীচের দোকানটার দিকে। এই বনের ও-প্রান্তে পাহাড়ের নিচে মারীচের ছোট দোকানে চাল-ডাল-নুন-তেল বিক্রিবাটা চলে, কিন্তু তলায়-তলায় সে মেঘবর্ণকে রাক্ষসদের সংবাদ সরবরাহ করে, অভী জানে। এর আগেও বারকয়েক সে এসেছে এখানে। প্রথমবার রাক্ষস দেখেছিল সে এই দোকানের ভেতরেই— রবিকাকা ছিল সে-বার সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দোকানটা দেখা গেল। মেঘবর্ণ বলল, “দোকানে খদ্দের নেই দেখছি। ভালোই হল, মারীচকে একা পাওয়া যাবে।”

দোকানের জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখেই মারীচ দরজা খুলে বেরিয়ে এল; তার মুখে একই সঙ্গে ভরপুর বিস্ময় এবং হাসি। “প্রলয়যোদ্ধা! তুমি বেঁচে আছ? আমি তো শুনেছিলাম, পীতপত্রবনের আগুন নিভিয়ে তুমি...!”

“মরে গেছি?” অভী হাসল। “নাহ্, পুরোপুরি মরতে আর পারলাম কই?”

মেঘবর্ণ বলল, “মারীচ, চলো ভেতরে। কথা আছে তোমার সঙ্গে।”

“আসুন, আসুন,” বলে খুব খাতির করে মারীচ ওদের দু'জনকে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা ঘরে তার দোকানের মালপত্র বস্তাবন্দি করে রাখা আছে। তার পাশের ঘরটাতে ওদের বসতে দিল সে। এই ঘরেই প্রথমবার রাক্ষস বৈদুর্যকে দেখেছিল অভী।

মারীচ যে বারবার তার হাতে ধরা রবিকাকার ফুলঝুরির দিকে তাকাচ্ছে, তা অভীর নজর এড়ায়নি। সে বলল, “তুমি এই লাঠিটা ধরো। তোমার কাছে এটা নিয়ে আসতে বলে গেছে রবিকাকা। কেন, বলতে পারবে?”

মারীচের মুখটা শুকনো হয়ে গেল। সে বলল, “ঐশিকদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের কয়েকদিন আগে তোমার কাকা এসেছিল আমার দোকানে। তখনই সে বলে গিয়েছিল, ‘মারীচ, আমি যদি মরে যাই, তাহলে মেঘবর্ণ আর অভী আসবে এই লাঠিটা নিয়ে। আমার চিঠিটা ওদের বার করে দিয়ো।’ তার কথা দেখছি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।”

মেঘবর্ণ চমকে উঠল। “রবি এই কথা বলে গেছে তোমাকে? তার মানে ও জানত আমি বেঁচে থাকব?”

মারীচ মাথা নাড়ল। অভী বলল, “লাঠিটার গায়ে একটা লুকানো খোপ আছে, আমি আগের বারেই দেখেছিলাম। সেখানেই আবার চিঠি রেখে গেছে রবিকাকা?”

ফুলঝুরির গায়ে হাত বুলিয়ে প্রকাশমায়া প্রয়োগ করতে করতে মারীচ বলল, “তোমার রবিকাকার সঙ্গে অধিনায়ক বজ্রধরও এসেছিলেন। আমার খুব প্রশংসা করে গেলেন নীরবে আয়তনের সেবা করে যাওয়ার জন্য। ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য হল আমার।”

বলতে বলতেই একবার চোখ মুছল মারীচ। বজ্রধরের প্রতি এই গোপনচারী রাক্ষসের শ্রদ্ধা দেখে অভী বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু মেঘবর্ণ আবার অবাক হল। “অধিনায়ক স্বয়ং এসেছিলেন এখানে রবির সঙ্গে? অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না! কিন্তু কেন এগুলো আমার কাছে লুকোলেন ওঁরা?”

মারীচের হাতের স্পর্শে বাঁশের লাঠিটার গায়ের গোপন খুপরিটা খুলে গেল। তার ভেতর থেকে ভাঁজ করে রাখা চিঠিটা বার করে মেঘবর্ণের প্রসারিত হাতে তুলে দিল মারীচ।

অভী লক্ষ করল, রবিকাকার চিঠির ভাঁজ খুলতে খুলতে মেঘবর্ণের হাত কাঁপছে।

চিঠিটা খুলেই সে বলে উঠল, “আরে, এ তো রবি নয়, নীলের হাতের লেখা!”

অভীও অবাক হয়ে বলল, “বাবা চিঠি লিখে গেছে তোমাকে? আর সেই চিঠি রবিকাকা আর অধিনায়ক মিলে লুকিয়ে রেখেছেন ফুলঝুরির মধ্যে?”

ততক্ষণে প্রিয় বন্ধুর লেখা শেষ চিঠি পড়তে শুরু করে দিয়েছে মেঘবর্ণ। অভীও তার পাশ থেকে উঁকি মেরে পড়তে লাগল।

মেঘ,

তুই এই চিঠি পড়ছিস মানে আমরা চারজন আর বেঁচে নেই। আশা করছি, অভীও এখন তোর সঙ্গেই আছে। ওকে আমাদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা দিস।

প্রথমেই বলি, তুই রাগ করিস না, ভাই; অভিমানও করিস না। তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস, আমাদের সকলের সঙ্গে যমদণ্ডের মিলিত তেজ নিগ্গমনের পরেও তোর মৃত্যু কেন হল না। কারণটা বলছি, কিন্তু তার আগে বলি, এই সিদ্ধান্তটা নিতে আমাদের সকলেরই সময় লেগেছে। অধিনায়ক স্বয়ং মনে করেছেন, তোকে জীবিত রেখে যাওয়াতেই আয়তনের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল হবে। আমরা, বলা বাহুল্য, সকলেই এককথায় তাঁকে সমর্থন জানিয়েছি।

তোকে আমরা একা রেখে যেতে চাইনি, বিশ্বাস কর। কিন্তু এ-ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। একজন সমরোত্তম না থাকলে আয়তন-সহ পুরো সমরগরিমার আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষাব্যবস্থা সব ধ্বংস হয়ে যেত। তোর ওপর অনেক দায়িত্ব আমরা নিরুপায় হয়েই চাপিয়ে দিয়ে গেলাম রে।

যুদ্ধ কেমন হবে, কীভাবে আমাদের শেষ মুহূর্ত আসবে, আমরা এখনও জানি না, কিন্তু অধিনায়কের বুদ্ধিতে এইটি স্থির হয়েছে যে, যদি যমদণ্ডের মিলিত শক্তিমোচন করার মুহূর্ত আসে, তাহলে আমি তোর পোশাকের মধ্যে রাজকন্যা উর্মিমালার রেখে যাওয়া রক্তপদ্মরাগ মণিটি চুপিসারে ঢুকিয়ে দেব। ওই মণি যার কাছে থাকে, তার শেষ নিশ্বাস কিছুতেই বার হতে দেয় না। রক্ষোবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলে অধিনায়ক এই সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই এই পরিকল্পনা করেছেন। তোকে এ-বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, কারণ, বললে যে তুই কিছুতেই রাজি হতিস না, এ আমাদের চেয়ে বেশি আর কে জানে?

রক্তপদ্মরাগ মণিটি আমি চুপিচুপি চেয়ে নিয়েছি রক্ষোবৈদ্যের কাছ থেকে। অধিনায়কের আদেশে তিনিও আপত্তি করেননি। তোকে কিছু না জানানোর নির্দেশ আছে তাঁর ওপর। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদ বুঝলে এ-জিনিস নীরবে তোর কাছে পৌঁছে যাবে, তুই বুঝতেও পারবি না।

আবার বলছি, রাগ করিস না, দুঃখ পাস না। আয়তনের জন্য আত্মত্যাগ করার অনেক সুযোগ তুই পরেও পাবি, নিশ্চিত। কিন্তু আপাতত আয়তন এবং সমরগরিমার সকলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার কথা ভেবে এইটুকু চালাকি তোর সঙ্গে করতে হল, ভাই।

আর বেশি কিছু বলব না। লতা অনেক কষ্ট পেয়েছে জীবনে; তার যত্ন নিস। আমাদের অভীটাকে দেখিস, তার বাবা-মা হিসাবে আমরা তোকে এই অনুরোধ জানিয়ে রাখছি। আর শুধু অভী নয়, সমরগরিমার সবাইকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোকে দিয়ে গেলাম আমরা, মেঘ।

ওপারে আসবি যখন, তখন আবার দেখা হবে। আপাতত চললাম রে বন্ধু।

নীল

নীলাভ-র নামের নিচে নিজেদের হস্তাক্ষরে সই করেছেন সব সমরোত্তম।
অভী দেখতে লাগল নামগুলো— সমরোত্তম শ্যামশ্রী, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর,
সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর।

চিঠিটা হাতে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল মেঘবর্ণ; তার ফোঁটা-ফোঁটা চোখের
জল এসে পড়তে থাকল কাগজটার ওপর। অভী একটা হাত তার পিঠে রেখে
তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

তার নিজেরও বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসতে চাইছে কান্না। মনে
পড়ে যাচ্ছে আয়তনের ছাদে সেদিন বাবা-মায়ের কাছে বসে শোনা কথাগুলো।
নীলাভ বলেছিল তাকে, “যদি দেখা যায়, তুই রয়ে গেলি কিন্তু আমরা আর
থাকলাম না, তাহলে মনে রাখিস, বাবা-মা দু’জনেই তোকে ভীষণ ভালোবাসত।”

হ্যাঁ, বাবা-মা ভালোবাসত তাকে, তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। চিরজীবন
মনে রাখবে সে এ-কথা।

মারীচ ওদের দু’জনকে কক্ষের মধ্যে রেখে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল বাইরে।
অভীর একবার মনে হল, তার হাত যেন আবার ঠান্ডা হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু
কই, তার মধ্যে তো আর একটুও ঘৃণা নেই? তাহলে?

যুদ্ধে মৃত শিক্ষার্থী এবং সৈনিকদের যথোচিত মর্যাদায় সমাহিত করা হল পরের
দিন সকালবেলা। আয়তনের সব শিক্ষার্থীকে জড়ো করল মেঘবর্ণ অনুশীলন
মঞ্চের মাঠে। লীনা, অভী আর নিধি দাঁড়িয়ে রইল বাকি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে।
অভীর কাঁধের ওপর বসে রইল স্বর্ণখেচর। তাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে
ছিল সন্দীপ, মৃগেন্দ্র, উষসী, নীপা, দেবদত্ত। আয়তনের একপাশে নেমে এল
অভীর অপরাজিতা, মেঘবর্ণের আহুদি, বজ্রধরের সুসভ্য-সহ জটায়ুবাহিনীর
প্রত্যেকটি মহাগৃধ্র। সমগ্র মায়াজগতের মঙ্গলের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন,
সেই সব মানুষ, রাক্ষস এবং অর্ধরাক্ষসের অবদানকে নতশিরে স্মরণ করল
সমরগরিমার সবাই।

অভীর নেতৃত্বে ‘সমরোত্তম সমরগরিমা’ নামের সেই হাতের পাঁচ আঙুলের
ভাস্কর্যটিকে সংগ্রহশালা থেকে সদ্যনির্মিত প্রস্তরবেদির ওপর এনে রাখা হল
মঞ্চের সামনে। তার সামনে জ্বালানো হল প্রদীপ।

ভিড় করে এসেছে মানবমন্দিরের মানুষ আর সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসরা।
সেই ভিড়ের মধ্যে অনেকগুলো চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছিল অভী— লতাকাকিমা,
তরুণের মা, ফলদোকানি সুচিত্র, ছায়াভবনের সঞ্জীব, নিয়ামকের কার্যালয়ের
অসিত, মৃগেন্দ্রর বাবা রথীন্দ্র, নিধির বাবা এবং মা।

মেঘবর্ণের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রক্ষোবৈদ্য। তাঁর সাদা দাড়ি কাঁপছে
সকালের হাওয়ায়। তাঁর পাশেই উত্তরার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল পর্বত; তার গায়ে
গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার কুকুর বক্রপুচ্ছ।

মেঘবর্ণ বলল, “এই বেদির নাম শান্তিবেদি। যে সমরোত্তমগণ, যে শিক্ষার্থীগণ, যে সৈনিকগণ প্রত্যেকটি জীবের প্রাণরক্ষা করার জন্য অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের যেন আমরা কোনোদিন ভুলে না যাই, তার জন্য নির্মিত হল এই বেদি। বেদির গায়ে লেখা রইল সমরগরিমার জন্য আত্মোৎসর্গকারী প্রত্যেক মানুষ, অর্ধরাক্ষস এবং রাক্ষসের নাম। নিয়তি যেন আমাদের ওঁদের মতোই অকুতোভয় করেন। আমরা যেন আমাদের সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করে ওঁদের সকলের মতো কর্তব্যে অবিচল থাকতে পারি, এই আজ নিয়তির কাছে আমাদের প্রার্থনা।”

অভী দেখতে পাচ্ছিল শান্তিবেদির গায়ের নামগুলো— চারজন সমরোত্তমের নিচে আরও কত পরিচিত নাম— তরুণ, উর্মি, অরিত্র, চক্রবাক, পুনর্বসু, কল্পনাথ...

মেঘবর্ণ আবার বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর আমার ওপর ন্যস্ত করে গেছেন আয়তনের মঙ্গলসাধনের গুরুদায়িত্ব। আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো আদেশ আমি লঙ্ঘন করিনি; আজও করব না। আগামীকাল আয়তনের অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। তার পরের দিন থেকে যথানিয়মে শিক্ষার্থীদের অস্ত্র অনুশীলন শুরু হবে। যে সমরগরিমার কল্যাণের জন্য এতজন আত্মত্যাগ করেছেন, তার গৌরব আমরা আগের মতোই অক্ষুণ্ণ রাখব।”

প্রত্যেকে সমস্তরে মেঘবর্ণের কথায় সায় দিল। তারপর প্রত্যেকে শান্তিবেদির সামনে গিয়ে মাথা নত করে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এল।

তখনও শান্তিবেদিতে পুষ্প-অর্পণ অনুষ্ঠান চলছে, এমন সময় লীনা একসঙ্গে অভী আর নিধির হাত ধরে টানল; ফিসফিস করে বলল, “ওই দ্যাখো।”

অভী আর নিধি অবাক হয়ে দেখল, নিধির বাবা দিঙনাগ এগিয়ে এসেছেন একমুঠো ফুল নিয়ে। হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি শান্তিবেদির সামনে, তারপর মাথা নীচু করে ফুল নিবেদন করলেন বেদির পাদদেশে।

নিধি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। দিঙনাগ আবার উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন সুদক্ষিণসারি থেকে আসা অর্ধরাক্ষসদের ভিড়ের মধ্যে।

অভী বলল, “এ-জিনিস ওঁর কাছ থেকে আমি অন্তত আশা করিনি।”

নিধি বলল, “আমি তো করিইনি।”

লীনা বলল, “নিধি, তোমার মা আসছেন এইদিকেই।”

ওরা একটু অবাক হল। নিধির মা জমায়েত মানুষ-অর্ধরাক্ষসের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে। লীনা বলল, “কী ব্যাপার, নিধি? কাকিমা কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?”

নিধি বলল, “জানি না। বুঝতে পারছি না।”

প্রৌঢ়া অর্ধরাক্ষস মহিলা এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। অভী আর লীনা সঙ্গে-সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। তিনি ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, “নিধি, একবার বাড়ি আসবি না?”

নিধি ভিড় পেরিয়ে তাকাল অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দিঙনাগের দিকে। তিনিও তাকিয়ে ছিলেন এইদিকেই; মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিলেন।

নিধি স্থিরভাবে চেয়ে রইল মায়ের দিকে। “কেন আমি বাড়ি যাই না, তুমি তো জানো, মা।”

ভদ্রমহিলা একবার চোখের কোণ মুছে নিলেন আঙুল দিয়ে; তারপর বললেন, “তোরা বাবা বলছিল, ‘বড়ো-মা-কে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। একবার ওকে আসতে বলো না।’ আসবি না?”

নিধিকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে অভী আর লীনা একসঙ্গে বলে উঠল, “যাবে বইকি, কাকিমা। আপনি যান, ও এখুনি যাচ্ছে।”

তিনি চলে যাওয়ামাত্র লীনা বলল, “নিধি, কোনো কথা শুনতে চাই না। এখনই যদি একবার বাড়ি না যাও, বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে, বলে রাখছি।”

অভী বলল, “ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কঙ্কাল ঝোলানোর কথাটা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই?”

নিধি এবার হেসে ফেলল। “আচ্ছা, যাব। আর ভয় দেখিয়ো না তোমরা।”

সম্মেলন কক্ষে বসেছিল অভী আর লীনা। মেঘবর্ণ আসতে বলেছে ওদের। নিধি আপাতত নেই; সে বাড়ি গেছে— এখনও ফেরেনি।

একজন অতিথি নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে আয়তনে আসবেন; তিনি চেয়েছেন, অভী, লীনা এবং রক্ষোবৈদ্য যেন তখন উপস্থিত থাকেন।

এই অজানা অতিথিটি কে, অভীর কোনো ধারণাই নেই। তবু সে এসেছে; লীনাও এসেছে তার সঙ্গে। এখন লীনা অনেকটাই সুস্থ। সামান্য দুর্বলতা ছাড়া আর কোনো অসুবিধা তার নেই।

এখানে আসার আগে একবার সংগ্রহশালায় গিয়েছিল ওরা দু’জন। সমরোত্তমদের লেখা শেষ চিঠি আর উর্মির রক্তপদ্মরাগ— এই দুটো জিনিস চন্দ্রহাসের খালি কাচের বাস্কের মধ্যে রেখে এসেছে অভী। রক্ষোবৈদ্য তাকে মণিটা দিয়ে বলেছিলেন ওটা রেখে আসতে চিঠিটার সঙ্গে। সেদিন শেষ যুদ্ধে মেঘবর্ণ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তার পোশাকের মধ্য থেকে গড়িয়ে মণিটা পড়ে গিয়েছিল মৃত দেবতার নদীর বালির ওপর; সেখান থেকে ওটাকে খুঁজে বার করে কুড়িয়ে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন রক্ষোবৈদ্য।

জিনিসদুটো সংগ্রহশালায় রেখে সম্মেলন কক্ষে এসে বসল ওরা দু’জন। এইটুকু সময় একান্তে লীনার সঙ্গে কাটাতে চাইছিল অভী। চুপ করে তাকিয়ে ছিল সে প্রিয় বান্ধবীর মুখের দিকে। লীনা হেসে বলল, “কী দেখছ এত, প্রলয়যোদ্ধা? অগ্নিদানবকে?”

অভীও হাসল। “অগ্নি দেখছি তোমার চোখে, দানবকে তো দেখতে পাচ্ছি না।”

তার নাকটা ধরে নেড়ে দিল লীনা। “খুব কথা শিখেছ দেখছি এই ক’দিনে।”
অভী বলল, “হ্যাঁ, অনেকদিন তুমি চুপচাপ ছিলে কিনা, তাই অনেক কথা জমে আছে।”

তার হাত ধরল লীনা। “তা-ই বুঝি? কী কথা জমে আছে, বলো শুনি।”

“বলব?”

“বলোই না।”

লীনার হাত নিজের দু’হাতে চেপে ধরে উষ্ণতাটুকু অনুভব করতে করতে তার চোখের দিকে চেয়ে রইল অভী। অদ্ভুত একটা ভালোলাগায় যেন ভরে যাচ্ছে তার ভেতরটা। ফিসফিস করে সে বলল, “এখন নয়, পরে বলব।”

লীনা হি-হি করে হেসে বলল, “ভীতু, ভীতু! প্রলয়যোদ্ধা ভীতু!”

হাসিটা তার বড়ো ছোঁয়াচে। অভীও হেসে ফেলল ফিক করে। তারপরেই চমকে উঠে লীনার হাত ছেড়ে দিল সে। খোলা দরজা দিয়ে সম্মেলন কক্ষে ঢুকছে পর্বত।

পর্বত দেখেছে দৃশ্যটা, কিন্তু কিছু না বলে একটু মুচকি হেসে সে গিয়ে বসে পড়ল নিজের আসনে। অভীর কান লাল হয়ে উঠল।

পর্বত বলল, “এখন কেমন আছ, লীনা?”

লীনা বলল, “ভালো আছি, পর্বতদা। বউদি কেমন আছে?”

“সে দিব্যি আছে। রক্ষোবৈদ্য তাকে সেবাকক্ষে নিজের সহকারী করে নিয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রটা ওঁর কাছে মন দিয়ে শিখছে সে। মাল্যপর্বতের থেকে এখানে অনেক ভালো আছে উত্তরা।”

অভী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রক্ষোবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেতরে এসে ঢুকল সমরোত্তম মেঘবর্ণ।

মেঘবর্ণের হাতে একটা চিঠি; সেটা রক্ষোবৈদ্যের সামনে তুলে ধরে সে বলছিল, “এখানেই উনি লিখেছেন, আলোকপর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়ার পরেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল মাল্যপর্বতের ঘটোংকচ বাহিনী; নয়তো সেদিনের যুদ্ধে তাদেরকেও দেখতে পেতাম আমরা। যাকগে, ওই বাহিনী আসেনি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে।”

কক্ষের বাইরে অলিন্দে পদশব্দ শোনা গেল। দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে মেঘবর্ণ ঘোষণা করল, “আমাদের অতিথি এসে গেছেন।”

পরক্ষণে কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন রক্ষোপুরীর প্রাক্তন সেনানায়িকা প্রজ্ঞা। মেঘবর্ণ নমস্কার করে বলল, “সমরগরিমা আয়তনে আপনাকে স্বাগত।”

প্রজ্ঞাও কক্ষের প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আপনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে সমরোত্তম মেঘবর্ণকে চিঠি লিখেছেন, শুনলাম?”

প্রজ্ঞা বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তিনজনের কাছে আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। সমরোত্তম মেঘবর্ণ, তারপর একটি অনুরোধ করব আপনাকে। তবে সেই অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন কি না, তা একান্তই আপনার সিদ্ধান্ত।”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনি কী বলতে চান, নিঃসঙ্কোচে বলুন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “অভী, লীনা, প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। লীনা, আমার ছেলে সুতসোম যেভাবে অবিবেচকের মতো তোমার ওপর হৃদয়শর মায়া প্রয়োগ করেছিল, এবং তার জন্য তোমাকে এবং তোমার নিকটজনদের যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত।”

লীনা বলল, “সুতসোম যা করেছে, তা একেবারেই তার নিজের সিদ্ধান্ত। তার জন্য আপনি অনুতপ্ত হচ্ছেন কেন? আমরা সে-জন্য আপনার ওপর আদৌ ক্রুদ্ধ নই।”

প্রজ্ঞা বললেন, “অভী, এই একই কারণে আমি তোমার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তার সব অনুচিত কাজ সত্ত্বেও তুমি যেভাবে তাকে নিজের ভাইয়ের মতো স্নেহ দিয়েছ, তার জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আজ সে আর নেই, তবু বলছি, যদি মনে মনে তার প্রতি কোথাও রাগ থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা কোরো। ও যত বড়ো মায়াযোদ্ধাই হোক না কেন, আসলে ও তো একটা বাচ্চা ছেলে, এইটুকু শুধু তোমরা মনে রেখো।”

অভী বুঝতে পারছিল, একটা অসহায় অপরাধবোধ প্রজ্ঞাকে অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে; কিছুতেই স্থির হতে দিচ্ছে না। সে ধীরে-ধীরে বলল, “আপনি দয়া করে শান্ত হোন। এ-সব কথা আমি এখনও কাউকে বলিনি, কিন্তু আপনার কষ্ট দেখে না বলে পারছি না। শেষ যুদ্ধে যখন আমি পাণ্ডপত প্রয়োগ করেছিলাম, তখন মৃত দেবতা আমাকে মৃত্যুর ওপারের দৃশ্য দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সেই সময় সুতসোমকে দেখেছি আমি। এইটুকু বলতে পারি, তার আর কোনো কষ্ট নেই।”

প্রজ্ঞা মুখ নামিয়ে নিলেন; মৃদু স্বরে একবার শুধু বললেন, “ধন্যবাদ, অভী।”

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। সকলেই তাঁকে সামলে নেওয়ার এই সময়টুকু দিল; কেউ কোনো কথা বলল না।

তারপর তিনি মুখ তুলে তাকালেন রক্ষোবৈদ্যের দিকে। “রক্ষোবৈদ্য, আপনার কাছে আমার যেটুকু বলার, তাকে একজন যুদ্ধক্লান্ত রাক্ষসের স্বীকারোক্তি বলতে পারেন। আপনি আমাদের রাক্ষসদের আদর্শ হতে পারতেন, কিন্তু আমরা শুধু যুদ্ধকেই ভালোবেসেছি। আপনার জীবনদর্শনকে বুঝতে চেষ্টা করলে রাক্ষসজাতির এতদিনে অনেক উন্নতি হত।”

রক্ষোবৈদ্য একটু হেসে বললেন, “আমি কী করেছি, আমি জানি না। অধিনায়ক বজ্রধর না থাকলে যেটুকু করতে পেরেছি, তা-ও পারতাম না, শুধু এইটুকু জানি। তবে হ্যাঁ, আপনার ওই ‘যুদ্ধক্লান্ত’ কথাটার সঙ্গে আমি একমত। আমার জাতির যুদ্ধপ্রিয়তা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়েই আমি সরে এসেছিলাম ওই জীবন থেকে। আমি যখন পেরেছি, আপনিও পারবেন।”

প্রজ্ঞা মাথা নত করে বললেন, “আশীর্বাদ করবেন।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “আমার শুভকামনা রইল আপনার প্রতি।”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনি আমাকে একটা অনুরোধ করবেন বলেছিলেন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “হ্যাঁ। যে রাজার রাজত্বে আমার জীবনের সব সফলতা পেয়েছি, সেই পুনর্বসু আর নেই। সুতসোমও নেই। সিংহাসনে সৌজন্য যতদিন ছিল, ততদিন কর্তব্যের খাতিরে আমাকে থাকতে হয়েছে। কিন্তু মাল্যপর্বতের প্রতি আমার যেটুকু টান ছিল, তা এবার ফুরিয়েছে। অভিজাত বিমোহক আর পত্রতিলক রাক্ষসরা মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করবেন শীঘ্রই; রাজা আর কেউ থাকবেন না মাল্যপর্বতে। আমার আর ওখানে কোনো কাজ নেই; ওই শূন্যপুরীতে এতকালের স্মৃতিগুলো আমাকে কেবল যন্ত্রণাই দিচ্ছে। আমি আর ওই প্রাসাদে থাকতে পারছি না। আপনি কি আমাকে সমরগরিমায় স্থান দেবেন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ খুশিমুখে বলল, “সানন্দে। আপনার মতো একজন যুদ্ধবিশারদকে পেলে আমাদের আয়তনের মঙ্গলই হবে।”

প্রজ্ঞা হাসলেন। “না সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এ-জীবনে আর অস্ত্র স্পর্শ করব না। অনেক যুদ্ধ করা হয়ে গেছে আমার। বাকি জীবনটুকু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কাটাতে পারলেই আমার শান্তি।”

অভীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল অধিনায়ক বজ্রধরের একটা কথা। সে বলল, “আমি একটা কথা বলতে চাই। বলব?”

মেঘবর্ণ বলল, “অবশ্যই।”

“অধিনায়ক বজ্রধর একবার আমাকে বলেছিলেন, সেনানায়িকা প্রজ্ঞার মতো ঠান্ডা মাথার সৎ মহিলাকে আমাদের সমরগরিমার প্রশাসনিক পদে পেলে বড়ো ভালো হত।”

রক্ষোবৈদ্য তাকে সমর্থন করে বলে উঠলেন, “অধিনায়ক এই কথা আমার কাছেও একবার বলেছিলেন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

মেঘবর্ণ একবার অভী আর একবার রক্ষোবৈদ্যের দিকে তাকাল; বলল, “আমি যা ভাবছি, আপনারাও কি সেই একই কথা ভাবছেন?”

অভী বলল, “আমি তো তা-ই ভাবছি।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আমিও।”

লীনা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অভীর দিকে তাকাল। সে এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। অভী নীচুগলায় তাকে বলল, “একটা শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন উনি।”

মেঘবর্ণ বলল, “পর্বত, তুমি কী বলো?”

পর্বত বলল, “আমার মতে, ওঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি এই মুহূর্তে সমরগরিমায় আর কেউ নেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “অতি উত্তম। মাননীয় প্রজ্ঞা, আপনি কি আমাদের সমরগরিমার নিয়ামক পদে যোগদান করে আমাদের সম্মানিত করবেন?”

প্রজ্ঞা অবাক হয়ে কক্ষের সকলের মুখের দিকে তাকালেন। এই প্রস্তাব আসতে পারে, তিনি ভাবতে পারেননি।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, “আপনারা যে এই সম্মানিত পদের জন্য আমার কথা ভেবেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের অনুমতি

পেলে আমি এই পদে যোগদান করতে রাজি। তবে সমরগরিমার আইন সংক্রান্ত বইপত্র যা আছে, সেগুলি আমাকে একবার পড়ে নিতে হবে।”

নতুন নিয়ামককে স্বাগত জানিয়ে করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সম্মেলন কক্ষ।

লীনা আর নিধিকে নিয়ে অভী বসে ছিল মানবমন্দিরের একটা পুকুরের ধারে। তার কাঁধে বসে ঝিমোচ্ছিল স্বর্ণখেচর পাখিটা। মেঘবর্ণ লীনাদের বাড়িতে গেছে লতার কাছে; তাদের মধ্যকার ভুল-বোঝাবুঝি মিটে গেছে।

অভী বলছিল, “প্রলয়যোদ্ধা নামের বোঝাটা যেন এতদিন আমার দমবন্ধ করে রাখত, জানো তোমরা?”

লীনা বলল, “জানি না, কিন্তু অনুমান করতে পারি। তবে, অভী, ফিরে আসার পর দেখছি, তোমার চেহারা আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে; চোখের কোলে যে কালি পড়েছিল, সেটা মিলিয়ে গেছে।”

অভী বলল, “এত খারাপের মধ্যে আর একটা ভালো জিনিস হয়েছে। সেই মারাত্মক ঘণাবোধকে আমি নিজের মধ্যে এখন আর অনুভব করতে পারি না। রণিতের মতো বিচ্ছু ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালেও আমার ঘণা হবে না, আমি জানি। এই দ্যাখো, আর আমি বরফ জমাতে পারছি না।”

হিমকুশলতা প্রয়োগ করে হাত থেকে বরফের একটা ধারা বার করে আনার চেষ্টা করল অভী। হাত এখনও ঠান্ডা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই হিমশ্রোত আর নিজের হাতে ডেকে আনতে পারছে না সে।

একবার তার মনে হল, কী যেন একটা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি এখনও কাজ করছে তার মধ্যে, কিন্তু বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে না।

নিধি বোধহয় কিছু আঁচ করে থাকবে। সে বলল, “কী হল তোমার? কী ভাবছ?”

মনের অস্বস্তি চেপে রেখে এক আঁজলা জল পুকুর থেকে তুলে নিয়ে অভী বন্ধুদের দেখাল। “দ্যাখো, এই জলকে আর কিছুতেই বরফ করে তোলা যাচ্ছে না।”

বন্ধুরা তার দিকে একবার তাকাল, তারপর তাকাল পুকুরটার দিকে। নিধি গলার মধ্যে একটা হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করল। স্বর্ণখেচরও চমকে গিয়ে ডানা ঝটপট করে উঠল অভীর কাঁধের ওপর। লীনা উত্তেজিত স্বরে বলল, “অভী, সামনে তাকিয়ে দেখো একবার!”

তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে পুকুরটার দিকে তাকিয়েই অভী ভীষণভাবে চমকে উঠল; অঞ্জলিবদ্ধ জলটা মাটিতে পড়ে গেল আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

তার হাত ডোবানোর পরেই অত বড়ো পুকুর পুরোটা ঢেকে গেছে সাদা বরফের আস্তরণে।

সমাপ্ত

।। পরিশিষ্ট ।।

পাঠক, আপনার অস্ত্রপরীক্ষা।

ধরুন, আপনার হাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিয়তির নীল আত্মনচিহ্ন। সেই নিয়তिलाङ्गন আপনাকে নিয়ে এসেছে সমরগরিমা আয়তনে। অভীর প্রথমবার আয়তনে পা দেওয়ার পর যা হয়েছিল, সেইরকম ভাবে আপনার জন্যেও অপেক্ষা করে আছে অস্ত্রপরীক্ষা। কী করবেন আপনি?

অস্ত্রপরীক্ষা তো শুধু অস্ত্রের পরীক্ষা নয়, তা মানসিকতার পরীক্ষা, যোদ্ধার দৃঢ়তার পরীক্ষা। কেমন ফল করবেন আপনি সে পরীক্ষায়? আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন প্রাথমিক অস্ত্র আপনার জন্য বাছবেন দুর্ধর্ষ অস্ত্রশিক্ষকেরা? চলুন, দেখা যাক।

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য যে উত্তরটি আপনি বাছবেন, তার পাশে নম্বর দেওয়া আছে। নিজের প্রাপ্ত নম্বরগুলি যোগ করতে থাকুন পরপর। মনে রাখবেন, এখানে কোনো উত্তরই ঠিক নয় বা কোনোটিই ভুল নয়। নিজের পছন্দ অনুযায়ী সবচেয়ে কাছাকাছি উত্তরটি বেছে নিন। তারপর পনেরোটি প্রশ্নের শেষে যোগফল মিলিয়ে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন অস্ত্র আপনার হাতে উঠল, তা দেখে নিন শেষ পাতায়।

সমরোত্তম মেঘবর্ণকৃত অস্ত্রপরীক্ষা।

সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর ও সহ-অধিনায়িকা শ্যামলী দ্বারা অনুমোদিত।

১) আপনার অস্ত্র কতটা ভারী হোক, আপনি চান?

ক. বেশ হালকা	৩০
খ. মাঝারি	১০
গ. অমানুষিক ভারী	৪০
ঘ. ভীষণ ভারী নয়, তবে খুব হালকাও নয়	২০

২) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সামনে পড়লে আপনার প্রথম কাজ কী হবে?

ক. আগে আক্রমণ করা	৪০
খ. পিছিয়ে এসে শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করা	১০
গ. নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেওয়া	২০
ঘ. পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করে শত্রুর দুর্বল জায়গা অনুসন্ধান করা	৩০

৩) কেমন লড়াই লড়তে ভালোবাসেন আপনি?

- | | |
|---|----|
| ক. মুখোমুখি— একজনের বিরুদ্ধে আর একজন | ২০ |
| খ. সবার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া | ৪০ |
| গ. একটু দূর থেকে, বেশি পরিশ্রম না করে | ৩০ |
| ঘ. নিখুঁত আঘাতে একটি একটি করে শত্রু নাশ করা | ১০ |

৪) যুদ্ধক্ষেত্রে এক যোদ্ধার কোন গুণটি সবচেয়ে দরকারি বলে মনে করেন আপনি?

- | | |
|-------------------------------|----|
| ক. দৈহিক ক্ষমতা | ৪০ |
| খ. অস্ত্রভাণ্ডার | ৩০ |
| গ. চাতুর্য | ২০ |
| ঘ. দূর থেকে আঘাত হানার ক্ষমতা | ১০ |

৫) আপনি যদি যুদ্ধের নেতা হন, তাহলে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

- | | |
|---|----|
| ক. নিজের অস্ত্রকৌশল বৃদ্ধির দিকে মন দিয়ে বেশি অনুশীলন করবেন। | ২০ |
| খ. বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে তরতাজা রাখবেন | ৪০ |
| গ. সেনাদলের সঙ্গে বেশি সময় কাটাবেন ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেবেন | ১০ |
| ঘ. শত্রুর ও নিজেদের দুর্বলতার তুল্যমূল্য বিচার করবেন। | ৩০ |

৬) যদি মায়াশক্তি ব্যবহার করতে চান, তাহলে কেমন মায়া আপনার পছন্দ?

- | | |
|--|----|
| ক. অভীর মতো হিমকুশলতা | ৫ |
| খ. শ্যামশ্রীর মতো দূরবস্তু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা | ৩৫ |
| গ. সুতসোমের মতো অন্যের মনের কথা পড়তে পারা | ২৫ |
| ঘ. উর্গায়ুর মতো রূপান্তর মায়া | ১৫ |

৭) কোন দৈবাস্ত্রটি আপনি জীবনে একবার হলেও ধারণ করতে চান?

- | | |
|--------------------|----|
| ক. ভীমের গদা | ৩৫ |
| খ. পরশুরামের কুঠার | ২৫ |
| গ. চন্দ্রহাস | ১৫ |
| ঘ. যমদণ্ড | ৫ |

৮) যে মায়াপ্রাণীটি আপনার বশ্যতা স্বীকার করলে আপনি
খুশি হবেন।

- | | |
|----------------|----|
| ক. মহানীলগৃধ্র | ১৫ |
| খ. উড্ডীনখর | ৫ |
| গ. নীরসেনা | ২৫ |
| ঘ. মহাসর্পিণী | ৩৫ |

৯) দিনের কোন সময়ে আপনি যুদ্ধ করতে বেশি স্বচ্ছন্দ?

- | | |
|-------------------|----|
| ক. সকালে | ১৫ |
| খ. দুপুরের রৌদ্রে | ৫ |
| গ. রাতের অন্ধকারে | ৩৫ |
| ঘ. গোধূলিতে | ২৫ |

১০) কোনো বস্তুতে মনঃসংযোগ করতে বললে আপনি কতক্ষণ
পারবেন?

- | | |
|--|----|
| ক. পাঁচ থেকে দশ মুহূর্তের বেশি নয় | ৩৫ |
| খ. কমবেশি পাঁচ মিনিট | ১৫ |
| গ. যতক্ষণ বলা হবে, ততক্ষণই | ২৫ |
| ঘ. আমি কোনো কিছুতেই বেশিক্ষণ মন লাগিয়ে রাখতে
পারি না | ৫ |

১১) যুদ্ধক্ষেত্রে ন্যায়যুদ্ধ ব্যাপারটা আপনি কতটা জরুরি মনে
করেন?

- | | |
|---|----|
| ক. এটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয় | ২৫ |
| খ. ন্যায়যুদ্ধ সম্ভব হলে ভালোই, নাহলেও ক্ষতি নেই | ১৫ |
| গ. ন্যায়যুদ্ধ আবার কী? জয়লাভ করা নিয়ে কথা | ৫ |
| ঘ. যারা ন্যায়যুদ্ধ করে, তাদের আমি দুর্বল মনে করি | ৩৫ |

১২) আপনি নিজেকে কতটা রাগী মনে করেন?

- | | |
|---|----|
| ক. আমার শরীরে রাগ নেই। আমি অতি ঠান্ডা মাথার মানুষ। | ৫ |
| খ. পরিস্থিতি সেরকম হলে রেগে যাই বইকি, তবে চট
করে সামলেও নিই। | ১৫ |
| গ. দ্রুত রেগে যাই। রাগ কমতে সময় লাগে। | ২৫ |
| ঘ. একবার রেগে গেলে কারও রক্ষা নেই। | ৩৫ |

১৩) মানুষের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু কে?

ক. অর্থসম্পদ	১৫
খ. অটুট স্বাস্থ্য	২৫
গ. বুদ্ধিবৃত্তি	৫
ঘ. ধৈর্যশক্তি	৩৫

১৪) যোদ্ধা হিসাবে নিজেকে কেমন মনে করেন আপনি?

ক. নেতৃত্বগুণবান, জেদি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী	৩০
খ. নীরব, চতুর, সতর্ক	১০
গ. দুঃসাহসী, আবেগপ্রবণ, সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন	৪০
ঘ. আত্মবিশ্বাসী, উদ্ভাবক, অসমসাহসী	২০

১৫) সমরগরিমা আয়তনের এই চার যোদ্ধার মধ্যে কাকে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ?

ক. মেঘবর্গ	২০
খ. বজ্রধর	১০
গ. শ্যামশ্রী	৩০
ঘ. পর্বত	৪০

এইবার আপনার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের সঙ্গে মিলিয়ে নিন আপনার ফলাফল।

২০০-এর কম : ধনুর্বাণ

২০৫— ৩৩০ : তরবারি

৩৩৫— ৪৫০ : মায়াযুদ্ধ

৪৫০-এর ওপর : গদা

ধনুর্বাণ

আপনার মধ্যে দক্ষ ধনুর্ধর যোদ্ধা হয়ে ওঠার গুণ আছে। সাধারণত আপনি স্বাধীনচেতা স্বভাবের; একাই নিজের কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। দূর থেকে এবং চুপিসারে শত্রু তথা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে আপনি ভালোই পারেন। সামনাসামনি শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার থেকে আপনি তিরের মুখে তার আক্রমণের জবাব দেওয়াই পছন্দ করেন। আপনি শান্ত, কিন্তু অতি শানিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

সমরোত্তম মেঘবর্গ আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতে।

তরবারি

আপনার মধ্যে বৃহৎ সেনাদলকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ আছে, কিন্তু একই সঙ্গে আপনি একাও শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পান না। আপনি চাইলে জীবনযাপনে বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু দরকার পড়লে শত্রুকে অস্ত্রমুখে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলার দক্ষতা আছে আপনার। আপনি চতুর এবং সাহসী; শত্রুর দুর্বলতা মেপে আক্রমণে যেতে জানেন। অন্যদের বিশ্বাসের মূল্য আপনি দিতে জানেন এবং প্রয়োজনমতো পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন; তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি আপনার দলের অমূল্য যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারেন।

সমরোত্তম মেঘবর্গ আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন তরবারি অভ্যাস করতে।

মায়া

পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। বিপুল পরিমাণ ক্ষমতার আধার আপনি। দুর্নিবার যোদ্ধার গুণাবলি তো আপনার মধ্যে আছেই, তার সঙ্গে আছে প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং ন্যায়বোধ। জীবনের যুদ্ধ থেকে আপনি পালিয়ে আসাকে ঘৃণা করেন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব তথা মায়াশক্তি দিয়ে আপনি বহু গুণমুগ্ধকে অনুপ্রাণিত করেন। আপনার মধ্যে সুপ্ত ক্রোধ আছে, কিন্তু সেই ক্রোধকে আপনি বাস্তববুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। বুদ্ধি এবং ক্ষমতার এই মেলবন্ধন আপনাকে মায়াশক্তির উপযুক্ত চালক করে তুলতে পারে।

সমরোত্তম মেঘবর্গ আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন মায়াচালনা অভ্যাস করতে।

গদা

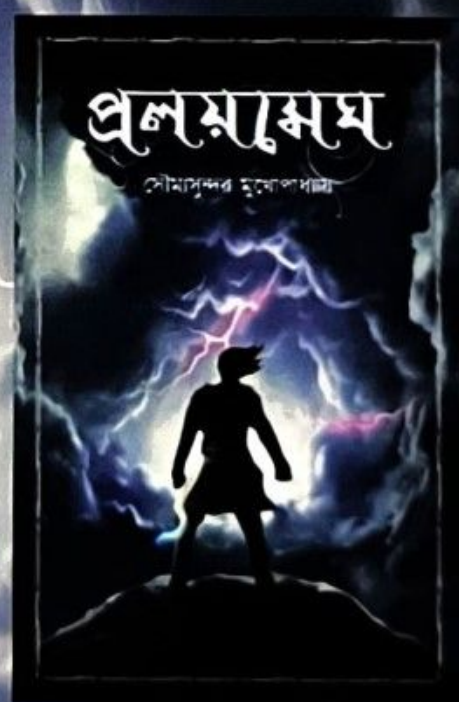
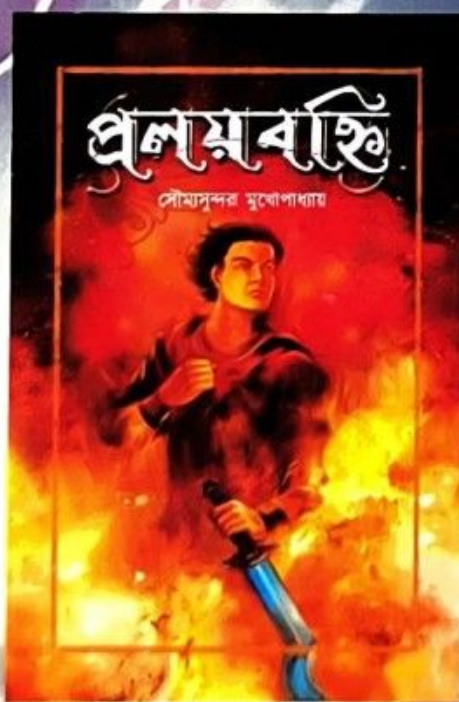
যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং ভীমের মতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারেন আপনি। আপনার মধ্যে তীব্র যুদ্ধোন্মাদনা ও ক্রোধ রয়েছে, যা দিয়ে আপনি নিম্নোক্তে বহু শত্রুসৈন্য নাশ করতে পারেন। উত্তেজিত হলে মত্ত হস্তীর মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন আপনি এবং শত্রুরা এই ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার জন্য মনে-মনে আপনাকে ভয় করে। আপনার মধ্যে জয়লাভের তীব্র আবেগ রয়েছে এবং বহু আঘাত সহ্য করেও আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকতে পারেন।

সমরোত্তম মেঘবর্গ আপনাকে উপদেশ দিচ্ছেন গদা অভ্যাস করতে।

সমরগরিমা আয়তনে আপনাকে স্বাগত।



জন্ম মেদিনীপুর শহরে ১৯৮৫
সালে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।
পেশায় স্কুলশিক্ষক। নেশায় পাঠক।
দুঃসাহসে লেখক। লেখেন মূলতঃ
কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসি। বাংলা ও
ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখালিখি
করছেন দেশ ও দেশের বাইরের
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গল্প-
সংকলনে। অস্ট্রেলিয়া এবং
আমেরিকার একাধিক স্পেকুলেটিভ
সংকলন ও পত্রিকায় প্রকাশিত
হয়েছে বেশ কিছু গল্প। হলিউডে
অনুষ্ঠিত কল্পসাহিত্য প্রতিযোগিতা
এল. রন হারবার্ডের নামাঙ্কিত
'রাইটার্স অফ দ্য ফিউচার'-এ
একমাত্র ভারতীয় হিসাবে পরপর
দু'বছর পেয়েছেন 'অনারেবল
মেনশন'-এর সম্মান। ভালোবাসেন
বেড়াল, ব্যাটম্যান, সুকুমার রায়
এবং নলেন গুড়ের সন্দেশ।



aranyamon.com



9 789393 645951

Rs : 500.00